সংস্কৃত উপরূপক ও নির্বাচিত রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্য : নান্দনিক প্রসঙ্গ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. উপাধিপ্রাপ্তির
জন্য প্রদেয় গবেষণাসন্দর্ভ

গবেষক : সমীপেষু দাস

নিবন্ধনক্রম : A00SA1200918

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. শিউলি বসু

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৪

Saṃskr̥ta Uparūpak(a) O Nirvācita Rabīdranāṭyasāhitya : Nāndanik(a) Prasaṅga

A thesis submitted to the Faculty of Arts of Jadavpur University in partial fulfilment for the Award of the Degree of Ph.D. in Sanskrit

Submitted by

Samipeshu Das

Registration No : A00SA1200918

Under the Supervision of

Dr. Shiuli Basu

Professor, Dept. of Sanskrit

Jadavpur University

2024

Certificate

Certified that the Thesis entitled **সংস্কৃত উপরূপক ও নির্বাচিত রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্য : নান্দনিক প্রসঙ্গ** , submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of **Dr. Shiuli Basu**, Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor:

Shiuli Basu

Dated: 02.09.2024.

Professor, Department of Sanskrit
Jadavpur University
Kolkata- 700032

Candidate:

Samipeshu Das

Dated: 03.09.24

ঋণ-স্বীকার

এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রস্তুতি এবং প্রকল্প-রূপায়ণে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করতে হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সকল অধ্যাপকবৃন্দের প্রতি। তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা এবং প্রণতি। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক ড. শিউলি বসু মহাশয়ার পূর্ণ সম্মতি, তত্ত্বাবধান এবং সহযোগিতায় এই শোধকার্য সম্পন্ন হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র এবং রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান এই গবেষণায় ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। এছাড়াও এই গবেষণায় যাঁরা উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন, তাঁরা হলেন অধ্যাপক ড. অশোক কুমার মাহাত (বর্তমান বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), এমেরিটাস অধ্যাপক ড. ঋতা চট্টোপাধ্যায় (সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. দেবদাস মণ্ডল (সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) এবং অধ্যাপক ড. রাজ্যেশ্বর সিনহা (বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)। এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের নির্মাণপদ্ধতি বিষয়ে তাঁদের একাধিক মূল্যবান সদুপদেশ পাথেয় হয়েছে। এছাড়াও কতজ্ঞতা-প্রকাশ করতে হয় শ্রীমতী শুভ্রা ঠাকুর (জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির সদস্য), অধ্যাপক তথা নাট্যকুশীলব ড. অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় (বিশ্বভারতী) এবং অধ্যাপক তথা রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী দেবাশিস রায়চৌধুরী (আনন্দমোহন কলেজ)-র প্রতি। তাঁদের থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন সম্ভবপর হয়েছে। অধ্যাপক তথা নৃত্যশিল্পী ড. শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্বভারতী)-এর সঙ্গেও দীর্ঘদিনব্যাপী বাক্যালাপের মাধ্যমে এই রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের নৃত্যাঙ্গিক সম্বন্ধে যথাবিধি পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে যা এই গবেষণার পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর প্রতিও অবিরাম শ্রদ্ধা রইল। অধ্যাপক ড. সোমনাথ সরকার (কাঁচড়াপাড়া কলেজ) উপরূপক বিষয়ে তাঁর অভিচিন্তন প্রকাশ করেছেন যেটি ব্যতিরেকে এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের গ্রন্থনা সম্ভব ছিলনা। তাই তাঁর প্রতিও অশেষ কৃতজ্ঞতা রয়েই যায়। এছাড়াও বিশ্বভারতী-র সংগীত ভবনের দুই প্রাক্তন শিক্ষার্থী ড. তমালিকা দে এবং শুভদীপ সরকারকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেই হয়। এই গবেষণার জন্য রবীন্দ্রনৃত্য সম্বন্ধে তাদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন যা তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হয়েছে। বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সহযোগিতার জন্য দেবর্ষি ভদ্রের (গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) কাছেও ঋণ রয়ে যায়। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিকের সহায়তায় বিভিন্ন গ্রন্থপাঠ সম্ভব হওয়ার দরুণ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই হয় উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি। পরিশেষে বলতেই হয় পারিবারিক সহযোগিতার প্রসঙ্গ। এই গবেষণাকার্যের জন্য নিরন্তর উৎসাহদান এবং ইতিবাচক চিন্তাধারা এই গবেষণাকে তরান্বিত করেছে। তাই এই গবেষণা কার্যে যে নানাবিধ বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের অবদান নিহিত রয়েছে, তা ভাষাতীত।

ধন্যবাদান্তে

সমীপেষু দাস

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ঋণ-স্বীকার	
ভূমিকা	**১-২৮**
প্রথম অধ্যায় : উপরূপক : উৎস ও ক্রমবিকাশ	**২৯-৬৭**
১.১ 'উপরূপক' শব্দের প্রথম উল্লেখ	২৯-৩০
১.২ উপরূপকের সংখ্যানির্ণয়	৩০-৩১
১.৩. উপরূপকের ক্রমবিবর্তন	৩১-৫৫
১.৪ 'উপরূপক' পদপ্রাপ্তি	৫৫-৫৬
১.৫ উপরূপকে নাটিকা-র প্রাধান্য	৫৬-৫৮
১.৬ উপরূপকের ক্রমবিবর্তনের কালবিভাজন	৫৮-৫৯
১.৭ রূপক ও উপরূপকের দ্বন্দ্ব	৫৯-৬০
১.৮ রূপক ও উপরূপকের পার্থক্য	৬০-৬২
১.৯ উপরূপককারের অভিধায় উপরূপক	৬২-৬৩
দ্বিতীয় অধ্যায় - উপরূপক : সেকাল ও একাল	**৬৮-১৩৬**
২.১ অষ্টাদশ উপরূপকের শাস্ত্রীয় নামকরণ ও আধুনিক টীকাকার	৬৮-৭৯
২.২ উপরূপকের শ্রেণিবিভাগ : সমকালীন দৃষ্টিকোণ	৭৯-৮৪
২.৩ রূপক ও উপরূপকের পারস্পরিক সম্পর্ক : নবীন ভাবনা	৮৫-৯৩
২.৪ রূপক ও উপরূপকের নবরূপে সজ্জীকরণ	৯৩-৯৪
২.৫ প্রাচীন গেয়রূপক : আধুনিক বিশ্লেষণ	৯৪-৯৫
২.৬ উপরূপক নাট্যরচনা : লক্ষণ ও ব্যতিক্রম	৯৫-১০৯
২.৭ উপরূপক-সমীক্ষায় আধুনিক পণ্ডিতদের মতামত	১০৯-১১৭
২.৮ প্রাক্-রবীন্দ্রনাট্যযুগে বাংলা সাহিত্যে উপরূপকের সন্ধান	১১৭-১২৫
২.৯ উপরূপকের মঞ্চায়ন : অতীত ও বর্তমান	১২৫-১২৮

তৃতীয় অধ্যায় - উপরূপক ও রবীন্দ্রনাট্য : সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ **১৩৭-২০৬**
৩.১ রবীন্দ্রনাট্যে রবীন্দ্রচিন্তা ১৩৯-১৪০
৩.২ রবীন্দ্রনাট্যের শ্রেণিবিন্যাস ১৪০-১৬৬
৩.৩ উপরূপক ও রবীন্দ্র-কাব্যনাট্য ১৬৬-১৭৯
৩.৪ উপরূপক ও রবীন্দ্র-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য ১৭৯-২০১

চতুর্থ অধ্যায় - নাটিকা ও *মায়ার খেলা* : তুলনামূলক আলোচনা **২০৭-২৬২**
৪.১ রবীন্দ্রভাবনায় 'নাটিকা' ২০৭-২০৮
৪.২ *মায়ার খেলা* : রচনাকাল, প্রকাশ ও প্রথম অভিনয় ২০৮-২০৯
৪.৩ *মায়ার খেলা* : উৎস ও বস্তুনির্দেশ ২০৯-২১৪
৪.৪ নাটিকা ও *মায়ার খেলা* : বহিরঙ্গ সাযুজ্য ২১৪-২৩৭
৪.৫ নাটিকা ও *মায়ার খেলা* : অন্তরঙ্গ সাযুজ্য ২৩৭-২৫৪
৪.৬ প্রকরণিকা ও সট্টক-এর সাপেক্ষে *মায়ার খেলা* ২৫৪-২৫৫

পঞ্চম অধ্যায় – প্রেঙ্খণ ও *নটীর পূজা* : নব মূল্যায়ন **২৬৩-২৯৭**
৫.১ *নটীর পূজা* : উৎস, বিবর্তন ও গ্রন্থপ্রকাশ ২৬৩-২৬৫
৫.২ *নটীর পূজা* : বস্তুনির্দেশ ২৬৫-২৭০
৫.৩ প্রেঙ্খণ ও *নটীর পূজা* : বহিরঙ্গ সাযুজ্য ২৭০-২৮৩
৫.৪ প্রেঙ্খণ ও *নটীর পূজা* : অন্তরঙ্গ সাযুজ্য ২৮৪-২৯৩

ষষ্ঠ অধ্যায় – ত্রোটক ও *শাপমোচন* : একটি সমীক্ষা **২৯৮-৩৪৩**
৬.১ *শাপমোচন* : উৎস, মঞ্চায়ন ও বিবর্তন ২৯৮-৩০৭
৬.২ ত্রোটক ও *শাপমোচন* : বহিরঙ্গ সাযুজ্য ৩০৭-৩২৩
৬.৩ ত্রোটক ও *শাপমোচন* : অন্তরঙ্গ সাযুজ্য ৩২৩-৩৩৮

উপসংহার **৩৪৪-৩৫২**
গ্রন্থপঞ্জি **৩৫৩-৩৬৫**
পরিশিষ্ট **৩৬৬-৩৬৯**

ভূমিকা

ভূমিকা

১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রবর অধ্যাপক ড. শিউলি বসু মহাশয়ার অধীনেই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের শিলান্যাস হয়। পরবর্তী সময়ে তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপস্থিতিতে গবেষণার বিষয় নির্ধারিত হয়। সেই সময়ে এই গবেষণাকার্যের জন্য উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন এমেরিটাস অধ্যাপক ড. ঋতা চট্টোপাধ্যায় (সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. দেবদাস মণ্ডল (সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) এবং অধ্যাপক ড. রাজ্যেশ্বর সিনহা (বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) । কালান্তকের পরিহাসে গত ১২ই অগাস্ট, ২০২২ তারিখে অধ্যাপক ড. ঋতা চট্টোপাধ্যায় অমৃতলোকে গমন করেন। ওনার বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে শান্তিপ্রার্থনা-ই একমাত্র অর্ঘ্য।

আকাশে 'চন্দ্র' যেমন হেমযবনিকার নেপথ্যে চলে গেলে প্রভাতে 'রবি'র উদয় ঘটে, তেমনই মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্রের জীবনাবসানের পরবর্তী শতকে রবীন্দ্রনাথ এলেন ময়ূখের ধনসম্ভার বোঝাই করে। *সংগীতচিন্তা* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধবিশেষ 'কথা ও সুর'-এর একটি রাবীন্দ্রিক বচন-ই একটি প্রামাণিক উৎকর্ষ যেখানে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যবিদ্যা এবং গান্ধর্ববিদ্যার পরম মৈত্রী সাধিত -

আমি যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে থাকি সে বিশেষভাবে সংগীতশাস্ত্র নয়, কাব্যশাস্ত্রও নয়, তাকে বলি ললিতকলা শাস্ত্র – সংগীত ও কাব্য দুই তার অন্তর্গত।[১]

সংস্কৃত ভাষায় রচিত সৃজনশীল সাহিত্য (Creative Literature) প্রকৃততঃ কবিকর্মহেতু 'কান্তাসম্মিতভাবী কাব্য'। যেহেতু নাট্যসন্দর্ভ-ও সাহিত্যমাতৃকারই সন্তান, তাই নাট্য এবং সংগীত এই দ্বিবিধ কলা (Arts)-ই যে পরিবারতন্ত্রের ছত্রে লালিত বলেই স্বীকার করতে হয়, তা হ'ল 'ললিতকলা'। এই পারিভাষিক শব্দটি বর্তমানে প্রভূত ব্যবহৃত। ভারতে 'ললিতকলা আকাদেমি' নামক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান চিত্রাঙ্কন এবং ভাস্কর্যনির্মাণের বিষয়েই যে কার্যকর, সেই একমুখী প্রকল্পন্যাসই দৃশ্যগোচর হয়। আবার এরই সমান্তরালে 'সাহিত্য কলা পরিষদ্', 'সাহিত্য আকাদেমি', 'সংগীত নাটক আকাদেমি' ইত্যাদি সংস্থানের কোনও একটি বিষয়ে কার্যসূচি গ্রহণ করতে দেখা যায়। অথচ এই চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, সংগীত, সাহিত্যকে যদি একটিই বিশেষ 'ললিতকলা' নামে অভিহিত করতে পারা যায়, তবে এই একাধিক বিষয়ের মধ্যে একটি সম্প্রীতি গড়ে তোলা সম্ভব। প্রস্তাবিত এই শোধকার্য নাট্যবিষয়ক একটি গবেষণা, তাই নাট্য তথা সাহিত্যের ললিতকলায় কীরূপে অবস্থান রয়েছে, তার বিচার করতেই হয়। তাই এই বিষয়টির জন্যই 'ললিতকলা' শব্দটির পুরাকালীন প্রয়োগ এবং বিভিন্ন শিল্প বা কলা-র ঐক্যবিধানের নির্দেশগুলিকে দেখে নেওয়া যাক।

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"[২] - মহাকবি কালিদাসের *রঘুবংশ* মহাকাব্যে এই 'ললিতকলা' শব্দটির উল্লেখ থেকেই প্রমাণিত যে মহাকবি কালিদাসের সময় থেকেই এই শব্দের ধারণা

ভারতীয়দের চারুবাসনার অভিস্রবণকে তুলে ধরে। কী এই 'ললিতকলা', কেন-ই বা এর সহস্রাব্দ ধরে সমাজকে নিয়ত কর্ষণ করে চলেছে এবং কে এর ধারক বা বাহক এই সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর ক'তখানি বিচারসাপেক্ষ বা কতখানি আবেগতাড়িত, সে বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হয়। এই ললিতকলা তথা তৎসম্পর্কিত শাস্ত্রপ্রণয়ন এবং চর্চা ভারতীয় সংস্কৃতিরই একটি বিস্তীর্ণ অধ্যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ললিতকলা নিয়ে জিজ্ঞাসু সত্তা শুধুমাত্র ললিতকলাশাস্ত্রেই সীমায়িত না থেকে বিভিন্ন ধারার শাস্ত্রে তা স্থান অধিকার করেছে। তবে তা কেন ? ললিতকলা-র প্রস্তাব এবং প্রসঙ্গ বিনা কারণে উত্থিত হতে পারেনা। তাই প্রথমে দেখা যাক কোন্ কোন্ শাস্ত্রে এই ললিতকলা-র অন্তর্ভাব ঘটেছে।

প্রথমতঃ শব্দশাস্ত্র বা ব্যাকরণশাস্ত্র এবং অভিধানগ্রন্থ। সেখানে 'শিল্প' শব্দের ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গানুযায়ী ললিতকলা বিষয়ক বহুবিধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী*, ভট্টোজি দীক্ষিতের *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী* গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে কোশ এবং অভিধানরচনার ধারায় ললিতকলা বিষয়ক শব্দগুলির অর্থ জ্ঞাতব্য। তাই সেক্ষেত্রে ললিতকলার পর্যায়বাচী বিষয়গুলি কী কী এবং তার কর্মপদ্ধতিগত সমীক্ষা-ই প্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে পড়ে *অমরকোশ*, হলায়ুধের *অভিধানরত্নমালা* ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের গ্রন্থ যাকে বলা হয় অলংকারশাস্ত্র। এই অলংকারশাস্ত্র একটি নির্দিষ্ট গোত্র হলেও এর মধ্যে সাহিত্যতত্ত্ব এবং সংগীততত্ত্ব দুটি ভাগ রয়েছে। সাহিত্যালোচনায় সংগীতের প্রয়োজন সর্বথাসিদ্ধ হলেও সংগীততত্ত্বে সর্বদাই সাহিত্য অধীত হয়নি। ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র* থেকে শুরু ক'রে আধুনিক যুগের চন্দ্রকান্ত তর্কালংকারের *অলংকারকৌমুদী* পর্যন্ত কাব্য এবং কাব্যনিহিত বিষয়াবলির উল্লেখ ও চারুত্বপ্রসঙ্গে এই আলোচনা একটি পরম্পরা তৈরি করেছে। এই ধারায় তথ্য থেকে তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়। এখানে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের উত্তরকালের কাব্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রতিটি গ্রন্থই আলোচ্য। বিশেষভাবে *নারদীয় শিক্ষা*, ধনঞ্জয়ের *দশরূপ*, ভোজদেবের *শৃঙ্গারপ্রকাশ*, রাজশেখরের *কাব্যমীমাংসা*, শার্ঙ্গদেবের *সংগীতরত্নাকর*, বিঠ্‌ঠলের *নর্তননির্ণয়*, বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণ* এই ধরণের গ্রন্থগুলি একাধারে সংগীততত্ত্ব এবং নাট্যতত্ত্বের জন্য গ্রহণীয়।

তৃতীয়তঃ হ'ল রাজনীতিশাস্ত্র। প্রাচীন ভারতের বর্ণবিভাগ এবং আশ্রমবিভাগ প্রথার বিধিবিধানে এই আলোচনা উঠে এসেছে। তার কারণ এখানে শূদ্রবর্ণ এবং গণিকাদের দিনচর্যা তথা জীবিকানির্বাহের দিকগুলি আলোচিত হওয়ার সঙ্গেই ললিতকলা-র বিষয়গুলি উল্লেখিত। তবে এই ধারার আলোচনায় তার নান্দনিকতার পর্যবেক্ষণের অবকাশ নেই। শুধুমাত্র ললিতকলায় কী কী বিষয় রয়েছে, তা-ই দ্রষ্টব্য। এখানে কৌটিলীয় *অর্থশাস্ত্র*, *শুক্রনীতিসার*-এর ম'ত গ্রন্থগুলি স্বীকৃতি পায়।

চতুর্থতঃ তন্ত্রশাস্ত্র। গুহ্যসাধনার অঙ্গ এই তন্ত্রশাস্ত্র। যা তনু এবং মনকে ত্রাণ করে, তা-ই তন্ত্র। এই তন্ত্রশাস্ত্রের ধারায় বিভিন্ন সাধ্য ইষ্ট দেবদেবীর অভিচারসম্বন্ধিত বিষয়ে ললিতকলা অন্তর্গত। *ললিতসহস্রনামস্তোত্র*, *সাম্রাজ্যলক্ষ্মীপীঠিকা* ইত্যাদি গ্রন্থগুলি এই পর্যায়ভুক্ত।

উপরিউক্ত ধারাচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রতিটি শাস্ত্র-ই উদাহরণসহযোগে ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত। তাই প্রথমেই ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রসঙ্গ আসে। এখানে 'শিল্প' শব্দকে কেন্দ্র ক'রেই তৎকালীন ভারতবর্ষের একটি আর্থ-সামাজিক চিত্র ধরা পড়ে। আচার্য পাণিনির কয়েকটি সূত্রে 'শিল্প' শব্দটি উপলব্ধ। যথা 'শিল্পিনি ষ্বুন্' (৩/১/১৪৫), 'গস্থকন্' (৩/১/১৪৬), 'পাণিঘতাডঘৌ শিল্পিনি' (৩/২/৫৫), 'শিল্পম্' (৪/৪/৫৫), 'পাপং চ শিল্পিনি' (৬/২/৬৮), 'শিল্পিনি চাকৃঞ্' (৬/২/৭৬) ইত্যাদি। এগুলির দ্বারা । এছাড়াও 'পারাশর্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ' (৮/৩/১১০) এবং 'ছন্দোগৌক্থিযাজ্ঞকবহ্বৃচনটাঞ্ঞ্যঃ' (৫/৩/১২৯) এই দুটি সূত্রে 'নট' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও 'আখ্যাতোপযোগে' (১/৮/২৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ভট্টোজিদীক্ষিত *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*-র বৃত্তিতে বলেছেন "নটস্য গাথাং শৃণোতি"[৩]। অর্থাৎ নট বা নটকথিত গাথার মধ্যে নটসংবন্ধিত্ব ধর্ম বর্তমান। তাই 'নাট্য' যে সমাজে একটি বিশেষ আসন গ্রহণ ক'রে রয়েছে, তা পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* গ্রন্থ প্রমাণ করে।

আবার কোশ ও অভিধানবিষয়ক গ্রন্থাবলির মধ্যে সর্বপ্রথমেই আসে *অমরকোশ*-এর নাম। সেখানে নর্তন-এর শব্দান্তরের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

তাণ্ডবং নটনং নাট্যং লাস্যং নৃত্যং চ ।
ত্রৌর্যত্রিকং নৃত্যগীতবাদ্যং নাট্যমিদং ত্রযম্ ।।[৪]

অর্থাৎ নর্তনগুলি হ'ল যথাক্রমে তাণ্ডব, নটন, নাট্য, লাস্য এবং নৃত্য। আবার 'ত্রৌর্যত্রিক' (সংগীত) হ'ল গীত, বাদ্য এবং নৃত্যের সমাহার যা নাট্যে লক্ষণীয়। এছাড়াও সাহিত্যরসপ্রসঙ্গেও পাওয়া যায় –

শৃঙ্গারবীরকরুণাড্ভুতহাস্যভযানকাঃ ।
বীভৎসরৌদ্রৌ চ রসাঃ... ।।[৫]

সুতরাং *অমরকোশ* অনুসারে আস্বাদ্য সাহিত্যরসের সংখ্যা অষ্ট। অলংকারশাস্ত্রের একটি প্রাচীন প্রস্থান (sect) 'রস'। তাই কোশগ্রন্থও এই আলোচনার জন্য ধর্তব্য। রসপ্রস্থানে কোন্ ক'তগুলি রসের স্বীকৃতি রয়েছে, সে বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের ম'ত প্রাথমিক কার্যে *অমরকোশ* অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

হলায়ুধের *অভিধানরত্নমালা*-র প্রথম অধ্যায় 'স্বর্গকাণ্ড'-এও এই একই বিষয় আলোচিত। সেখানে পাওয়া যায় "নৃত্যং তু তাণ্ডবং লাস্যং ত্রিতযং নাট্যমুচ্যতে"[৬] এবং "প্রেক্ষার্থং গীতবাদ্যং তু সঙ্গীতমভিধীযতে"[৭]। অর্থাৎ তাণ্ডব, লাস্য এবং নৃত্য এই ত্রিবিধ কলা 'নাট্য'-এর অন্তর্ভুক্ত এবং গীত ও বাদ্য যখন প্রেক্ষণীয় বা দর্শনীয় হয়ে ওঠে, তখন তা 'সংগীত'। এই 'প্রেক্ষার্থ' ক্রিয়াটিই হ'ল 'নৃত্য'। আবার, এই গ্রন্থ এমন একটি গ্রন্থ যা নব নাট্যরসকে স্বীকার করে –

শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভযানকাঃ ।
বীভৎসাড্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ।।[৮]

হেমচন্দ্রের *অভিধানচিন্তামণি* গ্রন্থে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত বিভিন্ন নর্তনের বিবরণ পাওয়া যায়। যথা লাস্য, নৃত্ত, হল্লীসক ইত্যাদি। এই গ্রন্থের 'দেবকাণ্ড'-এ উল্লিখিত হয়েছে –

লসতে লাস্যম্।...তথাহি অঙ্গবিক্ষেপমাত্রং বিবাহভ্যুদযাদৌ নৃত্তম্, ললিতকরণাঙ্গহারাভিনযকৌশিকীবৃত্তিপ্রধানং বাসকসজ্জাদিনাযিকাচরিতং ডাম্বিলিকাদিনিবদ্ধং শ্লিষ্টত্বাদ্ লাস্যম্। মণ্ডলেন তু যদ্ নৃত্তং স্ত্রীণাং হল্লীসকং হি তত্।[৯]

অর্থাৎ যা আনন্দদান করে এবং যার মধ্যে একটি ঔজ্জ্বল্য রয়েছে, তা-ই লাস্য। তখন বিবাহাদি অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত হ'ত 'নৃত্ত' যা কেবলমাত্র চারু অঙ্গবিন্যাসেই করণীয়। অন্যদিকে ললিত করণ, অঙ্গহার, অভিনয়ের দ্বারা কৌশিকীবৃত্তিপ্রধান বাসকসজ্জাদি নায়িকার ভাবাভিব্যক্তিপ্রকাশই ছিল 'নৃত্য'। আবার 'হল্লীসক' নামাঙ্কিত আরও একটি নর্তনের কথা জানা যায় যা নারীরাই মণ্ডলাকারে পরিবেশন করত। সুতরাং তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় কখনও পারিবারিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান এবং রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠেয় সাংস্কৃতিক মূর্চ্ছনায় নারীদের নর্তনে একটি অধিকারের কথা জানা যায় এবং সেই নর্তনগুলি জনগণের কাছে ছিল উপভোগ্য তথা ভাবব্যঞ্জিত। অর্থাৎ শব্দশাস্ত্র এবং কোশগ্রন্থাদির পরিদর্শনে পাওয়া যায় সেকালে ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'নৃত্য' এবং 'নাট্য'-এর একত্রাবস্থান। উল্লেখ্য এই 'হল্লীসক' পরবর্তীতে উপরূপকের গোষ্ঠীতে আসন লাভ করেছে। তাই নৃত্যানুষ্ঠান থেকে উপরূপক হয়ে ওঠার যাত্রায় এই গ্রন্থ-ও প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় ধারাটির মধ্যে অলংকারশাস্ত্র এবং সংগীতশাস্ত্রের যুগপদ অবস্থান সূচিত। 'নন্দনতত্ত্ব' অভিধায় কাব্য, সংগীত, নাট্যসংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ই অন্তর্বর্তী হতে পারে তথাপি অলংকারশাস্ত্রের মধ্যে সাধারণতঃ সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা-ই উপজীব্য হওয়ায় সংগীতশাস্ত্রটিকে পৃথক রাখতে হয়। সংগীতের মধ্যে গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং প্রয়োজনসাপেক্ষে নাট্যের তথ্যমূলক বিবৃতি দেওয়া হলেও সাহিত্যতত্ত্ব অচর্চিত রয়ে গেছে। তেমনই কাব্যশাস্ত্রে নাট্যকলার ব্যাখ্যায় নৃত্যের ভূমিকা কথিত হলেও গীতবিধি এবং বাদ্যবিধি কোনওরূপ উল্লিখিত হয়নি। ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র*-ই এমন একটি গ্রন্থ যেখানে এই প্রতিটি বিষয় আলোকিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির পরে এমন কোনও গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রণীত হয়নি যাকে 'বিশ্বকোশ' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র* এই বৃহদায়তন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে নাট্যে সকল প্রকার জ্ঞান, শিল্প, বিদ্যা, কলা, যোগ এবং কর্মের মেলবন্ধন ঘটে –

ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা ।
নাসৌ যোগো ন তত্ কর্ম নাট্যেস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে ।।[১০]

এখানে 'শিল্প' এবং 'কলা'-র সংজ্ঞাপ্রসঙ্গে ভরতাচার্য নীরব থাকলেও অভিনবগুপ্ত তাঁর *অভিনবভারতী* টীকায় বলেছেন যে 'শিল্প' হ'ল "মালাচিত্রপুস্তাদিযোজনম্"[১১] এবং 'কলা' হ'ল "গীতবাদ্যাদিকা"[১২]। সুতরাং শিল্পের মধ্যে পড়ে আহার্যাভিনয়ের অঙ্গ যা নটনটীর অলংকরণ বা মঞ্চসজ্জায় প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে গীত, বাদ্যের ম'ত অভিকরণাত্মক কার্যগুলি কলার পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত। 'আদি' শব্দের দ্বারা নৃত্যের গ্রহণ হওয়াই যুক্তিযুক্ত ব'লে বোধ

জন্মায়। এখান থেকেই চারুশিল্প (Performing Arts) এবং কারুশিল্পের (Handicrafts) পার্থক্য নির্দেশিত হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের বাইরের কোনও ভারতীয় রাজ্যে বিশেষতঃ উত্তর ভারতে সংগীতশিল্পীকে 'কলাকার' বলা হ'লেও পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ কথ্যভাষায় 'কলাকার' শব্দের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। আবার এখানেই 'শিল্পপতি' শব্দটি কোনও বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত ব্যবসায়ীকে (Industrialist) বোঝানো হয়। এই বিষয়টি গবেষণায় প্রয়োজনীয় না হ'লেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 'শিল্প' বা 'কলা'-র কথ্য প্রয়োগ কীরূপ; তা বোঝানোর জন্যই উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক।

এর পরবর্তীতে বামনাচার্যের *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি*-তে এই 'কলা'-র অভিধা সম্পর্কে অধিক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাব্যের অঙ্গগুলিকে ত্রিধাবিভক্ত ক'রে পুনরায় ষড়বিধ বিদ্যার মধ্যে স্থান দিয়েছেন 'কলা'কে - "শব্দস্মৃত্যভিধানকোশচ্ছন্দবিচিতিকলাকামশাস্ত্রদণ্ডনীতিপূর্বাবিদ্যাঃ"[১৩]। অর্থাৎ প্রতিভাসম্পন্ন কবিকে শব্দশাস্ত্র (ব্যাকরণ), স্মৃতিশাস্ত্র, অভিধানগ্রন্থ, কোশগ্রন্থ, ছন্দঃশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, দণ্ডনীতিবিদ্যার সঙ্গে কলাশাস্ত্রবিষয়েও কৃতবিদ্য হতে হবে এবং এই কলাশাস্ত্রের লক্ষণে তিনি গীত, নৃত্য, চিত্র-কে বিশেষরূপে স্থান দিয়েছে – "কলাগীতনৃত্যচিত্রাদিকান্তাসামভিধাযকানি শাস্ত্রাণি বিশাখিলাদিপ্রণীতানি কলাশাস্ত্রাণি"[১৪] । সুতরাং এখানেও নৃত্য এবং গীত একত্রে কলা-র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীর আলংকারিক রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা গ্রন্থের 'কবিরহস্য' নামক প্রথম অধিকরণের প্রথম অধ্যায় 'শাস্ত্রসংগ্রহ'-তে বিভিন্ন আচার্যের (Exponent) উল্লেখপ্রসঙ্গে বৈনোদিক শাস্ত্রের প্রবক্তা হিসেবে নাম রয়েছে কামদেবের "বৈনোদিকং কামদেবঃ,..."[১৫]। মধুসূদন শাস্ত্রীর *মধুসূদনী* টীকায় এই বৈনোদিক শাস্ত্রের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে এভাবে –

বিনোদো যাসু তা বৈনোদিকাঃ চতুঃষষ্টিকলাদ্যাঃস্তা অস্মিন্নধিকরণে সন্তি তদধিকরণং চতুঃষষ্টিকলানঞ্চতুঃশতোপকলানাঞ্চোপদেশকমিতি যাবত্ কামদেবঃ।[১৬]

অর্থাৎ যা থেকে বিনোদ বা আনন্দ উৎসারিত হয়, তা-ই বৈনোদিক কলা এবং তা সংখ্যায় চৌষট্টি। এছাড়াও শত প্রকার অতিরিক্ত উপকলা-ও বর্তমান রয়েছে যার হোতৃস্বরূপ কামদেবকে চিহ্নিত করা যায়।

এমনকি এই *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থেরই উক্ত অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায় 'শাস্ত্রনির্দেশ'-এ 'সাহিত্যবিদ্যা' (Lirerary Criticism) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি বিদ্যাবিশেষ যা 'উপবিদ্যা'-র থেকে স্বতন্ত্র –

শব্দার্থযোর্যাবত্ সহভাবেন বিদ্যা সাহিত্যবিদ্যা। উপবিদ্যাস্তু চতুঃষষ্টি। তাশ্চ কলা ইতি বিদগ্ধবাদঃ। স আজীবঃ কাব্যস্য।[১৭]

অর্থাৎ তিনি সাহিত্যবিদ্যা-র থেকে কলা-কে পৃথক করেছেন। অর্থাৎ সাহিত্য বা কাব্যের মধ্যেই যদি নাট্যসাহিত্যকেও 'দৃশ্য' বা 'দৃশ্যশ্রব্য' কাব্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তবে তার প্রয়োগকালে সংগীত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলেও সেখানে উপবিদ্যার প্রয়োগ ঘটছে। যদি সেই গানটি নাট্যকারের-ই রচনা হয়ে থাকে, তবে সেই

রচনাটি সাহিত্য কিন্তু তার প্রয়োগে উপবিদ্যার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। তাই ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র-কে বলা যায় বিদ্যা এবং উপবিদ্যা সম্মেলক এক অভূতপূর্ব শাস্ত্র। তাই সাহিত্যশাস্ত্র (Rhetoric) শুধুই বিদ্যাসন্নিধানের প্রকরণরূপী গ্রন্থ নয়; বৃহদর্থে তা হয়ে উঠেছে ভারতীয় নন্দনতত্ত্বজ্ঞাপকের প্রকৃষ্ট নির্দশন।

খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীতে ভোজদেব *শৃঙ্গারপ্রকাশ* গ্রন্থে এই নৃত্যাদি কলাগুলিকে সমষ্টিবাচকরূপে গ্রহণ ক'রে তার কয়েকটি শ্রেণিবিভাগ করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ষোড়শ প্রকাশে দেখা যায় তিনি শৃঙ্গার রসের উদ্দীপনবিভাব প্রসঙ্গে এই কলার উল্লেখ করেছেন – "তত্র চতুষষষ্টির্মূলকলাঃ"[১৮] এবং এরপরেই তিনি এই চৌষট্টি প্রকার কলাকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা 'কর্মাশ্রয়শ্চতুর্বিংশতি', 'দ্যুতাশ্রযাঃ বিংশতিঃ', 'শযনোপচারিক্যঃ ষোডশ' এবং 'চতস্র উত্তরকলা'[১৯]। এরই মধ্যে কর্মকে আশ্রয় ক'রে যে চব্বিশ প্রকার কলা অবস্থান করে, সেগুলির তালিকায় লক্ষ্য করা যায় নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদিকে – "গীতং বাদিত্রং নৃত্তং নাট্যং... ."[২০]।

এই আলোচনারই রেশ এসে পৌঁছায় তৃতীয় প্রকার শাস্ত্রে। রাজনৈতিক শাস্ত্রের মধ্যে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের অনুষঙ্গজড়িত *শুক্রনীতিসার* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় প্রকরণ 'বিদ্যাকলানিরূপণ'-এ বত্রিশ প্রকার বিদ্যা এবং চতুঃষষ্টি কলার মান্যতা থাকলেও 'কলা'-র সংজ্ঞায় এক নতুন পন্থার প্রবর্তনা লক্ষ্য করা যায়। মূক ব্যক্তিও যা করতে সক্ষম, তাকেই বলা হয় 'কলা' – "শক্তো মূকো'পি যত্ কর্ত্তুং কলাসংজ্ঞং তু তত্ স্মৃতম্"[২১]। এখানে 'গীত' কলার পর্যায় থেকে বহিষ্কৃত হয়ে পড়লেও বাদ্য এবং নৃত্য পারিভাষিক দিক থেকে 'কলা' হতে কোনও বাধার সম্মুখীন হয়না।

এই ধারারই প্রবাহ এসে পড়ে কৌটিলীয় *অর্থশাস্ত্র*-এ। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধিকরণ 'অধ্যক্ষপ্রচার'-এর 'গণিকাধ্যক্ষ' অধ্যায়ে দেখা যায় যে গণিকা এবং রঙ্গোপজীবিনীদের উচ্চশিক্ষিত হওয়ার জন্য বিবিধ বৈদিক কলাজ্ঞানের আয়োজন থাকত –

গীতবাদ্যপাঠ্যনৃত্তনাট্যাক্ষরচিত্রবীণাবেণুমৃদঙ্গপরচিত্তজ্ঞানগন্ধমাল্যসংযূহনসম্পাদনসংবাহনবৈশিককলাজ্ঞানানি গণিকা দাসীরঙ্গোপজীবিনীশ্চ গ্রাহযতো রাজমণ্ডলাদাজীবং কুর্যাত্।[২২]

এগুলির মধ্যে গীত, বাদ্য, নৃত্ত, নাট্য, বীণাবাদন, বেণুবাদন, মৃদঙ্গবাদন এই জ্ঞানগুলি সংগীতেরই অন্তর্ভুক্ত; পাঠ্য এবং বাক্কৌশলের দ্বারা সংবাদ বাচিক অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত যেহেতু বাচিক অভিনয় বাণীপ্রধান। T. Gaṇapati Śāśtrī তাঁর *শ্রীমূলা* টীকায় 'রঙ্গোপজীবিনী' শব্দের অর্থ দিয়েছেন "নটাদিস্ত্রিযশ্চ" অর্থাৎ অভিনেত্রী (female actress)।[২৩] সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলে বলা যায় যে সেই সময় বারাঙ্গনাদের জীবিকানিরূপণে ললিতকলার ব্যবহার ছিল। অর্থাৎ ললিতকলার ধারক এবং পালক হিসেবে বারনারীদের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে।

এই আলোচনার জন্যই অবশেষে যে প্রামাণ্য গ্রন্থটির দ্বারস্থ হতে হয়, তা হ'ল বাৎসায়নের *কামসূত্র* । এই গ্রন্থের প্রথমাধিকরণ 'বিদ্যাসমুদ্দেশ' প্রকরণে মধ্যে গীতাদি চতুঃষষ্টিরঙ্গবিদ্যার কথা জানা যায়[২৪] যাকে এই গ্রন্থেরই

অন্যত্র 'যোগ'[২৫]-ও বলা হয়েছে। তাই অলংকারশাস্ত্র এবং রাজনীতিশাস্ত্রের যৌথবিচারে এই চতুঃষষ্টি কলাকে 'যোগরূপরঙ্গকলাবিদ্যা' বলাই উপযুক্ত।

চতুর্থতঃ বা শেষতঃ যে প্রকার শাস্ত্রে কলার সমুল্লেখ পাওয়া হয়, তা তন্ত্রশাস্ত্র। *সাম্রাজ্যলক্ষ্মীপীঠিকা* । এখানে ৬৪তম পটলে শিব-পার্বতীর কথোপকথনের আকারে কলাসম্পর্কে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করা যায়। যথা –

মীমাংসাখ্যা কলা দেবি বেদান্তাদ্যাঃ কলা ততঃ ।
সাঙ্খ্যবিদ্যা রোগবিদ্যা কাব্যবিদ্যা ততঃ পরা ।।
নানানটকবিদ্যা চ হ্যলঙ্কারকলা ততঃ ।
কবিত্ববিদ্যা দেবেশি মন্ত্রযন্ত্রকলা ততঃ ।।
আয়ুর্বিদ্যা ধনুর্বিদ্যা শিল্পবিদ্যা হিমাদ্রিজে ।
সঙ্গ্রামবিদ্যা ভেতালবিদ্যা'নঙ্গকলা ততঃ ।।
সূদবিদ্যা চ গান্ধর্ববিদ্যা বীণালো প্রিয়ে ।
বেণুবিদ্যা তালকলা তথা মার্দঙ্গিকী কলা ।।
নৃত্তবিদ্যা গীতবিদ্যা চিত্রকর্মকলা তথা ।
রথলক্ষণবিদ্যা চ হ্যশ্বলাক্ষণিকী কলা ।।[২৬]

অর্থাৎ এখানে নাটক, কবিত্ব, শিল্পবিদ্যা, গান্ধর্ববিদ্যা, বেণুবিদ্যা, তালকলা, মার্দঙ্গিকী কলা, নৃত্তবিদ্যা, গীতবিদ্যা এগুলি সাহিত্য এবং সংগীতের আবহে অবস্থিত। তাই একদিকে যেমন মীমাংসা, সাংখ্য ইত্যাদি ভারতীয় আস্তিক্যবাদী দর্শনশাস্ত্রও 'কলা', তেমনই সাহিত্য-সংগীতও একপ্রকার 'কলা' এবং রথলক্ষণ, অশ্বলক্ষণের ম'ত বিদ্যাও 'কলা'র সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট।

এরই সঙ্গে *ললিতসহস্রনামস্তোত্র*-এ দেবী ললিতার বিভিন্ন নামগুলির মধ্যে কয়েকটি নাম বা বিশেষণ যে 'ললিতকলা'-র সঙ্গেই সমবেত সমবায় সম্বন্ধে রয়েছে, তা উপলব্ধি করা যায়। যথা "চতুঃষষ্টিকলামযী"[২৭] "মহাচতুঃষষ্টিকোটিযোগিনীগণসেবিতা"[২৮], কলাবতী"[২৯], "কাব্যালাপবিনোদিনী"[৩০], "লাস্যপ্রিযা"[৩১], "কাব্যকলা"[৩২], ইত্যাদির মাধ্যমে। এর মধ্যে 'মহাচতুঃষষ্টি..' পদের ব্যাখ্যায় শম্ভুনাথের *বালাতপা* টীকায় বলা হয়েছে –

চতুরধিকা ষষ্টিঃ তৎসংখ্যকাস্তন্ত্রোক্তা যে উপচারাঃ উপাসককৃতৈস্তৈরাঢ্যা যুতা।...চতুঃষষ্টিকলা গীতাদিবিজ্ঞানান্তাঃ তন্ময়ী তত্ প্রচুরা।[৩৩]

বাংলায় এর সরল অর্থ হয় ললিতা দেবী গীতপ্রভৃতি জ্ঞেয় জ্ঞানে সদা প্রসন্নময়ী। "কাব্যালাপবিনোদিনী" শব্দের ব্যাখ্যা টীকাকার শম্ভুনাথ করেছেন - "কাব্যানাং বাল্মীক্যাদিমহাকবিকৃতপ্রবন্ধবিশেষাণামষ্টাদশলক্ষণলক্ষিতানাং রূপকভেদভিন্নানামালাপেন বিশিষ্য মোদত ইতি বা"[৩৪] ব'লে। অর্থাৎ আদিকবি বাল্মীকিসহ একাধিক যশস্বী মহাকবিগণের রচনা এমনকি রূপক তথা নাট্যসাহিত্যের ভেদাভেদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিগূঢ় জ্ঞানের অধিকারিনী দেবী

বিশেষরূপে মোদিত হয় ভাবয়িত্রী অবতারে এবং 'লাস্যপ্রিয়া' বিশেষণটি পূর্বোক্ত টীকাতে ব্যাখ্যাত হয়েছে দেবীর নর্তনকলার প্রতি প্রিয়ত্বে - "লাস্যং নর্তনং প্রিযং যস্যাঃ।... তালৈর্নৃত্যগীতযোঃ সমকালপরিচ্ছেদো বা লযঃ তস্য করী কর্ত্রী"[৩৫] এবং দেবীর আরও একটি বিশেষণ "কাব্যকলা"-র সম্পর্কে টীকায় প্রদত্ত হয়েছে "কাব্যোৎপাদকপ্রতিভৈব বা কাব্যকলা"[৩৬]। সুতরাং এখানে কাব্য একটি কলাবিশেষ যে ধারণা রাজশেখর অপেক্ষা স্বাধীন। তাই এই কাব্যকারিণী প্রজ্ঞা হ'ল একপ্রকার ললিতকলা যা দেবীর আশীর্বাদ। তাই এই তন্ত্রোক্ত দেবীর বিবরণে বা তার বিশিষ্টতায় স্থান পেয়েছে ললিত মনোহারী রঙ্গকলাবিদ্যা। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রকে যদি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে মোক্ষপ্রদায়িনী বিদ্যার পীঠস্থানরূপেই গ্রহণ করতে হয়, তাহলেও দেখা যাচ্ছে যে সেখানে তৃতীয় পুরুষার্থ কামের উপচার জড়িত। আরাধ্যা দেবী-ই ললিতকলায় মূর্ত। অর্থাৎ এই বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নবশতঃ ললিতকলা সম্বন্ধীয় যে তথ্যগুলিতে উপনীত হওয়া যায়, তা হ'ল –

- ললিতকলা অর্থোপার্জনকারী জীবিকার উৎসস্থল।
- গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞানমার্গস্বরূপ তন্ত্রশাস্ত্রে ললিতকলা সাধ্য বা উপেয়।
- ললিতকলার সঙ্গে নিরন্তর অনুশীলন জড়িত এবং তার উৎকর্ষতা সহৃদয়ের পক্ষে আহ্লাদনীয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ললিতকলা-র মধ্যে নৃত্য এবং নাট্য এই দুটি বিষয়ই সমশীর্ষীকতায় অপরিহার্য সেকথা প্রমাণিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন ওঠে এই নৃত্য এবং নাট্য-এর পারস্পরিক সম্পর্ক কীরূপে ললিতকলা সংস্কৃতিতে যুগলবন্দী হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গেই এই গবেষণাকার্যের প্রয়োজন। ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থটি আপাতঃদৃষ্টিতে Encyclopedia of Indian Theatre ব'লে মনে হলেও এই গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রেরও আকরগ্রন্থ। আবার, সংগীতের মধ্যেই 'নৃত্য' এই প্রকরণ গ্রন্থের চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায় যথাক্রমে 'তাণ্ডবলক্ষণ' এবং 'পূর্বরঙ্গবিধান'-এ বিস্তৃত হয়েছে। তবে এই নৃত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে নাট্যের প্রয়োজনেই। নাট্যপ্রযোজনার প্রারম্ভেই যে পূর্ববঙ্গের আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়, সেখানেই 'নৃত্য' একটি অঙ্গ যা 'চিত্রপূর্বরঙ্গ'-এই প্রযোজ্য –

যশ্চাযং পূর্বরঙ্গস্তু ত্বযা শুদ্ধঃ প্রযোজিত।।
এভির্বিমিশ্রিতশ্চাযং চিত্রো নাম ভবিষ্যতি।[৩৭]

মূলতঃ দেবস্তুতিবিষয়ক সুকুমার নৃত্যকলা-ই ছিল 'তাণ্ডব' যা তণ্ডুমুনির উদ্ভাবনা। সেকারণেই সেই অনুষঙ্গ ধরে রাখার জন্য এই নামটি ব্যবহৃত হয়েছিল –

প্রাযেণ তাণ্ডববিধির্দেবস্তুত্যাশ্রযো ভবেত্ ।।
সুকুমারপ্রযোগশ্চ শৃঙ্গাররসসম্ভবঃ ।[৩৮]

কিন্তু কালক্রমে এই নৃত্যাঙ্গিক 'উদ্ধত' নৃত্যে পরিণত হয় যা *দশরূপ* গ্রন্থে কথিত –

মধুরোদ্ধতভেদেন তদ্দ্বযং দ্বিবিধং পুনঃ ।
লাস্যতাণ্ডবরূপেণ নাটকাদ্যুপকারকম্ ।।[৩৯]

এভাবে একটি নৃত্যপদ্ধতির পরিবর্তনকে স্মরণ ক'রেই সংশয় জাগে যে নাট্যশাস্ত্রের সর্বজনবিদিত টীকা *অভিনবভারতী* [৪০] এবং *দশরূপ*-এর *দশরূপাবলোক* বা *অবলোকবৃত্তি* [৪১]-কে মিলিয়ে সেই সমুচ্চারিত নৃত্যগুলি ডোম্বিকা, ভাণ, প্রস্থান, ষিদ্গক, ভাণিকা, রামাক্রীড়, হল্লীসক, রাসক, শ্রীগদিত, কাব্য ইত্যাদি পরিবর্তন হয়েছিল কিনা পরবর্তী যুগে। যখনই *শৃঙ্গারপ্রকাশ* [৪২] এবং *ভাবপ্রকাশন* [৪৩] গ্রন্থের উপকণ্ঠে উপস্থিত হই, তখনই সেই সন্দেহের নিরসন ঘটে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে দেখা যায় যে সেই নৃত্যগুলি নাট্যরূপ লাভ করতে উদ্যত। এমনকি *সাহিত্যদর্পণ* [৪৪]-এ দেখা যায় কাব্য, রাসক, প্রস্থান, শ্রীগদিত, হল্লীশ, ভাণিকা এগুলি 'উপরূপক' নাট্যসম্মান লাভ করেছে। তবে এই শব্দটি নিরপেক্ষ নয়। 'উপ' অব্যয় এখানে সামীপ্যার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং রূপক-এর বাস্তবতায় উপরূপক সিদ্ধ। ভরতোক্ত দিশায় 'দশরূপক' বা দশবিধ নাট্যধারা (নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, ভাণ, সমবকার, বীথী, প্রহসন, ডিম এবং ঈহামৃগ) যা কথাবস্তু এবং অন্যান্য বিধিনিয়মের দ্বারাই একে অন্যের থেকে পৃথক, সেই দশটি রূপেরও যখন অতিরিক্ত আরও কিছু নাট্যশৈলী তদানীন্তন বৃহত্তর ভারতবর্ষের ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে চলেছিল, তখনই সেই নাট্যশৈলীগুলিকে একত্রিত ক'রে পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন পড়ে। তাই বিশ্বনাথ কবিরাজের সময় খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে একটি দ্বিতীয় গোত্র উদ্ভুত হয় – 'উপরূপক'।

অর্থাৎ গৌণত্ব থেকে মুখ্যত্বলাভ বা নৃত্য থেকে নাট্য হয়ে ওঠার এই যাত্রাপথটিই গবেষণার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এই গবেষণায়। উপরূপকগুলি নৃত্যনাট্যেরই পরিচয়ান্তর কিনা সেটি যেমন একটি লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, তেমনই এটিও জ্ঞানৈষণার দিক হতে পারে যে আধুনিক যুগের কোনও নৃত্যনাট্য বা নৃত্যপ্রধান নাট্যের মধ্যে উপরূপকের বীজ লুক্কায়িত রয়েছে কিনা। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা-ই প্রধান কথ্য এবং লেখ্যভাষা, তাই এখানে বাংলা সাহিত্য ঋদ্ধ এবং আদৃত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-ই এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাঁর রচিত এবং পরিকল্পিত নৃত্যনাট্যগুলি অদ্যাবধি জনপ্রিয়তার শিখরে। তাই তাঁর ভাবাদর্শে রূপায়িত নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যেই উপরূপকের নির্যাস নিহিত রয়েছে কিনা তা অনুধাবনের জন্য এই গবেষণাকার্যে রবীন্দ্রনাট্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কেন বাংলা ভাষার নৃত্যনাট্যকেই নির্বাচন করা হয়েছে, সে বিষয়ে কৌতূহল উদ্রিক্ত হ'লে তার উত্তর হবে যে ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা যেমন হিন্দি, অসমীয়া, তামিল, তেলুগু ইত্যাদি ভাষা এবং সেই ভাষাশ্রিত সাহিত্যকর্মগুলি অজ্ঞাত থাকার ফলেই বাংলা সাহিত্যের নির্বাচন করা হয়েছে। তাই এই গবেষণার দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্রনাট্যে উপরূপকত্ব বর্তমান, তবে তা প্রমাণ করেনা যে একমাত্র রবীন্দ্রনাট্যেই তা নিহিত। অন্যান্য ভাষা বা সাহিত্য এমনকি বাংলা ভাষার অন্যান্য নাট্যকারদের নাট্যরচনাতেও উপরূপকের সুবাস পাওয়া যেতে পারে কিন্তু যেহেতু এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি গতিশীল, তাই বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাট্যের মধ্যেই প্রাচীন উপরূপকের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

❖ **গবেষণার বিষয় :**

প্রস্তাবিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভে যে শোধপত্র পরিবেশিত হতে চলেছে, তার শিরোনাম "সংস্কৃত উপরূপক ও নির্বাচিত রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্য : নান্দনিক প্রসঙ্গ"। এই বিষয়টিকে যথাযথ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেই স্রবন্তী 'ললিতকলা'-র কয়েক গণ্ডুষ জলকেই স্পর্শ করতে হয়। সেই স্পর্শ যতখানি মধুর, ততখানিই দিব্য। "সংস্কৃত

উপরূপক" শব্দটির মধ্যে একটি বিশেষ্যপদ এবং একটি বিশেষণপদ রয়েছে। সাধারণতঃ 'সংস্কৃত' যার অর্থ দাঁড়ায় পরিশুদ্ধ, পরিমার্জিত, নতুনরূপে আবির্ভূত প্রভৃতি। এক্ষেত্রে 'সংস্কৃত' সেই অর্থকে গৌণ ক'রে একটি সুনির্দিষ্ট ভাষার বাণীবৈদুষ্যকেই সূচিত করে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর 'শতম্' শাখায় ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার মধ্যে ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন স্তরের ভাষার নির্দশন যে 'সংস্কৃত' ভাষা বা সারস্বতসমাজে যার অধিগ্রহণ হয় 'দেবভাষা' রূপে, সেই সংস্কৃত ভাষাকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এরপরে আসে 'উপরূপক'-এর প্রসঙ্গ। এটি একটি বিশেষ্যপদ। 'উপরূপক' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীর ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের প্রামাণ্য প্রকরণগ্রন্থ *সাহিত্যদর্পণ*-এ। অর্থাৎ এখানে সংস্কৃত ভাষায় উপন্যস্ত উপরূপকের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। এরপরের লক্ষ্য 'উপরূপক'-এর আভাস। *সাহিত্যদর্পণ*-এ উপরূপকের কোনওরূপ সংজ্ঞা অনুল্লিখিত হয়েই অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকের উদ্দেশ এবং লক্ষণ বিবৃত হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাগ্রে আসে নাটিকা। এর দৃষ্টান্ত শ্রীহর্ষকবির *রত্নাবলী*। এই *রত্নাবলী* সাহিত্যকর্মটি যদি কোনও সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক অধ্যয়ন করে, তবে তার ভাবনায় এটি একটি নাট্যসাহিত্য। ভারতীয় বা বৈদেশিক যে কোনও ভাষায় নাট্যসাহিত্য যেরূপ বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং তাদের ক্রিয়ার দ্বারা গ্রথিত হয়, রত্নাবলী-ও তার ব্যতিক্রম নয়। তাহলে সেই পাঠকের দৃষ্টিতে মহাকবি কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্র* বা *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাট্যসাহিত্যে পাঠতঃ যে আবেগ, অনুভূতি জন্মায় এবং সর্বোপরি নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে যে ধারণালাভ হয়, *রত্নাবলী* পাঠের ফলেও তার সঙ্গে ভাবনাগত বৈসাদৃশ্য প্রতীত হয়না। অথচ *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* এবং *রত্নাবলী*-র জাতি এবং গোত্র পৃথক। প্রথমটি 'নাটক' এবং দ্বিতীয়টি 'নাটিকা'। এখানেই এই গবেষণার প্রয়োজন। কেন নাটক এবং নাটিকা-র ভিন্ন আবাসস্থল, তার অনুসন্ধান করতে হয়। সেখানেই জানা যায় যে 'নাটক' এবং 'নাটিকা' উভয়েই নাট্যসন্দর্ভ হলেও প্রথমটি হ'ল 'রূপক' এবং দ্বিতীয়টি হ'ল 'উপরূপক'। সুতরাং প্রাচীন ভারতে সাংস্কৃতিক চর্যায় নাট্যধারা, নাট্যপরিবেশনা এবং নাট্যরসোপভোক্তাদের তারতম্যের হিসেবে এই সূক্ষ্ম পার্থক্য অবস্থান করত। তাই "সংস্কৃত উপরূপক" বলতে বিশ্বনাথ কবিরাজ কর্তৃক দৃষ্ট নাটিকা ইত্যাদি অষ্টাদশ উপরূপককেই গ্রহণ করা হয়েছে।

এরপরে আসে দ্বিতীয় বাক্যাংশটি – "নির্বাচিত রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্য"। একটি যৌগিক বাক্যের মধ্যে সংস্কৃত উপরূপকের সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যসাহিত্যকে যুক্ত করার প্রয়াস রয়েছে একথা প্রমাণিত হলেও একটি সংযোগের কারণটি স্বচ্ছ হওয়া দরকার। প্রথমে বলা যাক 'নির্বাচিত' শব্দটির কারণ। বর্তমানে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ*-তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মোট ৫৪টি নাট্যকর্ম মুদ্রিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম খণ্ডে রয়েছে ২৬টি নাট্যসাহিত্য এবং দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে ২৮টি নাট্যসাহিত্য। এতগুলি নাট্যসন্দর্ভের মধ্যে যে তিনটিকে নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলি হ'ল *মায়ার খেলা* (গীতিনাট্য), *নটীর পূজা* এবং *শাপমোচন* (কথিকা)। এই তিনটিকেই অতিশয় নির্বাচিত করার কারণ হ'ল উপরূপক নাট্যধারার মধ্যে একটি সাংগীতিক আবহ বর্তমান ছিল। এর জন্য ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র থেকে শুরু ক'রে খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত *সংগীতদামোদর* গ্রন্থ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ক্রমানুযায়ী পাঠগ্রহণ করা যায়, তাহলে দেখা যায় 'নৃত্য' থেকেই উপরূপকের জন্ম। তাহলে পূর্বপক্ষীয় মতে প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায় মায়ার খেলা গীতিনাট্যকে কোন্ যুক্তিতে

স্বীকৃতি দেওয়া হ'ল। সেক্ষেত্রে উত্তরপক্ষের যুক্তি *মায়ার খেলা* এমনই একটি নাট্যরচনা যা প্রাচীন নাটিকা-র কাঠামোয় গঠিত। বসন্ত ঋতুতে অমর-শান্তা-প্রমদার ত্রিকোণপ্রেমের সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক রূপরেখা এখানে কথাবস্তুতে স্থান পেয়েছে। তবে দুই নায়িকা এবং এক নায়কের কথাশ্রিত কোনও নাট্যকর্ম-ই নাটিকা নয়। *সাহিত্যদর্পণ*-এর পর্যন্ত কারিকাগুলিতে নাটিকা-র লক্ষণ বিধৃত। তাই প্রতিটি লক্ষণ-ই *মায়ার খেলা* গীতিনাট্যে উপস্থিত অথবা আংশিকতাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত এই যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই *মায়ার খেলা*-কে উপপাদ্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাচীন নাটিকা জাতীয় উপরূপক আধুনিক বাংলা ভাষার একটি গীতিনাট্যে তার ধর্মকে কীভাবে অনুসরণ করেছে বা কীভাবে উপেক্ষা করেছে; তার জন্যই মায়ার খেলা-র দ্বারস্থ হওয়া।

নির্বাচিত দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাট্য হ'ল *নটীর পূজা* । এই নাট্যের সঙ্গে যে উপরূপকের সাদৃশ্য নির্ণয়ের যথাসাধ্য বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করা হয়েছে, সেটি হ'ল প্রেঙ্খণ। বিশ্বনাথ-কবিরাজ-স্বীকৃত এটি উপরূপক। নৃত্য থেকেই উপরূপকের জন্ম হলেও এই উপরূপকের উদ্ভব, প্রারম্ভ দশা এবং বিবর্তন একটি বিস্তৃত আলোচনা। উপরূপকতত্ত্বের জন্য বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ-কে আদর্শ গ্রন্থ মানলে সেই সময় প্রেঙ্খণ-এর আকার-আয়তন, রূপ-রস প্রভৃতি বিষয়ে যতখানি তথ্য পাওয়া যায়, তার সঙ্গে *নটীর পূজা*-র মিল রয়েছে। সততার বিজয় এবং রিপুদমনমূলক বীররসব্যঞ্জক এই উপরূপকের যে বার্তা, তার সঙ্গে প্রাচীন প্রেঙ্খণ-এর অনেকখানিই ভাবসাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ প্রসঙ্গক্রমে *অচলায়তন, রক্তকরবী, মুক্তধারা* এই জাতীয় নাট্যেও বীররস ধ্বনিত। তাহলে এগুলির মধ্যে কোনও একটিই কোন্ অযোগ্যতায় এই শোধকার্যে স্থান পায়নি তাও একটি প্রশ্ন। *অচলায়তন* ইত্যাদি নাট্যরচনাগুলি তত্ত্বপ্রধান নাটক বা রূপক সাংকেতিক নাটক। এগুলির দীর্ঘ কলেবর, যথোপযুক্ত নাট্যবস্তুর অভাব, নৃত্যগীতের খর্বতা এবং সর্বোপরি কেবলমাত্রই লোকরঞ্জনার্থে উপস্থাপনযোগ্য নয়। এগুলির দার্শনিক ঋদ্ধি এবং আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত সুগ্রন্থিত ইতিবৃত্তের অভাবজন্যই এগুলি উপরূপকপর্যায়ে বিচার্য নয়। *নটীর পূজা* প্রথমতঃ সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিন্যস্ত একটি নাট্য। এখানে নাট্যদ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে চরিত্রগুলির বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার কারণেই। তাই পৌরুষের দম্ভ, সাংঘিক বিরোধ *অচলায়তন* এবং *রক্তকরবী*-তে থাকলেও তা জনজীবনের বৃহত্তর চেতনায় অধিষ্ঠিত। প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত বা উপকাহিনির পরিমাণ তত্ত্বপ্রধান রবীন্দ্রনাট্যে যতখানি দৃশ্য, *নটীর পূজা*-য় ততখানি পরিস্ফুট নয়। তাই এমনই একটি নাট্যনির্বাচন প্রয়োজন যেখানে উপরূপকের মনোরঞ্জকধর্ম বর্তমান থাকবে। *নটীর পূজা*-য় চরিত্রের অনুভাব (aaction সক্রিয় নয়। *অচলায়তন, রক্তকরবী*-তে পদে পদে শরীরী মূর্তির সঞ্চরণ লক্ষিত। তাই প্রাচীন উপরূপকের ধারানুসারে *নটীর পূজা*-য় বিচার্য হতে পারে এই আশ্বাস এবং বিশ্বাসেই এখানে *নটীর পূজা*-র নির্বাচন করা হয়েছে।

তৃতীয় তথা শেষ যে রবীন্দ্রনাট্যটি গবেষিতব্য ব'লে ধার্য হয়েছে, তা হ'ল *শাপমোচন* । এখানে যে উপরূপকের সাপেক্ষে এটির লাক্ষণিক এবং নান্দনিক দিক বিশ্লেষণ করা হবে, তা হ'ল ত্রোটক। এটি এমন একটি উপরূপক যেখানে স্বর্গ এবং মর্ত্যের চরিত্রের মেলবন্ধন ঘটে। *শাপমোচন*-এ গন্ধর্ব সৌরসেন শাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যে জন্ম নেয়। একই সঙ্গে সমদুঃখবণ্টনে তার সঙ্গিনী হয় প্রেয়সী মধুশ্রী। তাই নাট্যেতিবৃত্তের এই আদলটির জন্যই *শাপমোচন*-

কে নির্বাচিত করা হয়েছে। তবে শুধুমাত্র বস্তুগত সাদৃশ্য-ই নয়; সাহিত্যদর্পণপ্রোক্ত ত্রোটক নাট্যসংরূপের অন্যান্য বিষয়গুলিকেও এখানে সমগুরুত্ব দেওয়া হবে। তাই বর্গক্ষেত্রের চতুষ্কোণের পরিপ্রেক্ষিতেই *শাপমোচন*-এর মধ্যে ত্রোটকত্ব নির্ণীত হবে। যেহেতু স্বর্গ-মর্ত্যের কথাশ্রয়ী ইতিবৃত্ত অপর রবীন্দ্রনাট্যে লব্ধ নয়; সেহেতু ত্রোটক-এর সঙ্গে একমাত্র এই নাট্যটিরই তুলনামূলক আলোচনা করণীয়।

একবারে শেষে আসে "নান্দনিক প্রসঙ্গ" এই শব্দদ্বয়। এখানে প্রসঙ্গ যদি বিশেষ্য পদ হয়, তবে তার বিশেষণ হয় 'নান্দনিক'। সুতরাং উপরূপক এবং নির্বাচিত রবীন্দ্রনাট্যত্রিতয়ের মধ্যে যে দৃষ্টিকোণ থেকে তার সমীকরণ ঘটানো হবে, তা হতে হবে নান্দনিকতা অনুসারে। 'নান্দনিক' শব্দটি এসেছে 'নন্দন' শব্দ থেকে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*-এ এই শব্দের বহুবিধ অর্থের মধ্যে দুটি অর্থ হয় আনন্দদায়ক এবং আনন্দজনক[৪৫]। শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের দ্বারা সংকলিত এবং সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের দ্বারা সংশোধিত *Samsad Bengali-English Dictionary* অনুসারে 'নন্দন' শব্দের ইংরেজি অর্থ হয় a son, paradise, eden, a delightful এবং pleasing[৪৬]। সুতরাং 'delightful' এবং 'pleasing'-কে আনন্দজনকত্ব হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে 'নন্দনতত্ত্ব'-এর পরিসরে। এই প্রসঙ্গেই ইংরেজি 'Aesthetics' শব্দটিও অনুপ্রবেশ করে। H. C. Sur কর্তৃক সম্পাদিত *Comprehensive English-Bengali Dictionary* গ্রন্থটি এই তত্ত্বটিকে অনেকখানি স্বচ্ছ ক'রে তোলে। সেখানে 'Aesthetics' বা "the science of the beautiful in nature; and art"[৪৭]-এর বাংলা পরিভাষা হয়েছে 'রুচিবিজ্ঞান'। Art যদি শিল্প বা কলা হয়, তবে তদসম্বন্ধীয় সুস্থ, নির্মোহ এবং বিবেকী সহৃদয়ের রসাভিব্যঞ্জনা-ই সেই রুচিবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়। সুতরাং সাহিত্যবিদ্যা এবং চতুঃষষ্টি কলার সার্থকতা শিল্পরসিকের সদর্থকতাতেই। ড. সুখেন বিশ্বাস *নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'শিল্পের সংজ্ঞা স্বরূপ বৈচিত্র্য'-তে এই নন্দনতত্ত্বকে পাঁচটি ভাগে করেছেন[৪৮]। যথা ধ্রুপদী নন্দনতত্ত্ব (Classical Aesthetics), রীতির নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics of Style), সৃজনশীল নন্দনতত্ত্ব (Creative Aesthetics), পরিবেশমূলক নন্দনতত্ত্ব (Environmental Aesthetics) এবং মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব (Marxist Aesthetics)। তবে এই পাঁচটির মধ্যে তৃতীয় প্রকার নন্দনতত্ত্বকেই তিনি জিজ্ঞাসু শিল্পরসজ্ঞদের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট ব'লে মনে করেছেন – "এর মধ্যে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও অনুভূতি শীল নন্দনতত্ত্ব হল 'Creative Aesthetics'"[৪৯]। রাজশেখর *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থেই বলেছেন যে যারা সহৃদয় অর্থাৎ শিল্পের অবিরাম রসগ্রাহী, তাদেরও একটি প্রতিভা থাকে যাকে বলে 'ভাবয়িত্রী প্রতিভা' – "ভাবকস্যোপকুর্বাণা ভাবযিত্রী। সা হি কবেঃ শ্রমমভিপ্রায়ং চ ভাবযতি"[৫০]। তাই এই গবেষণাকার্যে নাট্যতত্ত্বকেই 'নন্দনতত্ত্ব' হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। একটি নাট্যরচনা অনুপম সুন্দর হয়ে ওঠে নাট্যতত্ত্বের সমুচিত এবং সমুন্নত প্রয়োগে। নাট্যের নাটকীয়তা এবং এক প্রকার রূপক বা উপরূপক থেকে দ্বিতীয় প্রকার রূপক বা উপরূপকের পৃথক রমণীয়ত্ব সহৃদয় সামাজিক উপভোগ করে এই নাট্যতত্ত্বের পারিপাট্যেই। তাই নির্বাচিত রবীন্দ্রনাট্যগুলি জনপ্রিয় এবং হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠার কারণ কি প্রাচীন ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের প্রভাব নাকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা অভিভাবিত নিজস্ব কোনও নাট্যতত্ত্বের নান্দনিকতা; সেই প্রশ্নের সমাধান-ই এখানে করণীয়। অর্থাৎ সাহিত্য এবং সংগীতের একটি যুগলবন্দী সংস্কৃতি এই গবেষণায় শোধিত

হতে চলেছে। তাই বলা যায় যে এক্ষেত্রে সৃজনশীল নন্দনতত্ত্বের আশ্রয়েই সংস্কৃত উপরূপক এবং উল্লিখিত রবীন্দ্রনাট্যগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

❖ গবেষণার নেপথ্যকথা :

পিতা সমীরণ দাস একদা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীতভবনের ছাত্র ছিলেন (১৯৮১-৮৬)। তাই রবীন্দ্রধ্বনি অবিরতভাবে চৈতন্যের স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হতে থাকে। বীরভূম জিলা স্কুল-এ যথাবিধি পাঠশেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য স্নাতকস্তরের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া। এই বিভাগের প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাই সারস্বত অনুশীলনের ব্রত-উদ্‌যাপনের উপচারের সুব্যবস্থা করে দেন। বিশেষতঃ স্নাতকোত্তরপর্বের দ্বিতীয় বর্ষে 'সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব' বিশেষপত্রের (Group A) অধ্যয়নলগ্নে শিক্ষাপ্রদানের সরলতা ও সরসতা-ই ভাবিত করেছিল 'জানার মাঝে অজানারে'-র সন্ধানে। স্নাতকোত্তর পর্বে তৎকালীন উক্তবিশেষপত্রের পাঠ্যক্রমের Course XX-তে *দশরূপ* এবং *নাটকলক্ষণরত্নকোশ* পাঠ্য ছিল। নাট্যতত্ত্বের এই বিষয়টিতে পাঠদান করেন অধ্যাপক ড. শিউলি বসু। সেই সময়েই 'নৃত্য'-এর ব্যাখ্যায় অধ্যাপক ড. শিউলি বসু 'উপরূপক'-এর ধারণাটি ছাত্রসম্মক্ষে তুলে ধরেন যা সেই সময় ছিল এক নতুন জ্ঞান। সেই সময় চতুর্থ অন্ত্য সেমেস্টারের Internal Assesment-এর একটি প্রকল্প নির্মাণের জন্য ভরতোক্ত *নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়দর্পণ, কাব্যাদর্শ, দশরূপ, অবলোকবৃত্তি* এবং *সাহিত্যদর্পণ* এই কয়েকটি গ্রন্থ থেকেই নৃত্য এবং নাটিকা নামক উপরূপকের ইতিহাসজ্ঞানের ক্ষুদ্রতম অনুশীলন সম্ভব হয়। তখন থেকেই প্রত্যয় জন্মায় যে যদি কখনও উচ্চতর বিদ্যাভ্যাসের সুযোগ আসে, তখন উপরূপক সম্পর্কিত কোনও বিষয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। তবে তা কেবলমাত্র উপরূপকের সংখ্যা, উদাহরণেই সীমান্ত নির্দেশিত হবেনা; বরং কোনও আধুনিক নাট্যসন্দর্ভ বা নাট্যব্যক্তিত্বের সাহিত্যকৃতিকে উপরূপকের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হবে। পারিবারিক সূত্রে পিতার নিজস্ব সাংগীতিক প্রতিষ্ঠান 'হিন্দোল নৃত্যসঙ্গীত মহাবিদ্যালয়'-এর একাধিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের মহড়ার ধারা ছিল। তাই *চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা* ও *বাল্মীকি-প্রতিভা* ইত্যাদি নাট্যের গানগুলি একপ্রকার অন্তঃস্থ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি বিশ্বভারতী (বিশ্ববিদ্যালয়) আয়োজিত বসন্তোৎসবের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাট্যের মঞ্চায়ন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেছিল ২০০০-২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাই উপরূপকের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য বা নৃত্যপ্রধান রবীন্দ্রনাট্যের সম্বন্ধের কৌতূহলবশতঃ এই গবেষণাকার্যে প্রবৃত্ত হওয়া।

❖ গবেষণার উদ্দেশ্য :

তবে এই গবেষণাকার্যের উদ্দেশ্য হ'ল দু'প্রকার। প্রথমতঃ শিক্ষাবিষয়ক (academic) এবং দ্বিতীয়টি হ'ল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট (socio-economic)। শিক্ষাক্ষেত্রে এই গবেষণাটি যেভাবে আখ্যায়িত হতে পারে, তা হ'ল তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। প্রাচীন ভারতের উপরূপকধারার নাট্যসংস্কৃতির বর্তমান অস্তিত্বনিরূপণ। উপরূপকগুলির মধ্যে একমাত্র 'নাটিকা' শব্দটি জনমানসে প্রচলিত থাকলেও তা ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রগত অভিধার অনুসারী নয়। নাটিকা ব্যতিরিক্ত অন্যান্য উপরূপক যথা প্রস্থান, হল্লীশ প্রভৃতি উপরূপকগুলির নামও বর্তমান সময়ে ব্যবহৃত

হয়না। তাই এরূপ নির্দিষ্ট পারিভাষিক শব্দের মাধ্যমে যে প্রাচীন নাট্যশৈলিগুলি সাহিত্যদর্পণাদি নাট্যশাস্ত্রমূলক গ্রন্থাবলিতে বিধৃত হয়েছে, সেই বৈশেষিক দিকটির পরিপ্রেক্ষিতেই নির্বাচিত রবীন্দ্রনাট্যকে আলোকিত করা হবে। এর ফলে দুটি দিক প্রকাশিত হতে পারে। যথা প্রথমতঃ প্রাচীন ভারতীয় নাট্যসংস্কৃতি কীভাবে রবীন্দ্রনাট্যে ধরা দিয়েছে এবং তা ক'তখানি বিবর্তিত হয়েছে, তা বোঝা যাবে। দ্বিতীয়তঃ সচেতনভাবে একজন নাট্যকার উপরূপকের অনুসরণ এবং অনুকরণপ্রথার আশ্রয় না নিলেও একটি নাট্যে কীভাবে প্রাচীন পন্থা সুপ্তভাবে আশ্রয় নেয়, তাও উঠে আসতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সচেতনভাবেই সংস্কৃত উপরূপক নাট্যতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তার কারণ ফাল্গুনী নাট্যকাব্যে নাটক ব্যতীত প্রকরণ, ভাণ এই দুটি রূপকের নামোল্লেখ[৪৯] করেছেন যা সচরাচর বাংলা নাট্যসাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়না। বনফুল দশটি ভাণ রচনা করলেও 'প্রকরণ' শব্দটির রাবীন্দ্রিক ব্যবহার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। দশরূপকের প্রগাঢ় জ্ঞান না থাকলে এই ধরণের রূপকের নামোচ্চারণ সম্ভব নয়। সুতরাং প্রাচীন নথিবদ্ধ নাট্যতত্ত্বকে কীভাবে সমসাময়িক পরিস্থিতিতে গ্রহণ বা বর্জন করতে হয়, তারও একটি রেখা নির্ণয় করা সম্ভব হবে ব'লেই মনে হয় এই গবেষণার দ্বারা।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই গবেষণাটি বিচার্য হবে এভাবে যে চতুর্বর্ণেরই যে কোনও এক বর্ণের সামাজিক অবস্থান, জীবিকা এবং রাজস্বের পরিমাণগত তথ্যের পরিসংখ্যান। উপরূপকের বিবর্তনে যখন দেখা যাচ্ছে যে একটি একক নর্তনকলা হয়ে উঠছে পূর্ণ নাট্য। অর্থাৎ সেখানে নাট্যস্থ একাধিক পাত্রপাত্রীর ভূমিকায় একাধিক কুশীলবদের অংশগ্রহণ হতে চলেছে। তাই নর্তন থেকে উপরূপক হওয়ার সঙ্গে যেমন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একটি বিবর্তন উঠে আসে, তেমনই এটিও স্বীকরণীয় যে বহু মানুষের এই ললিতকলাকে কেন্দ্র ক'রে জীবিকানির্বাহ ঘটেছে। শিল্পীর সংখ্যাবৃদ্ধি এটিকেও সূচিত করে। যদিও ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রমূলক গ্রন্থের পরম্পরায় দর্শনী (fare) বা সাম্মানিক (honorarium)-এর কোনও উল্লেখ নেই। তথাপি এই বিষয়ে অনুমান করা যেতে পারে যে পারিশ্রমিকবাবদ কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ছিল। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে উদার মানসিকতায় এই বিষয়টিরও গ্রহণীয়তা থাকা উচিত ব'লেই মনে করা যেতে পারে।

তাই জোরপূর্বক মিথ্যাচার এই গবেষণাকার্যের উদ্দেশ্য নয়। প্রাগুক্ত নির্বাচিত রবীন্দ্রনাট্যগুলির মধ্যে যদি যথাক্রমে নাটিকা, প্রেঙ্খণ এবং ত্রোটক-এর সম্পূর্ণ অবয়ব পরিলক্ষিত না হয়, তাও যেমন প্রত্যক্ষভাবে উক্ত হবে এবং যদি সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তাও উচ্চারিত হবে। এ বিষয়ে কোনওরূপ ধন্ধ বা দ্বিধার অবকাশ দাবি করেনা এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভ।

❖ **গবেষণার পদ্ধতি :**

প্রস্তাবিত গবেষণাকার্যে 'উপরূপক' এবং 'রবীন্দ্রনাট্য' এই দুটি বিষয়ই সমান্তরালভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই গবেষণাপদ্ধিতে এই দুটির কোনওটিই যেন ক্ষীণ না হয়ে যায়, তার জন্য যথাবিধি সতর্কতার অবলম্বন করা হয়েছে। এগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

- **ভাষা ও লিপির ব্যবহার :**

যদিও 'উপরূপক' বিষয়টি যে যে নাট্যতত্ত্বমূলক গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে, সেই গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত তথাপি রবীন্দ্রনাট্য বিষয়টি এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে একাধিক পঙক্তির ব্যবহার অবধারিত ব'লেই সমগ্র গবেষণাটি বাংলা ভাষায় এবং বাংলা বর্ণমালায় সজ্জিত হয়েছে। 'রূপক', 'উপরূপক', 'নাট্য', 'আধিকারিক ইতিবৃত্ত', 'বস্তু', 'সহৃদয়' প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রীয় পারিভাষিক শব্দগুলিকে অবিকৃত রেখেই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নিবন্ধিত হয়েছে। এগুলির সপক্ষে কোনও কাল্পনিক বাংলা শব্দের ব্যবহার করা হয়নি। এছাড়াও আরও একটি দিকের উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। সেটি হ'ল হিন্দি উদ্ধৃতির জন্য দেবনাগরী লিপির ব্যবহার করা হলেও সংস্কৃত উদ্ধৃতির জন্য দেবনাগরী লিপির ব্যবহার করা হয়নি; বরং তা বাংলা হরফেই লিখিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিচারিতার প্রশ্ন উঠলেও তার মীমাংসার্থে প্রদত্ত যুক্তিটি হ'ল যে হিন্দি উদ্ধৃতির সংখ্যা সংস্কৃত উদ্ধৃতির তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। তাই বারংবার দেবনাগরী লিপির ব্যবহার দৃষ্টিনন্দনকে ভারাক্রান্ত করে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে যায়। তাই যথাসম্ভব মনঃসংযোগের ব্যাঘাত না ঘটানোর জন্যই বাংলা লিপি গৃহীত হয়েছে। ইংরেজি ভাষার উদ্ধৃতির জন্য রোমক লিপিকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে। তাই সামগ্রিকভাবে চারটি ভাষা এই গবেষণা গ্রন্থে দেখা যাবে। যথা বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি এবং ইংরেজি।

- **বানানবিধি :**

এই গবেষণাকার্যের জন্য বাংলা বানানবিধি বিষয়ে আধুনিক বাংলা বানানবিধিকেই আদর্শ করা হয়েছে। তদনুসারে বাংলা বানান লিখিত হয়েছে। তবে তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দের বানানে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। তাই 'শ্রেণী', 'শৈলী' এই ধরণের বানানে পরিবর্তন করা হয়নি।

- **উদ্ধৃতি-ব্যবহার-কৌশল :**

এই গবেষণায় বিভিন্ন সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা এবং ইংরেজি গ্রন্থগুলি থেকে যে উদ্ধৃতিগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলির ব্যবহারে একটি বিধিবদ্ধ সতর্কতার অবলম্বন করা হয়েছে গ্রন্থনায় সৌন্দর্যায়নের প্রেক্ষিতেই। সংক্ষিপ্ত গদ্যোক্তির ক্ষেত্রে তা অনুচ্ছেদের মধ্যেই ব্যবহার করা হয়েছে এবং দীর্ঘ উক্তির ক্ষেত্রে একটি hi fen এর মাধ্যমে সেটিকে নিচে লেখা হয়েছে। অন্যদিকে শ্লোক বা কারিকার ক্ষেত্রে যদি চতুষ্পাদের উল্লেখ আবশ্যক ব'লে মনে হয়েছে, তবে সেক্ষেত্রে শ্লোকাকারেই লিখিত হয়েছে কিন্তু যেখানে শ্লোক বা কারিকার অংশবিশেষ গৃহীত হয়েছে, সেখানে তা অনুচ্ছেদে বাক্যের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া কোনও শব্দ, প্রতিষ্ঠানের নামকে বিশেষভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য single inverted comma এবং কোনও গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরতে double inverted comma-র ব্যবহার করা হয়েছে।

- **উল্লেখপঞ্জি এবং গ্রন্থপঞ্জির বিশেষত্ব :**

এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে উল্লেখপঞ্জির ব্যবহার করা হয়েছে প্রতি পৃষ্ঠায় পাদটীকার পরিবর্তে। যেক্ষেত্রে একই উদ্ধৃতি এবং আলোচনা প্রয়োজনীয় হয়েছে, সেক্ষেত্রে উল্লেখপঞ্জিতে 'দ্রষ্টব্য' এবং তার

সঙ্গে গবেষণা-অভিসন্দর্ভের ক্রমাঙ্ক ও পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি অংশে একটি কৌশলের অবলম্বন করা হয়েছে। প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় রচিত আকর গ্রন্থগুলিকে রাখা হয়েছে। যেহেতু গ্রন্থের সারণীতে অবিকল গ্রন্থবিবরণ প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে সংস্কৃত গ্রন্থ হলেও যেগুলির নামকরণ ইংরেজি ভাষায় তথা রোমক লিপিতে মুদ্রিত হয়েছে,সেক্ষেত্রে সেগুলিকে 'বিভাগ-খ'-এ স্থান দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে যেগুলি দেবনাগরী বা বাংলা লিপিতে গ্রন্থের নাম মুদ্রিত হয়েছে, সেগুলিকে 'বিভাগ-ক'-তে রাখা হয়েছে। এমনকি সম্পাদক,প্রকাশকের নামের ক্ষেত্রে যারা অবাঙালি বা বিদেশীয়, তাদের ক্ষেত্রে সঠিক নামের উচ্চারণ না বোঝা গেলে এবং কোনও সম্পাদকের নামের ক্ষেত্রে যদি শুধু প্রথম letter দেওয়া থাকে (যেমন M. R. Kale), সেগুলিকেও অবিকল রেখে রোমক লিপির ব্যবহার ঘটেছে। এরপর বাংলা ভাষায় রচিত আকর গ্রন্থ এবং সহায়ক গ্রন্থ এই তিনটি ভাগে ভাগ ক'রে সেগুলির পৃথক সজ্জীকরণ হয়েছে। তারপরে হিন্দি ভাষায় রচিত আলোচনামূলক গ্রন্থগুলি উল্লিখিত হয়েছে এবং পরিশেষে ইংরেজি বা আঙ্গলভাষায় রচিত কিছু সমালোচনামূলক এবং পত্রিকাকে ভিন্ন শ্রেণিবিন্যাসে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থনির্দেশের জন্য MLA Style sheet অনুসরণ করা হয়েছে। ভাষাগত গ্রন্থবিভাজনরীতিপূর্বক পঠিত গ্রন্থগুলির যাবতীয় তথ্যপ্রকাশে পাঠকের খেদোৎপত্তি ঘটবে না ব'লেই আশা করা যায়।

- **অধ্যায় বিভাজন :**

এই সমগ্র গসমগ্রকার্যটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। এগুলি নিম্নলিখিত –

ভূমিকা
প্রথম অধ্যায় – উপরূপক : উৎস ও ক্রমবিকাশ
দ্বিতীয় অধ্যায় – উপরূপক : সেকাল ও একাল
তৃতীয় অধ্যায় – উপরূপক ও রবীন্দ্রনাট্য : সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ
চতুর্থ অধ্যায় – নাটিকা ও *মায়ার খেলা* : তুলনামূলক আলোচনা
পঞ্চম অধ্যায় – প্রেঙ্খণ ও *নটীর পূজা* : নব মূল্যায়ন
ষষ্ঠ অধ্যায় – ত্রোটক ও *শাপমোচন* : একটি সমীক্ষা
উপসংহার

প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে 'উপরূপক' শব্দের প্রথম উল্লেখ, এই শব্দের নামান্তর, উপরূপকের সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতানৈক্য, সর্বাধিক প্রাচীন উপরূপকের নাম, অপর উপরূপকগুলির প্রাথমিক উৎস এবং স্বরূপব্যাখ্যা, নৃত্যের সঙ্গে উপরূপকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং নৃত্যনাট্যের সঙ্গে উপরূপকের আলিঙ্গন, উপরূপক বিষয়ে পণ্ডিতদের মতামত এবং প্রধানতম উপরূপকের নাম এবং প্রসার।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিতব্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে উপরূপকগুলির নামকরণের সার্থকতা। এই নামকরণটি ব্যাকরণগত দিক থেকে কতখানি সার্থক তা যেমন বিচার করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে এটিও দ্রষ্টব্য যে আধুনিক

সময়ে প্রাপ্ত কিছু উপরূপকের মধ্যে সেই নামকরণটির যৌক্তিকতা ক'তখানি বর্তমান। এরপরে রূপক এবং উপরূপকের সম্পর্ক বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় নাট্যশাস্ত্রভিত্তিক গ্রন্থগুলির মধ্যে উপরূপকের শ্রেণিবিভাগ করা হয়নি। তাই এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উপরূপকের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাপ্ত কয়েকটি উপরূপকের সঙ্গে প্রাচীনকালের কয়েকটি উপরূপকের আঙ্গিকগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উভয়ই ব্যাখ্যাত হয়েছে। আধুনিক যুগের বিভিন্ন নাট্যসমালোচকদের দৃষ্টিকোণ থেকে উপরূপকসম্পর্কিত ভাবনাগুলিও উল্লিখিত হয়েছে এবং তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এমনকি এই অধ্যায়ের শেষ পর্বে প্রাচীনকালে কী ধরণের বা কোথায় বা কীভাবে উপরূপকের মঞ্চাভিনয় ঘটত এবং বর্তমান সময়ে ভারতে স্থান-কাল-পাত্রোল্লেলপূর্বক কয়েকটি উপরূপকের মঞ্চায়ন তথ্যসহ কথিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়টি উপরূপকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ দর্শিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে নির্বাচিত রবীন্দ্রনাট্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাঙ্ক পদ্ধতির নাট্য, কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, ঋতুনাট্য এই জাতীয় নাট্যগুলির মধ্যে কীভাবে উপরূপকের মৌল আভ্যন্তরীণ বিশিষ্টতাগুলি ধরা দিয়েছে, তা বিচার করা হয়েছে। এগুলি নামাঙ্কিত কোনও নির্দিষ্ট উপরূপক না হওয়া সত্ত্বেও উপরূপকত্বের ছায়াপাত যে অলক্ষ্যক্রমে ঘটে গেছে তা নির্ণয় করা হয়েছে। তাই এই অধ্যায়ের ফলে পরোক্ষভাবে উপরূপকের প্রকৃতিগত আচরণ তথা কবিভঙ্গীভণিতির আতিশয্যগত আড়ম্বর-ও উঠে আসে।

পরবর্তী তিনটি অর্থাৎ চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে নির্বাচিত নাট্যত্রিতয়ের একেকটি অধ্যায়ে নির্দিষ্ট উপরূপকের সাপেক্ষে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তবে এই ব্যাখ্যাকার্যটি শুধুমাত্র *সাহিত্যদর্পণ* বা নাট্যশাস্ত্রমূলক লক্ষণগ্রন্থের সাপেক্ষেই করা হয়নি। এখানে লক্ষ্যগ্রন্থ অর্থাৎ নাটিকা, প্রেঙ্খণ এবং ত্রোটক-এর গ্রন্থসাপেক্ষেও করা হয়েছে। তাই দ্বিবিধ পদ্ধতিতে উক্ত রবীন্দ্রনাট্যগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট উপরূপকের নির্যাস অনুসন্ধান করা হয়েছে।

- **গ্রন্থাগার-পরিদর্শন :**

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রস্তুতিপর্বে বেশ কয়েকটি গ্রন্থাগার-পরিদর্শন করা হয়েছে। তন্মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের reading section, reference section, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ' (কলকাতা) , 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' (কলকাতা), 'টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (কলকাতা) ইত্যাদি গ্রন্থাগারের মাধ্যমে এই গবেষণায় অগ্রগতি এসেছে। বিশেষতঃ *পার্থপাথেয়* উল্লাপ্যোপরূপকটি 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ'-এর গ্রন্থাগারেই সযত্নে রক্ষিত রয়েছে ব'লেই এটির পাঠগ্রহণ সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য *নাট্যসম্ভব* উপরূপকটি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর সংগ্রহে থাকার সুবাদে এই গ্রন্থাধ্যয়ন করা হয়েছে। *হ্বাগনের এবং রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য* গ্রন্থটি 'টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। এ কারণেই সেটির প্রাপ্তি ঘটেছে। এইভাবেই বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকদের আনুকুল্যে এই গবেষণা কার্যক্রমটিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

- **সাক্ষাৎকার-গ্রহণ :**

এছাড়াও এই গবেষণাকার্যের সুবিধার্থে এবং মানোন্নয়নের জন্য রবীন্দ্রসংগীত এবং রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। যথা জোড়াসাঁকো-ঠাকুরপরিবারের সদস্য শ্রীমতী শুভ্রা ঠাকুর, অধ্যাপক ড. অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় (বিশ্বভারতী), অধ্যাপক দেবাশিস রায়চৌধুরী (আনন্দমোহন কলেজ, 'দক্ষিণী'-র সদস্য এবং রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী), ড. তমালিকা দে (প্রাক্তন ছাত্রী, বিশ্বভারতী) এবং শুভদীপ সরকার (প্রাক্তন ছাত্র, বিশ্বভারতী তথা গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)। তবে এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারগুলিকে অবিকল লিপিবদ্ধ করা হয়নি। প্রসঙ্গানুযায়ী সেই মতামতগুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

- **আলোকচিত্রের ব্যবহার :**

গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি আলোকচিত্রকে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের সমাপ্তিপর্বে 'পরিশিষ্ট' অংশে রাখা হয়েছে। সেগুলি হ'ল *নাট্যসম্ভব* উপরূপক গ্রন্থের প্রচ্ছদ, 'চিদাকাশ কলালয়' কর্তৃক ভাণিকা প্রযোজনার প্রচারপুস্তিকা, বিশ্বভারতীর *মায়ার খেলা* প্রযোজনা,জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে *নটীর পূজা* অভিনয়, বিশ্বভারতী-র *শাপমোচন* প্রয়োজনা, 'টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর *শাপমোচন* প্রযোজনা এবং শ্রীমতী শুভ্রা ঠাকুরের নৃত্যাভিনয়। তারই সঙ্গে সেই আলোকচিত্রগুলির বিবরণ লিখিত হয়েছে। এমনকি সেই চিত্রগুলি কোথা থেকে কীভাবে সংগৃহীত হয়েছে, সেই তথ্যসূত্র উল্লিখিত হয়েছে।

- **গ্রন্থসমীক্ষা :**

এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রস্তাবিত বিষয় সম্পর্কে ধারণা ইতোপূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এখন দ্রষ্টব্য যে এই বিষয়টি ক'তখানি অভিনবত্বের দাবি জানাতে সক্ষম। উপরূপকের সঙ্গে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের সম্পর্কে যে রবীন্দ্রনাথ উপরূপকদ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এই প্রসঙ্গটি বার্ণিক রায় *হ্বাগনের ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য* গ্রন্থে তুলে ধরেছিলেন। তবে তিনি উপরূপকের আবেদন, রীতি এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের আবেদন, রীতি এবং রসবত্তার অপরিমেয় দূরত্ব নির্ণয় করেছেন –

সংস্কৃতের উপরূপকশ্রেণীর নাটিকা ত্রোটক গোষ্ঠী সত্তক নাট্যরাসক উল্লাপ্য কাব্য সংলাপক শ্রীগদিত দুর্মল্লিকা বিলাসিকা প্রস্থান ভাণিকা রাসক প্রকরণিকা হল্লীশ প্রেঙ্খন – রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের পর্যায়ের নয়। সংস্কৃত সাহিত্য ও জীবনের অবনতিকালের সময়, মানুষের পঙ্ক আনন্দের বহিঃপ্রকাশই নাচে গানে, অশ্লীল কথাবার্তায় যৌন ব্যভিচারিতায় রূপ পেয়েছে উপরূপকে। নাচ ও গানের অস্তিত্বই গীতিনাট্যের অস্তিত্ব প্রকাশ করে না।[৫১]

যদিও এখানে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা,শ্যামা* এবং *মায়ার খেলা*-র সঙ্গেই উপরূপকের সাদৃশ্যসম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়নি। তাই বার্ণিক রায়ের বক্তব্যকে খণ্ডন করার প্রসঙ্গ উত্থাপনের অবসর নেই। তবে তিনি তাঁর বক্তৃতার মধ্যেই পরোক্ষভাবে বলতে চেয়েছেন যে উপরূপক হ'ল প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যনাট্যপদ্ধতি। এই মতামতকেই কার্যতঃ সমর্থন করা যায়না। এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়েই তা পরিষ্কৃত

করা হয়েছে যে উপরূপক নৃত্যনাট্যের নামান্তর নয়। পদার্থাভিনয়মূলক ভাবাশ্রয়ী নৃত্য থেকেই উপরূপক প্রসূত হলেও খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে *সাহিত্যদর্পণ*-এর যুগে তা কেবলমাত্র নৃত্যায়িত নাট্যরূপে অবস্থান করেনি। *রত্নাবলী, কর্পূরমঞ্জরী, বিক্রমোর্বশী* যেগুলি উপরূপকরূপে সেখানে মান্যতা পেয়েছে, সেগুলি নৃত্যনাট্য নয়। সুতরাং নাটিকা, সট্টক, ত্রোটক এগুলি উপরূপক হলেও তথাকথিত 'নৃত্যনাট্য' নয়। এমনকি অশ্লীলতার দায়ে তিনি যেভাবে উপরূপক সংস্কৃতিকে অভিযুক্ত করেছেন, তা সত্য হলেও যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ উপরূপক আধুনিককালের নৃত্যনাট্য নয়, তাই দার্শনিক ভাবগম্ভীর রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের কোনও কোনও ক্ষেত্রে সে জাতীয় কামজ শরীরী অভিব্যক্তির কথাও উল্লিখিত হয়েছে যা তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এছাড়াও উপরূপক এবং রবীন্দ্রনৃত্যবিষক এই দুটি ধারায় যে গবেষণাকার্য সম্পন্ন এবং গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই উপরূপকবিষয়ে যে গ্রন্থগুলি উপলব্ধ,সেগুলির কালানুক্রমিক উল্লেখ করা হ'ল –

১) *সংস্কৃত নাটিকা বিমর্শ* – জয়শ্রী সিনহা (১৯৮৫) । এই গ্রন্থটি উপরূপকের অন্যতম নাটিকা-র যাবতীয় বিষয়ে আলোচিত এক নিষ্কর্ষ। একদিকে যেমন নাটিকা-র লাক্ষণিক দিকগুলি উল্লিখিত হয়েছে, তেমনই *রত্নাবলী* ইত্যাদি বিভিন্ন নাটিকা গ্রন্থেরও পরিচয়, বিশিষ্টতা নির্ধারিত হয়েছে। এই গ্রন্থাধ্যয়নে যে উপকারটি পাওয়া গেছে, তা হ'ল সংস্কৃত উপরূপকমালার মধ্যে সপ্তদশ পুষ্প থাকলেও নাটিকা হল মধ্যমণি দোলক। অর্থাৎ উপরূপকসংস্কৃতিতে নাটিকা যে অগ্রমান্য, সেকথা এই গ্রন্থটি প্রমাণ করেছে। তাই আলোচ্য গবেষণাকার্যের প্রথম অধ্যায়েই উপরূপক-সংস্কৃতির মধ্যে নাটিকা-র স্থানমাহাত্ম্য যেমন দর্শিত হয়েছে, তেমনই এই নাটিকা-র প্রেক্ষিতে *মায়ার খেলা* গীতিনাট্যের কৌশল ব্যাখ্যা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে।

২) *उपरूपकों का उद्भव और विकास* – ইন্দ্রা চক্রবাল (১৯৮৬)। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষায় বিরচিত উপরূপক নাট্যধারা বিষয়ক তথ্যের জন্য এই গ্রন্থ অদ্বিতীয়। এখানে উপরূপকের সংখ্যা, উপরূপকের নামান্তর, উপরূপকের বিবর্তন, একাধিক প্রাচীন এবং আধুনিক উপরূপকের সারাংশ, উপরূপককারগণের পরিচয় ও কবিকৃতিপরত্ব এবং বিভিন্ন নাট্যতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের মনীষা পৃথক পৃথক অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থপাঠের ফলেই *পার্থপাথেয়, দ্রৌপদীস্বয়ংবর* ইত্যাদি উপরূপকগুলির কথ জানা গেছে এবং পরবর্তীতে সেই গ্রন্থগুলির পাঠগ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে এই শোধপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

৩) *Uparūpaka-s in Indian Performing Arts* – Ed by Deepti Omchery Bhalla (2023)। এই গ্রন্থটি ত্রয়োদশ প্রবন্ধের সংকলন। বর্তমান সময়ে উপরূপকসম্বন্ধিত একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থরূপেও এটিকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। এর মধ্যে রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর 'Uparūpaka-s and Nātyasāstra', পিয়াল ভট্টাচার্য এবং দীপ ঘোষের 'Comprehending 'Upa-rūpaka': An exploration of it's nature and the dynamics of two variants – Bhāna and Bhānikā', বি এন মনোরমার 'The contemporaries of Ancient Uparūpaka Tradition Traced in Coastal Karnataka's Yaksagāna and Post Medieval Period',

শরোদী সাইকিয়া-র 'Ankiyā Nāt and Bhāonā : it's affinities with Uparūpaka-s', পার্বতী দত্তের 'Tracing of Performative Community of Rāsaka : from Uparūpaka to Rāsa and beyond', প্রিয়াশ্রী ভি রাও-এর 'Common threads of concepts and Ideas between Uparūpaka-s and Bharatanātyam', মধু রাণী শুক্লা-র 'नौटंकी में भाषागत एवं सांगीतिक वैशिष्ट्य' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য কারণ উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলিতে বর্তমানে প্রচলিত ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক নাট্য এবং নৃত্যের মধ্যেই প্রাচীন উপরূপকগুলির প্রতিফলন দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে কর্ণাটক, অসম, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যের সংস্কৃতি উঠে এসেছে। অর্থাৎ উপরূপকগুলি যে বর্তমানে সুপ্তাবস্থায় রয়েছে এবং আধুনিক কালের কোনও নৃত্যনাট্য বা নৃত্যাত্মক নাট্যেও যে উপরূপকের নির্যাস উপলব্ধ হতে পারে, সে বিষয়ক একটি সদর্থক ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাট্যের মধ্যে উপরূপকের অনুষঙ্গ-সন্ধান যে গবেষণাযোগ্য একটি বিষয়, সে সম্পর্কে একটি সমর্থন এই গ্রন্থের দ্বারাই লব্ধ।

এরপর কয়েকটি শোধপ্রবন্ধের উল্লেখ করা যাক –

শিরোনাম	**গবেষক**	**তত্ত্বাবধায়ক**	**বিশ্ববিদ্যালয়**	**খ্রিস্টাব্দ**
चन्द्रकला नाटिका एवं रत्नावली का नाट्यशास्त्रीय अध्ययन	অপর্ণা পাণ্ডে	ওঙ্কারনাথ বর্মা	ড. বি আর আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৮৮
उपलब्ध सट्टकों का आलोचनात्मक अध्ययन	অনিল কুমার মিশ্র	শঙ্কর দয়াল দ্বিবেদী	ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়	২০০২
The Contribution of Orissa to Uparupakas	বিজয়লক্ষ্মী আচার্য	প্রফুল্ল কুমার মিশ্র	উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়	২০০৫
ललित कलाओं की दृष्टि से संस्कृत उपरूपक नाटिका : एक अध्ययन	পুনম তিওয়ারি	সুভদ্রা ত্রিপাঠী	ছত্রপতি শাহজালাল মহারাজ বিশ্ববিদ্যালয়	২০০৭
नाटिका की परम्परा में रत्नावली एवं चन्द्रकला का तुलनात्मक अध्ययन	রামমনোহর পাণ্ডে	রঘুনাথ পাঠক	ভি বি এস পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়	২০০৯
प्राकृत सट्टकों का नाट्यशास्त्रीय विवेचन	শুক্ল জয় গুরুদেব	হরিশ্চন্দ্র মিশ্র	ড. রামমনোহর লোহিয়া অবধ বিশ্ববিদ্যালয়	২০১২

অর্থাৎ এই গবেষণাগুলির মধ্যে যে তথ্যটি অধিকতর আলোকিত হচ্ছে, তা হ'ল 'নাটিকা' এবং 'সট্টক' এই দুই উপরূপকবিষয়ে গবেষকদের উৎসাহ। এই কৌতূহলেরও প্রধান দুটি কারণ চিহ্নিত করা যায়। সেগুলি হ'ল –

- বর্তমান সময়ে এই দুটি উপরূপকের মুদ্রিত সংস্করণের আকারে বহু গ্রন্থের প্রাপ্তি।
- অষ্টাদশ উপরূপকের মধ্যে এই দুটি উপরূপকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

এছাড়াও গবেষক বিজয়লক্ষ্মী আচার্যের The contribution of Orissa to Uparupakas গবেষণায় উড়িষ্যা রাজ্যের গোষ্ঠী শৈলীর একটি উপরূপক সম্পর্কে জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়েছে। এই উপরূপকটি হ'ল অনাদিমিশ্র রচিত *রাসসংগোষ্ঠী* । তবে এই গ্রন্থটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ করা যায়নি এই গবেষণাকার্য চলাকালীন। তাই এর সম্পর্কে বিশেষ মতামত পোষণ করাও অধরা থেকে গেছে। তবে এই গবেষণায় *উৎসাহবতীরূপক* সম্পর্কে হল্লীসক-এর পরিচয় দেওয়া হলেও সেই যুক্তিগুলি সঠিক ব'লে বিবেচিত হয়না। তাই এই শোধপ্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করা হয়েছে।

সুতরাং উপরূপক বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রন্থ এবং শোধকার্যের উপস্থিতিতে যে যে বিষয়গুলি নতুনভাবে অন্বেষণযোগ্য, সেগুলি হ'ল –

- নাটিকা এবং সট্টক ব্যতীত অপর ষোড়শ উপরূপকের সমীক্ষণ।
- উপরূপকের উৎস, বিবর্তন এবং মঞ্চায়ন সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ।
- শুধুমাত্র *সাহিত্যদর্পণ* বা তজ্জাতীয় নাট্যতত্ত্বমূলক গ্রন্থে বিবৃত উপরূপকের লাক্ষণিক দিকগুলি ছাড়াও উপরূপকের প্রয়োগকৌশলগত স্বচ্ছ তত্ত্বের অনুসন্ধান।
- প্রাচীন উপরূপকগুলির সঙ্গে সাম্প্রতিককাল বা বিগত দুই শতাব্দীতে গ্রথিত উপরূপকগুলির পাঠগ্রহণ এবং আধুনিকত্বের বিশ্লেষণ।
- আধুনিক ভারতীয় নৃত্যনাট্যের সঙ্গে উপরূপকপদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে একটি সত্যে উপনীত হওয়া।

এই পঞ্চবিধ কারণকে স্মরণে রেখেই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায় নির্মিত হয়েছে। সেখানে উপরিউক্ত বিষয়গুলি সাধ্যানুসারে বিশ্লেষিত করার প্রয়াস রয়েছে।

এরপরে আসা যাক রবীন্দ্রনৃত্য বিষয়ে। রবীন্দ্রনৃত্য বিষয়ক যে গ্রন্থগুলি সুলভে প্রাপ্ত, সেগুলি হ'ল –

১) *রবীন্দ্রসঙ্গীত* – শান্তিদেব ঘোষ (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ/১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ)। মূলতঃ এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের গানের বৈচিত্র্য, রবীন্দ্রনাথের সংগীতভাবুকতা, রবীন্দ্রনাথের গানের প্রয়োগের মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলিই প্রধানরূপে ব্যক্ত হলেও রবীন্দ্রগীতিনাট্য এবং রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যেরও প্রয়োজনসাপেক্ষে আলোচনা উঠে এসেছে। এখানেই 'গীতনাট্যের বৈচিত্র্য' অধ্যায়ে শান্তিদেব ঘোষ প্রাচীন উপরূপকের মধ্যে নৃত্যনাট্যের অঙ্গোপাঙ্গের চিহ্নের নির্দেশ দিয়েছেন।[৫২]

তবে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যমাত্রেই যে সেটি শাস্ত্রবিহিত কোনও না কোনও নির্দিষ্ট উপরূপকেরই নিদর্শন হবে এমন ধারণা দিয়ে যাননি বা সেটি তাঁর অভিপ্রায় ছিলনা।

২) *নৃত্য* – প্রতিমা দেবী (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ/১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ) । এই গ্রন্থে 'নৃত্য' সম্পর্কে যেমন রাবীন্দ্রিক ভাবনা প্রভাসিত হয়েছে, তেমনই রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় *চিত্রাঙ্গদা* এবং *চণ্ডালিকা* নৃত্যনাট্যে কীরূপ নৃত্যশৈলির ছায়াপাত ঘটেছিল, তাও ভাষিত হয়েছে। এই গ্রন্থপাঠে রবীন্দ্রনৃত্যের আদর্শ স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এটি ক'তখানি 'ভাবনৃত্য' বা ক'তখানি 'পদার্থাভিনয়ী' ললিতকলা সে বিষয়ে যে ধারণা জন্ম নেয়, সেই ধারণা অনেকখানি পাথেয় হয়ে উঠেছে এই গবেষণা সমীক্ষায়। নৃত্যাশ্রয়ী রবীন্দ্রনাট্যের নৃত্যের মধ্যে উপরূপকত্ব রয়েছে কিনা তা নির্ণয়ের জন্ এই গ্রন্থের কাছে ঋণ রয়ে যায়।

৩) *রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য* – প্রণয়কুমার কুণ্ডু (১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ) । এই গ্রন্থটির থেকে রবীন্দ্রগীতিনাট্য এবং রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য এবং তত্ত্ব উপলব্ধ হলেও যে বিশেষ দুটি কারণে গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হ'ল এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'উনিশ শতকের বাংলা গীতিনাট্য এবং রবীন্দ্র-গীতিনাট্যের জন্মলগ্ন'-তে গ্রন্থকার 'নাট্যরাসক' শব্দের উল্লেখ করেছেন – "কখনো কখনো নাট্যরাসক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে উনিশ শতকে উদ্ভূত বাংলা গীতিনাট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে"[৫৩]। বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণ*-এর মতে নাট্যরাসক হ'ল তম উপরূপক। তাই উপরিউক্ত বাক্য থেকে একটি তথ্য অবগত হওয়া যায় যে খ্রিস্টিয় উনবিংশ শতকে বঙ্গে গীতিনাট্যকে 'নাট্যরাসক' অভিধায় অভিহিত করা হ'ত। তাই সেই সময়ের কয়েকটি নাট্যরাসক-এর অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সাহিত্যদর্পণোক্ত নাট্যরাসক-এর ধর্ম ক'তখানি সেই গীতিনাট্যগুলিতে অক্ষুণ্ণ থেকেছে, সে বিষয়ে উক্ত অধ্যায়টিতেই দীর্ঘ আলোচনা চলেছে।

দ্বিতীয়তঃ এই গ্রন্থের 'রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের পর্যালোচনা' নামক চতুর্থ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যে চিত্রধর্মিতার স্থান পরিমিত এবং ভাবধর্মিতার স্থান অপরিমিত। এই ভাবধর্মিতাকেই গ্রন্থকার অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন –

রবীন্দ্রনাথ যে নৃত্য প্রযোজনা করেছেন তাঁর নৃত্যনাট্যে, তার মধ্যেও ওই ব্যঞ্জনা বা ধ্বনির ব্যবহার অল্প নয়, অনিবার্যতা যথেষ্ট এবং এই নৃত্যধারার বিশিষ্টতারও লক্ষণ।[৫৪]

তাই উপরূপকের যুগের নৃত্যে কতখানি ধ্বনিপ্রাধান্য ছিল এবং কতখানি অভিধেয়ার্থের গৌণতা ছিল, তা বিচার করার দাবি ওঠে এরপরেই। প্রস্তাবিত শোধকার্যের দ্বিতীয় অধ্যায়েই তা উদাহরণসহযোগে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এমনকি তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন কয়েকটি উপরূপকের উদাহরণের সাপেক্ষে রবীন্দ্রনাট্যের পদ্যাংশ, গদ্যাংশ, গান, গীতাশ্রয়ী নৃত্যের মধ্যেও বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থের স্থাননিরূপণ করা হয়েছে।

৪) *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য* – শান্তিদেব ঘোষ (১৩৯০ বঙ্গাব্দ/১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ) । এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্তা রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে কীভাবে রবীন্দ্রনৃত্য এবং নৃত্যপ্রধান রবীন্দ্রনাট্যগুলির বিকাশলাভ হয়েছিল, তা

স্মৃতিচারণার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই তথ্যগুলি প্রস্তাবিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভের চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে যথাক্রমে নটীর পূজা এবং শাপমোচনের উৎস, বিবর্তন এবং মঞ্চাভিনয়ের আলোচনায় উঠে এসেছে।

৫) *রবীন্দ্রনৃত্য বিরচনা* – স্নেহাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১০ খ্রিস্টাব্দ)। এই গ্রন্থটি নৃত্যশাস্ত্র এবং রসশাস্ত্রের বৈয়াকরণিক দিকের উপাত্তেই রবীন্দ্রনৃত্যের ধারণাকে উপস্থাপন করেছে। 'নৃত্য সংশ্লেষ' অধ্যায়ে গ্রন্থকার বলেছেন–

শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা কোন বিশিষ্ট নৃত্যকলার আঙ্গিককে গ্রহণ করেনি, বরং মূকাভিনয় প্রধান ভাবনৃত্য বলাই উচিত। যাতে মিশ্র তাল ও ভঙ্গীর সহযোগে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হয়েছে।[৫৫]

অর্থাৎ উনি মনে করেছেন যে দশরূপ গ্রন্থের ভাবপ্রকাশক 'নৃত্য'-ই তাললয়চাতুর্যকলা 'নৃত্ত'-এর সৌহার্দ্যেই শান্তিনিকেতনী রবীন্দ্রনৃত্যের জন্ম। এই উক্তিটির প্রয়োগ যেমন বর্তমানে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রযোজিত রবীন্দ্রনৃত্যে দেখা যায়, তেমনই এই গবেষণার ক্ষেত্রে এটি একটি ভূমিতলের ন্যায় ভিত্তি হয়ে ওঠে। উপরূপকের মধ্যে যদি *বিক্রমোর্বশী*-কে ধরা হয়, তবে তার (সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত) চতুর্থ অঙ্কে রাজা পুরুরবার বেশ কয়েকটি নৃত্যের উল্লেখ রয়েছে। সেই নৃত্যগুলির স্বরূপ না জানতে পারার ফলে সেখানে তাল এবং আঙ্গিক অভিনয়ের সমপরিমাণ মিশ্রণ কীভাবে ঘটেছিল, তা বলা যায়না। তবে শ্লোকগুলি যেহেতু বিষয়েরই ভাষিক রূপ, তাই সেখানে ছন্দের মাধ্যমে তাল এবং লয়কে দেখে নেওয়া যেতে পারে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে তা যথাসম্ভব দেখানো হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের যেহেতু তাল উল্লিখিত, তাই *বিক্রমোর্বশী* এবং *শাপমোচন*-এর গানের ভাষানুযায়ী তাল বা ছন্দ এবং লয়ের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ সেখানে প্রদর্শিত হয়েছে।

৬) *Tagore's Mystique of Dance* – Utpal K Banerjee (২০১১ খ্রিস্টাব্দ)। এই বৃহদায়তন গ্রন্থটি শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী এবং রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতির একটি আকর গ্রন্থ। এখানে রবীন্দ্রনাথের সংগীতবিষয়ক মনন, রবীন্দ্রনাট্যে নৃত্যপ্রয়োগ, নৃত্যের প্রাসঙ্গিকতা, নৃত্যের ঔচিত্যবোধ, বিশিষ্ট সংগীতশিল্পীদের জীবনী, রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের মঞ্চায়ন সম্পর্কিত বিস্তৃত জ্ঞানলাভের জন্য উপাদেয়। এই গ্রন্থপাঠহেতু রবীন্দ্রনৃত্যে নাট্যিকতা এবং রবীন্দ্রনাট্যে নৃত্যনির্মিতি এই দুইয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুভূত হয় যা এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের জন্য উপাদেয় হয়েছে।

৭) *রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য : একটি নারীবাদী পাঠ* – শেফালী মৈত্র (২০১৯ খ্রিস্টাব্দ)। এই গ্রন্থটি একটি বিশেষ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে 'শাপমোচন' অধ্যায়ে উক্ত রবীন্দ্রনাট্যবিষয়ে বহুবিধ অভিনব চিন্তা গুচ্ছাকারে জোট বেঁধেছে। প্রথমতঃ এটি যে *চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা* এবং *চণ্ডালিকা*-র সমগোত্রের এবং সমমানের যে নয়, সে বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্রী অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছেন কিন্তু 'কথিকা' শব্দের ব্যাকরণগত এবং প্রয়োগগত কারণের সত্যতা প্রকাশিত হতে বাকি থেকেছে – "জমাট কোন প্লট না থাকাটা একটা কারণ হতে পারে"[৫৬]। সেকারণেই এই বিষয়ে তৎপরতা সহকারেই 'কথিকা' শব্দটির কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

৮) *রবীন্দ্র নৃত্যতত্ত্ব* – দেবতোষ নাথ (২০১৯ খ্রিস্টাব্দ)। দ্বাদশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই গ্রন্থটির নামকরণ গ্রন্থটির অধ্যায়বিন্যাসগত উপস্থাপনার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনৃত্যবিষয়ে কোনওরূপ শব্দোচ্চারণ ঘটেনি। ভারতীয় নৃত্যকলার আদর্শগত স্বরূপ এবং রসসিক্ততা-ই সেখানে ব্যক্ত। তবে *অভিনয়দর্পণ*-এর কারিকা উদ্ধৃত হলেও *দশরূপ, শৃঙ্গারপ্রকাশ, ভাবপ্রকাশ*-এর ম'ত গ্রন্থগুলির কোনও উল্লেখ দেখা যায়না। ফলে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য যা উপরূপকের পূর্বপ্রজন্ম, তার গৌরব অকথিত থাকায় প্রথম ছয়টি অধ্যায় তথ্যগত দিক থেকে অপূর্ণ। সপ্তম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনৃত্যবিষয়ে দেবতোষ নাথ বলেছেন –

তাই বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় কেউ কেউ নৃত্যছন্দের পারদর্শিতা দেখানোর যথেচ্ছ সুযোগ না পেয়ে যেমন আক্ষেপ করতে থাকেন, তেমনি আবার কেউ কেউ নিজের নৃত্যপটুত্ব প্রদর্শনের জন্য অহেতুক ভাবহীন অঙ্গবিক্ষেপের মাধ্যমে শুধুমাত্র গানের মাহাত্ম্যকে খর্ব করেন না, কখনো কখনো বিরক্তিরও কারণ হয়ে ওঠেন।[৫৭]

উদ্ধৃতিটি থেকে বুঝে নিতে হয় যে গ্রন্থকার যেভাবে রবীন্দ্রনৃত্যকে ভেবেছেন, সেখানে আঙ্গিক অভিনয়ের বাহুল্য সমীচীন নয়। অর্থাৎ প্রাচীন নৃত্যগুলির মধ্যে অঙ্গবিক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা এবং নান্দনিকতার দিকটি ব্যাখ্যাত হওয়ার প্রশ্নোত্থাপন করে। তাই এই গবেষনাকার্যের প্রথম অধ্যায়েই নৃত্যের মধ্যে আঙ্গিক অভিনয়ের স্থান বিষয়টি পরিষ্কৃত হয়েছে।

৯) *Rabindranritya : the dance idiom created by Tagore* – শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৯ খ্রিস্টাব্দ)। এই গ্রন্থটিও রবীন্দ্রনৃত্যের উদ্ভব, বিকাশ এবং বিভিন্ন গুণী নৃত্যশিল্পীবৃন্দের রবীন্দ্রনদত্যনাট্য প্রযোজনার ইতিহাসকেই তুলে ধরেছে। গবেষণা-অভিসন্দর্ভে এই গ্রন্থটি সবিশেষ সহায়তা দান না করলেও বর্তমানে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের কোন্ কোন্ বিষয়গত দিক থেকে গ্রন্থ রচিত হয়ে চলেছে, তার ধারণার জন্যই এটির উল্লেখ আবশ্যিক।

১০) *রবীন্দ্রনৃত্য* – অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় (২০১৯ খ্রিস্টাব্দ)। এই গ্রন্থটি তিনটি ভাগে বিন্যস্ত। যথা প্রস্তুতি, প্রয়োগ এবং প্রগতি। প্রস্তুতি অংশে রবীন্দ্রনৃত্যের ইতিহাস, প্রয়োগাংশে রবীন্দ্রনৃত্যের বিধি-শিক্ষাগত যোগ্যতা-সচেতনতা-পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ইত্যাদি তথ্য আলোকিত হয়েছে এবং প্রগতি অংশে ভবিষ্যৎ কালের রবীন্দ্রনৃত্য কীরূপ হতে পারে বা কীরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় বলেছেন –

ক্রমে 'রবীন্দ্রনৃত্য' বিষয়-পরিকল্পনায় যেদিকগুলি সম্প্রতি গুরুত্ব পাচ্ছে- সে রবীন্দ্রনাথের রচনামাত্র নয়- রচনার ভাব, অভিপ্রায় এবং ভঙ্গিকে নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা। এই যথাযথ রূপ দিতে প্রাথমিক এবং আবশ্যিক শর্ত হল ভাষাজ্ঞান। সে-ভাষা শুধুমাত্র বাংলা ভাষা নয়, রবীন্দ্রসাহিত্যের, সৃজনের, দর্শনের ভাষা।[৫৮]

এই বাক্যবন্ধটির থেকেই উপরূপকের সঙ্গে রবীন্দ্রনৃত্যের মৈত্রীর একটি বোধের জন্ম দেয়। যেহেতু আচার্য ধনঞ্জয়ের সময় 'নৃত্য' ছিল ভাব বা ক্রিয়াশ্রয়ী। ক্রিয়ার গতিশীলতার নান্দনিক এবং আভিনয়িক প্রকাশস্বরূপ

নৃত্যগুলিই ভোজদেবের সময়ে ‘পদার্থাভিনয়ী’ কলায় পরিণত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্বনাথ কবিরাজের সময় ‘উপরূপক’ আখ্যা পায়। তাই রবীন্দ্রনাথের “দর্শনের ভাষা” হ’ল সহৃদয়হৃদয়গম্য আনন্দজ্ঞানরস। উপরূপকীয় নৃত্যধারা তথা নাট্যধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাট্যের কীরূপ সম্বন্ধ রয়েছে, তার জন্য এই গ্রন্থপাঠ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

১১) *রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য : সেকাল থেকে একাল* - ইন্দ্রাণী সেন (২০২২ খ্রিস্টাব্দ) । এই গ্রন্থটির শিরোনাম-ই স্পষ্ট করে দেয় যে এটি রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের বিবর্তনকে ইতিহাসের জঠরে বিচার করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি তথ্যবহুল হলেও এটি উপরূপকভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য বা বলা ভালো রবীন্দ্রনাট্যের সংযোগসাধনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলির সমীক্ষা এবং সমালোচনার শেষে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে যে সম্ভাব্য প্রশ্ন মনে উদিত হতে পারে, সেগুলি হ’ল –

- রবীন্দ্রনৃত্য রবীন্দ্রসংগীত বা রবীন্দ্রসাহিত্যের ওপর কতটা নির্ভরশীল ?
- রবীন্দ্রনৃত্যে ‘পদার্থাভিনয়’ এবং ‘বাক্যার্থাভিনয়’ কি পৃথক দুটি সত্তা নাকি একই সত্তায় উভয়ে অন্তর্ভাবিত?
- প্রাচীন উপরূপকগুলির মধ্যে প্রাপ্ত অভিনয়নির্দেশতুল্য বিধি রবীন্দ্রনাট্যের মধ্যে প্রযোজিত নৃত্যে নিশ্চিতরূপে রয়েছে কিনা।
- রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের নৃত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য ধারার নাট্যের মধ্যে অংশবিশেষে প্রযোজিত নৃত্যের পার্থক্যের নির্ণয়।
- রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য কি উপরূপকের নামান্তর ?
- রবীন্দ্রনৃত্যকে রবীন্দ্রোপরূপক বলা কতখানি সঙ্গত বা কতখানি বিভ্রান্তিকর ?
- রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয়কৌশল এবং রবীন্দ্রনৃত্যের অভিনয়কৌশলের কীরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত ?
- রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যে পুরুষ এবং নারীর নৃত্যের স্থান প্রাচীন উপরূপকগুলির সাপেক্ষে কতখানি মান্যতা পেতে পারে।
- রবীন্দ্রনৃত্যের কোনও বিশেষ শৈলি অনুসৃত হলে তবেই তাকে উপরূপকের সঙ্গে একাসনে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত ?
- উপরূপক বর্তমান সময়ে নৃত্যাত্মক রবীন্দ্রনাট্য ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার নাট্যে আত্মগোপন ক’রে রয়েছে কিনা।

এই প্রশ্নগুলিকে উপস্থিত রেখেই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের নির্মাণ করা হয়েছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম থেকে নবম প্রশ্নগুলির সমাধান বিস্তৃতাকারে প্রদত্ত হয়েছে। তবে তৃতীয় অধ্যায় ব্যতিরিক্ত পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে

যথাক্রমে *নটীর পূজা* এবং *শাপমোচন*-এর আলোচনার অবসরে উক্ত নাট্যদ্বয়ে প্রযোজিত নৃত্যপদ্ধতির প্রসঙ্গে অষ্টম প্রশ্নটি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং উপসংহার পর্বে প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের লক্ষ্যই নবদিগন্তের উন্মোচন। এই গবেষণার মাধ্যমে সারস্বত ক্ষেত্র কতখানি ওজস্বিতায় পরিপূর্ণ হবে তা বলা যায়না। তবে একাধিক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকার অধ্যয়ন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপচারিতা এবং নিজস্ব অভিচিন্তনের দ্বারা যথাসম্ভব প্রয়াস করা হয়েছে এবং উপরূপকের বর্তমান অবস্থান নির্ণয় ও রবীন্দ্রনাট্যের বিশ্লেষণের একটি ভিন্ন দিশার উদ্ভাবনে আশাবাদী হয়েই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রবর্তনা।

উল্লেখপঞ্জি

১. *সংগীতচিন্তা,* কথা ও সুর - ১, পৃষ্ঠা - ৭৭

২. *The Raghuvaṁśa of Kālidāsa : with The Commentary (the Sanjīvanī) of Mallinātha*, সম্পাদক – মোরেশ্বর রামচন্দ্র কালে, ৮/৬৭, পৃষ্ঠা - ১৮৮

৩. *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী : বালমনোরমা-তত্ত্ববোধিনীসহিতা (কারকপ্রকরণান্তা) : প্রথমো ভাগঃ,* কারকপ্রকরণম্, পৃষ্ঠা - ৬৬২

৪. *অমরকোশঃ : শ্রীমদমরসিংহবিরচিতঃ,* সম্পাদক – ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস শ্রেষ্ঠী, ১/৭/১০, পৃষ্ঠা - ৪০

৫. *তদেব,* ১/৭/১৭, পৃষ্ঠা - ৪২

৬. *Halayudha's Abhidhana Ratnamala : A Sanskrit Vocabulary*, সম্পাদক – Th. Aufrecht ১/৯৩, পৃষ্ঠা - ১১

৭. *তদেব,* ১/৯৫, পৃষ্ঠা - ১১

৮. *তদেব,* ১/৯২, পৃষ্ঠা - ১১

৯. *কলিকালসর্বজ্ঞ-শ্রীহেমচন্দ্রাচার্যবিরচিতঃ অভিধানচিন্তামণিঃ : ,সটিপ্পণ 'মণিপ্রভা' হিন্দীব্যাখ্যাবিমর্শোপেতঃ,* সম্পাদক – হরগোবিন্দ শাস্ত্রী, ২/১৯৫, পৃষ্ঠা - ১১৭

১০. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol. I,* সম্পাদক – M. Ramkrishna Kavi, ১/১১৬, পৃষ্ঠা - ৪১

১১. *তদেব,* ১/১১৬- *অভিনবভারতী,* পৃষ্ঠা - ৪১

১২. *তদেব,* ১/১১৬ – *অভিনবভারতী,* পৃষ্ঠা - ৪২

১৩. *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ : বামনবিরচিতা,* সম্পাদক – শ্রীকৃষ্ণমুরি, ১/৩/৩, পৃষ্ঠা - ২৬

১৪. *তদেব,* ১/৩/৭ – বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ২৯

১৫. *The Kāvyamīmāṃsā of Rājaśekhara*, সম্পাদক – মধুসূদন শাস্ত্রী, প্রথম অধিকরণ – প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ৪

১৬. *তদেব, মধুসূদনী,* পৃষ্ঠা - ৪

১৭. *তদেব,* প্রথম অধিকরণ – দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ২২

১৮. *শৃঙ্গারপ্রকাশঃ [সাহিত্যপ্রকাশঃ] : দ্বিতীয়ো ভাগঃ [১৫-২৫, ২৭-৩৬ প্রকাশাঃ],* সম্পাদক – রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী ও সদাশিবকুমার দ্বিবেদী, ষোড়শ প্রকাশ, পৃষ্ঠা - ৯৫৪

১৯. *তদেব,* ষোড়শ প্রকাশ, পৃষ্ঠা - ৯৫৪

২০. *তদেব,* ষোড়শ প্রকাশ, পৃষ্ঠা - ১৫৫

২১. *Śukranītisāra : Vol. 1*, সম্পাদক – Gustav Oppert, ৪/৩/২৪, পৃষ্ঠা - ১৯৩

২২. *Arthaśāstra of Kauṭalya : Edited with the commentary 'Srīmūlā' of Mahāmahopādhyāya T. Gaṇapati Śāstrī*, সম্পাদক – T. Gaṇapati Śāstrī, অধ্যক্ষপ্রচার– গণিধাধ্যক্ষ, পৃষ্ঠা - ৩০৫

২৩. *তদেব, শ্রীমূলা*, পৃষ্ঠা - ৩০৬

২৪. *মহর্ষিবাৎসায়নপ্রণীতং কামসূত্রম্*, সম্পাদক – মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ১/৩/১৬, পৃষ্ঠা - ৫২

২৫. *তদেব*, ১/৩/১৬, পৃষ্ঠা - ৫০

২৬. *Samrajya Lakshmi Pithika*, সম্পাদক - K. Vasudeva Sastri K. S. Subrahmanya Saatri, ৬৪/৮-১২, পৃষ্ঠা - ২০৬

২৭. *ভাস্কররায়-গ্রন্থাবলী [প্রথমো ভাগঃ] : ললিতাসহস্রনামস্তোত্রম্ (ব্যাখ্যাদ্বযোপেতম্).* সম্পাদক – বটুকনাথ শাস্ত্রী ও শীতলাপ্রসাদ উপাধ্যায়, ৪/৩ - শ্লোকসংখ্যা ১০৮, পৃষ্ঠা - ১১২

২৮. *তদেব*, ৪/৩ - শ্লোকসংখ্যা ১০৯, পৃষ্ঠা - ১১৩

২৯. *তদেব*, ৫/৪ - শ্লোকসংখ্যা ১২৫, পৃষ্ঠা - ১৪২

৩০. *তদেব*, ৮/৭ – শ্লোকসংখ্যা ১৭৪, পৃষ্ঠা - ২১১

৩১. *তদেব*, ৯/৮ – শ্লোকসংখ্যা ১৯৪, পৃষ্ঠা - ২৪৬

৩২. *তদেব*, ৯/৮ – শ্লোকসংখ্যা ২০৩, পৃষ্ঠা - ২৬১

৩৩. *তদেব, বালাতপা*, পৃষ্ঠা - ১১২

৩৪. *তদেব, বালাতপা*, পৃষ্ঠা - ২১১

৩৫. *তদেব, বালাতপা*, পৃষ্ঠা - ২৪৬

৩৬. *তদেব, বালাতপা*, পৃষ্ঠা - ২৬১

৩৭. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol. I*, সম্পাদক – M. Ramkrishna Kavi, ৪/১৫-১৬, পৃষ্ঠা - ৮৮

৩৮. *তদেব*, ৪/২৬৮-৬৯, পৃষ্ঠা – ১৮০-৮২

৩৯. *Daśarūpam with Dhanika's Commentary*, সম্পাদক – F E Hall, ১/১০, পৃষ্ঠা - ৫

৪০. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol. I*, সম্পাদক – M. Ramkrishna Kavi, ৪/ ২৬৮ – *অভিনবভারতী*, পৃষ্ঠা - ১৮১

৪১. *Daśarūpam with Dhanika's Commentary*, সম্পাদক – F E Hall, ১/৮ - *অবলোকবৃত্তি*, পৃষ্ঠা – ৫

৪২. *শৃঙ্গারপ্রকাশঃ [সাহিত্যপ্রকাশঃ] : প্রথম ভাগঃ [১ -১৪ প্রকাশঃ]*, সম্পাদক – রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী ও সদাশিবকুমার দ্বিবেদী, ১১/২৮০-৩২৮, পৃষ্ঠা – ৬৬০-৭২

৪৩. *Bhāvaprakāśana of Sāradātanaya*, সম্পাদক – Yaduraja Yatigiri Zwami ও K S Ramaswami Sastri, ৮/৭, পৃষ্ঠা - ২২১

৪৪. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৪-৬, পৃষ্ঠা - ২৮৮

৪৫. *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*, সম্পাদক - জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, পৃষ্ঠা - ৮৩২

৪৬. *Samsad Bengali-English Dictionary*, পৃষ্ঠা - ৬৬১

৪৭. *Comprehensive English-Bengali Dictionary*, পৃষ্ঠা - ২১

৪৮. *নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য*, শিল্পের সংজ্ঞা স্বরূপ বৈচিত্র্য, পৃষ্ঠা - ২৯

৪৯. তত্রৈব

৫০. *The Kāvyamīmāṃsā of Rājaśekhara*, সম্পাদক – মধুসূদন শাস্ত্রী, প্রথম অধিকরণ – চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৪৮

৫১. *হ্যাগনের ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য*, দেশী পাঁচালি ও গীতিনাট্য, পৃষ্ঠা - **১১**

৫২. *রবীন্দ্রসঙ্গীত*, গীতনাট্যের বৈচিত্র্য, পৃষ্ঠা - **১৮৯**

৫৩. *রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য*, উনিশ শতকের বাংলা গীতিনাট্য এবং রবীন্দ্র-গীতিনাট্যের জন্মলগ্ন, পৃষ্ঠা - ২৭

৫৪. *তদেব*, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের পর্যালোচনা, হয় - **১৫৫**

৫৫. *রবীন্দ্রনৃত্য বিরচনা*, নৃত্য সংশ্লেষ, পৃষ্ঠা - **১৫**

৫৬. *রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য : একটি নারীবাদী পাঠ*, শাপমোচন, পৃষ্ঠা – ৫৪

৫৭. *রবীন্দ্র নৃত্যতত্ত্ব*, সপ্তম অধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যভাবনা ও তার ভবিষ্যৎ, পৃষ্ঠা – ৮৮

৫৮. *রবীন্দ্রনৃত্য*, পৃষ্ঠা - **১৩৫**

প্রথম অধ্যায়

উপরূপক : উৎস ও ক্রমবিকাশ

বর্তমানে 'নাটক' বা 'নাট্য' শব্দের ব্যবহার যতখানি বিস্তৃত, 'রূপক' বা 'উপরূপক' শব্দদ্বয়ের প্রসার চলমান নাট্যসংস্কৃতির জগতে ততখানি নয়। তবে সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য বা শাস্ত্র চর্চা যারা করেন এবং বিশেষতঃ ভারতীয় শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস যাদের কাছে জ্ঞাত, তাদের কাছে এই শব্দটি নতুন নয়। এর সমান্তরালে যারা নাট্যজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের কাছেও এই শব্দ অপরিচিত নয়। তাই এই শব্দটির উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ কীভাবে ঘটেছে, তা-ই এই প্রথম অধ্যায়ের বিষয়। ভরতোক্ত *নাট্যশাস্ত্র* থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কীভাবে এর ক্রমবিবর্তন ঘটেছে, তা-ই এখানে উপস্থাপন করা হ'ল। তবে এক্ষেত্রে 'উপরূপক' এই পারিভাষিক শব্দটির প্রথম ব্যবহার কোথায় এবং কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেছে, সেটির উল্লেখ করা উচিত সর্বাগ্রে। যেহেতু উপরূপক একটি গোষ্ঠীবাচক বা গোত্রবাচক শব্দ এবং এর মধ্যে বিভিন্ন নাট্যসংরূপ অন্তর্ভুক্ত, তাই সেই নাট্যসংরূপগুলির প্রাচীনতা এবং ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের ক্রমবিকাশের ধারাটি উপস্থাপন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে যেমন সেই নাট্যসংরূপগুলির বিবর্তন শনাক্ত করা যাবে, তেমনই সুপ্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত 'উপরূপক'-এর অপর অভিধাগুলি কী কী হয়েছে, তারও একটি রূপরেখা নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

১.১ 'উপরূপক' শব্দের প্রথম ব্যবহার :

সংস্কৃত নাট্যকে অনুসরণ করেছে প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্রপরম্পরা। লক্ষ্য গ্রন্থরচনায় নাট্যকার যতখানি স্বাধীন বা স্বতন্ত্র, তেমনই নাট্যতাত্ত্বিকগণ ততখানিই পরাধীন বা পরনিয়ন্ত্রিত। বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে শাস্ত্র রচিত হতে পারেনা। তাই যখন নাট্যনিকুঞ্জে নানাবিধ পুষ্পের সমাগম ঘটতে লেগেছিল, তখনই তার রূপ-রসের সৌন্দর্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার হওয়া প্রয়োজন ছিল। তখনই কিছু শ্রেণিবিভাগের দ্বারা যেমন পৃথক পৃথক গোত্রের উদ্ভব ঘটেছিল। তাই 'নাটক' মাত্রেই 'নাট্য' হলেও নাট্যের সমার্থক 'নাটক' থাকেনি।তাই নাটকপ্রভৃতি দৃশ্যশ্রব্যের একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়; যার নাম 'রূপক'। অন্যদিকে সেই গোষ্ঠীবহির্ভূত দৃশ্যশ্রব্যকাব্যগুলির নতুন সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। তা হল 'উপরূপক'। ভারতীয় নাট্যসংস্কৃতিতে তথা নন্দনতত্ত্বে 'উপরূপক' শব্দের প্রথম শাস্ত্রীয় উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতক অর্থাৎ ইতিহাসের আলোকে মধ্যযুগের পণ্ডিতপ্রবর ব্যক্তিত্ব তথা আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণ*-এ লিপিবদ্ধ আকারে। সেখানে তার সংখ্যা অষ্টাদশ। সেগুলি হ'ল যথাক্রমে নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লীশ এবং ভাণিকা –

নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টক নাট্যরাসকম্ ।
প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খণং রাসকং তথা ।।
সংলাপক শ্রীগদিতং শিল্পিকং চ বিলাসিকা ।
দুর্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাণিকেতি ।।
অষ্টাদশ প্রাহুরূপরূপকাণি মনীষিণঃ ।[১]

তবে এই প্রসঙ্গেই আরও একটি গ্রন্থের উল্লেখ করতেই হয়। সেটি হ'ল আচার্য অমৃতানন্দযোগী *অলংকারসংগ্রহ*। V. Krishnamachaya এবং Pandit K. Ramachandra-এর যৌথ সম্পাদনায় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে দ্য অ্যাডয়ার লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত *অলংকারসংগ্রহ*-এর ভূমিকা অংশে C. Kunhan Raja-র গবেষণায় উঠে এসেছে যে এই গ্রন্থটি পূর্ণাকারে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে অনেক বিলম্বে। তাই তিনি 'উপরূপক' বিষয়ে অমৃতানন্দযোগীর অবদান সম্পর্কে বলেছেন –

I am not sure which tradition Amrtānanda has followed in enumerating the uparupaka, as given earlier. Other Alamkara works in South India of more or less the same period like Prāparudrīya can give no clue.[২]

সুতরাং একথা বোঝাই যাচ্ছে যে এই মতকে প্রামাণ্য মেনে যদি আনুমানিক ১২৫০ খ্রিস্টাব্দের আশেপাশে বা ত্রয়োদশ শতাব্দী ব'লে এই গ্রন্থের রচনাকাল ব'লে অভিহিত করা হয়, তাহলে বিশ্বনাথ কবিরাজের পূর্ববর্তী সময়ে দক্ষিণ ভারতে 'উপরূপক' তত্ত্বের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। তবে মাননীয় সুশীল কুমার দে *Studies in the History of Sanskrit Poetics* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে জানিয়েছেন যে তিনি এই গ্রন্থের মোট পাঁচটি অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি লক্ষ্য করেছিলেন। যেহেতু তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন "The work consists of five chapters",[৩] তাই উপরূপকের বিচার-বিশ্লেষণ নবম পরিচ্ছেদে থাকায় এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়না। তবে যাই হোক, বর্তমানে প্রাপ্ত এই গ্রন্থে দশটি পরিচ্ছেদ উপলভ্য। সেহেতু একথা ব্রাত্য করা যায়না। তাই *অলংকারসংগ্রহ* এবং *সাহিত্যদর্পণ*-এর মধ্যে পৌর্বাপর্য বিচারে কোনটি প্রাচীনতর এবং 'উপরূপক' শব্দসহ নাট্যতত্ত্ববিশ্লেষণে কে কার দ্বারা প্রভাবিত, সে বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়েই যায়। তবে *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থটি বর্তমানে অত্যন্ত লোকপ্রিয়তা অর্জন করায় এই গ্রন্থের খ্যাতি অধিক ব'লেই এই গ্রন্থটি 'উপরূপক' তত্ত্বের জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে বিগদ্ধমহলে।

১.২ উপরূপকের সংখ্যানির্ণয় :

প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভারতের সংস্কৃতিতে 'উপরূপ' এবং 'উপরূপক' এই দুটি শব্দ পাওয়া গেলে এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও উপরূপকের সংখ্যা নিয়ে নাট্যশাস্ত্রমূলক গ্রন্থগুলিতে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন অমৃতানন্দযোগীর *অলংকারসংগ্রহ*-তে পাওয়া যায় ষোড়শ প্রকার উপরূপ। সেগুলি ক্রমান্বয়ে হ'ল নাটিকা, সট্টক, ত্রোট (বা ত্রোটক), প্রেক্ষণ, গোষ্ঠী, ভাণিকা, সংলাপক, প্রস্থান, কাব্য, হল্লীস, রাসক, শ্রীগদিত, লাসিকা, দুর্মল্লী, নাট্যরাসক এবং উল্লাপ্য –

নাটিকা সট্টকং ত্রোটো প্রেক্ষণকং গোষ্ঠীভাণিকে ।।
সংলাপকশ্চ প্রস্থানং কাব্যং হল্লীসরাসকে ।
শ্রীগদিতং চ লাসিকা দুর্মল্লী নাট্যরাসকম্ ।।
উল্লাপ্যমুপরূপাণি ভবন্ত্যেতানি ষোডশ ।[৪]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এখানে ‘উপরূপক’-এর স্থানে ‘উপরূপ’ শব্দটি প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। এছাড়াও বিশ্বনাথ কবিরাজ কর্তৃক চিহ্নিত শিল্পক এবং প্রকরণিকা নামক উপরূপকদুটির নাম দৃষ্টিগোচর হয়না এই তালিকায়।

অন্যদিকে বিশ্বনাথের পরবর্তী যুগে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রমূলক *সংগীতদামোদর* গ্রন্থে। যদিও এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্রমূলক নিষ্কর্ষ নয়। তবুও এই গ্রন্থের চতুর্থ স্তবকটি উপরূপকের বৈচিত্র্য নিয়ে সুসংহত তথ্য আলোচিত। শুভঙ্কর মোট সপ্তদশ উপরূপকের নাম এবং পরিচয় দিয়েছেন। সেগুলি যথাক্রমে হ’ল তোট (বা ত্রোটক), শাটক (বা সট্টক), নাটিকা, হল্লীসক, রাসক, শিল্প, উল্লাপ্য, নাট্যরাসক, প্রস্থান, সংলাপক, গোষ্ঠী, প্রেক্ষণ, লাসিকা, দুর্মল্লিকা, ভাণিকা, কাব্য এবং শ্রীগদিত –

তোটং শাটকনাটিকে নটতনুর্হল্লীসকং রাসকং ।
শিল্পোল্লাপকনাট্যরাসকমথ প্রস্থানসংলাপকৌ ।।
গোষ্ঠীপ্রেক্ষণলাসিকা মধুরিপুর্দুর্মল্লিকাভাণিকা- ।
-কাব্যশ্রীগদিতানি তানি তনুতে রঙ্গে কুরঙ্গীদৃশাম্ ।।[৫]

বিশ্বনাথ কবিরাজ কর্তৃক স্বীকৃত তম উপরূপক প্রকরণিকা-কে স্বীকার করেননি অমৃতানন্দযোগী এবং শুভঙ্করাচার্য। আবার নাটিকা-কে প্রত্যেকেই প্রথমে স্থান দিয়েছেন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে বিশ্বনাথ কবিরাজ-ই সর্বাধিক উপরূপক স্বীকার করেছেন। তাই *সাহিত্যদর্পণ*-এর মতকে আদর্শায়িত করলে উপরূপকের সংখ্যা নির্ধারিত হয় অষ্টাদশরূপেই এবং শিল্পক ও প্রকরণিকা তুচ্ছ নয়। এমনকি এই পণ্ডিতত্রয়ের মধ্যে কোন্ মত অর্থাৎ সংখ্যাটিকে আদর্শ ধরা হবে; সেই প্রশ্ন উঠলে বলতে হয় যে এই গবেষণাকার্যে বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ-এর মতামতটিকেই আদর্শ ধরা হবে। এর প্রধান কারণ শুধুমাত্র গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা-ই নয়; বিশ্বনাথ কবিরাজ স্বয়ং ছিলেন উপরূপককার। তিনি *চন্দ্রকলা* নামক একটি নাটিকা রচনা করেছিলেন। তাই যিনি অন্ততঃ একটি শ্রেণীর উপরূপক-ও রচনা করেছেন, তাঁর উপরূপকবিষয়ে যে শাস্ত্রনিষ্ণাত জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল একথা অনুমানের দ্বারা ধরে নিতে অসুবিধা হয়না। অন্যদিকে সর্বাধিক সংখ্যক উপরূপক তিনি স্বীকার করেছেন। তাই এক্ষেত্রে অষ্টাদশ সংখ্যাটিকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে বা আপ্তবাক্যরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে এটিই যে সকলে স্বীকার করবেন এমন দৃঢ় বাক্য-ও উচ্চারণ করা যায়না।

১.৩ উপরূপকের ক্রমবিবর্তন :

উপরিউক্ত পণ্ডিতত্রয়ের দ্বারা ‘উপরূপক’ নামাঙ্কিত কোনও নাট্যধারা সম্পর্কে অবগত হওয়া গেলেও এই উপরূপকের সূচনা কখন, কীভাবে এবং কোথায়; তা জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন এই গবেষণার ক্ষেত্রে। তাই খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বকালে এই অষ্টাদশ উপরূপকের কোনও শাস্ত্রীয় অস্তিত্ব ছিল কিনা এবং তা থাকলেও তখন তার আখ্যা এবং লোকসমাজে গ্রহণযোগ্যতা কীরূপ ছিল; সেই বিষয়টিও নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করা

উচিত। তাই ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র তথা নন্দনতত্ত্ব যে সময় থেকে মৌখিকতা এবং শ্রৌত পরম্পরার পরে লিখিত আকারে গ্রথিত হতে লাগল, সেই সময়কাল থেকেই ধারাবাহিকভাবে একটি ইতিহাস তুলে ধরা যাক।

❖ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উপরূপকের সন্ধান

এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত এবং প্রমাণিত প্রাচীন ভারতবর্ষের নাট্যশাস্ত্রমূলক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও পরিণত গ্রন্থ হ'ল ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র* । যদিও অভিকরণকলার সামগ্রিক চিত্র এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, নৃত্য, গীতি, বাদ্য, নাট্য ইত্যাদি কলার সম্পর্কেই যথোচিত মন্তব্য এখানে উঠে এসেছে। *নাট্যশাস্ত্র* অনুসারে এই গ্রন্থ 'পঞ্চম বেদ' নামাঙ্কিত হয়েছে "নাট্যাখ্যং পঞ্চমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহম্"[৬] এই কারিকাংশের মাধ্যমে। প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয় যেহেতু নাট্যনির্ভর, তাই নাট্যসম্পর্কিত আলোচনার অবসরেই উপরূপকের আদিরূপের সন্ধান করণীয়। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর 'দশরূপবিকল্পনম্' অধ্যায়ে দশটি রূপক সম্বন্ধে তথ্যলাভ করি। সেই দশটি রূপক হ'ল নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, ভাণ, সমবকার, বীথী, প্রহসন এবং ডিম-

নাটকং সপ্রকরণমঙ্কো ব্যায়োগ এব চ ।
ভাণঃ সমবকারশ্চ বীথী প্রহসনং ডিমঃ ।।
ঈহামৃগশ্চ বিজ্ঞেয়ো দশমে নাট্যলক্ষণে ।[৭]

এই দশটি রূপকের অতিরিক্ত আরও একপ্রকার নাট্যধারাও যে সেই সময়ে প্রচলিত ছিল, সেকথাও এই প্রসঙ্গেই জানা যায়। তার নাম 'নাটিকা'। এই বিশেষ নাট্যসংরূপকে দশরূপকের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়নি যে যুক্তির সপক্ষে, সেটি হ'ল এটি নাটক ও প্রকরণের সমমিশ্রণে নির্মিত একটি যৌগিক নাট্যবিশেষ – "প্রকরণনাটকভেদাদুৎপাদ্যং বস্তু"[৮]। অর্থাৎ নাটকাদি রূপক মৌলিক সৃষ্টি। অথচ এটির অবয়বে নাটক এবং প্রকরণের একাধিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট রয়েছে বলেই *নাট্যশাস্ত্র*-এর কথকের অভিমত। যদিও নাটিকা-র বিষয়ে কোনও উচ্চতর মনোভাব এই গ্রন্থ বিধৃত করেনা তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে নাটিকা যা পরবর্তীতে উপরূপকের জগতে প্রধান হয়ে উঠেছে, তার প্রচলন কিন্তু সেই ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র*-এর সুপরিণত রূপের লগ্ন থেকেই।

❖ অভিনেয়ার্থ কাব্যে উপরূপকের উল্লেখ

এই ধারাবাহিতাকে অটুট রেখেই এরপরেই আসতে খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকের ভামহের *কাব্যালংকার* গ্রন্থের উপকণ্ঠে। এখানে তদানীন্তন সময়ের পঞ্চ 'অভিনেয়ার্থ' কাব্যের কথা জানা যায়। যথা নাটক, দ্বিপদী, শম্যা, রাসক এবং স্কন্ধক –

নাটকং দ্বিপদীশম্যারাসকস্কন্ধকাদি যত্ ।
উক্ত তদভিনেযার্থমুক্তো'ন্যৈস্তস্য বিস্তরঃ ।।[৯]

ভরতমুনি যে দৃশ্যশ্রব্যধর্মী কাব্যের কথা বলেছিলেন, তিনি তারই নতুন অভিধা দিলেন 'অভিনেয়ার্থ'। তবে 'রূপক' এই পরিভাষা তিনি ব্যবহার করেননি। 'নাটক' সম্পর্কে ইতঃপূর্বে জ্ঞানলাভ হয়ে থাকলেও বাগভিনেয়োপযোগী কাব্যের কোনওরূপ বৈশিষ্ট্য তিনি তুলে ধরেননি। তবে দ্বিপদী, শম্যা নৃত্য তথা সংগীত শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে উত্তরকালে কিন্তু 'রাসক' এই একই নামের একটি উপরূপক পাওয়া যায় *সাহিত্যদর্পণ*-এই। তবে ভামহবেদিত 'রাসক'-ই বিশ্বনাথ কবিরাজের স্বীকৃত রাসক নামক উপরূপকের প্রাচীন রূপ কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিতরূপে জানার অবকাশ নেই।

❖ ভাবনৃত্য ও উপরূপকের পারস্পরিক সম্পর্ক

এবার আলোচনায় আসে ধনঞ্জয়ের *দশরূপ* গ্রন্থ। ভরতপ্রবর্তিত পথেই এই গ্রন্থ অগ্রসর হয়েছে। তাই 'ভাবনৃত্য'-এর স্বরূপ জ্ঞাত হওয়ার পূর্বেই যে চারুকলা 'ভাবনৃত্য' নয় তা চিহ্নিত করে দেওয়া প্রয়োজন এবং দশরূপকার সেভাবেই গ্রন্থবিন্যাস করেছেন। ভরতোক্ত দশপ্রকার রূপককেই ধনঞ্জয়াচার্য মর্যাদা দিয়েছেন। তথাপি তিনি নাটিকা-কে বর্জন করতে পারেননি। এই নাট্যবিধিকে *দশরূপ* গ্রন্থকার 'সংকর রূপক' ব'লে ভূষিত করেছেন – "লক্ষ্যতে নাটিকাপ্যত্র সংকীর্ণান্যবৃত্তয়ে"[১০]। এ বিষয়ে ধনিকও যথেষ্ট সরব থেকেছেন এবং পূর্বাচার্যদের মতখণ্ডন করেছেন *অবলোকবৃত্তি* -তে। প্রথম প্রকাশের ৭নং কারিকার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন "রসানাশ্রিত্য বর্তমান দশপ্রকারম্, এবেত্যধারণং শুদ্ধাভিপ্রায়েণ। নাটিকাযাঃ সংকীর্ণত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাত্"[১১]। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে রূপকের শ্রেণিবিভাগ হয়ে যায় এর মাধ্যমেই। সংকর শব্দের অর্থ যদি মিশ্রিত হয়, তবে বলা যায় যে ধনঞ্জয় রূপকের দুটি ধারা 'শুদ্ধ' বা 'মৌল' এবং 'সংকর' বা 'মিশ্র'-কেই প্রদর্শিত করতে চেয়েছেন। আবার তৃতীয় প্রকাশের ৪৩ নং কারিকার ব্যাখ্যায় তিনি পূর্বপ্রচলিত মতের বিরোধিতা ক'রে বলেন "সমানলক্ষণত্বে বা ভেদাভাবাত্, বস্তুরসনাযকানাং প্রকরণভেদাত্ প্রকরণিকাযাঃ অতো'নুদ্দিষ্টাযা নাটিকাযা যন্মুনিনা লক্ষণং কৃতং তত্রাযমভিপ্রাযঃ"[১২]। নাটিকা এবং প্রকরণিকা এই দুটি প্রযোজনার মধ্যে অভেদত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন ধনিক। একদা এদুটিকে একত্রিত করে 'নাটী' সংজ্ঞায়িত করা হ'ত। প্রকরণ নামক রূপকের থেকে প্রকরণিকা-র বস্তু (plot),নায়ক এবং রস স্বতন্ত্র। তবুও এটি নাটিকাপ্রতিম হওয়ার যুক্তিতে কৌশলে তিনি প্রকরণিকা-র পৃথক অবস্থানকে ক্ষুণ্ন করেছেন। এর দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে প্রকরণিকা নামক একটি নাট্যকলা যা নৃত্যসমুদ্ভূত নয়, তার প্রয়োগ জনসমাজে প্রচলিত ছিল। ধনিকের প্রকরণিকা-কে নস্যাৎ করার মনোবাসনা ছিলনা। শুধুমাত্র নাটিকা এবং প্রকরণিকা যে একই জাতি সেকথাই বলতে চেয়েছেন বৃত্তিতে। ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র*-এ 'সংকীর্ণ' জাতীয় কোনও বিশেষণ ধার্য হয়নি নাটিকা-র জন্য। তাই খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দী-ই যে রূপক এবং উপরূপকের শ্রেণিবিভাগের সূচনালগ্ন এই তথ্য সংযুক্ত করা অসঙ্গত হবেনা।

পুনশ্চ এই গ্রন্থেই 'নাট্য', 'নৃত্য' ও 'নৃত্ত'-এর স্বভাবগত ও স্বরূপগত পৃথকীকরণের যুক্তি এবং মতামত প্রকাশ হতে দেখা যায়। ধনঞ্জয়ের উক্তিতে রয়েছে –

অবস্থানুকৃতির্নাট্যং রূপ দৃশ্যতযোচ্যতে ।
রূপকং তত্ সমারোপাত্ দশধৈব রসাশ্রযম্ ।।[১৩]

অর্থাৎ পাত্রপাত্রীর মনস্তাত্ত্বিক গতিবিধি এবং তজ্জন্য ফলিত কার্যক্রমের অবস্থার অনুকরণ হ'ল 'নাট্য'। এই অনুকরণের মাধ্যম চতুর্বিধ অভিনয়। যথা আঙ্গিক (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা অভিনেয়), বাচিক (কণ্ঠস্বর, বাক্যোচ্চারণের দ্বারা অভিনেয়), আহার্য (সাজসজ্জা এবং মঞ্চসজ্জা) এবং সাত্ত্বিক (শরীরী ভাবের সুসামঞ্জস্য)। এই চার প্রকারের অভিনয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র*-ই যথাবিহিত অভিমত দিয়ে গেছে। এখানে তার কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি। এই চতুর্বিধ অভিনয়ই যে নাট্যগ্রন্থনার জন্য অবশ্যম্ভাবী তা বোঝা যায় 'নৃত্য'-এর সংজ্ঞার মাধ্যমে। তার কারণ ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র*-এর অষ্টম অধ্যায় 'উত্তমাঙ্গাভিনয়'-এ জানা যায় অভিনয়ের সংজ্ঞা যা হ'ল "চতুর্বিধশ্চেষ ভবেন্নাট্যস্যাভিনযো দ্বিজাঃ"[১৪]। এই চতুর্বিধ অভিনয় যে আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক; সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় উক্ত গ্রন্থেরই প্রারম্ভিক তথা প্রথম অধ্যায়ে। সেখানে বলা হয়েছে যে অপৌরুষেয় চতুর্বেদ থেকেই (ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্য বা নাট্যসন্দর্ভ, সামবেদ থেকে গান বা বাচিকাভিনয়প্রকারবিশেষ, যজুর্বেদ থেকে অনুভাবাত্মক অঙ্গাভিনয় ও আহার্যাভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে সত্ত্বগুণোদ্রিক্ত ভাবপ্রধান নাট্যরস) নাট্যোৎপত্তি দর্শিত –

জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাত্ সামভ্যো গীতমেব চ ।
যজুর্বেদাদভিনযান্ রসানথর্বণাদপি ।।[১৫]

অর্থাৎ নৃত্যে আঙ্গিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ের প্রভাবশীল ভূমিকা থাকলেও বাচিক অভিনয় নিষ্প্রয়োজন। আবার আহার্যের গ্রহণ হ'লেও নাট্যাভিনয়গত আহার্য অপেক্ষা পৃথক। দেবস্তুতিবিষয়ক বা নিসর্গশোভাবিবৃতির অনুকারক নৃত্যে নৃত্যশিল্পী নির্দিষ্ট নৃত্যকলার জন্য পোশাক, অঙ্গরচনা ইত্যাদির আশ্রয় নেয় কিন্তু নাট্যাভিনয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে তাদাত্ম্য সম্বন্ধস্থাপনের জন্য এক শতাংশ শূন্যতা তৈরি হওয়া উচিত নয়। তাই নাট্যগ্রন্থে যেরূপে চরিত্রটির উল্লেখ রয়েছে, সেরূপেই তার আহার্যগ্রহণ একান্তভাবে কাম্য। ভাবাশ্রয়ী নৃত্যের আঙ্গিক অভিনয়ের ক্ষেত্রে ভরতোক্ত *নাট্যশাস্ত্র* বা *অভিনয়দর্পণ* ইত্যাদি অন্য কোনও নৃত্যশাস্ত্রকে অনুসরণপূর্বক গতি, চারী, মুদ্রা প্রভৃতির নান্দনিক প্রকাশ ঘটবে যা লোকধর্মী নাট্যাভিনয়ে প্রযোজ্য নয়। তাই নৃত্য মূলতঃ ভাবের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাই *দশরূপ*-এ নৃত্যের সংজ্ঞাটি হ'ল -

অন্যদ্ ভাবাশ্রযং নৃত্য নৃত্তং তাললযাশ্রযম্ ।
আদ্যং পদার্থাভিনযো মার্গো দেশী তথা পরম্ ।।[১৬]

নৃত্যকে তিনি বলেছেন ভাবাশ্রয়ী এবং এখানে 'পদার্থাভিনয়' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গেই ব'লে রাখা উত্তম যে নৃত্য এবং নৃত্ত নিয়ে নাট্য এবং সংগীতশাস্ত্রে বহুমাত্রিক আলোচনা রয়েছে। একপক্ষের যুক্তিতে যেখানে ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, তা-ই 'নৃত্য' ও অপরদিকে 'নৃত্ত' তাল, লয়ের ম'ত ব্যাকরণগত শিক্ষার আদলে উৎসবাদিতে অনুষ্ঠিত নৃত্য এবং অপরপক্ষ সেই একটা কার্যকারিতা খুঁজে পেয়েছেন নৃত্তের মধ্যে। প্রথমপক্ষে রয়েছেন অভিনয়দর্পণকার নন্দিকেশ্বর, নর্তননির্ণয়গ্রন্থকর্তা বিঠ্ঠল, সংগীতদামোদরকৃৎ শার্ঙ্গদেব প্রমুখেরা। অন্যপক্ষে *ভাবপ্রকাশন*-এর রচয়িতা শারদাতনয়, *কাব্যানুশাসন*-এর প্রণেতা বাগভট অবস্থান করছেন। *অভিনয়দর্পণ*-এর মতে "রসভাবব্যঞ্জনাদিযুক্তং নৃত্যমিতীর্যতে"[১৭] সংজ্ঞার মাধ্যমে সরস ভাবাভিনয়কেই নৃত্য এবং নৃত্তের ভেদকরূপে

স্বীকার করা হয়েছে। তাই নৃত্যে সেই ভাবাভিনয় থাকলেও নৃত্তে সেই শূন্যস্থান রয়েই যায় ব'লে তাঁর মন্তব্য। আবার বিঠ্‌ঠলের *নর্তননির্ণয়*-এ নৃত্য হয় শরীরী আঙ্গিক অভিনয়ের কমনীয় এবং নমনীয় যোজনা যেটি হয় সর্বাঙ্গসুন্দর এবং লোকসমাজে মনোহারী। সেই লক্ষণটি হ'ল –

সর্বাঙ্গসুন্দরং নৃত্যং সর্বলোকমনোহরম্ ।
হস্তপাদাদিবিক্ষেপৈশ্চমৎকারাঙ্গশোভিতম্ ।।[১৮]

নৃত্ত সম্পূর্ণতঃ অভিনয়শূন্য। অর্থাৎ চতুর্বিধ অভিনয়ের কোনওটিই নৃত্তে বর্তমান নয় এমনটিই মনে করেন বিঠ্‌ঠল। অথচ সেটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে লোকসমাজে। *সংগীতরত্নাকর*-এ এই নৃত্ত ত্রিধা প্রকৃতির। "বিষমং বিকটং লঘিত্যেতত্তেদত্রযং.."[১৯] এই কারিকাংশ-ই বলে দেয় তা হল যথাক্রমে বিষম, বিকট এবং লঘু। *সুধাকরটীকা*-য় বিষমনৃত্তের উদাহরণে রাখা হয়েছে রজ্জুভ্রমণকে, বিকট নৃত্ত হ'ল হাস্যকর এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পরিহিত হয়ে অনুষ্ঠিত কোনও কলা এবং পেরণি তার নিদর্শন। গ্রামের মহিলাদের উৎসবাদিতে সারিবদ্ধভাবে নৃত্ত হ'ল লঘুনৃত্ত - "তত্র ঋজুভ্রমণাদিকং বিষমমুচ্যতে। বিরুদ্ধরূপবেষাবযবক্রিযাদিভির্যুক্তং বিকটম্, যথা পেরণ্যাদিবত্, অঞ্চিতাদ্যং অল্পৈঃ করণৈর্যুক্তং লঘিত্যুচ্যতে, যথা উৎসবাদৌ গ্রাম্যযোষিতামিতি"[২০]।

এখন প্রশ্ন হ'ল এই 'ভাব' বলতে কী বুঝতে হবে ? ত্রিমুনিব্যাকরণপরম্পরায় ভ্বাদিগণীয় √ভূ ধাতু থেকে ঘঞ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন 'ভাব' অর্থে ক্রিয়া। অর্থাৎ কোনও ক্রিয়ানুকরণ যখন নাট্যাভিনয়ভিন্ন অপর কোনও চারুকলার মাধ্যমে ললিতভাবে প্রকাশিত হয়,তাই-ই নৃত্য। আবার 'ভাব' বলতে ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র*-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের রসসূত্রে উল্লিখিত ভাবত্রিতয়কেও উপেক্ষা করা যায়না। যথা বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব। সেই প্রসঙ্গেই বিখ্যাত রসসূত্রটি হ'ল "বিভাবানুচাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ"[২১]। এমনকি তৎসহ ভরতোক্ত সাত্ত্বিক ভাবের প্রসঙ্গও স্মরণে উদিত হয়। তবে ধনঞ্জয়কথিত 'ভাব' যে রসতত্ত্বালোচনায় উল্লিখিত 'ভাব'-ই; তার প্রমাণ দশরূপকের বিশেষণ 'রসাশ্রযম্' পদটি। রস এবং ভাব সাহিত্যতত্ত্বের দিক থেকে দুটি পৃথক বিষয়। সহৃদয়ের রসধ্বনির জন্য চতুর্বিধ অভিনয় প্রয়োজন। নাট্যস্থ তথা অনুকরণীয় চরিত্রের সঙ্গে নটনটীর তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্থাপিত না হ'লে রসাভিব্যক্তির অপূর্ণতা রয়ে যায়। নৃত্য যদি অভিনয় হয়, তবে সেখানে মূল উপজীব্য আঙ্গিক ও আহার্য অভিনয়। বাচিক সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক না হলেও আঙ্গিক এবং সাত্ত্বিককে নৃত্যাভিনয় থেকে ব্রাত্য রাখা অসম্ভব। *দশরূপ*-এর ওপর ধনিকের রচিত *অবলোকবৃত্তি*-তে কয়েকটি নৃত্যের উদাহরণ পাই যা অভিনয়যোগ্য ভাবাশ্রয়ী চারুকলা। যথা –

ডোম্বী শ্রীগদিত ভাণো ভাণীপ্রস্থানরাসকাঃ ।
কাব্যং চ সপ্ত নৃত্যস্য ভেদাঃ স্যুস্তে'পি ভাণবত্ ।।[২২]

অর্থাৎ নৃত্য হ'ল সপ্ত প্রকার এবং সেগুলি যথাক্রমে ডোম্বী, শ্রীগদিত, ভাণ, ভাণী, প্রস্থান, রাসক এবং কাব্য। এখন 'ভাবাভিনয়'-এর সঙ্গেই আরও একটি বিশেষণ নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । সেটি তার পদার্থাভিনয়াত্মকতা।

এই 'পদার্থ' কোনও বস্তু নয়। এখানে ব্যাকরণগত অর্থের গ্রহণ হবে। 'পদস্য অর্থঃ' এভাবে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস নির্ণয়পূর্বক 'পদ'-এর লক্ষণ দেখতে হবে। বৈয়াকরণিক পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী*-র 'সুপ্তিঙন্তং পদম্' (১/৪/১৪) এই সূত্রানুসারে পদের সংজ্ঞা যেমন ভাবতে পারি, তেমনই একটি শ্লোকের একেকটি চরণকেও পদ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। এমনকি শ্লোকস্থ অবান্তর বাক্যকেও পদ ব'লে শনাক্ত করার রীতিও শাস্ত্রানুমোদিত। কয়েকটি উৎকৃষ্ট উদাহরণের সাহায্যে 'পদার্থাভিনয়'কে মনোজ্ঞভাবে তুলে ধরা যায় বোধসৌকর্যার্থে । ধরা যাক *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের প্রথম অঙ্কের সেই বহুখ্যাত শ্লোকটি –

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং ।
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি ।।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী ।
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ।।[২৩]

শ্লোকটির ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায় যে (সরোবরে) পদ্ম শৈবালে পরিপূর্ণ হয়েও রমণীয়, চন্দ্রের কলঙ্ক থাকা সত্ত্বেও চন্দ্রের কোনওরূপ মালিন্য লক্ষ্য না ক'রে বরং তার দীপ্তিকে প্রসারিত করে। তাই (আশ্রমকন্যা শকুন্তলা) বল্কল বসন পরিহিত হয়েও তার স্বাভাবিক কান্তিকে পরাজিত করতে পারেনি বরং অধিকতর মনোরম হয়ে উঠেছে। যারা নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অধিকারী, তাদের কাছে বাহ্যিক অলংকার পরাজিত। এটি দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে দেখে ভাবতে থাকে আপন মনে। এখানে যে রসের বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে, তা শৃঙ্গার রস। নাটকের অভিনয়ে এই শ্লোকোচ্চারণ রীতিতে যেমন শোক বা বিরহের অনুভব থাকবেনা, তেমনই বীররসোদ্দীপক আস্ফালনও একজন অভিনেতা প্রকাশ করবেনা। অর্থাৎ শৃঙ্গারোপযোগী স্বরপ্রক্ষেপণের মাধ্যমেই রসকে অভিব্যক্ত করতে হবে। এর জন্য বাগভিনয়-ই একমাত্র পন্থা। এখানে আঙ্গিক অভিনয়ের স্থান নেই। অথচ যদি এটি নৃত্যের মাধ্যমে ভাবাভিনীত হয়ে থাকে, তখন "শৈবলেন সরসিজম্ অনুবিদ্ধং", "লক্ষ্ম মলিনম্ অপি হিমাংশোঃ লক্ষ্মীং তনোতি", "ইযং তন্বী বল্কলেন অপি অধিকমনোজ্ঞা" এই প্রতিটি শ্লোকাংশের অর্থ প্রকাশ করতে হবে আঙ্গিক অভিনয়ের দ্বারা। চন্দ্র, শৈবাল, পদ্ম ব্যবহারের জন্য নৃত্যশিল্পীকে করণ বা মুদ্রার অবলম্বন করতে হবে। এই প্রকারে শ্লোকস্থ অর্থের সামগ্রিক নির্যাসকে উপস্থাপিত করতে হবে। এর সপক্ষে যুক্তি পাওয়া যায় ধনিকের বচনে। তা হ'ল –

রসস্য চ পদার্থীভূতবিভাবাদিসংসর্গাত্মকবাক্যার্থহেতুত্বাদ্বাক্যার্থাভিনযাত্মকত্বং রসাশ্রযম্.... নটে কিঞ্চিচ্চলনার্থত্বাত্ সাত্ত্বিকবাহুল্যম্,.... গাত্রবিক্ষেপার্থত্বে সমানে'প্যনুকারাত্মকত্বেন নৃত্তাদন্যন্নৃত্যং তথা বাক্যার্থাভিনযাত্মকান্নাট্যাত্ পদার্থাভিনয়াত্মকন্যদেব নৃত্যমিতি।[২৪]

সরলভাষায় ব্যক্ত করতে বলতে হয় যে সমগ্র বাক্যের অর্থানুপযোগী বিভাবাদি ত্রিবিধ ভাবের জন্য বিহিত সংহত এবং মার্জিত অভিনয়-ই হ'ল নাট্যাভিনয়। অত্যধিক গাত্রবিক্ষেপ বা চলিত ভাষায় যাকে 'অতিনাটকীয়' ভঙ্গি তা একেবারেই কাম্য নয়। অপরপক্ষে বাক্যের উপাদান পদের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হ'ল নৃত্যানুষ্ঠান। অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত নৃত্য ও নাট্যের বিলক্ষণতার একটি হেতু আঙ্গিক এবং বাচিক অভিনয়ের প্রাধান্য। নৃত্যের আলোচনায়

আরও একটি পদ লক্ষণীয়। সেটি হ'ল "ভাণবত্"। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে নামগত সাদৃশ্য থাকলেও সপ্ত নৃত্যের অন্যতম 'ভাণ' দশরূপকের অন্তর্গত 'ভাণ' অপেক্ষা ভিন্ন। কারিকায় উক্ত প্রথম প্রকার 'ভাণ' নৃত্যকলাবিশেষ এবং দ্বিতীয় প্রকার 'ভাণ' ভরতোক্ত দশরূপকের অন্তর্গত রূপকবিশেষ। সুতরাং নৃত্যকে বলা হ'ল ভাণ নামক রূপকাভিনয়ের তুল্য। ভরতমুনিকথিত দশরূপকের অন্যতম হ'ল ভাণ। এই 'ভাণ' শব্দটির অর্থের জন্য নাগার্জুন রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থ *মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাশাস্ত্র*-এর সহায়তা প্রার্থনা করতে হয়। সেখানে উনবিংশতম অধ্যায়ে 'কলবিঙ্ক-ভাণ' শব্দের অনুবাদে 'ভাণ' অর্থে দাঁড়ায় একক উক্তি।[২৫] এই অর্থটির গ্রহণ সমীচীন হবে কিনা তার জন্য ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র*-এর বিবৃতি দ্রষ্টব্য। ভাণের সংজ্ঞাপ্রসঙ্গে ভরতমুনি বলেছেন –

> পরবচনমাত্মসংস্থং প্রতিবচনৈরুত্তরোত্তরগ্রথিতৈ
> আকাশপুরুষকথিতৈরঙ্গবিকারৈরভিনয়ৈশ্চৈব ।
> ধূর্তবিটসংপ্রযোজ্যো নানাবস্থান্তরাত্মকশ্চৈব ।
> একাঙ্কো বহুচেষ্টঃ সততং কার্যো বুধৈর্ভাণঃ ।।

এটি কোনও নটের একক অভিনয়। কোনও একজন নট বা অভিনেতা প্রসঙ্গ অনুসারে বিভিন্ন চরিত্রের অনুকরণ করে। এই উপস্থাপন পদ্ধতি কেবলমাত্র আঙ্গিক, বাচিক এবং সাত্ত্বিক অভিনয়কে সঙ্গী ক'রে। আহার্য বা উপযুক্ত সাজসজ্জা, অলংকরণ সেখানে অনুপস্থিত। এমনকি এর কোনওরূপ প্রসঙ্গ আসতেই পারেনা। একজন অভিনেতার পক্ষে তাৎক্ষণিক বেশবদল সম্ভব নয়। তাই নৃত্যের ক্ষেত্রেও একই বিষয়ের অবতারণা হয়ে থাকে। এই সাত প্রকার নৃত্যেই শুধুমাত্র ভাবাভিনয় থাকে। তবে 'শ্রীগদিত' এই শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ দেখলে জানতে পারি এখানে দুটি পদ রয়েছে – শ্রী এবং গদিত। শ্রী শব্দের অর্থ লক্ষ্মী। আবার সংস্কৃত √গদ্ ধাতুর অর্থ কিছু বলা। অর্থাৎ শ্রী-র দ্বারা কিছু বলা অথবা শ্রী শব্দের উচ্চারণ এই দু'ভাবেই ব্যাসবাক্য ধরা যায়। এই 'গদিত' শব্দটির থেকেই সন্দেহ জন্মায় যে খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীতে কি নৃত্যে কথকতার ভূমিকা ছিল ? তবে এক্ষেত্রে নৃত্যে বাগভিনয়ের প্রমাণ না পাওয়ায় আরও একটি অনুমান করা যায় যে লক্ষ্মীর দ্বারা কোনও বিষয় কথিত হলেও সেই বাগভিনয় বা গানটি নেপথ্য থেকে গীত হ'ত যা আধুনিককালের নৃত্যবৈশিষ্ট্য। নেপথ্যে গানটি গীত না হলে সেক্ষেত্রে নৃত্যশিল্পী হয়ত বাচিক অভিনয়েরও আশ্রয় নিত। তবে সেটি পদ্যাকারে নাকি গদ্যাকারে নাকি গীতের মাধ্যমে, তার সঠিক তথ্যের অভাব রয়েছে । নেপথ্য থেকে প্রযোজিত সংগীতের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশিত হ'লে নর্তক বা নর্তকীকে শুধুমাত্র আঙ্গিক এবং সাত্ত্বিক অভিনয়েই বিষয়টিকে পরিস্ফুট করতে হবে। যদি সেই ব্যবস্থা না থেকে থাকে, তবে নৃত্যশিল্পীকেও বাচিক অভিনয়ে রপ্ত হতে হবে নর্তনবিধির সমান্তরালে। তাই পদার্থাভিনয়ে ভাবপ্রকাশক নৃত্যগুলির সংজ্ঞা এবং নৃত্যগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া গেলেও গানের সঙ্গে নৃত্যের সংযোগের সূত্রটি সম্পূর্ণভাবে বিদিত হয়নি। তাহলে *দশরূপ* এবং *অবলোকবৃত্তি*-র সম্যক নিরীক্ষণে নাট্য ও নৃত্য-এর একত্রীকরণে বেশ কয়েকটি উপস্থাপনার নাম জানা যায় যা পরবর্তীতে উপরূপক-এর আশ্রয়ে নির্বিবাদে বসবাস

করতে পারবে। যথা নাটিকা, প্রকরণিকা, শ্রীগদিত, প্রস্থান, রাসক এবং কাব্য। সুতরাং এখান থেকেই প্রমাণিত অষ্টাদশ উপরূপকের কয়েকটি 'ভাবনৃত্য'রূপে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবাহে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

❖ নৃত্তপ্রবন্ধে উপরূপকের প্রসঙ্গ

অবলোকবৃত্তি-র সঙ্গেই কাশ্মীরের পণ্ডিত আচার্য অভিনবগুপ্তপাদের *অভিনবভারতী* টীকার উল্লেখ করণীয়। অভিনবগুপ্তের আনুমানিক সময়কাল খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। এই টীকা ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের ওপর আধারিত হলেও অভিনবগুপ্ত অলংকারশাস্ত্র বা ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থকৃৎদের তুল্য আসন লাভ করেছেন। ভরতোক্ত *নাট্যশাস্ত্র*-এর অষ্টাদশ অধ্যায়ের টীকায় তিনি সট্টক প্রযোজনার শুধুমাত্র শব্দোচ্চারণ করেছেন কিন্তু তাঁর পক্ষে বা বিপক্ষে কোনওরূপ যুক্তিই তিনি প্রকাশ করেননি – "অত এবং ন দশ সংখ্যা – বিভাগার্থো যেন সট্টকাদীনাং ত্যাগঃ স্যাত্। তত্রাপি হি দশরূপলক্ষণযোগো'স্ত্যেব"[২৭]। তবে এটুকু বুঝতেই পারা যায় যে তিনি ভরতমুনির বাক্যকেই প্রামাণ্য ব'লে মনে করেন। তাই দশটি রূপকের অতিরিক্ত কোনও রূপকের ঘটমানয়তা সম্পর্কে শব্দব্যয় করেননি। আবার চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি কয়েকটি নৃত্তাত্মক প্রবন্ধের নাম এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন পরম্পরাগতভাবে প্রচলিত কিছু কারিকার মাধ্যমে। সেগুলি যথাক্রমে ডোম্বিকা, ভাণ, প্রস্থান, ষিদ্গক, প্রেরণ, ভাণিকা, রামাক্রীড়, হল্লীসক এবং রাসক।[২৮] নৃত্য এবং ভাণের পারস্পরিক তুলনা প্রসঙ্গে পূর্বে যে যুক্তিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি এখানেও প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এই 'ভাণ' নামক নৃত্তাত্মক প্রবন্ধ সম্পর্কে অভিনবগুপ্তপাদ প্রচলিত উক্তিকেই নথিবদ্ধ করেছেন। সেটি হ'ল –

নৃসিংহসূকরাদীনাং বর্ণনাং জল্পযেদ্যতঃ ।
নর্তকী তেন ভাণঃ স্যাদদুদ্ধতাঙ্গপ্রবর্তিতঃ ।।[২৯]

বিষ্ণুর দশটি অবতারকে যখন ভাবাশ্রয়ী নর্তনকলা উদ্ধত রূপের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, তখন সেই বিশেষ নর্তনকলাকে 'ভাণক' ব'লে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই 'প্রবন্ধ' শব্দের অর্থ হয় প্রকৃষ্টরূপে সৃষ্ট কোনও শৃঙ্খলিত বন্ধনী বা সম্মিলিতভাবে প্রদর্শিত কোনও কলা। এখানেও বিষ্ণুর দশটি অবতার যথা কূর্ম বা মৎস্য বা বুদ্ধের যথাযথ বেশধারণ আবশ্যক নয়। চারী, করণ, পাদবিক্ষেপ, সাত্ত্বিক ভাব মিলিয়ে শরীরী প্রকাশ প্রয়োজন। এমনকি ভাণক-এর লক্ষণে নৃসিংহ অবতারের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। নৃসিংহের ইতিবৃত্তে সেখানে বীর ও রৌদ্র রসের অভিব্যঞ্জনা রয়েছে। একথা আনন্দবর্ধনের *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের মঙ্গলাচরণমূলক কারিকায় দেখি –

স্বেচ্ছাকেসরিণঃ স্বচ্ছস্বচ্ছাযাযাসিতেন্দবঃ ।
ত্রাযন্তাং বো মধুরিপোঃ প্রপন্নার্তিচ্ছিদো নখাঃ ।।[৩০]

আবার বিষ্ণুর বরাহ অবতারে বীভৎস রসের ব্যঞ্জনা হয়ে যায় সহৃদয়সম্মুখে। সুতরাং একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে নানাবিধ ভাবকেই বিকশিত করা যায়, তা 'রসাশ্রয়ী' হয়না। একটি রসের যথোপযুক্ত অভিব্যক্তির জন্য বিভাব-

অনুভাব-ব্যভিচারিভাবের প্রয়োজন। বিভাব দু'প্রকার – আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। আলম্বন বিভাব সেটিই যাকে বা যেটিকে আশ্রয় ক'রে রসের উদ্গম হয়ে থাকে। আবার উদ্দীপন বিভাব তা-ই যা রসকে উদ্দীপিত করে। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের পূর্বোক্ত "সরসিজমনুবিদ্ধং..." শ্লোকটিকেই গ্রহণ করা হ'লে সেখানে দেখা যায় যে দুষ্যন্ত শকুন্তলার বল্কলবসনের উল্লেখ করছেন। সুতরাং শ্লোকেই নির্দেশ দেওয়া রয়েছে তার বেশভূষা কীরূপ হওয়া উচিত। শকুন্তলার চরিত্রে অভিনয়কারী কোনও অভিনেত্রীকে এমন আহার্য-ই গ্রহণ করতে হবে যেখানে দুষ্যন্তের উক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবে। আবার দ্বিতীয় অন্ততঃ দুষ্যন্তের আত্মকথনের শ্লোকগুলিতে যে যে ভাবনা ধরা দিয়েছে, তার জন্য শৃঙ্গারকে অব্যাহতি দেওয়া যায়না। এখানে ভরতোক্ত আদিরস বা শৃঙ্গার রসের ঘনীভূত হওয়ার পরিবেশ তৈরি করেছে এই উদ্দীপন বিভাবগুলি। অনুভাব (action) এবং ব্রীড়াদি ব্যভিচারিভাবের উপস্থিতি নর্তনকলার মাধ্যমেও সম্ভব। রসের পরিপাকের জন্য যে তিনটি ভাবের কোনওটিকেই অবহেলা করা যায়না, সেকথা সংস্কৃত নাটকাদি রূপকের পাঠেই বোঝা যায়। নৃত্যের মাধ্যমে সাত্ত্বিক এবং রসানুসারী ব্যভিচারিভাবগুলিকে অতিক্রম ক'রে রসাভিনয় পর্যন্ত উন্নীত হওয়া যায়না ব'লেই ধনঞ্জয়ের বক্তব্য। সেকারণেই তিনি নাট্যলক্ষণে অবধারণার্থে 'দশ' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। দশটির কম বা অধিক কোনও 'রূপক'-এর অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী নন। তাই নৃত্যগুলিও 'রূপক' ব'লে আখ্যায়িত হতে পারেনা। ধনিক এবং অভিনবগুপ্তপাদ উভয়েই নৃত্যের কিছু দৃষ্টান্ত রেখেছেন। তবে অভিনবগুপ্তপাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে নৃত্তাত্মক প্রবন্ধগুলির গতিপ্রকৃতি। ভাণক-এ যেরকম রৌদ্ররসব্যঞ্জক ইত্যাদি ব্যভিচারি ভাবের ভূমিকাকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করতে হয়, তেমনভাবেই প্রস্থান-এ দেখা যায় যে গজগতির অনুকারী একটি ললিত ভঙ্গি। সেজন্যই সেখানে পদাভিনয় আবশ্যিক। ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র*-এর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রয়েছে বিভিন্ন গতির ব্যাকরণগত নীতিনির্দেশ। সুতরাং এই স্বল্প আঙ্গিক অভিনয়ের জন্যই রসকে ধ্বনিত করা সম্ভব নয়। আবার হল্লীশ-এ গোপিনীদের মধ্যে একক পুরুষ কৃষ্ণের পরিবেশনায় সম্ভোগ শৃঙ্গারের পথে অগ্রসর হওয়া। সুতরাং উপরিউক্ত উদাহরণের সাহায্যে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় *দশরূপ* গ্রন্থের বচনের যাথার্থ্য। তবুও এই ইতিহাসের বিচারে এটিকেও অস্পৃশ্য রাখা যায়না যে উপরূপকগুলির মধ্যে একদা নৃত্যসৌরভ বর্তমান ছিল। এগুলির মধ্যে সংগীতপ্রধানতার মান্যতা নিম্নে বর্ণিত আরও কয়েকটি গ্রন্থের সাপেক্ষেও দেখা যেতে পারে।

❖ পদার্থাভিনয়ে উপরূপকের প্রাচীনতা

খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীতে ধারা নগরীর পরমার বংশের রাজা ভোজদেব অলংকারশাস্ত্রের ওপর দুটি গ্রন্থ রচনা করেন – *শৃঙ্গারপ্রকাশ* ও *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*। *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-এর একাদশ প্রকাশ 'রসাবিয়োগ'-এ তিনি দৃশ্যশ্রব্যকাব্যের একটি সমার্থক শব্দ প্রয়োগ করেন 'প্রেক্ষ্যপ্রবন্ধ' যা দ্বিধাবিভক্ত – বাক্যার্থাভিনয়োপযুক্ত (রসাভিনয়) ও পদার্থাভিনয়োপযুক্ত (ভাবাভিনয়)।[৩১] এই ভাগ দু'টি রূপক এবং উপরূপককেই দ্যোতিত করে যা ধনিকের বৃত্তিতে পূর্বেই দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তবে বাক্যার্থাভিনয়ে দশটি রূপক ছাড়াও যুক্ত হয়েছে আরও দুটি অভিনেয় প্রবন্ধ – নাটিকা ও সট্টক[৩২]। এই গ্রন্থেই নাটিকা প্রথমবার উচ্চ সমাদর লাভ করে। নাটিকা যে 'রূপক'

সেকথাও তিনি বিশেষভাবেই উল্লেখ করেছেন – "প্রকরণনাটকভেদো রূপকমিহ নাটিকা ভবতি"[৩৩]। আবার সট্টকের প্রসঙ্গেও জানিয়েছেন যে এটিরও উৎস দশরূপকান্তরর্গত প্রকরণ নামক রূপক। প্রকরণ থেকেই জাত হয়েও এটি নাটিকাতুল্য। নাটিকা ও সট্টক-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য ভাষাগত। সামাজিক অবস্থান ও লিঙ্গ অনুযায়ী বহুবিধ পাত্রপাত্রীর বহু ভাষাব্যতিরেকে কেবলমাত্র একটি ভাষাতেই নিবদ্ধ হতে হবে সট্টক-কে। ভাষার ব্যবহারের বিশেষত্বের জন্যই নাটিকাসমতুল্য এই অভিনয়কলা একটি ভিন্ন নামধারণ করেছে – "প্রকরণসমুদ্ভবা পুনরুৎপাদ্যং বস্তু নাযকং নৃপতিম্"[৩৪] বা "অপ্রাকৃত-সংস্কৃতযা স সট্টকো নাটিকাপ্রতিমঃ"[৩৫]। তাই *শৃঙ্গারপ্রকাশ* এমন একটি গ্রন্থ যেখানে পূর্বাচার্যদের মতকেও যেমন গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনই নতুন দিশাকেও স্বাগত জানানো হয়েছে । নাটক ও প্রকরণের নিয়মের একাংশকে বজায় রেখেও যে একটি স্বয়ংক্রিয় 'রূপক' সৃষ্ট হতে পারে তার প্রমাণ ভোজদেবের ব্যক্তিগত মতামত। একইভাবে নাটিকা-র কায়ায় আরও এক প্রাণের জন্ম হতে পারে সেকথাও তিনি প্রচার করেছেন।

এরপর প্রসঙ্গক্রমে আসতে হয় 'পদার্থাভিনয়' বিষয়ে। পদার্থাভিনয়কেও তিনি দ্বাদশ প্রকারে সজ্জিত করেছেন। প্রতিটির নিজস্ব আবেদন রয়েছে । এগুলি হ'ল শ্রীগদিত, দুর্মিলিকা, প্রস্থান, কাব্য, ভাণক, ভাণিকা, গোষ্ঠী, হল্লীসক, নর্তনক, প্রেক্ষণক, রাসক এবং নাট্যরাসক।[৩৬] এগুলির জন্য 'নৃত্য' এই বিশেষ্যপ্রয়োগ না থাকলেও এগুলির বর্ণনায় নৃত্য, গীতের আনুষঙ্গিকতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন স্ত্রী নৃত্যশিল্পীর দ্বারা অভিনেয় 'নর্তনক' এই শব্দটিই যথেষ্ট। এটির লক্ষণটি হ'ল –

যস্য পদার্থাভিনযং ললিতলযং সদসি নর্তকী কুরুতে ।
তন্নর্তনকং শম্যালাস্যছলিকদ্বিপদাদি ।।[৩৭]

এছাড়াও শ্রীগদিত, কাব্য, ভাণক, ভাণিকা, রাসক প্রযোজনাতেও সংগীতের স্পর্শ অনুভূত হয়। এগুলির মধ্যে যেমন পূর্বের নৃত্যগুলিকেও পাওয়া গেল, তেমনই তৎকালীন প্রচলিত আরও কয়েকটি নৃত্যকলার অন্তর্ভুক্তিকে মান্যতা দেওয়া হ'ল। তবে কালস্রোতে যে উপনদী এসে মূল নদী প্রবাহে অন্তর্লীন হচ্ছে, তারও তথ্য উন্মুক্ত হয়। ভাণক (পূর্বোক্ত 'ভাণ') সেই সময়ে যে যেভাবে পরিবেশিত হওয়ার কথা জানা যায় তা অনেকখানিই বিবর্তিত। যেমন এখানে বলা হয়েছে –

হরিহরভানুভবানীস্কন্দপ্রমথাধিপস্তুতিনিবন্ধঃ ।
উদ্ধতকরণপ্রাযঃ স্ত্রীবর্জো বর্ণনাযুক্তঃ ।।
ধবলগুণকীর্তনপরৈর্গাথারম্ভাদিভিঃ স্তুতিনিবন্ধঃ ।
গাযনসহোক্তিযুক্তোদন্তেন বিভূষিযপ্রাযঃ ।।[৩৮]

অভিনবভারতী-তে দেখা গেছে যে সেখানে নর্তকী (female dancer) উদ্ধত অঙ্গাভিনয়ে নৃসিংহাদি বর্ণনা করবে । এখানে দেখতে পাওয়া যায় যে হরিহর, ভবানী, কার্তিকেয়, শিব ইত্যাদি দেবতার স্তুতি ও মহিমাকীর্তন করা

হবে উদ্ধত করণের মাধ্যমে। এমনকি 'স্ত্রীবর্জো' বিশেষণটিও অভিনব। এর পূর্বে নারীরাই নৃত্যশিল্পের উপস্থাপনা করত। অথচ এখানে বলা হয়েছে যে এই নৃত্যকলায় স্ত্রীদের ভূমিকা একেবারেই বর্জনীয় বা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত একটি মতপ্রকাশ করেছেন ভোজদেব। অর্থাৎ ভাণক-এ কেবলমাত্র নর্তকদের (male dancer) অধিকার ছিল ভোজদেবের দৃষ্টিকোণ থেকে।

প্রস্থান-এর ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে আদিম রূপ অনেকখানিই সংস্কারসাধিত। *অভিনবভারতী*-তে ছিল কেবলমাত্র গজগতির আঙ্গিকে নৃত্তরচনার দ্বারা প্রবাসগমনের উদ্ধত এবং মসৃণ ভঙ্গিমায় চিত্তরঞ্জক দৃশ্যায়ন। *শৃঙ্গারপ্রকাশ* এটিকে বর্ধিত রূপে তুলে ধরে। এখানে দেখা যায় এটি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারসূচক একটি পদার্থাভিনয়। কোনও একজন প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা অনুরাগ-মান-প্রবাস ইত্যাদি অবস্থাকে অনুভাবের মাধ্যমে প্রকাশ করে। এমনকি বর্ষা বা বসন্তকালীন বিরহেরও কিঞ্চিৎ অভিনয় হয়ে থাকে ললিত আবেশে। তবে অন্তিম কালে বীররসের অভিব্যক্তি হয়ে থাকে –

অন্তে বীররসাঢৈর্নিবদ্ধমেতচ্চতুর্ভিরপসারৈঃ ।
প্রস্থানমিতি ব্রুবতে প্রবাসমুপলক্ষযেত্ সুধিযঃ ।।[৩৯]

তাহলে এর থেকেও প্রমাণিত যে একদা প্রবাসগমনের চিত্রকল্প কোনও এক কামিনী নায়িকার দীর্ঘকালের বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ এভাবেই 'পদার্থাভিনয়' কলাসমূহ তার কৈশোর অবস্থা কাটিয়ে তারুণ্যে উপনীত হতে চলেছে। তবে একটি বিষয় স্মতর্ব্য যে প্রতিটি নৃত্ত-ই যে ভোজদেবের সময়ে বিবর্তিত ও বিবর্ধিত হয়েছে, এমনটি নয়। এই পক্ষের উদাহরণস্বরূপ আসতে হল্লীসক-এর কথা । এই প্রজাতির নৃত্তে অভিনবগুপ্তপাদ এবং ভোজদেব উভয়কেই একই স্তরে অবস্থান করতে লক্ষ্য করা যায়। বহু স্ত্রীর মণ্ডলাকারে নৃত্তের মধ্যে যদি কোনও একজন পুরুষ থাকে, তবে সেই শ্রেণীর প্রযোজনাকে হল্লীসক বলা কর্তব্য। *অভিনবভারতী*-তে প্রদত্ত লক্ষণটি হ'ল –

মণ্ডলেন তু যন্নৃত্তং হল্লীসকমিতি স্মৃতম্ ।
একস্তত্র তু নেতা স্যাদ্ গোপস্ত্রীণাং যথা হরিঃ ।।[৪০]

এবং *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-এ কথিত হল্লীসক-এর লক্ষণটি হ'ল –

যন্মণ্ডলেন নৃত্তং স্ত্রীণাং হল্লীসকং তু তত্ প্রাহুঃ ।
তত্রৈকো নেতা স্যাদ্ গোপস্ত্রীণামিব মুরারিঃ ।।[৪১]

সুতরাং এটির নির্মাণগত কৌশলের যে কালিক বিবর্তন সাধিত হয়েছিল এমনটি নয়। হল্লীসক-এ কৃষ্ণ ও গোপিনীদের লীলার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তবে এটি নয় যে এটি গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের একক নৃত্য। অন্য কোনও পুরুষ একাধিক নারী সহযোগে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সুষ্ঠু চারু কৌশলে একটি নৃত্যালেখ্য রসিকসমাজে আলোকিত করতেই পারে।

ভোজদেবের দ্বিতীয় গ্রন্থ *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*-এ রয়েছে নর্তকনিষ্পাদিত চতুর্বিধ অভিনয়োপেত ছয় প্রকার 'প্রেক্ষণ' অনুষ্ঠান। এগুলি হ'ল লাস্য, তাণ্ডব, ছলিক, সম্পা, হল্লীসক এবং রাস –

যদাঙ্গিকৈকনিবর্ত্যমুজ্ঝিতং বাচিকাদিভিঃ ।
নর্তকৈরভিধীযতে প্রেক্ষণাক্ষ্বেডিকাদি তত্ ।।
তল্লাস্যং তাণ্ডবং চৈব ছলিকং সংপযা সহ ।
হল্লীসকং চ রাসং চ ষট্প্রকারং প্রচক্ষতে ।।[৪২]

প্রতিটি উপস্থাপনাকেই বলা হয়েছে আঙ্গিকাভিনয়প্রধান এবং রসপুষ্ট। যেমন লাস্য, হল্লীসক ও রাসক হ'ল শৃঙ্গারপ্রধান, তাণ্ডব হ'ল বীররসপ্রধান, ছলিক ও সম্পা শৃঙ্গার ও বীরের একত্র সহাবস্থান। তাহলে এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে নর্তনক ললিতকলায় শম্যা, লাস্য, ছলিক, দ্বিপদী ইত্যাদির ব্যবহার থাকে। তাহলে *শৃঙ্গারপ্রকাশ* গ্রন্থান্তরে ভোজদেবের স্বীয় রচনায় একেকটিকে পৃথকভাবে পরিবেশিত হওয়ার কথাও অনুপলব্ধ নয়। তবে এখানে ছলিক-এর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত না হলেও পূর্বে খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকে দণ্ডী-র *কাব্যাদর্শ* গ্রন্থে এগুলি নাট্যেতর 'প্রেক্ষার্থকাব্য' রূপে কিঞ্চিৎ অবহেলিত ছিল। *কাব্যাদর্শ*-এর *মালিন্যপ্রোচ্ছায়া* টীকা 'ছলিত'কে বলেছেন পুরুষনৃত্য এবং শল্যা হ'ল কপালে হাত রেখে অনুষ্ঠেয় একপ্রকার নৃত্যাঙ্গিক।[৪৩] আবার মানস দাশগুপ্ত *তাল অভিধান*-এ তালক্রিয়ার আলোচনায় জানিয়েছেন যে প্রাচীন কালে গান্ধর্ব তাল ছিল অষ্টধা এবং শম্যা তার মধ্যে অন্যতম। এটির ক্রিয়া ছিল বাম হাত দিয়ে ডান হাতে তালি দেওয়া।[৪৪] সুতরাং গীত এবং নৃত্য দুটি ক্ষেত্রেই একই শব্দ এই দ্বর্থ্যকতা উৎপাদন করে। অর্থাৎ অনুমান হয় যে পুরাকালে হয়ত 'শম্যা তালনৃত্য' অনুষ্ঠিত হ'ত এবং তার আঙ্গিক ছিল কপালে হাত রেখে আঙ্গিকতা বজায় রাখা। মহাকবি কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকের প্রথমাঙ্কের প্রারম্ভিক পর্বে বিষ্কম্ভক অংশে চেটীর সংলাপে মালবিকার ছলিত নৃত্যের অভ্যাসের আভাস রয়েছে।[৪৫] আবার বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর পরিশিষ্ট অংশ যা *হরিবংশপুরাণ* নামে পরিচিতি লাভ করেছে,সেখানে বিষ্ণুপর্বে ছালিক্য গান এবং হল্লীসক নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ছালিক্যগেযং বহুসংনিধানং ।
যদেব গান্ধর্বমুদাহরন্তি ।।[৪৬]

অর্থাৎ এই ছালিক্য গানে বহুবিধ মানুষ একত্র হয়ে অংশগ্রহণ করেছিল যা 'গান্ধর্ব' নামেও পরিচিত ছিল। আবার এই প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে -

হল্লীসকং তু স্বযমেব কৃষ্ণঃ ।
সবংশঘোষং নরদেব পার্থঃ ।।[৪৭]

শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদনরত হয়ে এই হল্লীসক নৃত্য করেছিলেন, অর্জুন মৃদঙ্গবাদনে সঙ্গত করেন, রম্ভা যথাবিধ কাব্যার্থ অনুধাবন ক'রেই নৃত্যাভিনয় করেন এবং অন্যান্য অপ্সরারা কৃষ্ণের মনোরঞ্জনের জন্য নর্তনে অভিসারিণী হয়।

রম্ভার বিশেষণ রয়েছে "সাভিনযার্থতজজ্ঞা"[৪৮]। হল্লীসক যে অভিনয়সম্পন্ন নৃত্য তা আলংকারিক ব্যতীত ঋষিকবিরাও জানতেন সমকালে তার ব্যাপ্তির জন্যই। অতএব টীকাকার যে বক্তব্য রেখেছেন, তার সঙ্গে কালিদাসের কালের প্রভেদ অনেকখানি। যেহেতু দণ্ডী কোনও সংজ্ঞা বা লক্ষণ করে যাননি, তাই এবিষয়ে পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত হওয়া যায়না বা টীকার বক্তব্যকেও পূর্ণ সমর্থন করা যায়না । তবে এই শল্যা-র পরিবর্তে অন্য পুথিতে পাঠভেদে শম্যা শব্দটিও লক্ষিত হয়। দ্বিপদী-র উল্লেখ শ্রীহর্ষের *রত্নাবলী* নাটিকার প্রথমাঙ্কেই পাওয়া যায়[৪৯]। বসন্তোৎসবে কামুকী চেটীগণের শ্লোকাবৃত্তিসহ অভিব্যক্তি। তাহলে ভামহ, দণ্ডী, ভোজদেব এই পণ্ডিতত্রয়কে যদি একই পঙক্তিতে সারিবদ্ধ করা হয়, তবে একটি ছিন্ন যোগসূত্রকে পুনরায় উদ্ধার করা সম্ভব। শম্যা, দ্বিপদী, ছলিত (মতান্তরে ছলিক) এই ত্রিধারায় খ্রিস্টিয় একাদশ শতকে নর্তনক নামের এক প্রেক্ষ্যপ্রবন্ধ লোকপ্রিয় ছিল। তবুও বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণ*-এ নর্তনক নামটিকে জীবিত থাকতে দেখা যায় না। এক্ষেত্রে দুটি ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। নর্তনক নৃত্যকলা হয়ত ততদিনে অন্য কোনও পদার্থাভিনয়ে আত্মনিবেদন ক'রে তার নিজপরিচয় ধ্বংস করেছে অথবা ধীরে ধীরে এই ধারার অবলুপ্তি ঘটেছে। তবে ভোজদেবের নতুন সংযোজন যথা দুর্মিলিকা (নামান্তরে দুর্মল্লিকা), প্রেক্ষণক, ভাণিকা এবং নাট্যরাসক যে এই সময় থেকে যাত্রা শুরু করেছে এই বিষয়টিও উজ্জ্বল। এগুলির আহ্বায়ক 'উপরূপক'।

❖ নাট্যরূপে উপরূপক

এরপরের গন্তব্য শারদাতনয়ের *ভাবপ্রকাশন* গ্রন্থ। এটি এমন একটি প্রকরণগ্রন্থ যেখান থেকেই উপরূপকের যাত্রা শুরু না হলেও সেই যাত্রার মঙ্গলধ্বনি শ্রুত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম, অষ্টম এবং নবম অধিকার মিলিয়ে মত সংগ্রহ করতে হয়। প্রথম অধিকারে তিনি একটি কারিকায় দুটি পদের প্রয়োগ করেন। যথা "ত্রিংশৎপ্রকারভিন্নানি রূপকাণি"[৫০] এবং এরই পুনরুক্তি লক্ষ্য করি অষ্টম অধিকারে –"ত্রিংশদ্রূপকভেদাশ্চ"[৫১] এবং তার মধ্যে চিরায়ত প্রসিদ্ধ নাটকাদি দশ প্রকার রূপক 'রসাত্মক' এবং বাকিগুলি 'ভাবাত্মক' – "রসাত্মকা দশৈতেষু বিংশদ্ ভাবাত্মকা মতাঃ"[৫২]। এই গ্রন্থের পূর্বেকার কোনও শাস্ত্রীয় বচন এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার করা যায়নি যেখানে পদার্থাভিনয়সংকুল ভাবাশ্রয়ী নর্তনকলাগুলি 'রূপক'-এর শিরোপা পেয়েছে। দশটি রসানন্দপ্রদায়ী রূপকভিন্ন অন্য 'নৃত্ত'গুলির সারণি দু'বার পাওয়া যায়। অষ্টম অধিকারে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী এগুলির নাম যথাক্রমে তোটক, নাটিকা, গোষ্ঠী, সল্লাপ, শিল্পক, ডোম্বী, শ্রীগদিত, ভাণ, ভাণী, প্রস্থান, কাব্য, প্রেক্ষণ, সট্টক, নাট্যরাসক, লাসক, উল্লোপ্য, হল্লীস, দুর্মল্লিকা, মল্লিকা, কল্পবল্লী এবং পারিজাতক।[৫৩] আবার নবম অধিকারের সূত্রে নামগুলি যথাক্রমে তোটক, নাটিকা, গোষ্ঠী, সল্লাপ, শিল্পক, ডোম্বী, শ্রীগদিত, ভাণ, ভাণী, প্রস্থান, কাব্য, প্রেক্ষণ, নাট্যরাসক, রাসক, উল্লোপ্য, হল্লীস, দুর্মল্লিকা, কল্পবল্লী, মল্লিকা এবং পারিজাতক।[৫৪] এগুলি দেশ-কাল ভেদে নামান্তরেও প্রসিদ্ধ থাকতেই পারে এমনও একটি সূত্রের প্রাপ্তি ঘটে –"এতা নামান্তরৈঃ কৈশ্চিদাচার্যৈঃ কথিতা মতা"[৫৫]। তাহলে দেখা যাচ্ছে সট্টক নামক রূপকটি প্রথমবার উল্লিখিত হয়েও দ্বিতীয় তালিকায় উপেক্ষিত। এছাড়াও লাসক এবং রাসক-এর প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে সংস্কৃত ভাষার "রলযোরভেদঃ" নিয়মানুক্রমে হয়ত উচ্চারণভেদে একই

প্রযোজনা দুটি নামে পরিচিতি পেয়েছে। এখন সট্টক-এর সবিশেষ অন্তর্ভুক্তির হেতু কি রাজশেখরের *কর্পূরমঞ্জরী* কাব্যের অধিক প্রশস্তি ? কারণ একাদশ শতকের মধ্যে রাজশেখরের আবির্ভাব এবং শারদাতনয়ের সঠিক সময় নির্ণিত না হ'লেও খ্রিস্টিয় দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে কোনও এক সময়কেই শ্রদ্ধেয় সুশীলকুমার দে সঠিক মনে করেন[৫৬]। কোহল এটির সম্পর্কে কীরূপ মত পোষণ করতেন তা অজ্ঞাত কিন্তু তৎপরবর্তী যুগে নৃত্য রূপকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনায় আলংকারিকগণ 'সট্টক' এই সংরূপটির সম্পর্কে উদাসীন থেকেছেন। শারদাতনয় এখানে নাটিকার প্রতিবিম্ব লক্ষ্য না ক'রে এর পারতান্ত্রিকতাই প্রতিপাদন করেছেন। এই গ্রন্থের আরও একটি কীর্তি হ'ল লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বেশ কিছু পদার্থাভিনয়ানুসারী রূপকের নামের সুলভতা। ইতোমধ্যেই লক্ষণ অন্যত্র পাওয়া গেলেও লক্ষ্য গ্রন্থের নাম অজানা রয়ে গেছিল। তাই সেদিক থেকেও এর ভারবত্ব যথেষ্টই। এই সময় থেকেই দেখি যে ভাবানুগনকারী বিংশ প্রকার রূপক প্রায় 'নাট্য'-এর আশীর্বাদধন্য হতে পেরেছে। নেতৃচরিত্র কীরূপ হবে, অঙ্কসংখ্যা, সন্ধির অবস্থান, অঙ্গিরসের আস্বাদ কীরূপ হবে তার বিবরণ এখানে রয়েছে। দশরূপকের মধ্যে ভাণ একাঙ্কিকা ছিল। তবে এক্ষণে আরও কিছু রূপককে কমসংখ্যক অঙ্ক দিয়ে গড়া হতে দেখা যায়। এখানে গোষ্ঠী, শ্রীগদিত, কাব্য, প্রেক্ষণ, হল্লীস, মল্লিকা এবং পারিজাতক একাঙ্ক রূপক ব'লেই উল্লিখিত। আবার প্রস্থান দুটি অঙ্কের বন্ধনে গঠিত, সল্লাপে পাওয়া যায় তিনটি অঙ্ক এবং শিল্পক চারটি অঙ্কের সমষ্টি। অন্যদিকে গোষ্ঠী, শ্রীগদিত ,ভাণিকা, মল্লিকা ও কল্পবল্লী গর্ভ ও অবমর্শসন্ধিবিহীন। সল্লাপ কেবলমাত্র প্রতিমুখ সন্ধিকে ত্যাগ করে। অবমর্শ সন্ধি হল্লীসে বিযুক্ত, প্রস্থান ও পারিজাতক শুধুমাত্র মুখ ও নির্বহণ সন্ধির আশ্রয়স্থল[৫৭]। এগুলির যেমন নব আভরণ দেখা যায়, তেমনই নাট্যরাসক পূর্বাবস্থা থেকে কোনওরূপ উচ্চতায় পৌঁছায়নি। এই আভরণে কতখানি নবরূপে কান্তিময় হয়ে উঠেছে রূপকগুলি, তা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তুলে ধরা যাক।

একেবারে প্রথমেই উঠে আসে প্রস্থান-এর চর্চা। বিগত সময়ে সেটি ছিল কোনও প্রোষিতভর্তৃকা নারীর প্রিয়ের প্রবাসহেতু মান, অনুরাগের হাব-ভাব-হেলার ঋতু অনুযায়ী বর্ণনাত্মক ভাবাভিনয়। এখন প্রকাশিত হ'ল নায়কচরিত্র। দাস বা ভৃত্যশ্রেণীর কোনও এক পাত্র নায়ক এবং অতি নিম্ন স্বভাবের হীন উপনায়ক এখানে ইতিবৃত্তের নিয়ন্ত্রক। মুখ ও নির্বহণ সন্ধির উপস্থিতির থেকে বোঝা যায় কাহিনির মধ্যে উত্থান-পতন বা দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই।[৫৮] যাকে উদ্দেশ ক'রে বীজের উদগম, তা-ই সফল হয়ে যায় বিনা প্রতিঘাতে। এর উদাহরণে *শৃঙ্গারতিলক* উল্লেখযোগ্য হলেও বর্তমানে সেটি দুষ্প্রাপ্য। তাই মূল আধিকারিক ইতিবৃত্তটি না জানার ফলে এর বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়। তবে এটুকু অনুমেয় যে একদা কোনও এক কামিনী নারীর প্রিয়জনের সান্নিধ্যলাভ মূল বিষয়বস্তু। হীন উপনায়ক ত্রিকোণ তৈরি করে। হয়ত নায়ক ও উপনায়ক দু'জনেই একই প্রেয়সীকে কামনা করে কিন্তু নায়িকার শেষ পর্যন্ত নায়কের সঙ্গেই মিলন ঘটে। তাই প্রিয়কে নিকটে না পাওয়ার বিরহতাপ থেকে মান বা প্রবাসের সংবেদনশীল অভিনয় নৃত্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় সুরসিকগণের হৃদয়মধ্যে। ভোজদেবের সময়কাল পর্যন্ত এই অভিনয়ে কোনও পুরুষ চরিত্র বর্তমান ছিল কিনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তাই নায়ক-নায়িকা সম্ভোগ শৃঙ্গার অন্তিম লগ্নে পরিবেশিত হ'ত কিনা তাও বুদ্ধির অগোচরে রয়ে যায়। অর্থাৎ কয়েক শতাব্দী

যাবৎ এর অভিনয়ে কোনও স্তব্ধতা আসেনি। শুধু যুগের সঙ্গে সঙ্গী হয়েছে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, পুরুষচরিত্র এবং নাট্যসন্ধি।

একই কথা ঘুরেফিরে আসে গোষ্ঠী-র ক্ষেত্রেও। ভোজদবের মননে এর চিত্রকল্পটি ছিল যে গোষ্ঠে বিহারের সময় গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের রিষ্টাসুরবধের অভিনয়-ই গোষ্ঠী প্রযোজনা –

গোষ্ঠে যত্তু বিহরতশ্চেষ্টিতমিহ কৈটভদ্বিষঃ কিংচিত্ ।
রিষ্টাসুরপ্রমথনপ্রভৃতি তদিচ্ছন্তি গোষ্ঠীতি ।।[৫৯]

ভাবপ্রকাশন-এ দেখা যায় যে নয় বা দশ জন পুরুষচরিত্র এবং পাঁচ বা ছয়জন নারীচরিত্র এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করছেন। একটি অঙ্ক-ই সমগ্র কাহিনির ধারক। এখানে মুখ্যবস্তুর সূচনা (মুখসন্ধি), মূলস্রোতে কিছু বিপরীত স্রোতের আগমন (প্রতিমুখ) কিন্তু সাময়িক ব্যবধানে সেই বাধার অপসারণে পুনরায় ফলপ্রাপ্তি এবং উপসংহার। এখানে কৃষ্ণ কর্তৃক যমলার্জুনের প্রতি মোক্ষ বা অন্যান্য দানবের বধ দৃশ্যায়িত হলেও তবে এটি কৈশিকী বৃত্তির অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্গাররসের অভিনয়। অথচ উদাহরণের থেকে এখানে বীর বা রৌদ্র রসের প্রাধান্য অনুমিত হয়। তবে *শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ*-এর দশম স্কন্ধের যমলার্জুনের আখ্যানটি পাঠ করলে সেই সন্দেহের নিষ্পত্তি হতে পারে[৬০]। কুবেরপুত্র নলকুবের ও মণিগ্রীব সুরাপানে মত্ত হয়ে দেবকন্যাদের সঙ্গে কামকেলি করতে থাকে। হঠাৎ দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হয়ে পড়লে নারীরা বস্ত্রধারণ করলেও নলকুবের ও মণিগ্রীব বিবস্ত্র অবস্থাতেই পড়ে থাকে। তাই তারা শাপগ্রস্ত হয়ে স্থাবর অর্জুন বৃক্ষে পরিণত হয়। কৃষ্ণের লীলায় তারা জীবন ফিরে পায়। যেহেতু গোষ্ঠী নামক দৃশ্রশ্রব্যধর্মী নাট্যে বহু নরনারীর কামজ শৃঙ্গারের উল্লেখ রয়েছে, তাই ধারণা জন্মায় যে নলকুবের এবং মণিগ্রীবের সম্পূর্ণ বা আংশিক আখ্যান চিত্রিত হ'ত এবং গোপবালক কৃষ্ণের ভূমিকা ছিল তাদের উদ্ধারের নিমিত্ত। আবার প্রতিপ্রশ্ন উঠতেই পারে যে বৃন্দাবনের নরনারীদের রতিক্রিয়ার পরে ঘটনাবিশেষে দু'টি অর্জুন বৃক্ষের মধ্যে পুনঃপ্রাণসঞ্চারের একটি একমুখী ইতিবৃত্ত-ই হয়ত প্রদর্শিত হ'ত। সেই সন্দেহ নিরস্ত করার উপায় একটি যুক্তি। যদি এরূপ কোনও গোষ্ঠী প্রযোজনার নামকরণ বা প্রতিপাদ্য বিষয় 'যমলার্জুনোদ্ধার' হয়ে থাকে, তবে সেখানে তাকে কেন্দ্র ক'রেই কি আরম্ভ এবং উপসংহার হওয়াই ঔচিত্যবিধায়ক। সংস্কৃত কবিগণ সেই বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কাব্যের নামকার্য এবং গর্ভে থাকা বিষয় কখনওই পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি। তাই যমলার্জুনের পূর্ব ও উত্তর কথা-ই ছিল কাব্যের লক্ষ্য এমন সদর্থক আশা কল্পনাপ্রসূত বা ক্ষতিকর হবেনা। উচ্ছৃঙ্খল কামভোগে মত্ত হওয়ার পরিণামই এর বার্তা। ভোজদেবের রচনায় কতজন পাত্রপাত্রী গোষ্ঠী-তে অংশগ্রহণ করত তার কোনও দিকনির্দেশ নেই। তবে অসুরবধাদি কোনও বৃন্দাবনলীলা একক অভিনয়ে পরিস্ফুট না হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অর্থাৎ কিছু নিরুদ্দেশকে উদ্দিষ্ট করার জন্য *ভাবপ্রকাশন*-এর দান চিরস্মরণীয়।

হল্লীস-এর ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় একটি পরিমিতিবোধ। অভিনবগুপ্তপাদ কিংবা ভোজদেবের গ্রন্থে বলা ছিল মণ্ডলাকারে স্ত্রীদের মধ্যে একক পুরুষ। অথচ কতজন নারীর সমন্বয় সেকথা উহ্য থেকে গেছিল। *ভাবপ্রকাশন*

একটি সীমানা নির্ধারণ করেছে। এখানে দেখা যায় একাঙ্কের মধ্যেই ঘননিবিড় একটি দৃশ্যকাব্যে সাত বা আট বা সর্বাধিক নয় জন নারীভূমিকা থাকবে[৬১]। এই লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে এগুলিকে 'উপরূপক' পদকপ্রাপ্তির ধনাত্মক অনুঘটকের ন্যায় হয়ে উঠেছে।

এই গ্রন্থের সমীক্ষার শেষে আরও দুটি প্রযোজনার বিষয়ে আলোকপাত প্রয়োজনীয়। সেদুটি হ'ল ডোম্বী এবং কল্পবল্লী। এমন কয়েকটি প্রযোজনা খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে 'উপরূপক'-এর খেতাব থেকে কেন বঞ্চিত হয়েছে এই জিজ্ঞাসা বারংবার মনে আসে। বিশ্বনাথ কবিরাজ সর্বাধিক সংখ্যক উপরূপক স্বীকার করেও এমন কয়েকটিকে কেন বর্জন করলেন কোন্ প্রমাণের ভিত্তিতে ? এর অনুসন্ধানেও জ্বলন্ত প্রমাণ *ভাবপ্রকাশন* গ্রন্থ। ডোম্বী-র সঙ্গে আরও একটি উপরূপকে সংযুক্ত করতে হবে। সেটি ভাণিকা এবং কল্পবল্লী-র সঙ্গে জড়িত নাট্যরাসক। ডোম্বী-র লক্ষণে শারদাতনয়ের উক্তিটি উদ্ধৃত করা যাক।

ডোম্বেব ভাণ্ডিকোদাত্তনাযিকৈকাঙ্কভূষিতা ।
কৈশিকীভারতীপ্রাযা বীরশৃঙ্গারমেদুরা ।।
শ্লক্ষনেপথ্যভাঙ্মন্দোৎসাহা পুরুষনাযিকা ।
অঙ্গানি তস্যাঃ সপ্ত স্যুঃ কসমদত্তা যথা কৃতা ।।
বিন্যাসশ্চাপ্যুপন্যাসো বিবোধঃ সাধ্বসস্তথা ।
অনুবৃত্তিশ্চ সংহারঃ সমর্পণমিতি ক্রমাত্ ।।
নির্বেদবাক্যং বিন্যাস ইষ্টার্থবিরহার্জিতম্ ।
কার্যাখ্যানমুপন্যাসঃ তত্তদর্থপ্রস্যানে ।।[৬২]

অর্থাৎ একাঙ্কিকা ডোম্বী নামক কলাটি হ'ল মন্দ নায়ক ও উদাত্ত নায়িকার দ্বারা সজ্জিত, কৈশিকী এবং ভারতী বৃত্ত্যাশ্রয়ী এবং বেশভূষা তথা আহার্যাভিনয়ে আলোকিত। এমনকি বিন্যাস, উপন্যাস, বিবোধ, সাধ্বস, অনুবৃত্তি, সংহার এবং সমর্পণ নামক সপ্তাঙ্গ হবে ডোম্বীর নাট্যঘটনাবিন্যাসের প্রধান শর্ত।

অন্যদিকে সাহিত্যদর্পণোক্ত ভাণিকা-র লক্ষণটি হ'ল -

ভাণিকা শ্লক্ষনেপথ্যা মুখনির্বহণান্বিতা ।
কৈশিকীভারতীবৃত্তিযুক্তৈকাঙ্কবিনির্মিতা ।।
উদাত্তনাযিকা মন্দনাযকাত্রাঙ্গসপ্তকম্ ।
উপন্যাসো'থ বিন্যাসো বিবোধঃ সাধ্বসং তথা ।।
সমর্পণং নিবৃত্তিশ্চ সংহার ইতি সপ্তম ।[৬৩]

অর্থাৎ আহার্যাভিনয়প্রধান ভাণিকা হবে একাঙ্কিকা, কৈশিকী ও ভারতী বৃত্তির দ্বারা পূর্ণ, নায়ক হবে মন্দ কিন্তু নায়িকা হবে উদাত্ত এবং মুখ-নির্বহণ সন্ধিদ্বয়ের দ্বারা গ্রথিত। এমনকি উপন্যাস, বিন্যাস, বিবোধ, সাধ্বস, সমর্পণ,

নিবৃত্তি এবং সংহার নামক অঙ্গসপ্তক এটিকে ত্যাগ করতে পারেনা। তাহলে দুটি লক্ষণের মধ্যে যে ক'তখানি অন্তরঙ্গতা রয়েছে তা বোঝাই যায়। শুধু তাই নয়; *ভাবপ্রকাশন*-এ ডোম্বী-র প্রকৃষ্ট উদাহরণ *কামদত্তা* । বিশ্বনাথ কবিরাজ-ও সেই উদাহরণটিকেই ভরসা করেছেন ভাণিকা-র জন্য। তাই দুটি একই পদার্থাভিনয়ের নামান্তর কিনা তা নিয়ে সংশয়মুক্ত হওয়া যায়না। তাই যদি *সাহিত্যদর্পণ*-এ দুটিকেই স্থান দেওয়া হ'ত,তবে পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে শারদাতনয় এখানে ভাণিকা নামের যে রূপকের কথা বলেন, সেটি কিন্তু বিশ্বনাথ কবিরাজের ভাণিকা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। ডোম্বী-তে বলা হয়েছে কোনও একজন উদাত্তনায়িকা থাকবে এবং নায়ক হবে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। আহার্য অভিনয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ। লাস্যাঙ্গ উপস্থাপিত হবে ভাবাভিনয়ের মাধ্যমে। এবং মোট সাতটি অঙ্গ প্রসঙ্গ অনুসারে অঙ্গীভূত হয়ে থাকবে। অপরদিকে ভাণিকা ছিল ভাণ-এর সুকুমার ভঙ্গি - "সুকুমারতঃ প্রযোগাদ্ ভাণো'পি ভাণিকা ভবতি"[৬৪]। ভাণে যেভাবে হরিহর, শিব, কুমার ইত্যাদি দেবস্তুতির অভিনয় থাকত, এখানেও তেমনি কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা গাথার আকারে কোমল ও মধুর লাস্যপ্রয়োগের মাধ্যমে নারীচরিত্রগণ অভিনয় করবেন। এই অভিনয়টি বাচিকের দিকটিও ভীষণভাবে সূচিত করে - "লাস্যাঙ্গসন্ধিনিযমো ভাণবদেবাত্র ভাণিকাযাং স্যাত্"[৬৫]। ফলতঃ ভাণ এবং ভাণিকা যেন একই জাতির পৃথক দুই সত্তা। একটি পুরুষপ্রধান এবং অন্যটি স্ত্রীপ্রধান। এই ধরণের গাথামূলক রূপকও *সাহিত্যদর্পণ*-এ কোনও আসনলাভ করেনি। তাই একদিকে যেমন ভাণিকা নিজের পুরাতন পরিচ্ছদকে ত্যাগ করেছে, তেমনই আরও একটি পোশাকে সজ্জিত ক'রে নিজেকে 'উপরূপক' ব'লে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছে। তাই 'ডোম্বী' থেকে ভাণিকা এক রূপ থেকে রূপান্তরের পথে সুদীর্ঘ যাত্রা।

একই ঘটনা নাট্যরাসক-এর বিবর্তনেও লক্ষ্য করা যায় যার একদা নাম ছিল কল্পবল্লী। এই কল্পবল্লী-র লক্ষণটি দেখে নেওয়া যাক।

কল্পবল্লী ভবেত্ হাস্যশৃঙ্গাররসভাকযুক্ ।
উদাত্তনাযকোপেতা পীঠমর্দোপনাযকা ।।
অস্যাং বাসকসজ্জা স্যাত্ নাযিকা'ভিসারিকা ।
দ্বিপদীখণ্ডগেযাঢ্যা রথ্যাবাসকলতাযুক্ ।।
লযত্রযযুতা লাস্যদশকেন সমন্বিতা ।
ঈদৃশী কল্পবল্লী স্যাদ্যথা মাণিক্যবল্লিকা ।।
মুখসন্ধিপ্রতিমুখসন্ধিনির্বহণৈর্যুতা ।
উদাত্তবর্ণনোৎকর্ষা ললিতোদাত্তনাযকম্ ।।[৬৬]

এটিই *সাহিত্যদর্পণ*-এ যে ভূষণ গ্রহণ করেছে, সেটি 'নাট্যরাসক'। লক্ষণটি হ'ল -

নাট্যরাসকমেকাঙ্কং বহুতালস্থিতি ।
উদাত্তনাযকং তদ্বত্ পীঠমর্দোপনাযকম্ ।।

হাস্যো'ত্র সশৃঙ্গারো নারী বাসকসজ্জিকা ।
মুখনির্বহণে সন্ধী লাস্যাঙ্গানি দশাপি চ ।
কেচিত্ প্রতিমুখং সন্ধিমিহ নেচ্ছন্তি কেবলম্ ।।[৬৭]

সন্ধির নিয়মে স্বল্প বৈভিন্ন্য থাকা ছাড়া নায়ক, রস, উপনায়ক, নাট্যাঙ্গিকের একাধিক রীতিতে কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। দু'ক্ষেত্রেই নায়ক ধীরোদাত্ত, পীঠমর্দ শ্রেণীর উপনায়কের ভূমিকা, অবস্থা ভেদে নায়িকা বাসকসজ্জিকা বা নায়কের প্রতি অভিসারিকা । হাস্য এবং শৃঙ্গার যুগপৎ অঙ্গিরসে কৈশিকী বৃত্তি মালিকার ন্যায় শোভিত। সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন "বিনা বিশেষং সর্বেষাং লক্ষ্ম নাটকবন্মতম্"[৬৮] অর্থাৎ নাটকভিন্ন বাকি রূপক এবং উপরূপকগুলির কেবলমাত্র নাটকলক্ষণের সঙ্গে যে স্থানে স্বাধীন, শুধু সেই সেই লক্ষণগুলিই তুলে ধরা হবে। যেহেতু এই উপরূপকের আধিকারিক ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজ নীরব, তাই এখানে নাটকের ম'তই খ্যাতবৃত্ত বা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ কোনও বৃত্তকে ঘিরেই এর আবর্তন। যেহেতু *নর্মবতী* বা *বিলাসবতী*-র গ্রন্থ এখন উপলব্ধ নয়, তাই ইতিবৃত্তটি কোনও ঐতিহাসিকতা বা পৌরাণিকতা বজায় রেখেছে কিনা তা নিয়ে কুয়াশা কেটে ওঠেনি। তবে যেকথা ডোম্বী-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তার ব্যতিক্রম কল্পবল্লী নয়। এটিই যে *ভাবপ্রকাশন*-এর উত্তরকালে নাট্যরাসক নামগ্রহণ করেছে তা নিশ্চিত এবং তার পাশাপাশি এটিও সত্য যে নাট্যরাসক যে ধারাটি কিছু শতাব্দী ধরে সমভূমি প্রবাহে বয়ে চলেছিল, তা মজে গেছে অচিরেই। অষ্ট, দ্বাদশ বা ষোড়শ নারীর পিণ্ডীবদ্ধভাবে ললিতোপচারযুক্ত নৃত্য যা চর্চরী নামেও পরিচিত, তার অবসান হয়েছে নাট্যরঙ্গভূমিতে। উপরূপকগুলি খ্রিস্টিয় দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই রূপকের সমতুল্য হয়েছিল তাদের নাট্যিকতার সাফল্যেই। যেগুলি নাট্যাত্মক হয়নি, সেগুলি 'উপরূপক'-এর আখ্যালাভে অক্ষম থেকেছে।

এরপরে দ্রষ্টব্য জৈন আলংকারিকগণের সাহিত্যশাস্ত্রসন্দর্ভগুলি। প্রথমেই দেখে নিতে হয় হেমচন্দ্রের *কাব্যানুশাসন* গ্রন্থটিকে। সুশীলকুমার দে এই গ্রন্থের সময়কাল নির্ণয় করেছেন খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দী[৬৯]। তিনি ভরতমুনি, কোহল, ভোজদেব প্রভৃতি পূর্বাচার্যকে মান্যতা দিয়েছেন এবং নিজ উক্তির পরিবর্তে এই গ্রন্থের বৃত্তিতে বেশ কিছু কারিকাকে উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে এই প্রমাণ ছত্রে ছত্রে লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে দৃশ্যকাব্যের আলোচনা লক্ষণীয়। তিনি মূলতঃ দৃশ্যকাব্যকে শনাক্ত করেছেন 'প্রেক্ষ্যকাব্য' রূপে। এটি আবার দ্বিধাবিভক্ত। যথা 'পাঠ্যপ্রেক্ষ্যকাব্য'ও 'গেয়প্রেক্ষ্যকাব্য'[৭০]। প্রথম প্রকার কাব্যটি সংখ্যায় দ্বাদশ – নাটক, প্রকরণ, নাটিকা, সমবকার, ঈহামৃগ, ডিম, ব্যায়োগ, উৎসৃষ্টিকাঙ্ক, প্রহসন, ভাণ, বীথী এবং সট্টক।[৭১] অর্থাৎ এই ধারণাটি অনেকখানিই ভোজদেবের দ্বারা প্রভাবিত। তবে 'গেয়প্রেক্ষ্যকাব্য' বিষয়ক তথ্য পাওয়া যায় "গেযং ডোম্বিকা-ভাণ-প্রস্থান-শিঙ্গ-ভাণিকা-প্রেরণ-রামাক্রীড-হল্লীস-রাসক-গোষ্ঠী-শ্রীগদিত-রাগকাব্যাদি"[৭২] বৃত্তিটির দ্বারা। এই গণে রয়েছে একে একে ডোম্বিকা, ভাণ, প্রস্থান, শিঙ্গ, ভাণিকা, প্রেরণ, রামাক্রীড়, হল্লীসক, রাসক, গোষ্ঠী, শ্রীগদিত এবং রাগকাব্য। এছাড়াও "আদিগ্রহণাত্ শম্যাচ্ছলিতদ্বিপদ্যাদিপরিগ্রহঃ"[৭৩] এই বাক্যাংশটির ফলে এগুলি ছাড়াও কিছু অপ্রধান গেয়রূপক হিসেবে শম্যা, ছলিত এবং দ্বিপদীকেও স্থান দিয়েছেন। এই শিঙ্গ রূপকটি

সম্ভবতঃ *অভিনবভারতী* -তে উল্লিখিত ষিদ্গক-এর সম অর্থ বহন করে। *অভিনবভারতী*-তে ষিদ্গক সম্বন্ধে চিরন্তনের উক্তিতে কথিত হয়েছে –

সখ্যাঃ সমক্ষং ভর্তুর্যদুদ্ধতং বৃত্তমুচ্যতে ।
মসৃণং চ ক্বচিদ্ধূর্তচরিতং ষিদ্গকস্তু সঃ ।।[৭৪]

এবং *কাব্যানুশাসন*-এও শিঙ্গ সম্পর্কে বৃত্তিতে একইভাবে চিরন্তনের উক্তিকে উদ্ধৃত ক'রে বলা হয়েছে –

সখ্যাঃ সমক্ষং পত্যুর্যদুদ্ধৃতং বৃত্তমুচ্যতে ।
মসৃণং চ ক্বচিদ্ধূর্তচরিতং শিঙ্গকস্তু সঃ ।।[৭৫]

অর্থাৎ বিবৃতিটিই প্রমাণ করে যে পদার্থাভিনয়াত্মক ষিদ্গক এবং শিঙ্গ একই প্রযোজনার নামান্তর। তবে পৃথক নামকরণের হেতু নির্ণয় করতে পারা যায়না। এক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে যায়। যেমন প্রথমতঃ এটি পুথিভেদে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে লিখিত ত্রুটি অথবা দ্বিতীয়তঃ এটি মৌখিক ভাষায় বিভিন্ন অঞ্চলে বা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর কথ্যভাষার বৈভিন্ন্য।

তাহলে এই গ্রন্থ উপরূপকের বিবর্তনের মানচিত্রে নতুন কোনও পথের ঠিকানা দেয়না। উক্ত অভিনেয়কাব্যগুলি সম্পর্কে পূর্বেই ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে একমাত্র যে তত্ত্বটির জন্য হেমচন্দ্র সাধুবাদ অর্জন করেন, সেটি হ'ল 'গেয়' বিশেষণটির ব্যবহার। সংস্কৃতে √গৈ ধাতুর সঙ্গে যত্ প্রত্যয় যুক্ত হ'লে 'গেয়' প্রাতিপদিকটি নিষ্পন্ন হয় যার অর্থ গানের উপযুক্ত। অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে ভারতে একধরণের 'গীতিনাট্য'-এর প্রচলন ছিল তার একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এই গ্রন্থ। নাটিকা এবং সট্টক এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার সমর্থ কারণ হ'ল বর্তমানে যে ক'টি নাটিকা পাওয়া যায়, সেগুলির কোনওটিই আগাগোড়া গেয় নাট্যোক্তিতে রচিত নয়। হেমচন্দ্রের সময়ে *রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা*-র ম'ত নাটিকার জন্ম হয়ে গেছে। আবার সট্টকের দৃষ্টান্তে ছিল *কর্পূরমঞ্জরী*। অথচ ডোম্বিকাদি গীতিবহুল ও পদার্থাভিনয়ে আচ্ছন্ন নৃত্যপ্রধান কাব্যের কোঠায় যদি নাটিকা এবং সট্টক-কে রাখা হ'ত, তবে সমীকরণ নির্ভুল হতে পারত না। সেজন্যই ভরতমুনির উক্তিকে অমান্য না করেই দুটি রূপকধর্মী অভিনেয়কাব্যকে তাদেরই সঙ্গে যুক্ত ক'রে একটি নামকরণ করেছেন 'পাঠ্যপ্রেক্ষ্যকাব্য' অর্থাৎ এগুলি গানের মাধ্যমে উপস্থাপিত হওয়ার ম'ত কাব্য বা রূপক নয়।

❖ রূপকরূপে উপরূপক

দশরূপ-এর পরে শুধুমাত্র ভারতীয় নাট্যতত্ত্ব নিয়েই যদি কোনও প্রকরণ গ্রন্থ হয়ে থাকে তবে তা *নাট্যদর্পণ* যার প্রণেতাদ্বয় হলেন রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র। ধর্মদর্শনের দিক থেকে তাঁরা জৈন। এই গ্রন্থ দুটি দিক থেকে সমৃদ্ধ। প্রথমটি হ'ল নাটিকা ও প্রকরণীর গণনা রূপকের মধ্যেই নির্দিষ্ট।

নাটকং প্রকরণং চ নাটিকা প্রকরণ্যেথ ।
ব্যাযোগঃ সমবকারো ভাণঃ প্রহসনং ডিমঃ ।।
অঙ্কং ঈহামৃগং বীথী চত্বারঃ সর্ববৃত্তয়ঃ ।[৭৬]

দ্বিতীয়টি হ'ল "এতানি চ স্বল্পমাত্ররঞ্জনানিমিত্তাদ্ বৃদ্ধৈরনভিহিতত্বাচ্চ বৃত্তাবেব কীর্তিতানীতি।"[৭৭] উক্তির মাধ্যমে 'স্বল্পমাত্ররঞ্জনক্ষম রূপক' এই শব্দবন্ধের ব্যবহার। এই গ্রন্থের চতুর্থ বিবেকের শেষ পর্বে যে স্বল্প রঞ্জনকারী রূপকগুলির নাম ও বিবরণ পাওয়া যায়; যেগুলি হ'ল সট্টক, গোষ্ঠী, হল্লীসক, শম্যা, লাস্য, ছলিত, দ্বিপদী, প্রেক্ষণক, রাসক, নাট্যরাসক, কাব্য, ভাণক ও ভাণিকা[৭৮]। তবে সট্টক থেকে শুরু ক'রে ভাণিকা পর্যন্ত প্রতিটি রূপকের গ্রন্থকর্তাদ্বয় কোনও স্বকীয় সংজ্ঞা দেননি। পূর্বাচার্যদের মতকেই উদ্ধৃত করেছেন বা জনসমাজে প্রচলিত কিছু লোকশ্রুতিকে গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। তবে এই 'স্বল্পরঞ্জক' রূপকের মধ্যেই সট্টক-কে গ্রহণ করায় বোঝা যায় যে এই রূপকটির প্রতি তাঁরা সহানুভূতিশীল ছিলেন না। এমনকি সট্টকের লক্ষণ "অপ্রাকৃত-সংস্কৃতযা স সট্টকো নাটিকাপ্রতিমঃ"-এ 'নাটিকাতুল্য' বিশেষণটি থাকা সত্ত্বেও তিনি ত্রয়োদশ প্রকার রূপককে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেননি।

নাটিকা এবং সট্টক একই প্রজাতির পরিবারভুক্ত। এমনকি ভোজদেব ও হেমচন্দ্র এদুটিকেই একত্রে গণনা করেছেন কিন্তু এখানে সট্টক-এর আসনে বসেছে প্রকরণী। এই গ্রন্থের সর্বাধিক অবদান প্রকরণী-র রূপকমধ্যে গণনা। এই গ্রন্থেই প্রথম যে উপরূপকটির সম্মান লক্ষ্য করা যায়, সেটি প্রকরণী। নাটিকা, সট্টক, প্রকরণী যদি একটি পরিবারেরই তিন সদস্য হয়, তবে এদের মধ্যে সমানাধিকারের দাবি ওঠে। প্রকরণীর লক্ষণে দেখা যায়–

এবং প্রকরণী কিন্তু নেতা প্রকরণোদিতঃ ।।
একাহচিতরৈকাঙ্কো গর্ভামর্শবিবর্জিতঃ ।
অস্ত্রীনিমিত্তসংগ্রামো নিযুদ্ধস্পর্ধনোদ্ধতঃ ।।[৭৯]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে একাঙ্কিকা প্রকরণী তদানীন্তন সময়ে ছিল এমন এক রূপক যেখানে গর্ভ-অবমর্শ সন্ধির সঙ্গচ্যুত। এমনকি যুদ্ধ বা পারস্পরিক সংঘাত সেখানে বর্ণিত থাকলেও তা নায়িকা তথা কোনও নারীকে কেন্দ্র ক'রে ঘটবে না। কারিকা ছাড়াও স্বোপজ্ঞ বৃত্তিতে গ্রন্থকৃৎদ্বয় প্রকরণী-র রূপক হিসেবে মনোনয়নের কারণ দেখিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রথমেই বলা হয়েছে এই নামটির যৌক্তিকতা। প্রকরণী বললেই প্রথমে প্রকরণ নামটি মাথায় আসে। গ্রন্থে বলা হয়েছে "প্রকর্ষেণ ক্রিযতে কল্প্যতে অস্যামর্থ ইতি প্রকরণী, অল্পার্থে কপি প্রকরণিকা"[৮০]। প্রকৃষ্টরূপে যা করা হয়, তা-ই প্রকরণ। তাই 'প্রকরণ' নামটির মধ্যে নটসম্বন্ধিত কোনও অনুষঙ্গ জড়িত নয়। এই করণ নাট্যঘটনার সুষ্ঠুতা নাকি নাট্যদর্শনজন্য রসের আত্তীকরণ তা বোঝা যায়না। তবে প্রকরণ-এর ম'তই এখানের বস্তু কবিকল্পিত, তাই নামটি প্রকরণী বা প্রকরণিকা এই শব্দ গঠিত হয়। এই দুইয়ের কোনও ভেদ নেই। এমনকি এখানেও প্রকরণ-এর ম'ত নায়ক বণিক, অমাত্য অথবা ব্রাহ্মণ। যদিও বৃত্তিতে বণিককে ঘিরেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাহলে প্রকরণের ধর্মের জন্য 'রূপকভেদক'-এর দুটি বস্তু ও নেতা অসিদ্ধ হয়ে পড়ছে। প্রকরণের সঙ্গে প্রকরণীর এ'দুটির কোনও পৃথকত্ব নেই। নাটকের ধর্ম বলতে যেটির আমদানি ঘটেছে, সেটি কৈশিকী বৃত্তি। বৃত্তিতেই বলা রয়েছে "কৈশিকীবহুলত্বং চ নাটকধর্মঃ, প্রকরণস্যাল্পকৈশিকীত্বাত্" [৮১]। প্রকরণের তুলনায় নাটকের মধ্যে কৈশিকী বৃত্তির ব্যবহার অধিক। তাই মূল রস শৃঙ্গার-ই। তাহলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে

হবে নাটকের থেকে রসধর্মের পালন করেছে এই রূপক। তবে এখানে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে যে নাটকের অঙ্গিরস বীর ও শৃঙ্গার দুই-ই হতে পারে। বীররসপ্রধান নাটকে কৈশিকী বৃত্তির ঘাটতি লক্ষ্য যায়। তাই এখানে 'নাটকধর্ম' অর্থে শৃঙ্গাররসাশ্রিত নাটকের ধর্মের অধিগ্রহণ হয়েছে কিন্তু বীর রস প্রকরণে মর্যাদা পায়নি। এর থেকেই রসভেদকের দিকটিও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। যেহেতু প্রকরণী-তে রসও শৃঙ্গারসাগরের প্রতি বেগবান, অতএব প্রকরণ-এর বস্তু, নেতা ও রস প্রকরণী-তে সমুপস্থিত। নাটকধর্মকে বিনা পরিশ্রমেই অতিক্রম করেছে প্রকরণধর্ম।

ব্রাহ্মণ এবং অমাত্যের উদাহরণের সাপেক্ষে এখানে এই রূপককে ব্যক্ত না করা হলেও বলা যায় যে ত্রিবর্ণের কথাই পেতে পারি প্রকরণী-তে। অমাত্যকে যদি ক্ষত্রিয় বর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে ধরি, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ আরও এক বর্গ এবং বিপ্র বৈশ্যবর্গের প্রতীক। তাই কল্পিত সামাজিক ইতিবৃত্ত নিয়েই গড়ে উঠতে পারে এই রূপক। "নেতা প্রকরণোদিতঃ" এই অংশ থেকেই এই বিষয়ের আশঙ্কা আসে। যদি কেউ বলেন যে প্রকরণী কেবলমাত্র প্রকরণের বণিক চরিত্রের অনুরূপ, তবে তাও নিরস্ত হতে পারে। বৃত্তিতে রয়েছে বহুবচনের প্রয়োগ – "কল্প্যার্থত্বং বণিগাদিনাযকত্বং চ প্রকরণধর্মঃ..."[৮২]। এখানে 'আদি' শব্দ গ্রহণের তাৎপর্য এটিই যে এর দ্বারা ব্রাহ্মণ ও অমাত্যের গ্রহণ সিদ্ধ। ত্রিবর্গের ধর্মশাস্ত্রনির্দেশিত নিজ ধর্মপালন করার পরেও অন্তঃপুরে প্রবেশ এবং নারীলাভ এই বিষয় উঠে আসছে প্রকরণী-তে। শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক*-এ বণিক চারুদত্তের প্রথমা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও গণিকা বসন্তসেনার পাণিগ্রহণ ঘটেছে। তাহলে এই রূপকেও একই ঘটনা ঘটে থাকলে স্বতন্ত্র রূপকরূপে স্বীকারের কী যুক্তি? তার কারণ এখানে বাধক অঙ্কসংখ্যা। সেটিও বৃত্তিতে বলা রয়েছে "এবং নাটিকোক্তচতুরঙ্কত্বাদিলক্ষণানুসারেণ প্রকরণী গ্রথনীয়া"[৮৩]। নাটিকাসদৃশ এখানেও অনধিক চারটি অঙ্গবিন্যাস থাকবে। তাহলে সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে *মালতীমাধব, মৃচ্ছকটিক*-এর ম'ত পাঁচ বা ততোধিক অঙ্কসমষ্টির বর্তমানেও পাঁচটি অঙ্কের কম অঙ্কসংখ্যায় কিছু প্রকরণ উদিত হয়েছিল কবিপ্রতিভায়। তাল সেজন্যই প্রকরণ থেকে একটি ভিন্ন রূপককে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রসঙ্গ এসে পড়ে যেখানে নাটিকা-র ম'ত নর্মশৃঙ্গারের চটুলতা বেশি।

নাটিকা এবং প্রকরণী-র যাত্রা প্রশস্ত ছিলনা। এই দু'টিকে যথেষ্ট গঞ্জনা, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে ধনিকের সমালোচনায়। তবুও নাটিকা ভোজদেব ও হেমচন্দ্রের চিন্তনে উচ্চতর মান পেলেও *নাট্যদর্পণ*-এই প্রথম প্রকরণী-র উন্নয়ন ঘটল। তাহলে *নাট্যদর্পণ* মনে করে না যে নাটিকা এবং প্রকরণী দুটি একই নাট্যরূপের নামদ্বয় নয়। তবে এদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের হেতু কী ? ইতিবৃত্ত যদি এখানেও ক্লৃপ্ত হয়ে থাকে তবে নেতৃচরিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। *নাট্যদর্পণ*-এর সমকালে বা পূর্বকালে যে নাটিকাগুলি সহৃদয়সমাজে স্থান গ্রহণ করেছে, সেখানে নায়ক একজন রাজা। রাজা উদয়নের পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট না থাকলেও তাকে দুষ্যন্তের সঙ্গে তুলনা করতেই পারি নাট্যগ্রন্থনার কাঠামোয়। বণিকাদি চরিত্র নিয়ে নাটিকা উদ্ভূত হয়নি বলেই হয়ত তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকোষ্ঠ বরাদ্দ করেছিলেন প্রকরণী-র জন্য। প্রকরণী-র কোনও যথাযথ উদাহরণ বিশ্বনাথ

কবিরাজ-ও খুঁজে পাননি। তাই যেহেতু আস্থা রাখা যায় এমন কোনও আদর্শ প্রকরণী গ্রন্থের সুচিন্তিত গভীর পাঠ সম্ভব নয় এই সময়ে, তাই এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নয়। তবে মননশীল ভাবনায় এটুকুই বোঝা যায় নাটক, প্রকরণ এবং নাটিকা এই ত্রিধারার সঙ্গমস্থল ছিল প্রকরণী।

নাটিকা এবং প্রকরণী এই নাট্যধারাদ্বয় 'রূপক'-এর মানমর্যাদা প্রাপ্ত হ'লেও 'স্বল্পমাত্ররঞ্জনক্ষম' নাট্যগুলিও রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের দৃষ্টিকোণ থেকে 'রূপক'। অর্থাৎ *সাহিত্যদর্পণ*-এর প্রাক্ যুগে যে নাট্যতত্ত্ববিশেষজ্ঞগণ সট্টক, গোষ্ঠী, হল্লীসক ইত্যাদিকে রূপের আরোপাত্মক 'রূপক' রূপেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁরা হলেন রামচন্দ্র এবং গুণচন্দ্র। তাই এই *নাট্যদর্পণ* গ্রন্থের প্রভাবকে পরবর্তীতে যে উপেক্ষা করা যায়নি এমন দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা-ই গোচরে আসে। অর্থাৎ খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দী সময়কালটি উপরূপকের বিবর্তনের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সমালোচিত একটি সময়কাল।

এই প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখেই *অগ্নিপুরাণ*-কেও আলোচনায় রাখা কর্তব্য। এখানে কিছু প্রকীর্ণ কাব্যের কথা পাই যা শ্রব্য ও অভিনেয় এই দু'ভাগে বিভক্ত। এর পরেই সপ্তবিংশ প্রকার অভিনেয় কাব্যের সারণি পাওয়া যায়। সেখানে ভরতোক্ত দশরূপকের অব্যবহিত পরেই রয়েছে ত্রোটক এবং নাটিকা। অনন্তর ক্রমান্বয়ে রয়েছে সট্টক, শিল্পক, কর্ণালাপ, দুর্মল্লিকা, প্রস্থান, ভাণিকা, ভাণী, গোষ্ঠী, হল্লীশক, কাব্য, শ্রীগদিত, নাট্যরাসক, উল্লাসক, উল্লাপ্যক এবং প্রেক্ষণ –

> নাটকং সপ্রকরণং ডিমঃ ঈহামৃগো'পি বা ।
> জ্ঞেয়ং সমবকারশ্চ ভবেত্ প্রহসনং তথা ।।
> ব্যাযোগ-ভাণ-বীথ্যঙ্ক-ত্রোটকন্যথ নাটিকা ।
> সট্টকং শিল্পকং কর্ণালাপো দুর্মল্লিকা তথা ।
> প্রস্থানং ভাণিকা ভাণী গোষ্ঠী হল্লীশকানি চ।
> কাব্যং শ্রীগদিতং নাট্যরাসকোল্লাসকে তথা ।।
> উল্লাপ্যকং প্রেক্ষণঞ্চ সপ্তবিংশতিরেব তত্ ।[৮৪]

সুতরাং নাটিকা-র রূপকপদে জয়লাভের সম্ভাবনা অনেকখানি তরান্বিত করছে এই ব্রাহ্মণ্যবাদী মহাপুরাণ। 'অভিনেয়' ব্যতীত অন্য কোনও নতুন শব্দের ব্যবহার কররননি পুরাণকথক। যেহেতু বিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণ*-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমেই বলেছেন – "দৃশ্যং তত্রাভিনেযং তদ্ রূপারোপাত্তু রূপকম্"[৮৫]। অর্থাৎ 'দৃশ্যকাব্য' মাত্রেই তা 'অভিনেয়' এবং এই দৃশ্যশ্রব্যধর্মী কাব্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে গেলে চতুর্বিধ অভিনয়েরই সহায়তা প্রয়োজন। তাই 'অভিনেয় কাব্য'-ই হয়ে ওঠে 'রূপক'। সুতরাং এই ক্রমিক তত্ত্বটির ভিত্তিতে বলা যায় অগ্নিপুরাণ 'রূপক' শব্দটি অভিধেয় অর্থে প্রয়োগ না করলেও প্রতীয়মানার্থেই ব্যবহার করেছেন। তাই এই মহাপুরাণ-ও নাট্যদর্পণোক্ত স্বল্পরঞ্জনকারী নাট্যকলাগুলিকে 'রূপক' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হয়নি।

এরপরে যখন খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসে পৌঁছাই, তখন সাগরনন্দীর *নাটকলক্ষণরত্নকোশ* গ্রন্থের মাধ্যমে ভারতীয় নাট্যবিবর্তনের আরও এক নতুন তত্ত্বলাভ সম্ভব হয়। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ভরতোক্ত দশরূপককে বলা হয়েছে 'অভিনেয়কাব্য' –"অভিনেযং নাটকং প্রকরণং প্রহসনং অঙ্কঃ ব্যাযোগঃ ভাণঃ সমবকারঃ বীথী ডিমঃ ঈহামৃগশ্চেতি। দশৈতানি রূপকানি। অন্যান্যাপি নাটকালঙ্কারার্থং ব্যক্ষন্তে।"[৮৬] এরপর একবিংশ অধ্যায়ে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা পেয়ে থাকি যেগুলির উপযোগিতা নাটকের অলংকরণের প্রয়োজনে বর্তমান। সুতরাং বাকি অভিনেয় কাব্যগুলি নাটক নামক রূপকের সৌন্দর্যায়নে পরার্থে ভূমিকা রাখে। এগুলি হ'ল যথাক্রমে নাটিকা, (তোটক), গোষ্ঠী, সংলাপ, শিল্পক, প্রস্থান, কাব্য, হল্লীসক, শ্রীগদিত, ভাণিকা, ভাণী, দুর্মল্লিকা, প্রেক্ষণক, সট্টক, রাসক, নাট্যরাসক এবং উল্লাপ্যক। এগুলিতে রয়েছে কৈশিকী বৃত্তির আধিপত্য । যেমন কাব্য হ'ল মাত্রা, দ্বিপদী ও ভগ্নতালের দ্বারা সুশোভিত, রাসক-এ থাকে শৃঙ্গারাত্মক বহুবিধ কলা সম্পর্কে উপদেশ, নাট্যরাসক হয় বহু তাল-লয়ের গৃহ এবং উল্লাপ্যক হ'ল গীতিময়।[৮৭]

তবে গীতিধর্মী এই অভিনেয়কাব্যগুলি সম্পর্কে যত না অজ্ঞাত চমৎকার তথ্য পাওয়া যায়, তার থেকেও অধিক তথ্য পাওয়া যায় তোটক-এ। *সাহিত্যদর্পণ*-এ এটিই ত্রোটক নামে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। তাই তোটক, ত্রোট বা ত্রোটক যা হোক, এটিরও উপরূপকরূপে প্রকাশ হতে কিছু প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে। *ভাবপ্রকাশন*-এ যে দুটি রূপকের তালিকার পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে দেখা যায় যে দুবারই তোটক-এর অবস্থান। অথচ *ভাবপ্রকাশন*-এর নবম অধ্যায়ে নাটিকা, তোটক, সট্টক নিয়ে আলোচনা বিংশ প্রকার 'নৃত্যভেদস্বরূপ'-এ অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এই তিনটি স্বরূপ নাটক ও প্রকরণ-এর অংশে উজ্জ্বল –

নাটিকাযাস্তোটকস্য সট্টকস্য য লক্ষণম্ ।
অংশত্বান্নাটকস্যাপি তথা প্রকরণস্য চ ।।[৮৮]

নাটিকা, সট্টক-এর যে পূর্বাভাস রয়েছে, সেখানে বোঝাই গেছে এগুলি কেবলই নৃত্যগীতে প্রতিষ্ঠিত নয়। এখন বিচার্য তোটক-এর আকৃতি ও প্রকৃতি।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আসতে হয় *ভাবপ্রকাশন*-এ। এখানে দেখা যায় হর্ষ নামের কোনও এক পূর্বাচার্য বলে গেছেন নাটকেরই একটি বিশেষ ভেদ হ'ল তোটক (ত্রোটক) – "তোটকং নাম তৎপ্রাহুর্ভেদং নাটকসম্ভবম্"[৮৯]। সম্ভব শব্দের অর্থ জন্ম। সুতরাং নাট্যশাস্ত্রমতে নাটকের যা যা লক্ষণ, তার সবই ত্রোটক-এ বর্তমান থাকে। শুধু ব্যতিক্রম বলতে এখানে দিব্য এবং মনুষ্য পাত্র-ই মুখ্য পুরুষ ও স্ত্রী ভূমিকায় থাকে। উদাহরণস্বরূপ তিনি মহাকবি কালিদাসের *বিক্রমোর্বশী*-কে রেখেছেন। এরপরেই *নাটকলক্ষণরত্নকোশ*-এ এর বিতর্ক এবং মীমাংসা। এখানে অশ্মকুট্ট, নখকুট্ট, বাদরায়ণ প্রমুখ পূর্বতন আচার্যদের মতামত উল্লিখিত হয়েছে। অশ্মকুট্ট দিব্য-মনুষ্যের মেলবন্ধনাত্মক নাটকের প্রতি অঙ্কে বিদূষকের উপস্থিতিকেও মান্যতা দিয়েছেন কিন্তু অপর দুই নাট্যতত্ত্ববিদ্ সে প্রসঙ্গ শিরোধার্য করেননি। সাগরনন্দী নিজেও বলেছেন "প্রত্যঙ্কবিদূষকপ্রবেশকস্তূপলক্ষণম্"[৯০]। *বিক্রমোর্বশী*-তে প্রথম এবং চতুর্থ অঙ্কে বিদূষকের চরিত্র অনুপস্থিত। তাই অশ্মকুট্টের মতকে প্রণিধানযোগ্য করলে উক্ত নাটকটি

ত্রোটক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনা। *মেনকানহুষ* নামাঙ্কিত আরও একটি এই জাতীয় নাট্যকলার নির্দশন সেসময়ে চর্চিত বা অভিনীত হ'ত ব'লেই তাকে আদর্শ করার জন্যই হয়ত অশ্মকুট্ট প্রতি অঙ্কে বিদূষকের উপস্থিতিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন যেহেতু সেখানে এটি লক্ষ্য করা যেত ব'লেই সাগরনন্দী জানিয়েছেন। তাই যখন *সাহিত্যদর্পণ*-এর দ্বারে উপনীত হই, তখন সেখানে দেখতে পাওয়া যায় যে নাট্যসন্ধির আলোচনাপ্রসঙ্গে গর্ভসন্ধির অঙ্গের মধ্যে অন্যতম হ'ল ত্রোটক। সেখানে তার সংজ্ঞা হ'ল "ত্রোটকং পুনঃ সংরব্ধবাক্"[৯১]। এর বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় যে রুষ্ট বা ক্রুদ্ধ ব্যক্তির বাক্যকে ত্রোটক বলা হয়। এখন এই সংজ্ঞাটি থেকেই ত্রোটক নামক উপরূপকের উৎপত্তি কিনা তার সঠিক প্রমাণ না থাকলেও একথা স্পষ্ট যে *বিক্রমোর্বশী*-তে উর্বশী অভিশপ্ত হয়েছিল। 'লক্ষ্মীস্বয়ম্বর' নাটকে অভিনয়ের সময় ভুল সংলাপোচ্চারণের ফলে আচার্যদেব তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন। তাই রোষভাষণের ভূমিকাকে ত্রোটক থেকে বহিষ্কৃত করা যায়না। তবে গর্ভসন্ধির এই অঙ্গের সমরূপ নাট্যক্রিয়া অন্যত্রও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ কালিদাসেরই *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের চতুর্থ অঙ্কে ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ নেমে এসেছে শকুন্তলার জীবনে। যেহেতু নামকরণ নিয়ে প্রসঙ্গ উঠছে এবং একমাত্র *বিক্রমোর্বশী* এই রচনাসন্দর্ভটিই বর্তমানে প্রাপ্ত হয়, তাই সেখানে এই লক্ষণটির সুপ্রয়োগ হতে দেখি। বিশ্বনাথ কবিরাজ কিন্তু অশ্মকুট্টের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি প্রতি প্রতি অঙ্গে বিদূষকের উপস্থিতিকে স্বীকার করেছেন – "ত্রোটকং নাম তত্ প্রাহুঃ প্রত্যঙ্কং সবিদূষকম্"[৯২]। তবে তিনি আরও একটি কথা বৃত্তিতে সংযুক্ত করেছেন – "অত্র শৃঙ্গারো'ঙ্গী"[৯৩]। নাটকের লক্ষণেও বীর অথবা শৃঙ্গার রসকেই অঙ্গিরসরূপে স্বীকার করার প্রবণতা ভরতমুনির সময়কাল থেকেই পাওয়া যায়। এখানে আরও স্পষ্ট ক'রে উল্লেখের কারণ একটিই যে বীর কখনওই প্রধান উপজীব্য রস হতে পারেনা। এই নাট্যকলার অঙ্কসংখ্যা নিয়ে *ভাবপ্রকাশন*-এ বলা ছিল যে পঞ্চ, সপ্ত, অষ্ট বা নব সংখ্যক হতে পারে। বিশ্বনাথ কবিরাজ-ও সেই মতকেই হুবহু অনুসরণ করে গেছেন। এরপরে শুভঙ্কর আচার্য ত্রোটক নাট্যধারা নিয়ে আরও কিছু দিকের উল্লেখ করেছেন। যথা –

> তৌটঃ স্তাদিও দিব্যমানুষময়ঃ প্রত্যুল্লসত্ কৈশিকঃ ।
> পঞ্চাষ্টাঙ্কবিনির্মিতঃ স্ফুটকথনস্যোক্ত'বমর্ষেণ ।।
> সর্বাঙ্গঃ খল বিপ্রলম্ভগহনো নানাকলাসুন্দরঃ ।
> খ্যাতঃ ক্ষ্মাপতিনায়কঃ সুললিতঃ ক্রীড়াপ্রমোদাদিভিঃ ।।[৯৪]

এখানে আরও স্পষ্ট হয়ে গেল যে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রস-ই অঙ্গিরস হবে; সম্ভোগ শৃঙ্গার নয়। উর্বশী এবং পুরুরবার মধ্যে চিরমিলনের যে বাসনা তাঁর কিন্তু ওই নাট্যসন্দর্ভে বারংবার কথিত হয়েছে। এছাড়াও এখানে বৃত্তি হবে কৈশিকী। অর্থাৎ আনন্দ, উপভোগ, কামকে, বিলাসব্যসন, শিল্প, নৃত্য, গীত ইত্যাদি ললিত বিষয়ের মূর্ছনা থাকবে। সুতরাং নাটিকা উপরূপকের ম'ত এখানেও মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ এবং উপসংহৃতি বা নির্বহন সন্ধি থাকবে কিন্তু অবমর্শ সন্ধিও নিরুদ্দিষ্ট নয়। যেহেতু তিনিও ত্রোটক-এর নিদর্শনে *বিক্রমোর্বশী*-কেই রেখেছেন; তাই বলাই বাহুল্য তাঁর মতানুযায়ী সেখানে অবমর্শ সন্ধির অবস্থান লক্ষিত হয়নি। এমনকি অঙ্কসংখ্যা নিয়েও তিনি আপন

বক্তব্য রেখেছেন। কেবলমাত্র পাঁচটি বা আটটি অঙ্কের নাট্যরচনা হবে এই ত্রোটক শৈলীর নাট্যধারা এমনটিই দাবি করেছেন। তাই খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর গতিবিধি এবং বিবর্তনের ওপর ভিত্তি ক'রে কয়েকটি স্থায়ী সূচককে ব্যবহার করা যায় ত্রোটক উপরূপকের বৈশিষ্ট্যে। যথা এটি নাটকেরই বিশেষ ও ব্যতিক্রমী রূপ, এটি স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের চরিত্রের সমানুপাতিক মেলবন্ধন, এখানে অভিশাপবচন থাকবে এবং তার প্রভাবেই সুরলোকের চরিত্র মর্ত্যে সাময়িককালের জন্য বাস করবে, এখানে নৃত্য, গীতসহ বিভিন্ন চারুকলার ললিত সুষমা থাকবে, অন্ততপক্ষে পাঁচটি অঙ্ক বা দৃশ্য থাকবেই এবং রস হবে নায়ক-নায়িকার প্রেমকেন্দ্রিক শৃঙ্গার। তাহলে সাগরনন্দীর গ্রন্থখানি ত্রোটক-এর গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করে। যে নাট্যশৈলী সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজের পূর্বাচার্যগণ 'রূপক' ব'লেই মনে করতেন, বিশ্বনাথ তাকেই উপরূপকের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন ।

সাহিত্যদর্পণ-এর পূর্বে খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ দশকে কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতে হবে শুধুমাত্র ইতিহাসের শৃঙ্খলকে অবিভক্ত রাখতেই। এই সময়ে অন্ধ্রদেশীয় আলংকারিক বিদ্যানাথের *প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ* গ্রন্থটি পাওয়া যায়। যদিও এখানে উপরূপকের আলোচনা অনুপলব্ধ তবুও তাঁর দশ রূপক সম্বন্ধে ধারণার তত্ত্বটি লক্ষণীয় – "ভাবাশ্রয়ং তু নৃত্তং স্যাত্ নৃত্যং তাললযান্বিতম্।... এষা দশরূপকোক্তা প্রক্রিয়া।. তেন নাট্যেন দশরূপকানি ভবন্তি।"[৯৫] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নাটকাদি দশরূপক-ই কেবল নাট্যায়িত হয় সহৃদয় সামাজিকের অবস্থানে। এতদ্ব্যতীত যা কিছু পদার্থাভিনয়ে স্ফুট, তা সবই রূপকত্বহীন। এই সময়ের মধ্যে দেখতেই পাওয়া যায় যে উপরূপকগুলি আঁতুড়ঘর থেকে ক্রমশঃ স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে, সেই এমনই সময়ে বিদ্যানাথের এই উক্তি পক্ষান্তরে প্রমাণ করে নৃত্তাকারে রচিত কোনও কাব্যবন্ধের অস্তিত্ব থাকলেও তা দশরূপকের বহির্ভাগেই।

চতুর্দশ শতকের বাগভটের *কাব্যানুশাসন* গ্রন্থটি হেমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি গদ্যপদ্যময়ী কাব্যকে বলেন 'মিশ্রকাব্য' ও তাকেই 'অভিনেয়রূপক' এবং 'গেয়রূপক'-এ বিভাজন করেছেন। এই 'গেয়রূপক'গুলি হ'ল যথাসংখ্য নিয়মে ডোম্বিকা, ভাণ, প্রস্থান, ভাণিকা, প্রেরণ, শিঙ্গক, রামাক্রীড়, হল্লীসক, শ্রীগদিত, রাসক, গোষ্ঠী প্রভৃতি[৯৬]। তিনি এক্ষেত্রে *অভিনবভারতী*-র চিরন্তন বা লোকপ্রসিদ্ধ উক্তি এবং হেমচন্দ্রের অভিমতের বাইরে কোনও অভিনবত্ব যোগ করেননি। তবে 'গেয়' বিশেষণের দ্বারাই একটি রেখা ফুটে ওঠে যে অষ্টাদশ উপরূপকের মধ্যে নাটিকা, প্রকরণিকা, ত্রোটক এবং সট্টক গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্য নয়। বাকিগুলির মধ্যে নৃত্যগীতের পরিবেশ থাকলেও সেগুলি বিশ্বনাথ কবিরাজের সময়ে রূপকের কাছাকাছি এসে পৌঁছালেও উপরিউক্ত চারটি উপরূপকের থেকে অনেকখানি ব্যবধান ছিল ভাবগত ও আদর্শগত দিক থেকে।

১.৪ 'উপরূপক' পদপ্রাপ্তি :

প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই বলা হয়েছিল যে অমৃতানন্দযোগী এবং বিশ্বনাথ কবিরাজের মধ্যে কে পূর্ববর্তী তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাই উপরূপকের তত্ত্ব কার বুদ্ধিজাত সমীক্ষা তার সঠিক ধারণা পাওয়া দুষ্কর। যেহেতু বিশ্বনাথ কবিরাজ সর্বাধিক উপরূপক অঙ্গীকার করেছেন, তাই তিনি এই তত্ত্বের উদ্বোধক না হলেও ব্যাখ্যাতা তো বটেন-ই। তবে অমৃতানন্দযোগীর *অলংকারসংগ্রহ*-ও ব্রাত্য নয় একেবারেই। বিশেষতঃ এই গ্রন্থে

উপরূপগুলির ক্রমিক সজ্জায় একটি বিশেষ মনোভাব ধরা দেয়। তিনি ষোড়শ প্রকার উপরূপের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রেখেছেন যথাক্রমে নাটিকা, সট্টক এবং ত্রোট (ত্রোটক)-কে। পরীক্ষিত তিনটি উপরূপক-ই বাকি গুলির থেকে অধিক জনপ্রিয় এবং এগুলির আকর্ষণক্ষমতা দশরূপকতুল্য। বাকিগুলির ক্ষেত্রে *সাহিত্যদর্পণ*-এর সঙ্গে উল্লেখ্য পার্থক্য না থাকলেও প্রেক্ষণকের লক্ষণে 'গীতনাট্য' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন – "নেপথ্যে গীতনাট্যং চ পরত্রৈব প্রযোজনম্"[৯৭]। সম্ভবতঃ এই শব্দটি 'নাট্যগীতি' শব্দের পরিবর্ত। *সাহিত্যদর্পণ*-এ প্রেঙ্খণ সম্পর্কে বলা হয়েছে – "নেপথ্যে গীযতে নান্দী তথা তত্র প্ররোচনা"[৯৮]। অর্থাৎ নাট্যারম্ভকালেই বিঘ্নবিনাশের জন্য এবং শুভ সমাপ্তির জন্য নান্দীপাঠ করা হ'ত এবং সভা মধ্যে উপস্থিত বিদগ্ধ পণ্ডিতদের নাট্যে আগ্রহ বৃদ্ধির জন্যই যে আবৃত্তি বা গানের অনুষ্ঠান করা হ'ত, তার নাম 'প্ররোচনা'। তাই ভারতী বৃত্ত্যঙ্গ এই প্ররোচনা-কেই অমৃতানন্দযোগী 'গীতনাট্য' বলে সূচিত করতে চেয়েছেন বলেই ধারণা জন্মায়। তবে শব্দের আভিধানিক এবং গূঢ়ার্থ যা-ই হোক না কেন; 'গীতনাট্য' শব্দটির প্রাচীনতার জন্য এই গ্রন্থ অমূল্য সম্পদ।

তাই *সাহিত্যদর্পণ*-এর দিকে দৃষ্টিহেলন করলে দেখা যায় যে তিনি যেমন রূপক-কে গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনই সমগুরুত্ব আরোপ করেছেন উপরূপকের ক্ষেত্রেও। তবে তাঁর আবির্ভাবের প্রাক্কালে যে নাট্যসংরূপগুলিকে কিঞ্চিৎ রূপকের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছিল, সেই অভিনেয়কাব্যগুলিকে তিনি রূপকের মধ্যে গণনা করেননি। মোটামুটি দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই নাটিকা, সট্টক, প্রকরণিকা এবং ত্রোটক রূপকব্যতীত অন্য ধারায় চালিত হয়নি। তবুও বিশ্বনাথ সেগুলিকে উপরূপকের পর্যায়ে স্থান দিয়ে যেন প্রকৃতপক্ষে 'দশরূপক' তত্ত্বকেই সাদর সম্ভাষণ করলেন। দশটির বেশি কোনও অভিনেয় কাব্য-ই যে 'রূপক' হতে পারেনা, তার জন্যই এতগুলি 'উপরূপক'-এর অবস্থান এই গ্রন্থে।

১.৫ উপরূপকে নাটিকা-র প্রাধান্য :

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* থেকে শুরু ক'রে *সংগীতদামোদর* পর্যন্ত যে সমস্ত গ্রন্থগুলি ভারতীয় নাট্যসংস্কৃতির ইতিহাস নথিবদ্ধ করেছে, সেই প্রতিটি গ্রন্থই আলোচিত হয়েছে এবং দেখা গেল যে ত্রোটক, সট্টক এবং প্রকরণিকা গ্রন্থবিশেষে দাক্ষিণ্য লাভ করলেও নাটিকা-ই এমন একটি উপরূপক যাকে কোনও নাট্যজ্ঞ পণ্ডিত নির্বাসনদণ্ড দিয়েছেন। তাই নাটিকার পরিচয় কখনও 'সংকর রূপক' (*দশরূপ*), কখনও 'রূপক' (*কাব্যানুশাসন, নাট্যদর্পণ*), কখনও 'উপরূপ' (*অলংকারসংগ্রহ*) এবং কখনও 'উপরূপক' (*সাহিত্যদর্পণ, সংগীতদামোদর*)। এমনকি *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-এর ম'ত গ্রন্থ যেখানে 'বাক্যার্থাভিনয়' এবং 'পদার্থাভিনয়' সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট, সেখানেও নাটিকা 'বাক্যার্থাভিনয়'-এই স্থান পেয়েছে। এমনকি হেমচন্দ্রের *কাব্যানুশাসন*-মতে সেটি 'গেয়প্রেক্ষ্যকাব্য' নয়; বরং পাঠযোগ্য এবং অভিনয়যোগ্য প্রেক্ষ্যকাব্য। অর্থাৎ শুধুমাত্র অষ্টাদশ উপরূপকের মধ্যেই নয়; প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে নাটিকা একটি বিশেষ অভিনেয় নাট্যশৈলী।

শুধু তাই-ই নয়; দশরূপের ওপর রচিত *অবলোকবৃত্তি* যে গ্রন্থটি নাটকাদি দশপ্রকার রসাশ্রয়ী রূপকের জন্যই প্রবৃত্ত, সেখানেও নাট্যতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ে উদাহরণে *রত্নাবলী* নাটিকার শ্লোক বা গদ্যোক্তি ব্যবহার

করেছে। যেমন বীজের ব্যাখ্যায় ধনিক বলেছেন "যথা রত্নাবল্যাং বৎসরাজস্য রত্নাবলীপ্রাপ্তিহেতুরনুকূলদৈবো যৌগন্ধরাযণব্যাপারো বিষ্কম্ভকে ন্যস্তঃ..."[৯৯]। আবার বিন্দুর ক্ষেত্রেও তিনি *রত্নাবলী*-র উদাহরণ দিয়ে বলেছেন "যথা রত্নাবল্যামবান্তরপ্রযোজনানঙ্গপূজাপরিসমাপ্তৌ কথার্থবিচ্ছেদে সত্যনন্তরকার্যহেতুঃ..."[১০০]। এমনকি পঞ্চ অবস্থা যথা আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি এবং ফলাগমের প্রতিটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য ধনিক পুনর্বার রত্নাবলী নাটিকার সাহায্য গ্রহণ করেছেন[১০১]। পঞ্চসন্ধি এবং সন্ধ্যঙ্গের বিশ্লেষণের জন্যও *অবলোকবৃত্তি*-তে *রত্নাবলী*-র একাধিক গদ্যোক্তি এবং পদ্যোক্তি সমুপস্থিত। যেমন মুখসন্ধির উপক্ষেপ অঙ্গার্থের *রত্নাবলী*-র "দ্বীপাদন্যস্মাদপি..." শ্লোকটি ব্যবহৃত।[১০২] প্রতিমুখ সন্ধির বৃত্তিতে ধনিকের দীর্ঘ বাক্যে বক্তব্য –

যথা রত্নাবল্যাং দ্বিতীযে'ঙ্কে বৎসরাজসাগরিকাসমাগমহেতোরনুরাগবীজস্য প্রথমাঙ্কোপক্ষিপ্তস্য সুসঙ্গতাবিদূষকাভ্যাং জ্ঞাযমানতযা কিঞ্চিল্লক্ষ্যস্য বাসবদত্তযা চ চিত্রফলকবৃত্তান্তেন কিঞ্চিদুন্নীযমানস্য দৃশ্যাদৃশ্যরূপতযোদ্ভেদঃ প্রতিমুখসন্ধিরিতি।[১০৩]

এমনভাবেই গর্ভসন্ধির ক্ষেত্রে *রত্নাবলী*-র তৃতীয় অঙ্ক এবং অবমর্শ সন্ধির ক্ষেত্রে চতুর্থ অঙ্কের কথা বলেছেন বৃত্তিকার[১০৪]। *দশরূপ*-এর দ্বিতীয় প্রকাশ যেটি নায়ক-নায়িকার ভেদ এবং স্বরূপে সরব, সেখানেও *অবলোকবৃত্তি* ধীরললিত নায়কের উদাহরণে *রত্নাবলী* নাটিকার রাজা উদয়নের কথা তুলে ধরেছেন। "রাজ্যং নির্জিতশত্রু..." ইত্যাদি শ্লোকটিই উদয়নের ধীরললিত হওয়ার চিহ্ন ব'লেই স্বীকৃতি দিয়েছেন ধনিক[১০৫]। তৃতীয় প্রকাশে ভারতী বৃত্তির আলোচনাবসরে সেই বৃত্তির প্রথম অঙ্গ প্ররোচনার উদাহরণে ধনিক *রত্নাবলী*-র "শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ" শ্লোকটিকে উপযুক্ত ব'লে মনে করেছেন[১০৬] এবং কথোদ্ঘাত শ্রেণীর প্রস্তাবনাতেও "দ্বীপাদন্যস্মাদপি.." এই শ্লোকটি প্রযোজ্য।[১০৭] অর্থাৎ *রত্নাবলী*-র প্রস্তাবনাটি কথোদ্ঘাত রীতির।

একই বিষয় *সাহিত্যদর্পণ*-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধীরললিত নায়কের প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ কবিরাজের উক্তি "রত্নাবল্যাদৌ বৎসরাজাদিঃ"[১০৮]। সম্ভবতঃ এই 'আদি' শব্দের মাধ্যমে *প্রিয়দর্শিকা* নাটিকারও অন্তর্ভুক্তি হয়ে যায় যেহেতু সেটিরও নায়ক বৎসরাজ উদয়ন। এছাড়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে কথোদ্ঘাত প্রস্তাবনা,[১০৯] পঞ্চ সন্ধি,[১১০] প্রযত্ন[১১১] ইত্যাদি বিষয়ে *রত্নাবলী*-র দ্বারাই উদাহরণ নির্দিষ্ট। পতাকাস্থান প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বলেছেন "যথা রত্নাবল্যাম্ – 'বাসবদত্তেযম্' ইতি যদা রাজা তৎকণ্ঠপাশং মোচযতি তদা তদুক্ত্যা 'সাগরিকেযম্' ইতি। প্রত্যভিজ্ঞায 'কথং প্রিযা মে সাগরিকা' ?"[১১২]। তবে শুধু *রত্নাবলী*-ই নয়; সাহিত্যদর্পণকার তাঁর স্বরচিত *চন্দ্রকলা* নাটিকার কথা তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থেই। ষট্ত্রিংশ প্রকার নাট্যলক্ষণের মধ্যে বিচার, গুণাতিপাত, গুণাতিশয়, সংক্ষেপ ইত্যাদির প্রসঙ্গে *চন্দ্রকলা*-র দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে[১১৩]। আবার এই নাট্যলক্ষণগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধি নামক লক্ষণের উদাহরণে বিশ্বনাথ *বিক্রমোর্বশী* ত্রোটকের "সূর্যচন্দ্রমসৌ... " ইত্যাদি শ্লোকটির নির্বাচন করেছেন[১১৪]।

তবে এই দুটি গ্রন্থে *রত্নাবলী*-র যথেচ্ছ ব্যবহার এটিই প্রমাণ করেনা যে তদানীন্তন সমাজে নাটিকা উপরূপকের মান্যতা এবং গ্রাহ্যতা উৎকৃষ্ট ছিল। যদি গ্রন্থদ্বয়ে *রত্নাবলী* ব্যতীত *প্রিয়দর্শিকা, চন্দ্রকলা* প্রভৃতি অন্যান্য নাটিকা বা উপরূপকের অগণিত ভুক্তি থাকত, তাহলে ভাবা যেত যে রূপকের পাশাপাশি উপরূপক

সংস্কৃতিও সমপর্যায়ের ছিল। বরং এক্ষেত্রে এটিই প্রমাণ করে যে স্বয়ং *রত্নাবলী* নাটিকাটি ছিল নাট্যতত্ত্বে নিখুঁত এবং আদর্শ। তাই *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* বা *বেণীসংহার* নাটকের ম'ত *রত্নাবলী*-ও শাস্ত্রীয় নাট্যতত্ত্বে পূর্ণ থাকার দরুণ *রত্নাবলী* বা একটি নাটিকা তৎকালীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে যথাযোগ্য আসন অধিকার করেছিল। এমনটিও মনে করা যেতে পারে যে *রত্নাবলী* নাটিকার জন্য সামগ্রিকভাবে নাটিকা রূপকের সঙ্গে একাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল *নাট্যদর্পণ*-এর যুগে এবং পরবর্তীতে উপরূপকের মধ্যেও প্রধানতম হয়ে ওঠে। তাই উপরূপকের মধ্যে নাটিকার প্রাধান্য চিরন্তন হলেও এটি বিস্মৃত হলে চলবে না যে এর জন্য শ্রীহর্ষ কবি এবং *রত্নাবলী* নাটিকার অবদান যুগান্তকারী।

তাই দশরূপকের মধ্যে অগণ্য হলেও এর প্রভাব এবং প্রতিপত্তিকে সমাজ এবং শাস্ত্র কোনওদিক থেকেই ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। এমনকি বর্তমান সময়ে সাধারণ জনমানসে 'নাটিকা' শব্দটি যতখানি প্রসিদ্ধ, তার তুলনায় বাকি সপ্তদশ উপরূপকের নামগুলিও অজ্ঞাতসারে উচ্চারিত হয়না। তাই এই শব্দটিও যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছে একথা অনস্বীকার্য।

১.৬ উপরূপকের ক্রমবিবর্তনের কালবিভাজন :

উপরূপকের উৎপত্তি থেকে কালানুক্রমিক বিবর্তনের যাত্রাপথে অধ্যাপক ড. কল্পিকা মুখোপাধ্যায়ের মতটিকে স্মরণ করতে হয়। প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যে সঙ্গীত গ্রন্থের উপসংহার অংশে তিনি বলেছেন –

সত্য, সংস্কৃত নাট্যে গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় একটি গীত পরিবেশ। তারপরও আবার গীতের আধানকে অতিরিক্ত মনে হওয়া অসম্ভব নয়।... এইভাবে কণ্ঠের বিচিত্র স্বর, গতির ছন্দোময় ভঙ্গী, নানা প্রকার সঙ্গীতের বহুল প্রয়োগ কমে সংস্কৃত নাট্যকে করে তুলেছিল বর্তমান অপেরা জাতীয় অনুষ্ঠান। এতে মূল রূপকগুলির ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা করা যাচ্ছিল না। হয়তো তাই ভরতের অব্যবহিত পর থেকেই মূল রূপকগুলিতে সঙ্গীতের প্রয়োগের বাহুল্যকে বর্জন করার একটি প্রয়াস চলছিল।

কিন্তু সেই অভাব পূরণ করা হয়েছে উপরূপকগুলির মাধ্যমে। সঙ্গীতময় একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে দর্শকদের আনন্দ দেওয়াই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য।[১১৫]

সুতরাং অধ্যাপক ড. মুখোপাধ্যায়-ও স্বীকৃতি দিয়েছেন যে উপরূপক দশরূপকের পরবর্তী সময়ে একটি বিশেষ প্রয়োজনে উদ্ভাবিত হয়েছিল। তিনি উপরূপকের বিকাশের জন্য সংগীতের সহায়তাকে পূর্ণমাত্রায় প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাহলে উপরূপকের এই যাত্রাপথের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্যের বিশ্লেষণপূর্বক একে চারটি কালে পর্যায়ক্রমিকভাবে বণ্টন করা যায়। সেগুলি নিম্নলিখিত।

- ❖ **উদয় কাল :** এই পর্বে রূপক থেকে অস্পৃশ্য নাটিকা এবং কয়েকটি ভাবপ্রকাশক নৃত্য বা নৃত্তাত্মক প্রৰন্ধ। একটি বিষয়কে কেন্দ্রে রেখে অথবা দেবতাদির বন্দনাসুলভ কয়েকটি প্রযোজনা। এখানে

ভরতমুনি, ধনঞ্জয়, অভিনবগুপ্তপাদ এবং ধনিক উল্লেখযোগ্য। সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকে আনুমানিক খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

- **উন্মেষ কাল :** এই পর্বে বাক্যার্থাভিনয়ে দশরূপক প্রসিদ্ধ এবং তারই সমান্তরাল সরলরেখায় কয়েকটি পদার্থাভিনয়াত্মক দৃশ্যায়ন চলমান । নৃত্যের শৈশবাবস্থা কাটিয়ে এখানে বয়ঃসন্ধি দশায় কিছু ইতিবৃত্তের সংগ্রহ করেছে নৃত্যগুলি। এখানে কাণ্ডারীগণ হলেন ভোজদেব, হেমচন্দ্র এবং শারদাতনয়। সময়কাল খ্রিস্টিয় একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।
- **বিকাশ কাল :** এই পর্যায়ে নাটিকা, প্রকরণী, ত্রোটক, সট্টক ইত্যাদি যেমন কখনও কখনও 'রূপক'-এ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তেমনই নৃত্যগুলি গানকে সঙ্গে নিয়েই ইতিবৃত্তের মিত্রতায় 'স্বল্পমাত্ররঞ্জনক্ষম' গৌণ রূপকে মর্যাদালাভ করছে। রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র, সাগরনন্দী, বাগ্‌ভট এখানে মন্ত্রক। খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর স্থিতিকাল।
- **সমৃদ্ধি কাল :** এই পর্বেই শাস্ত্রনির্দেশ মতে নাট্যলক্ষণে অবগাহন ক'রে 'উপরূপক' রূপে ভারতীয় শিল্প-ইতিহাসে স্থানলাভ ঘটেছে। এখানে অমৃতানন্দযোগী, বিশ্বনাথ কবিরাজ ও শুভঙ্কর প্রধানভাবে ভারপ্রাপ্ত আচার্য। প্রধানতঃ খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর সময়কাল। এই পর্বের শেষেই শাস্ত্রীয় পরিধি থেকে উপরূপক উপেক্ষিত হতে থেকে পরিশেষে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। এই পর্ব-ই উপরূপকের সমৃদ্ধির সময়।

খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতকের পরেও সংস্কৃত ভাষায় কিছু উপরূপক (*দানকেলিকৌমুদী* ভাণিকা – ষোড়শ শতাব্দী, *শৃঙ্গারমঞ্জরী* সট্টক – আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দী, *পার্থপাথেয়* উল্লাপ্য – বিংশ শতাব্দী, *বিরাজ-সরোজিনী* নাটিকা – বিংশ শতাব্দী, *বিজয়াঙ্কা* প্রেক্ষণক – বিংশ শতাব্দী) রচিত হয়েছে কিন্তু যেহেতু *সংগীতদামোদর*-এর উত্তরকালে কোনও শাস্ত্রগ্রন্থে উপরূপকের বিশেষ উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়না; তাই এর পরবর্তী যুগে উপরূপকের অবস্থান কীরূপ; তা এখানে বিচার্য নয়।

১.৭ রূপক এবং উপরূপকের দ্বন্দ্ব :

বিশ্বনাথ যতগুলি অভিনেয়কাব্যকে গ্রহণ করেছেন, তার প্রত্যেকটিই সেই সময় বস্তু-নেতা-রস ছাড়াও অঙ্ক, সন্ধি, বৃত্তি এই নিয়মে দৃঢ় ছিল। তার ফলে রূপকের লক্ষণের সঙ্গে এগুলির লক্ষণ পাঠ করলেই রূপক এবং উপরূপকের মধ্যে তাত্ত্বিক দিক থেকে বিশেষ প্রভিন্নতা লক্ষ্যগোচর হয়না। প্রতিটি রূপক যেমন প্রসিদ্ধ কাহিনিকে অনুসরণ ক'রে রচিত নয় (যথা প্রকরণ, ভাণ, প্রহসন) তেমনই প্রতিটি উপরূপক-ও কবিকল্পিত বিষয়ের বুনটে গড়া নয় (যথা ত্রোটক, উল্লাপ্য, প্রেঙ্খণ, শ্রীগদিত)। আবার বীর বা শৃঙ্গার ব্যতিরিক্ত হাস্যরসপ্রধান রূপক হ'ল প্রহসন। অন্যদিকে নাটকবৎ শৃঙ্গার রস উপজীব্য এমন উপরূপকের মধ্যে গোষ্ঠী, বিলাসিকা ইত্যাদিকে উল্লেখ করা যায়। অনধিক পাঁচ অঙ্কের রূপকগুলি হ'ল সমবকার, ভাণ, ব্যায়োগ, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী এবং প্রহসন। একইভাবে পঞ্চাঙ্ক উপরূপকের মধ্যে ত্রোটক উল্লেখনীয়। এমনকি লাস্যাঙ্গ-এর ম'ত ব্যবহার রূপক এবং

উপরূপক দুটি ধারাই ব্যবহার করতে পারে। যথা ভাণ এবং নাট্যরাসক। একারণে অধ্যাপক ড. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় *ভারতীয় নাট্যবেদ এবং বাংলা নাটক* গ্রন্থে বলেছেন –

...'উপরূপক' শব্দের অর্থ 'রূপকের নিকটবর্তি' অর্থাৎ 'রূপক সদৃশ'। অর্থাৎ ইহারা ঠিক 'রূপক' নয়, রূপক অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্রতা কিসে, আকারে না উৎকর্ষে ? আকৃতিগত ক্ষুদ্রতাই যদি রূপক ও উপরূপকের মধ্যে পার্থক্যের হেতু, তবে বীথী, ব্যায়োগ, অংক, ভাণ প্রভৃতি একাংক রূপকগুলির উপরূপক সংজ্ঞা এবং উক্ত 'একাংকিকা'গুলি অপেক্ষা বৃহত্তর নাটিকা, ত্রোটক, সট্টক, প্রকরণিকা প্রভৃতির 'রূপক' সংজ্ঞা হওয়া উচিত। যদি উৎকর্ষ বা গুণগত ক্ষুদ্রতাই উপরূপকত্বের কারণ হয়, তবে ভাণ, প্রহসন প্রভৃতি নিকৃষ্ট দৃশ্যকাব্যগুলিকে কোণ প্রকারেই 'রূপক' বলা চলেনা, পক্ষান্তরে নাটিকা, ত্রোটক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উপরূপকগুলির রূপকগোষ্ঠীতেই স্থান হওয়া উচিত।"[১১৬]

সুতরাং উক্ত গবেষক ড. মুখোপাধ্যায়-ও নাটিকা, প্রকরণিকা, সট্টক এবং ত্রোটক-এর ব্যাপারে বিশ্বনাথ কবিরাজের সিদ্ধান্তে নিশ্চিন্ত নন। তাই এই চারটিকে উপরূপকের প্রথম সারিতরে রাখতেই পারা যায় গুণগত উৎকর্ষতার নিরীখে।

অতএব *সাহিত্যদর্পণ* কারিকারচনার মাধ্যমে দুটি পৃথক তত্ত্বের মাধ্যমে যে নাট্যপন্থার দু'টি পথ প্রদর্শন করতে পেরেছেন এমনটি নয়। হয়ত কিছু সম্ভোগশৃঙ্গারাশ্রিত উপরূপকের মধ্যে তাল, লয়, গান, বাদ্যের ব্যবহার বেশি কিন্তু একেবারে গীতশূন্য যে নাটক নয়, তার উদাহরণ *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*। উপস্থাপনার আঙ্গিক এবং সহৃদয়ের রুচি অনুযায়ী এগুলির প্রয়োগ প্রচলিত থাকলেও তিনি উপরূপকের কোনও সংজ্ঞা বা লক্ষণ উদ্দেশ না থাকার দরুণ কিছু জটিলতার অবকাশ রয়েই গেছে। আধুনিক কালের গবেষকদের মতে এগুলি 'গীতিনাট্য' নাকি 'নৃত্যনাট্য'-এর অঙ্কুরোদগম কাল এরও জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ নেই।

১.৮ রূপক এবং উপরূপকের পার্থক্য :

খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতকে *সাহিত্যদর্পণ*-এর পরবর্তী কালে উপরূপকের নাম এবং তাদের চরিত্র আলোচিত হয় আরও একটি গ্রন্থে। সেটি হ'ল শুভঙ্করের *সংগীতদামোদর*। এটিই বোধহয় শেষ গ্রন্থ যেখানে এই পারম্পর্যে ইতি টানা হয়। এই গ্রন্থের চতুর্থ স্তবকে সপ্তদশ উপরূপক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে প্রকরণিকা-র অবলুপ্তি ঘটেছে এবং 'সট্টক' নামের পরিবর্তন ক'রে 'শাটক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই দুটি দিক ছাড়া বাকি সবকিছুই বিশ্বনাথ কবিরাজের সংবিধানকেই অনুসরণ ক'রে গেছে। রূপক এবং উপরূপকের পার্থক্য বাচ্য না হয়ে ধ্বনিত হয়েছে। রূপক সম্পর্কে বলা হয়েছে –

গোপীভিঃ সমুচ্চকৈঃ সমবকারে দেবকীনন্দনঃ ।
সো'পীত্থং দশরূপকে দশতনুঃ ক্রীড়াং জিহীতে'ধিকাম ।।[১১৭]

বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় সমবকার নামক রূপকে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ সমৃদ্ধভাবে অভিনয় করেন। এইভাবেই দশটি রূপকের ন্যায় দশটি রূপে প্রকটিত হয়ে তিনি ক্রীড়া বা লীলাবিলাস করতে ইচ্ছুক। *সংগীতদামোদর*-এর পূর্বোক্ত ৪/৫০১ নং কারিকার বাংলা ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায় যে ত্রোটকাদি সপ্তদশ উপরূপকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার সময় শ্রীকৃষ্ণ মৃগনয়না গোপিনীদের অত্যন্ত দান করেন।

তাহলে শ্রীকৃষ্ণ নাটকাদি দশরূপকে অভিনয় করলে তার বিভিন্ন লীলার প্রকাশ ঘটে। কখনও গোপিনীদের সঙ্গে মধুরলীলায় শৃঙ্গার রসের প্রকাশ ঘটে, পুতনাবধে রৌদ্র রস এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনকে গীতামৃতের উপদেশদানকালে অর্জুনের মধ্যে শৌর্যবীর্যের ভাবোদ্রেকের প্রচেষ্টায় বীররস, বিশ্বরূপদর্শনের সময় অদ্ভুত রস ইত্যাদি। অর্থাৎ এই রূপকগুলি রসের ভাণ্ড; তারই ধারক যেন শ্রীকৃষ্ণ। অথচ উপরূপকের অভিনয়ে সেই দেবকীনন্দনের উদ্দেশ্য বৃন্দাবনের গোপিনীদের আনন্দদান। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* নাট্যের উদ্দেশ্য দু'টিভাবে জানিয়েছেন – "লোকোপদেশজননং লোকে নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি"[১১৮] এবং "বিনোদজননং লোকে নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি"[১১৯]।

অর্থাৎ একদিকে যেমন লোকশিক্ষার বাহক এই নাট্যসাহিত্য, তেমনই আনন্দের ফল্গুধারাও বিপুল স্রোতে বয়ে চলে নাট্যদর্শনে। উপরূপকগুলি যে কেবলমাত্র সহৃদয়ের রুচি, অভ্যাস ও পছন্দ অনুযায়ী লঘু পদ্ধতিতে মনোরঞ্জন-ই করতে পারে তারই বাচক এই কারিকা। নাট্যরাসক, বিলাসিকা, প্রস্থান-এর আদর্শ গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। তবুও সেই সব রচয়িতাদের প্রতি যথাপূর্বক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ক'রেই বলতে হয় যে এই ধরণের প্রযোজনার মধ্যে সমাজশিক্ষা, জনসচেতনতার বার্তার কিঞ্চিৎ হলেও হয়ত অভাব ছিল। কালিদাসের *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটক যে নীতিগত শিক্ষা দিয়ে যায় প্রতি পদে পদে, সেই একই গৌরব কি *বিক্রমোর্বশী* বহন করতে পারে ? বিরহতাপিত দম্পতির মানস উন্নয়ন এবং দেহজ কামের পরিবর্তে রূপরসস্পর্শহীন প্রেমের স্তরে উন্নীত হওয়া ছাড়াও কর্তব্যকর্মে অবহেলা না করা, পিতার কন্যার প্রতি সদুপদেশ, আশ্রমজীবনের নমনীয়তা, রাজার ধর্ম রাজ্যরক্ষা, মাতার প্রতি আজ্ঞাপালন ইত্যাদির একত্র সমাবেশ ঘটেছে এই নাটকে। অন্যদিকে উর্বশীও দায়িত্বে অবহেলা করায় শাপিত হয়েছে কিন্তু সেই শাপ তার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হয়েছে। এটি ত্রোটক কিনা তা নিয়ে বাদানুবাদ চললেও উপরূপকের মধ্যে যে অন্তর্ভাব হওয়াই উচিত তার যুক্তি *সংগীতদামোদর*-এর বক্তব্য।

তাই *সাহিত্যদর্পণ*-এ যে শূন্যস্থান রয়ে গেছিল, তারই পূরণ কিছুটা হলেও শুভঙ্কর করতে চেষ্টা করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলার উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। এই নাট্যসাহিত্য আমোদপ্রমোদের ব্যাঘাত ঘটায়নি। পুরুরবা ও উর্বশীর জীবনে বাধা বা প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন নীতিশিক্ষার ভারও এটি বহন করেনা। তাই বৈদিক সূক্ত অবলম্বনে রচিত হলেও এবং সর্বোপরি সেটি মহাকবি কালিদাসের রচনা হলেও সেটি কালিদাসের তুরীয় স্তরের রচনা নয়। এটির ফল মনোরঞ্জন ও রসাস্বাদন ঘটানো। তাই উপরূপকের যে দীর্ঘ প্রলম্বিত যাত্রা যা একদিন ভাবপ্রধান নৃত্য থেকে শুরু, তা-ই স্থান-কাল-পাত্রের ঔচিত্যে পরিমার্জিত এবং সংস্কৃত হয়ে একটি এমন অবয়ব

ধারণ করে যা 'নাট্য'। নৃত্যগীত তথা নিজের স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব না ক'রেই তার অভীষ্টপূরণ এবং নতুন পরিচিতির লাভ – 'উপরূপক'।

১.৯ উপরূপককারের অভিধায় উপরূপক :

রূপক এবং উপরূপকের যে পার্থক্য *সংগীতদামোদর*-এর ম'ত লক্ষণগ্রন্থ উপস্থাপন করেছে, তা যেমন স্বচ্ছ; তেমনই অন্যদিকে উপরূপককার যথা মহাকবি কালিদাস, শ্রীহর্ষ, রাজশেখর ইত্যাদি প্রাচীন উপরূপককার যাঁরা ত্রোটক, নাটিকা, সট্টকের ম'ত উপরূপকরচনা করেছিলেন, তাঁরাও রূপক-উপরূপকের ভেদকে সচেতনভাবেই তাঁদের নাট্যরচনায় প্রাধান্য দিয়েছিলেন কি ? এই প্রশ্নটির উত্তর নিরূপণ আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে নাতিদীর্ঘ আলোচনাটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ এমন ধরণের উপরূপককার যিনি বা যাঁরা রূপক এবং উপরূপক উভয় প্রকার নাট্যরচনা করেছেন; যথা মহাকবি কালিদাস এবং দ্বিতীয়তঃ এমন ধরণের উপরূপককার যিনি বা যাঁরা উপরূপক রচনা-ও করেছেন এবং রূপক-উপরূপকের ভেদাভেদ প্রতিষ্ঠা করেছেন শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে; যথা বিশ্বনাথ কবিরাজ। উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেছে যে পদার্থাভিনয়রূপী নাট্যতত্ত্বের আবির্ভাবকাল খ্রিস্টিয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ। ভোজদেব এবং শারদাতনয়ের সময়েই এই তত্ত্বটি উন্মেষিত হয়েছে। তবে নাটিকা, ত্রোটক, সট্টক এই তিনটিই 'উপরূপক' *সাহিত্যদর্পণ*-এর দৃষ্টিতে। রূপগোস্বামীর *দানকেলিকৌমুদী* খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতকের রচনা। তাই নাট্যকার *সাহিত্যদর্পণ*-এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত উপরূপকগুলির উদাহরণে রয়েছে *রত্নাবলী*[১২০], *বিক্রমোর্বশী*[১২১] এবং *কর্পূরমঞ্জরী*[১২২] যা বিশ্বনাথ কবিরাজ তথা ভোজদেবের-ও পূর্ববর্তী। যেহেতু ভরতোক্ত *নাট্যশাস্ত্র*-এর লগ্ন থেকেই নাটিকা রূপকের সম্মান থেকে বঞ্চিত এবং পরিশেষে *সাহিত্যদর্পণ*-এ উপরূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে; তাই কবি শ্রীহর্ষ কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে তার রচনা করেছিলেন এবং তাঁর দাবি কী ছিল, তা বোঝা যায়না। তবে এই গবেষণা সন্দর্ভের চতুর্থ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে যথাক্রমে নাটিকা এবং ত্রোটকের বিশদ আলোচনায় সেই উত্তর নিরূপিত হবে জিজ্ঞাসু পাঠকের জন্যই। উপরূপকগুলির রচনাশৈলী এবং অভিনেয় দিকগুলির প্রকাশভঙ্গিমার দ্বারা তা নির্ণীত হলেই এই উত্তর পাওয়া যাবে যে উক্ত উপরূপককারগণ তাঁদের রচিত নাট্য (উপরূপক)-গুলিকে সমকালীন রূপকজাতীয় বৈশিষ্ট্যের থেকে কীভাবে পৃথক করতে চেয়েছিলেন। বিশেষতঃ মহাকবি কালিদাস এমনই একজন ব্যক্তি যিনি একাধারে রূপক (নাটক) এবং উপরূপক (ত্রোটক) রচনা করেছেন। সুতরাং *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* এবং *বিক্রমোর্বশী*-র মধ্যে আভ্যন্তরীণ দিকগুলির পর্যালোচনায় বোঝা যাবে দুটি নাট্যরচনার মধ্যে দ্বৈবিধ্য বর্তমান কিনা। একই বিষয় বিশ্বনাথ কবিরাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যে তিনি *সাহিত্যদর্পণ*-এর পাশাপাশি *চন্দ্রকলা* নামক নাটিকা-র প্রণেতা। তাই যিনি রূপক এবং উপরূপক এই দুই জাতিভেদ দেখিয়েছেন, সুতরাং তাঁর রচিত নাটিকাতেও এমন কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত যা রূপকের রূপকল্পের সঙ্গে মিলিত হবেনা। তাই এই বিষয়টিও চতুর্থ অধ্যায়ের উপযুক্ত স্থানেই পরিষ্কৃত হবে। তাই *রত্নাবলী*, *প্রিয়দর্শিকা*, *বিক্রমোর্বশী*-র ম'ত রচনাগুলি যেভাবে

এবং যে নাট্যপদ্ধতিকে মেনেই রচিত হোক না কেন; *সাহিত্যদর্পণ*-এর মতকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে সেগুলিকে উপরূপকরূপেই মান্যতা দেওয়া হবে এই শোধপত্রে।

অর্থাৎ এই প্রথম অধ্যায়টি গবেষণার প্রারম্ভিক পর্ব। এখান থেকে যে বিষয়গুলি গবেষণার আকারে উঠে এসেছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা যাক।

- প্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় নাট্যরচনার ধারা অব্যাহত থেকেছে। সেই নাট্যরচনাগুলি নাট্যবস্তু, অঙ্গিরসের সমান্তরালে পরিবেশনকৌশলেও ক্রমাগত অভিনবত্ব দান করেছে।
- নাট্যকারগণ তাঁদের নাট্যকৃতিগুলির শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন না হলেও নাট্যশাস্ত্রকারগণ সেই বিষয়ে মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন যার ফলস্বরূপ 'রূপক এবং 'উপরূপক' এই দুটি পৃথক ধারা বা প্রস্থানের জন্ম হয়েছে।
- 'উপরূপক' শব্দের ব্যবহার খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ দেখা গেলেও দশপ্রকার 'রূপক'-এর অতিরিক্ত নৃত্যাশ্রয়ী পদার্থাভিনয়মূলক আরও একপ্রকার অভিনেয় কলারও আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তা ক্রমেই যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাও অজ্ঞাত থাকেনি।
- 'রূপক' এবং 'উপরূপক'-এর সম্পূর্ণ বিভাজন বিশ্বনাথ কবিরাজ কর্তৃক সম্পন্ন হলেও উভয়ের মধ্যে রস এবং ভাবগত উপস্থাপনরীতির বৈসাদৃশ্য তুলে ধরেছেন শুভঙ্কর।

তবে এই অধ্যায়ে উপরূপক সম্পর্কিত গ্রন্থপাঠ এবং সমীক্ষামূলক তথ্য-ই প্রদত্ত হয়েছে কালানুক্রমিকভাবে। তবে উপরূপকের তত্ত্ব আপাততঃ উপস্থাপিত হয়নি। কেন 'উপরূপক' ? এই প্রশ্নের জন্যই পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশ করা আবশ্যক। সুতরাং প্রথম অধ্যায়টিকে একপ্রকার তথ্যপ্রধান উপন্যাস বা গ্রন্থনা বলা হ'লে দ্বিতীয় অধ্যায়টি হওয়া উচিত তত্ত্বপ্রধান।

উল্লেখপঞ্জি

১. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৪-৬, পৃষ্ঠা - ২৮৮

২. *Alamkārasaṃgraha of Amṛtānandayogin*, সম্পাদক – V. Krishnamacharya এবং K. Ramachandra Sarma, Introduction, পৃষ্ঠা - ৩৪

৩. *Studies in the History of Sanskrit Poetics : Vol. I*, Chapter XXIX : Minor Writers on Alamkara, পৃষ্ঠা - ২৮৫

৪. *Alamkārasaṃgraha of Amṛtānandayogin,* সম্পাদক – V. Krishnamacharya এবং K. Ramachandra Sarma, ৯/২-৪, পৃষ্ঠা - ১৩১

৫. *সংগীত দামোদর,* সম্পাদক – মহুয়া মুখোপাধ্যায়, ৪/৫০১, পৃষ্ঠা - ১৭৯

৬. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol. I,* সম্পাদক – M. Ramkrishna Kavi, ১/১৫, পৃষ্ঠা ১৩

৭. *তদেব,* ১৮/২-৩, পৃষ্ঠা - ৪০৭

৮. *তদেব*, ১৮/৫৮, পৃষ্ঠা - ৪৩৫

৯. *আদ্যাচার্য ভামহবিরচিত কাব্যালঙ্কার*, সম্পাদক – রামানন্দ শর্মা, ১/২৪, পৃষ্ঠা - ২৮

১০. *Daśarūpam with Dhanika's Commentary,* সম্পাদক – F E Hall, ১/৭ – এর *অবলোকবৃত্তি*, পৃষ্ঠা - ১২৭

১১. *তদেব*, পৃষ্ঠা - ৪

১২. *তদেব*, পৃষ্ঠা - ১২৮

১৩. *তদেব*, ১/৭, পৃষ্ঠা - ৩-৪

১৪. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol. II*, সম্পাদক – M. Ramkrishna Kavi, পুনঃসম্পাদক – V. M. Kulkarni ও Tapasvi Nandi, ৮/৮, পৃষ্ঠা - ২

১৫. *তদেব*, ১/১৭, পৃষ্ঠা - ১৪

১৬. *Daśarūpam with Dhanika's Commentary*, সম্পাদক - F E Hall, ১/৮, পৃষ্ঠা - ৪-৫

১৭. *শ্রীনন্দিকেশ্বর বিরচিত অভিনয়দর্পণ*, সম্পাদক – হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শ্লোকসংখ্যা ১৪, পৃষ্ঠা - ১২

১৮. *Nartananirnaya of Puṇḍarīkaviṭṭhala*, সম্পাদক – মন্দাক্রান্তা বোস, ৪/৫-৬, পৃষ্ঠা - ৩০২

১৯. *Saṅgītaratnākara of Śārṅgadeva : with Kalānidhi of Kallinatha and Sudhākara of Siṃhabhūpala,* সম্পাদক – S. Subrahamanya Sastri, ৭/৩১, পৃষ্ঠা - ১৪

২০. *তদেব*, ৭/৩১ – *সুধাকর*, পৃষ্ঠা - ১৪

২১. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol. I*, সম্পাদক – M. Ramkrishna Kavi, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ২৭২

২২. Daśarūpam with Dhanika's Commentary, সম্পাদক - F E Hall, ১/৮-এর অবলোকবৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৪

২৩. *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ : মহাকবি -শ্রীকালিদাসপ্রণীতম্*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ১/২০, পৃষ্ঠা - ৪৫

২৪. *Daśarūpam with Dhanika's Commentary,* সম্পাদক – F E Hall, ১/৯ – এর অবলোকবৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৪-৫

২৫. *The Treatise on the Great Virtue of Wisdom of Nāgārjuna (Mahāprajñāpāramitāśāstra) : Vol II Chapter XVI-XXX*, অনুবাদক – Gelongma Karma Migme Chodron, উনবিংশ অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ৫৩৪

২৬. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol. II,* সম্পাদক – (প্রয়াত) M. Ramkrishna Kavi, পুনঃসম্পাদক – V. M. Kulkarni ও Tapasvi Nandi, ১৮/১০৯-১১০, পৃষ্ঠা - ৫৪০

২৭. *তদেব*, ১৮/৩ - *অভিনবভারতী*, পৃষ্ঠা - ৪০৮

২৮. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol I,* সম্পাদক – M. Ramkrishna Kavi, , ৪/২৬৮ – *অভিনবভারতী*, পৃষ্ঠা - ১৮১

২৯. তত্রৈব

৩০. *আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য-প্রণীতধ্বন্যালোক ও আচার্য্য অভিনবগুপ্ত-বিরচিত লোচন*, অনুবাদক – সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য, ১/১, পৃষ্ঠা - ১

৩১. *শৃঙ্গারপ্রকাশঃ [সাহিত্যপ্রকাশঃ] : প্রথম ভাগঃ [১-১৪ প্রকাশঃ]*, সম্পাদক – রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী ও সদাশিবকুমার দ্বিবেদী, পৃষ্ঠা - ৬৬০-৭২

৩২. *তদেব*, পৃষ্ঠা - ৬৬৮-৬৯

৩৩. *তদেব*, ১১/২৬৯, পৃষ্ঠা - ৬৬৯

৩৪. *তদেব*, ১১/২৭১, পৃষ্ঠা - ৬৬৯

৩৫. *তদেব*, ১১/২৭৩, পৃষ্ঠা - ৬৬৯

৩৬. *তদেব,* ১১/২৮০-৩২৮, পৃষ্ঠা - ৬৬৮-৭২

৩৭. *তদেব,* ১১/৩১০, পৃষ্ঠা - ৬৭১

৩৮. *তদেব,* ১১/২৮৮-৮৯, পৃষ্ঠা - ৬৬৯

৩৯. *তদেব,* ১১/২৮৫, পৃষ্ঠা - ৬৬৯

৪০. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol. ,* সম্পাদক – M. Ramkrishna Kavi, ৪/২৬৮ - *অভিনবভারতী,* পৃষ্ঠা - ১৮১

৪১. *শৃঙ্গারপ্রকাশঃ [সাহিত্যপ্রকাশঃ] : প্রথম ভাগঃ [১-১৪ প্রকাশঃ],* সম্পাদক – রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী ও সদাশিবকুমার দ্বিবেদী, ১১/৩০৯, পৃষ্ঠা - ৬৭১

৪২. *The Saraswatīkaṇthābharaṇa by Dhāreshvara Bhojadeva : with commentaries of Rāmsina (I-III) and Jagaddgara,* সম্পাদক – পণ্ডিত কেদারনাথ শর্মা ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পাঁণশিকর, ২/১৪২-৪৩, পৃষ্ঠা - ৩০৭-০৯

৪৩. *শ্রীদণ্ডাচার্য্যবিরচিতঃ কাব্যাদর্শঃ,* সম্পাদক – চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়, ১/৩৯-এর টীকা, পৃষ্ঠা - ১০৩

৪৪. *তাল-অভিধান,* পৃষ্ঠা - ১২

৪৫. *Mālavikāgnimitra of Kālidāsa : with the commentary of Kātayavema,* সম্পাদক – কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব, প্রস্তাবনার পরবর্তী বিষ্কম্ভকাংশ, পৃষ্ঠা - ৩-৪

৪৬. *হরিবংশপুরাণ : হিন্দিটীকাসহিত,* ২/৮৯/৬৭, পৃষ্ঠা - ৭২০

৪৭. *তদেব,* ২/৮৯/৬৮, পৃষ্ঠা - ২৭০

৪৮. *তদেব,* ২/৮৯/৬৯, পৃষ্ঠা - ২৭০

৪৯. *The Ratnavalī of Śrīharsha-deva*, সম্পাদক – M. R. Kale, ১/১৩-১৫, পৃষ্ঠা - ১৪

৫০. *Bhāvaprakāśana of Sāradātanaya,* সম্পাদক – Yaduraja Yatigiri Swami ও K. S. Ramaswami Sastri, ১/১৪, পৃষ্ঠা - ২

৫১. *তদেব,* ৮/৭, পৃষ্ঠা - ২২১

৫২. *তদেব,* ৮/৬, পৃষ্ঠা - ২২১

৫৩. *তদেব,* ৮/৩-৫, পৃষ্ঠা - ২২১

৫৪. *তদেব,* ৯/৫-৭, পৃষ্ঠা - ২৫৫

৫৫. *তদেব,* ৯/৮, পৃষ্ঠা - ২৫৫

৫৬. *Studies in the History of Sanskrit Poetics : Vol. 1,* XXV : Later Writers on Rasa, পৃষ্ঠা - ২৪২

৫৭. *Bhāvaprakāśana of Sāradātanaya,* সম্পাদক – Yaduraja Yatigiri Swami ও K. S. Ramaswami Sastri, পৃষ্ঠা ২৫৬-৬৯

৫৮. *তদেব,* পৃষ্ঠা ২৬২

৫৯. *শৃঙ্গারপ্রকাশঃ [সাহিত্যপ্রকাশঃ] : প্রথম ভাগঃ [১-১৪ প্রকাশঃ],* সম্পাদক – রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী ও সদাশিবকুমার দ্বিবেদী, ১১/৩০৮, পৃষ্ঠা - ৬৭১

৬০. *শ্রীমদ্ভাগবতম্ : দশমস্কন্ধমাত্রম (পূর্ব্বার্দ্ধ) শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম,* সম্পাদক – ত্রিদণ্ডীস্বামী-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজ, ১০/১০/১-৪৩, পৃষ্ঠা - ২১৯-৩৪

৬১. *Bhāvaprakāśana of Sāradātanaya,* সম্পাদক – Yaduraja Yatigiri Swami ও K. S. Ramaswami Sastri, পৃষ্ঠা - ২৬৬-৬৭

৬২. *তদেব,* ৯/২৬-৩২, পৃষ্ঠা - ২৫৭

৬৩. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৩০৮-১২, পৃষ্ঠা - ৪২০-২১

৬৪. *শৃঙ্গারপ্রকাশঃ [সাহিত্যপ্রকাশঃ] : প্রথম ভাগঃ [১-১৪ প্রকাশঃ]*, সম্পাদক – রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী ও সদাশিবকুমার দ্বিবেদী, ১১/৩০৩, পৃষ্ঠা - ৬৭০

৬৫. *Bhāvaprakāśana of Sāradātanaya*, সম্পাদক – Yaduraja Yatigiri Swami ও K. S. Ramaswami Sastri, পৃষ্ঠা - ২৬৩

৬৬. *তদেব*, ৯/১৩৯-৪২, পৃষ্ঠা - ২৬৮

৬৭. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/, পৃষ্ঠা - ৪১৪

৬৮. *তদেব*, ৬/৬, পৃষ্ঠা - ২৮৮

৬৯. *Studies in the History of Sanskrit Poetics : Vol. 1*, XIX : Hemacandra and the Vagbhatas, পৃষ্ঠা - ২০৪

৭০. *Kāvyānuśāsanam of Acharya Hemacandra,* সম্পাদক – রামানন্দ শর্মা, ৮/২, পৃষ্ঠা - ৬৪১

৭১. *তদেব*, ৮/৩, পৃষ্ঠা - ৬৪২

৭২. *তদেব*, ৮/৪, পৃষ্ঠা - ৬৫৪

৭৩. তত্রৈব

৭৪. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol. I,* সম্পাদক – M. Ramkrishna Kavi, *অভিনবভারতী* - চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১৮১

৭৫. *Kāvyānuśāsanam of Acharya Hemacandra*, সম্পাদক – রামানন্দ শর্মা, ৮/৪-এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৬৫৪

৭৬. *The Nāṭyadarpaṇā of Rāmacandra and Guṇacandra : A Critical Study,* সম্পাদক – K. H. Trivedi , ১/৩-৪, পৃষ্ঠা - ২৫-২৬

৭৭. *তদেব*, পৃষ্ঠা - ৪০৯

৭৮. *তদেব*, পৃষ্ঠা - ৪০৪-০৮

৭৯. *তদেব*, ২/৮-৯, পৃষ্ঠা - ২১৭-১৮

৮০. *তদেব*, পৃষ্ঠা - ২১৭

৮১. তত্রৈব

৮২. তত্রৈব

৮৩. তত্রৈব

৮৪. *অগ্নিপুরাণম্*, সম্পাদক – পঞ্চানন তর্করত্ন, ১৩৮/১-৪, পৃষ্ঠা - ৬৭৫

৮৫. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/১, পৃষ্ঠা - ২৮৭

৮৬. *সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোশ*, সম্পাদক – সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১

৮৭. *তদেব*, পৃষ্ঠা - ২৯১-৩০৭

৮৮. *Bhāvaprakāśana of Sāradātanaya*, সম্পাদক – Yaduraja Yatigiri Zwami ও K. S. Ramaswami Sastri, ৯/১০, পৃষ্ঠা - ২৫৬

৮৯. *তদেব*, ৮/১৮৫, পৃষ্ঠা - ২৩৮

৯০. *সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোশ*, সম্পাদক – সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, একবিংশ অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ২৯২

৯১. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ*, ৬/৯৫, পৃষ্ঠা - ৩৩৮

৯২. *তদেব*, ৬/২৭৩, পৃষ্ঠা - ৪১২

৯৩. *তদেব*, পৃষ্ঠা - ৪১৩

৯৪. *সংগীত দামোদর*, সম্পাদক – মহুয়া মুখোপাধ্যায়, ৪/৪৩২, পৃষ্ঠা - ১৬৭

৯৫. *Pratāparudrayaśobhuṣaṇa of Vidyānātha : with the Commentary, Ratnāpana, of Kumārasvāmin, son of Mallinātha*, সম্পাদক – কমলাশঙ্কর প্রাণশঙ্কর ত্রিবেদী, পৃষ্ঠা - ১০১

৯৬. *শ্রীমদ্বাগভটবিরচিতং কাব্যানুশাসনম্ : তেনৈব কবিনা বিনির্মিতয়া ব্যাখ্যয়া সমলংকৃতম্*, সম্পাদক – শিবদত্ত শর্মা ও বাসুদেব শর্মা, পৃষ্ঠা - ১৮

৯৭. *Alamkārasaṃgraha of Amṛtānandayogin*, সম্পাদক – V. Krishnamacharya এবং K. Ramachandra Sarma, , ৯/১২৪, পৃষ্ঠা - ১৫৫

৯৮. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৮৭, পৃষ্ঠা - ৪১৬

৯৯. *Daśarūpam with Dhanika's Commentary,* সম্পাদক – F E Hall, ১/১৭- এর অবলোকবৃত্তি, পৃষ্ঠা ৮

১০০. *তদেব,* ১/১৭-এর *অবলোকবৃত্তি,* পৃষ্ঠা - ৯

১০১. *তদেব,* ১/২০-২২ – এর *অবলোকবৃত্তি,* পৃষ্ঠা - ৯-১১

১০২. *তদেব,* ১/২৭-এর *অবলোকবৃত্তি,* পৃষ্ঠা - ১২

১০৩. *তদেব,* ১-/৩০-এর *অবলোকবৃত্তি,* পৃষ্ঠা - ২০

১০৪. *তদেব,* ২/৩৬ – এর *অবলোকবৃত্তি,* পৃষ্ঠা - ২৭

১০৫. *তদেব,* ২/৩ – এর *অবলোকবৃত্তি,* পৃষ্ঠা - ৬৩

১০৬. *তদেব,* ২/৫- এর *অবলোকবৃত্তি,* পৃষ্ঠা - ১১৩

১০৭. *তদেব,* ২/৯ – এর *অবলোকবৃত্তি,* পৃষ্ঠা - ১২৪

১০৮. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/৪০-এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৯২

১০৯. *তদেব,* ৬/৩৫-এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৩০১

১১০. *তদেব,* ৬/৭৬-৭৮ এর প্রতিটি বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৩২০

১১১. *তদেব,* ৬/৭২-এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৩১৮

১১২. *তদেব,* ৬/৪৬-এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৩০৬

১১৩. *তদেব,* ৬/১৮৪, ৬/১৮৫, ৬/১৯২-এর প্রতিটি বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৩৭২-৭৪

১১৪. *তদেব,* ৬/১৯১-এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৩৭৯

১১৫. *প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যে সঙ্গীত,* উপসংহার, পৃষ্ঠা – ৬২-৬৩

১১৬. *ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক,* পৃষ্ঠা - ১৭০

১১৭. *সংগীত দামোদর,* সম্পাদক – মহুয়া মখোপাধ্যায়, ৪/৫০০, পৃষ্ঠা - ১৭৮

১১৮. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol. I,* সম্পাদক – M. Ramkrishna Kavi, ১/১১৫, পৃষ্ঠা - ৪১

১১৯. *তদেব,* ১/১১৯, পৃষ্ঠা – ৪৪

১২০. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৬৯-৭২ -এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৪১২

১২১. *তদেব,* ৬/২৭৩ -এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৪১৩

১২২. *তদেব,* ৬/২৭৬ -এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৪১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপরূপক : সেকাল ও একাল

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উপরূপকের উৎস এবং পরিণতির পথের বিভিন্ন স্মারক, স্তম্ভ, সৌধের হদিশ পাওয়া গেছে। তার ফলে নৃত্য, পদার্থাভিনয়, গৌণ রূপক থেকে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপরূপকের যে তালিকা পেয়েছি, তার ফলে প্রধানভাবে অষ্টাদশ প্রকার উপরূপককেই স্বীকৃতি দিতে হয়। এরপর বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণ* অনুসারে উপরূপকগুলির যে ক্রম পাওয়া যায়, তাকে আদর্শ মেনেই নিবন্ধের প্রতি অভিমুখীকরণ। তাই পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার রক্ষার্থেই এখনকার আলোচ্য বিষয় হ'ল উপরূপকের স্বরূপ। অর্থাৎ উপরূপকের তত্ত্বের (theory) সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার আত্যন্তিক প্রয়াস এখানে লক্ষ্য করা যাবে। তবে তার জন্য 'সেকাল' এবং 'একাল' উভয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই প্রথম লক্ষ্য হ'ল এই 'সেকাল' এবং 'একাল'-এর কালপরিধি নিরূপণ। 'সেকাল' বলতে খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকে শুরু ক'রে ভারতেতিহাসের মধ্যযুগ অর্থাৎ খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়কেই ধরা হয়েছে এবং তৎপরবর্তী যুগকে 'একাল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের উপরূপক গ্রন্থ এবং উপরূপক সম্বন্ধীয় নাট্যশাস্ত্রীয় ব্যাকরণের সাপেক্ষে বর্তমান অর্থাৎ খ্রিস্টিয় উনবিংশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত সময়ে প্রাপ্ত সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষায় রচিত উপরূপক গুলির তুলনামূলক আলোচনা এই অধ্যায়ের লক্ষ্য। তাই এই অধ্যায়টিতে মোট দু'টি বিষয়ের ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হয়েছে। সেগুলি হ'ল নিম্নরূপ -

- উপরূপকগুলির নামকরণের তাৎপর্য অনুসন্ধানপূর্বক তার যাথার্থ্যবিচার এবং আধুনিক কালে প্রাপ্ত উপরূপকগুলির মধ্যে সেই নাট্যশাস্ত্রীয় বিধির মান্যতা বা অমান্যতার তুলনামূলক বিচার। সেই প্রসঙ্গেই রূপক এবং উপরূপকগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করণীয়। ভরতমুনির নাট্যবেদ থেকে শুরু ক'রে *সংগীতদামোদর* পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের ইতিহাস-পর্যালোচনায় উপরূপকের মধ্যে কোনও শ্রেণিবিভাগ করা হয়নি। তাই এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভে অষ্টাদশ উপরূপকের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ প্রদর্শিত হবে বিবিধ শর্তের ভিত্তিতে। এর ফলে গবেষণায় একটি নতুন দিক ভাস্বর হয়ে উঠতে পারে।
- বঙ্গদেশ তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুগে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বা প্রোভিন্স এবং স্বাধীনতোত্তরপর্বের পশ্চিমবঙ্গে উপরূপকের রচনা, উপরূপকতত্ত্ব নিয়ে বিগদ্ধসমাজে নানাবিধ সমালোচনা এবং অভিনয়ের ধারা এমনকি বাংলা ভাষায় প্রণীত সাহিত্যকর্মে উপরূপকের স্থান বিষয়েও যথাসম্ভব তথ্যপরিবেশনের প্রতিশ্রুতি জানায় এই অধ্যায়।

২.১ অষ্টাদশ উপরূপকের শাস্ত্রীয় নামকরণ ও আধুনিক টীকাকার :

এই উপরূপকগুলির নামকরণের তাৎপর্য বা যৌক্তিকতাপ্রসঙ্গে তার কথাবস্তু ও অঙ্গিরসের সাপেক্ষে ক'তখানি সঠিক, তা বুঝে নিতে হয়। নামকরণগুলি প্রাচীন হলেও আধুনিক কালের টীকাকার যথা কৃষ্ণমোহন শাস্ত্রী-র *লক্ষ্মী* টীকা এবং হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের (১৮৭৬-১৯৬১) *কুসুমপ্রতিমা* টীকার প্রয়োজনানুগ সাহায্য গৃহীত

হয়েছে। ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি ব্যতীত এই দুই আধুনিক যুগের টীকাকারের মাধ্যমেই প্রাচীনকে বিচার করা হয়েছে। এভাবেই এখানে সেকাল এবং একালের সংযোগ সাধিত হয়েছে। যেহেতু একাল বা আধুনিক যুগের কিছু উপরূপকের বিশ্লেষণ করা হবে, তাই প্রাচীনের সঙ্গে বর্তমানের রচনা বা প্রযোজনায় নতুন কোন্ কোন্ দিকের অবতারণা হয়েছে, তা বুঝে নেওয়া কর্তব্য। তাই *সাহিত্যদর্পণ*-এর ক্রমের ভিত্তিতেই সেগুলির উল্লেখ করা হ'ল। যেহেতু উপরূপকগুলির স্বরূপ এখানে বিচার্য নয়; তাই প্রতিটি উপরূপকের লক্ষণ উল্লেখ করা হয়নি। এর জন্য বিশ্বনাথ কবিরাজ কর্তৃক বিরচিত সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থের 'দৃশ্যশ্রব্যকাব্যনিরূপণ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৬৯-৩১২তম কারিকাগুলি দ্রষ্টব্য।

❖ **নাটিকা :**

'নাটিকা' শব্দটির মূলে রয়েছে 'নাটক' শব্দ। তাই এই 'নাটক' শব্দটির উৎস-বিশ্লেষণ না ক'রে 'নাটিকা' শব্দের যাথার্থ্য যাচাই ক'রে নিতে পারিনা। সংস্কৃতে ভ্বাদিগণীয় √নট্ ধাতুর উল্লেখ পাই যার অর্থ নর্তন[১] এবং চুরাদিগণীয় √নট্ ধাতুর অর্থ অবস্যন্দন।[২] 'নাটক' শব্দটির জন্য দ্বিতীয় প্রকার নট্ ধাতুকেই গ্রহণ করতে হয়। তার সঙ্গে ণ্বুল্ নামক কৃত্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে পুংলিঙ্গে 'নাটকঃ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। *বঙ্গীয় শব্দকোষ* গ্রন্থের প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই 'নাটক' শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে একটি পুংলিঙ্গ এবং একটি ক্লীবলিঙ্গের শব্দের যুগপৎ উল্লেখ করেছেন। ক্লীবলিঙ্গের 'নাটকম্' শব্দের ব্যুৎপত্তিতে তিনি √নাটি ধাতুর প্রসঙ্গ এনেছেন।[৩] ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* থেকে শুরু ক'রে সর্বত্রই 'নাটকম্' এই পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এখন যদি 'রূপকম্'-এর বিশেষণ হিসেবে ধরা হয়, তাহলে ভাণ, ব্যায়োগ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযুক্ত হ'লনা কেন এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আবার আচার্য ধনিক *অবলোক* বৃত্তিতে অবস্যন্দনার্থক √নট্ ধাতুর প্রয়োগ বিষয়ে মতামত দিয়েছেন যা প্রথম অধ্যায়ের আলোচিত হয়েছে।[৪] তাই এক্ষেত্রে একটি একটি বিরোধ দেখা যায়। তবে যাই হোক; 'নাটিকা' এই শব্দটি এসেছে 'নাটক' প্রাতিপদিক থেকেই। এক্ষেত্রে পাণিনীয় ব্যাকরণ অনুসারে 'প্রত্যযস্থাত্ কাত্ পূর্বস্যাত ঈদাপ্যসুপঃ' (৭/৩/৪৪) সূত্রবলে ন্-আ-ট্-অ-ক্-অ এই অচ্ ও হল্ বর্ণগুলিকে পরপর সাজালে সেখানে ট্-অ-ক্ এর মধ্যে অ-কারের ই-কারে পরিণতি এবং শেষের অ-কার আ-কার হয়ে যায় টাপ্ প্রত্যয়ের জন্যই। অর্থাৎ 'নাটিকা' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গে নির্দিষ্ট। Sir Monier Williams তাঁর *A Sanskrit-English Dictionary* তে 'নাটিকা' সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোনও বক্তব্য না রেখে কেবলমাত্র 'নাটক'-এর স্ত্রী লিঙ্গ হিসেবে তাকে দেখিয়েছেন[৫]। এখন 'নাটক' থেকে 'নাটিকা' এই লিঙ্গান্তরের কারণ কী ? এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে ক্ষুদ্রতর ভূমিকা একটি দিক হতে পারে। নাটক-এ ন্যূনতম পাঁচটি অঙ্ক আবশ্যক কিন্তু নাটিকা-য় চারটি অঙ্কের কোনও বিকল্প নেই। তাই এই ব্যবধান একটি ক্ষুদ্রতাকে নির্দেশ দেয়। উভয়ের মধ্যে এই ভেদটি ছাড়া অন্য একটি বিষয়ে মিলও বর্তমান। বস্তুগত ও রসগত সাযুজ্যের কারণে দুটি সংরূপকে পৃথক হিসেবে শনাক্ত করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ যদি কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্র*-কে ধরা হয়, সেখানে দেখা যায় যে এটি শৃঙ্গাররসপ্রধান রচনা। এমনকি রাজা অগ্নিমিত্র নাটকলক্ষণাক্রান্ত ধীরোদাত্ত গুণাধিকারী হলেও পুরাণপ্রসিদ্ধ কোনও চরিত্র নয়। তাই এর সঙ্গে *রত্নাবলী* নাটিকা-র উদয়নের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক

দিক থেকে যথেষ্টই অন্তরঙ্গতা রয়েছে। তাই উভয়ের মধ্যে ভেদক হ'ল অঙ্কসংখ্যা। যদিও বীররসপ্রধান নাটক-এর সঙ্গে এর মিশে যাওয়ার কোনওরূপ সম্ভাবনা নেই তবুও শৃঙ্গাররসপ্রধান নাটক-এর কিছু দৃষ্টান্তে একে নাটিকা ব'লে ভ্রম হতে পারে। যদিও নাটিকা সম্পূর্ণতঃ কবিকল্পিত কথাবস্তুর আশ্রয়ে গ্রথিত হলেও *মালবিকাগ্নিমিত্র*-এর ম'ত কিছু উদাহরণ উপস্থিত হ'লে একটি মীমাংসার প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে *রত্নাবলী* নাটকের পর্যায়ে উন্নীত না হলেও *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটিকার পর্যায়ে গণ্য হতে পারে। তাই সর্বনিম্ন পাঁচটি অঙ্কের অবস্থান এই অসাধারণ লক্ষণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার 'নাটিকা' বলতে নর্তকীকেও বুঝিয়েছেন[৬]। কৈশিকীবৃত্তির প্রভাবে নৃত্যগীতের আধিক্য থাকলেও এখনও পর্যন্ত এমন কোনও সংস্কৃত নাটিকা আবিষ্কৃত হয়নি যা কোনও একক নর্তকীর জীবনালেখ্য। তাই নর্তকীর গাথা হিসেবে এক্ষেত্রে 'নাটিকা' নামটি সিদ্ধ এমন দাবি অযৌক্তিক। মূলতঃ রসগত সাযুজ্যের কারণেই একটি ভেদরেখা টানতেই হয় এবং তার কারণেই নাটক নামক রূপকের রূপকের কাছাকাছি অবস্থানের জন্যই 'নাটিকা' নামক পরিভাষার জন্ম।

❖ **ত্রোটক :**

সাহিত্যদর্পণ-এ 'ত্রোটক' এই সংজ্ঞার উল্লেখ থাকলেও এই জাতীয় সন্দর্ভকে *নাটকলক্ষণরত্নকোশ* 'তোটক' ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। 'ত্রোটক' শব্দের মূলে রয়েছে সংস্কৃতে চুরাদিগণীয় √ক্রুট্ ধাতু যার অর্থ ছেদন করা[৭]। *সাহিত্যদর্পণ*-এর *কুসুমপ্রতিমা* টীকায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এর অর্থ করেছেন "ত্রোটকং প্রাহুঃ ত্রোটযতি নিজোৎকর্ষমান্বরূপকং খর্বীকরোতি ব্যুৎপত্তেঃ"[৮]। একই কথা কৃষ্ণমোহন শাস্ত্রী *লক্ষ্মী* টীকায় বলেছেন - "ত্রোটযতি স্বোৎকর্ষেণ রূপকান্তরং লঘুকরোতীতি ত্রোটকং নাম প্রাহুঃ"[৯]। এর বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় যে এই ধরণের উপরূপক নিজের উৎকর্ষতার প্রভাবে বাকি উপরূপকগুলিকে ম্লান ক'রে দেয় ব'লেই 'ত্রোটক' নামকরণটি সার্থক। তাই 'ছেদ করা' এই অর্থটি এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে। বলা যেতে পারে যে এই শ্রেণীর উপরূপক অন্যান্য গোত্রের উপরূপকগুলিকে ছেদ ক'রে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করে। তবে এটি বিস্মৃত হ'লে চলবে না যে সংস্কৃতে ত্রোটক ধারার উপরূপকগুলির রচনা ও তার সাফল্যের উত্তরকালে এই ধরণের যুক্তি দিচ্ছেন পণ্ডিতেরা। যে সময়ে একাধিক ত্রোটক রচিত হয়েছে, তখন সেগুলিকে কেন এই নামটি দেওয়া হয়েছিল, তা আজ সঠিকভাবে জানার উপায় নেই। তবে 'ত্রোটক' শব্দটি নাট্যসন্ধির আলোচনায় পেয়ে থাকি। গর্ভসন্ধির একটি অঙ্গ হ'ল ত্রোটক যা পূর্বাধ্যায়ে প্রদর্শিত হয়েছে। অর্থাৎ রুষ্টভাষণকে ত্রোটক বলা হয়। নাটকের সন্ধিতে এর ব্যবহার করতে হবে নাটককারকে। যেমন *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকে চতুর্থ অঙ্কে এই প্রকার পরুষ বাক্য শ্রাব্য হয়। এখন যে কয়েকটি ত্রোটকোপরূপকের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে *বিক্রমোর্বশী* ব্যতীত *স্তম্ভিতরম্ভ*, *মেনকানহুষ*-এর পুথি অধুনালুপ্ত। *বিক্রমোর্বশী*-তে দেখা যায় নাট্যাভিনয়কালে সঠিক শব্দপ্রয়োগে প্রমাদ ঘটে ব'লেই উর্বশী অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। তবে বাকি দুটির গ্রন্থ না পাওয়া গেলে পুরাণসাহিত্যে রম্ভার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তার অভিশপ্ত হয়ে প্রস্তরে রূপান্তরিত হওয়ার আখ্যানও *স্কন্দপুরাণ*-এ পাওয়া যায়[১০]। তাই প্রতিটিতেই এই অভিশাপের ভূমিকা ছিল ব'লেই পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়। তাই ছেদন করার অর্থটি হয়ত পুরাকালে এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে

কোনও একটি চরিত্রের স্খলনের জন্যই তার নিজ অবস্থান থেকে তাকে উচ্ছেদ করা হয়। পরবর্তীতে তার শাপমুক্তি ঘটলেও সাময়িক এই বিচ্ছেদটি রচনার কেন্দ্রবিন্দু। তবে যদি 'তোটক' শব্দটি গ্রহণ করা হয়, তবে তার উৎস হয়ত সংস্কৃত তুদাদিগণীয় √তুট্ ধাতু যার অর্থ কলহকর্ম[১১]। উল্লিখিত রচনাগুলিতে কলহের বিষয় নেই। তবে একটি মানসিক দূরত্ব বা দ্বন্দ্বের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে বর্তমান। তাই টীকাকারদের মত অপেক্ষা গ্রন্থগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক সেই উপরূপকটির নামকরণের সঙ্গতি খুঁজে নিতে চেষ্টা করাই উচিত।

❖ **গোষ্ঠী :**

তৃতীয় প্রকার উপরূপক হ'ল গোষ্ঠী। পূর্বাধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে এই নামটি ভোজদেবের *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-এ পাওয়া যায়। সেখানে এটির ইতিবৃত্ত বর্ণনার সময়ে বলা হয়েছে যে গোষ্ঠে বিহার করার সময় কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার প্রদর্শন এই পদার্থাভিনয়ে দৃশ্যমান হয়[১২]। অথচ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মতে এই তত্ত্ব একেবারেই খাটেনা। তিনি মূলতঃ বলতে চেয়েছেন যে গোষ্ঠীবদ্ধতার কারণেই এই উপরূপকের নাম গোষ্ঠী –"দশানামেব পুংসাং সভারূপত্বেন গোষ্ঠীত্বাত্ গোষ্ঠী স্যাত্"[১৩]।

বর্তমানে অনাদিমিশ্রের রাসসংগোষ্ঠী নামের একটি উপরূপকের সন্ধান পাওয়া গেছে[১৪]। *শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ*-এর অবলম্বনে বসন্তরাসের প্রেক্ষাপটে এই উপরূপকটির সৃজন। তাই একদিক থেকে এটি প্রাচীন ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার আধারে। যদিও কোনও দিব্যলীলার ম'ত চমৎকার কোনও কথা এখানে নেই। তার পরিবর্তে সম্ভোগ শৃঙ্গারাশ্রিত একটি লঘু নাট্যের গ্রন্থনা। কৃষ্ণ, সুদামা, সুবল, রাধা, ললিতা ও অন্যান্য ব্রজগোপিনীদের চরিত্র এখানে নাট্যক্রিয়া সম্পাদন করছে। তাই বিভিন্ন নটনটীর গোষ্ঠীবদ্ধভাবে অভিনয় করার জন্য 'গোষ্ঠী' নামকরণের যুক্তিকে নস্যাৎ করার উপায় নেই।

❖ **সট্টক :**

এই উপরূপকটি সংস্কৃতেতর প্রাকৃত ভাষার আশ্রয়ে নির্মিত হয়। মূলতঃ নাটিকা-র কায়াতেই এর নির্মাণ। এই নামকরণের কোনও উপযুক্ত হেতু নির্ণয় করেননি হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়। সংস্কৃত ভাষায় গত্যর্থক ভ্বাদিগণীয় √অট্ ধাতুর অস্তিত্ব রয়েছে[১৫]। আবার একই গণভুক্ত √অট্ট্ ধাতুর অর্থ হয় হিংসাত্মক কর্ম[১৬]। একই নামের আরও একটি চুরাদিগণীয় ধাতু রয়েছে যা অনাদর বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এখন সট্টক-এর ইতিবৃত্তে ভ্রমণ, হত্যা, অনাদর এই ধরণের কোনও বিষয় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নয়। ত্রোটক ধারায় যেরকম কঠিন বাক্যোচ্চারণ বিষয়টি স্পষ্ট, এক্ষেত্রে অনাদর বা হত্যা বা ভ্রমণ কোনওটিই স্ফুট নয়। *কর্পূরমঞ্জরী*-সহ আরও কয়েকটি সট্টকজাতীয় উপরূপক পাওয়া যায় যা অনেকাংশেই নাটিকাধর্মী। ইন্দ্রা চক্রবাল *उपरूपकों का उद्भव और विकास* গ্রন্থে এটিকে প্রাকৃত শব্দ ব'লেই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন এবং 'সাদিক' শব্দের সমার্থক হিসেবে ধরেছেন[১৭]। আবার *সংগীতদামোদর*-এর মতে এর নাম 'শাটক'[১৮]। তালব্য 'শ' এবং দন্ত্য 'স'-এর কী পার্থক্য; তার সপক্ষেও যোগ্য সদুত্তর নেই। যাঁরা এই গোত্রের উপরূপক রচনা করেছেন, তাঁরা এই উপরূপকের লক্ষণগুলিকেই অনুসরণ

করেছেন। অর্থানুযায়ী সন্দর্ভরচনা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলনা বলেই মনে করা যেতে পারে। সুতরাং এই নামকরণটির প্রাচীনতা বিষয়ে নিশ্চিত এবং সুসংবদ্ধ কোনও প্রমাণ নেই।

❖ নাট্যরাসক :

এটি এমন একটি উপরূপক যা শুধু প্রাচীন বা মধ্যযুগের সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাট্যধারায় আবদ্ধ থাকেনি। আধুনিককালে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গে এই 'নাট্যরাসক' আখ্যায় একাধিক নাট্যরচনা হয়েছে এবং বলা যেতে পারে একটি ধারা সেই সময় তৈরি হয়েছিল যা এই অধ্যায়েই যথানির্দিষ্ট স্থানে উল্লিখিত হবে। 'নাট্যরাসক' এই শব্দবন্ধে দুটি শব্দ রয়েছে। যথা 'নাট্য' এবং 'রাসক'। এখানে 'নাট্য' এই শব্দটি দেওয়ার যুক্তি হতে পারে যে 'রাসক' নামক উপরূপকের থেকে পৃথকীকরণের জন্যই। এটি একটি সমাসবদ্ধ পদ। এর ব্যাসবাক্যে দ্বন্দ্ব সমাস আসতে পারেনা। "নাট্য ও রাসক" এভাবে ভাঙলে দুটিকে ভিন্ন প্রযোজনা ব'লে মানতে হয়। আবার, "যাহা নাট্য তাহাই রাসক" কর্মধারয় সমাসেও তা প্রকাশিত হয়না। যদি "নাট্যের মাধ্যমে রাসক" বা "নাট্যায়িত রাসক" এইরূপে ভাবতে পারা যায়, তাহলে এর অর্থ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ নাট্য-এর অনুকরণাত্মকতা, দৃশ্যমানতা এবং রসপূর্ণতা এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য-ই এই উপরূপকে যথাযোগ্য স্থান পাবে। যেহেতু *সাহিত্যদর্পণ*-এর লক্ষণানুসারে এখানে লাস্যাঙ্গগুলির পরিপূর্ণ ঔজ্জ্বল্য বর্তমান থাকে[১৯]। তাই নৃত্যপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও নাট্যিকতার কোনও ত্রুটি ঘটেনা। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেছেন "নাট্যমভিনযং রাস্তা সভ্যেভ্যো রোচযতীতি ব্যুৎপত্তেঃ"[২০]। অর্থাৎ এই অভিনয়টি সহৃদয়দের মনে অত্যন্ত রসাভিব্যক্তি ঘটানোর জন্য এর এইরূপ নামকরণ হয়েছে। তবে সেই রসটি কী? তার উত্তরে বিশ্বনাথ কবিরাজের অনুসরণে বলতে হয় এটি সশৃঙ্গার হাস্যরস।

❖ প্রস্থানক :

সাধারণ বাস্তব জগতে 'প্রস্থান' শব্দটি যাত্রা, ব্রজ্যা এবং নিষ্কাশন-এর সমপর্যায়ে ধার্য। যেহেতু প্রথম অধ্যায়ে উপরূপকগুলির বিবর্তনের আলোচনায় দেখা গেছে যে এটি প্রারম্ভিক পর্যায়ে নর্তনকলা ছিল এবং সেখানে গজগতির অনুকার বিশেষভাবে লক্ষিত হ'ত, তাই এমন প্রশ্ন জাগতে পারে যে সেই গজগতির আঙ্গিকে যাত্রার জন্যই 'প্রস্থান' নামটি হয়েছে। একথা বললে যে কোনও নৃত্যেই একটি গতির প্রসঙ্গ থেকেই যায়। সেই অতিব্যাপ্তি দোষের নিরাকরণ প্রয়োজন। তবে *অভিনবভারতী*-তে উল্লিখিত অন্যান্য নৃত্তাত্মক প্রবন্ধ-এর তুলনায় এটি ছিল স্বতন্ত্র। কোনও এক কামিনী নায়িকার একক নর্তন। আবার কিছু স্থানে 'প্রস্থানক' শব্দটি পাওয়া বলেই এটিকে 'প্র-স্থানক' নাকি 'প্রস্থান-ক' হিসেবে ধরতে হবে সে নিয়ে সংশয় জাগে। ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যে (যথা ভরতনাট্যম্) স্থানক-এর একটি ব্যাকরণ রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন ধরণের অবয়ব ফুটে ওঠে যা পাদের সাহায্যে সম্ভব। যেমন কুম্ভপাদ ইত্যাদি। তাই হস্তীর ভঙ্গিমায় অবস্থানে একটি প্রকৃষ্ট স্থানক-এর অনুষঙ্গ এসে যায়। তবে এটি স্বীকার্য নয় কারণ একটি নৃত্তাত্মক পরিবেশনায় স্থিরতা কাঙ্ক্ষিত নয়। তাই গতিময় সঞ্চারই কাম্য। তাই 'প্রস্থান-ক' টিই সঠিক হবে কারণ এখানে কন্ নামক তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে 'প্রস্থান'-এর সঙ্গে। যেহেতু এই ধরণের নাট্যধারাগুলি দশরূপকের সঙ্গেই সমান্তরালে রয়েছে, তাই এদের নামকরণে অবশ্যই প্রাচীন রূপটির সাপেক্ষে

বিচার করণীয়। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের ধারণায় এখানে ‘প্র-স্থান’ হিসেবে ভাঙতে হবে। ‘প্র’ নিপাতের অর্থ ‘প্রকৃষ্ট’ এবং ‘স্থান’-এর মধ্যে ভাদ্দিগণীয় √স্থা ধাতু রয়েছে যা অবস্থান অর্থে নির্দিষ্ট। তাই প্রকৃষ্টরূপে অবস্থান এভাবে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরে নিতে হবে। তাহলে কীসের অবস্থান? এখানে সম্বন্ধটি হ’ল রসের সঙ্গে। সেই রস হ’ল কামশৃঙ্গার। প্রকৃষ্টরূপে শৃঙ্গার রসের স্থাপনা এই উপরূপকে হয় ব’লেই একে বলা হয় ‘প্রস্থান’ বা ‘প্রস্থানক’। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের উক্তিটি হ’ল “প্রতিষ্ঠন্তে রসবাহুল্যেন ধাবন্তি সহৃদযানাং মনাংস্যস্মিন্নিতি প্রস্থান তদাখ্যোপরূপকবিশেষ...”[২১]।

❖ **উল্লাপ্যক :**

এই উপরূপকটি ‘উল্লাপ্য’, ‘উল্লাপ’ ইত্যাদি নামেও পরিচিত। সংস্কৃতে উদ্ নিপাত পূর্বক √লাপি ধাতুর সঙ্গে কর্মে যক্ প্রত্যয় যুক্ত হলে ‘উল্লাপ্য’ শব্দটি নির্মিত হয় এমনটিই জানিয়েছেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* গ্রন্থে। সেখানে তিনি উল্লাপ, উল্লাপন শব্দেরও ব্যাখ্যা করেছেন। ‘উল্লাপ্য’-কে উপরূপকরূপে স্বীকৃতি দিলেও এই নামকরণের হেতু জানিয়েছেন[২২]। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এই প্রসঙ্গে *কুসুমপ্রতিমা* টীকায় বলেছেন “উল্লাপ্যতে রসবত্ত্বাদ্”[২৩]। আবার কৃষ্ণমোহন শাস্ত্রীর *লক্ষ্মী* টীকায় বলা হয়েছে এটি একটি মনোহর সুন্দর রূপক[২৪]। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের মতে ‘উল্লাপ’-এর আভিধানিক অর্থ “শোকাদির জন্য উচ্চধ্বনি; বিলাপ” এবং ‘উল্লাপন’ বলতে বোঝায় শাস্ত্রব্যাখ্যা বা আত্মাভিপ্রায়ের প্রকাশ[২৫]। এই উপরূপকের লক্ষণে বলা হয়েছে যে এখানে চারজন নায়িকা কোনও একজন নায়কের প্রতিই প্রেমাসক্ত হয়ে থাকে। *দেবীমহাদেব* এর যথোপযুক্ত প্রমাণ হলেও এটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তবে যে উল্লাপ্যটি পাওয়া যায়, তা প্রভুনারায়ণ সিংয়ের *পার্থপাথেয়* । এটি বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর ইরিবৃত্তের ছায়ায় রচিত। তিন অঙ্কের বন্ধনে রচিত এই নাট্যে অর্জুন নায়ক এবং চারজন নায়িকা হ’ল উলুপী, বর্গা, চিত্রাঙ্গদা এবং সুভদ্রা। এখানে অর্জুনের বিলাপের একাধিক শ্লোক পাওয়া যায়। তেমনই বিদূষকের কার্যে হাস্যরসের উদ্রেক ঘটায়। এমনকি প্রতিটি নায়িকার অর্জুনের প্রতি পূর্বরাগ ও অনুরাগের কারণে একটি শৃঙ্গার রসের আবহ তৈরি হয়। তাই উল্লাপ-এর অর্থ বিলাপগাথা ধরলে এই নামকরণটি অনেকখানি প্রাসঙ্গিক হয়। তাই বিলাপের সংগীতে মধুর একটি প্রযোজনা যা সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের প্রেক্ষিতে ‘উল্লাপ্যক’।

❖ **কাব্য :**

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের একটি অন্যতম বিতর্কিত শব্দ ‘কাব্য’। কবি শব্দের সঙ্গে ষ্যঞ্ প্রত্যয়যোগে কাব্য-এর ব্যাকরণগত অর্থ পাওয়া গেলেও প্রায়োগিক অর্থ নিয়ে বহু সমীক্ষা চলেছে। *কুসুমপ্রতিমা* টীকায় “কবে কর্ম্মেতি”[২৬] এই প্রনিধানের উল্লেখ থাকলেও সামগ্রিক চিত্রকল্প পাওয়া যায়নি। সাহিত্যদর্পণকার উক্ত গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের ‘কাব্য’ তথা সৃজনশীল সাহিত্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন “বাক্যং রসসত্মকং কাব্যম্”[২৭]। অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি রসের ব্যঞ্জনাসম্ভূত সহৃদয়-সমৃদ্ধ শব্দার্থময় রচনা-ই কাব্য (সাহিত্য)। আবার সেই সৃজনশীল সাহিত্য দৃশ্যশ্রব্যধর্মিতাকে প্রধান ক’রে তুললে তা হয় নাট্য। সেই নাট্যের মধ্যেই উপরূপকবিশেষ হ’ল কাব্য। সুতরাং এখানে সামগ্রিক কাব্যধারণার নিয়ম অনুসৃত হয়না। তাই প্রতিটি রূপক এবং উপরূপকই হ’ল কাব্যবিশেষ।

অথচ *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-এ সময় থেকেই কেন এই নাট্যসন্দর্ভটিকে 'কাব্য' নামে অভিহিত করা হ'ল তার প্রামাণ্য বিশ্লেষণের অভাব রয়েছে। বাংলা ভাষায় 'কাব্যনাট্য', 'নাট্যকাব্য'-এর সৃজন অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের। এর মধ্যে প্রথমটি ছন্দোবদ্ধ পদ্যের আকারে কাব্য; যথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *চিত্রাঙ্গদা* । অন্যদিকে দ্বিতীয় প্রকারে একটি কাব্য-ই নাট্যকারে পরিবেশিত হয়; যথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ফাল্গুনী* । বাংলায় গদ্য ও পদ্যের ধারণা সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের গ্রন্থ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। সংস্কৃতে গদ্যকেও কাব্য (Prose Literature) বলা হয়। তাই এই উপরূপকে কেবলমাত্র পদ্যসংলাপ বা শ্লোকের সমষ্টি এমন কথাও উচ্চকণ্ঠে বলতে পারা যায়না প্রাচীনকালের কাব্য উপরূপকের কোনও গ্রন্থ বর্তমানে সুরক্ষিত না থাকার দরুণ। তাই এ বিষয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি।

❖ **প্রেঙ্খণ :**

সংস্কৃতে 'প্র' নামক নিপাতের সঙ্গে ভাদিগণীয় √ইঙ্খ ধাতুর সঙ্গে ল্যুট্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'প্রেঙ্খণ' শব্দের প্রকাশ ঘটে। যেহেতু এই ধাতুর অর্থ গতি, তাই প্রকৃষ্টরূপে কোনও গতিকে বোঝায়। এই 'প্রেঙ্খণ' প্রযোজনার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় কথাকলি নৃত্যের একটি সংযোগ রয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে একদা কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা-ই 'কথাকলি' আকারে বিকশিত হয়[২৮]। এই 'যাত্রা' নামকরণটি ভারতীয় পরম্পরায় অনুসৃত হয়েছে বিভিন্ন প্রাদেশিক সংস্কৃতিতে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাত্রার সময়ে কিছু নাট্যাভিনয় হ'ত ব'লেই এহেন নামকরণ। প্রাচীনকালে কোনও প্রযোজনা তার বৈশিষ্ট্যের জন্যই একটি নির্ধারিত সংজ্ঞা লাভ করত। তাই অনুমান একসময় হয়ত প্রেঙ্খণ-এর রীতি এরকমই ছিল। এমনকি দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিত ভি রাঘবন বেশ কয়েকটি এই শ্রেণীর রচনা নিবন্ধিত করেছেন। তিনি দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্যের জন্যই যে এই উপরূপকগুলি প্রণয়ন করলেন একথা জোর দিয়ে না বলা গেলেও দক্ষিণী নৃত্যনাট্যকলার সঙ্গে এর সম্পর্ককে ছিন্ন করা যায়না। তবে এই প্রযোজনারই অপর নাম 'প্রেক্ষণক' যা *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-এ কথিত[২৯]। এখানে ব্যুৎপত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভাদিগণীয় √ঈক্ষ্ ধাতু থেকে এর নাম কার্যক্রম সাধিত হয়। এই ধাতু দর্শনার্থে বহু ব্যবহৃত হয়। তাই দৃশ্যমানত্বের জন্য একে 'প্রেক্ষণ' শব্দের উৎপত্তি ধরকে বিষয়টিতে কোনও জটিলতার অবকাশ থাকেনা। তবে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এই প্রসঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন "প্রেক্ষ্যতে রসানুভবসনন্দনহৃদযমান্দোল্যতে অনেনেতি ব্যুৎপত্তেঃ"[৩০]। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে এই নাট্যদর্শনের মাধ্যমে সহৃদয় বর্গের হৃদয়বআন্দোলিত হয় রসব্যঞ্জনার কারণে। এটি একটি সরল অভিমত। এই মত অধিক গ্রহণযোগ্য নয়।

❖ **রাসক :**

চুরাদিগণীয় √রস্ ধাতুর অর্থ আস্বাদন করা[৩১]। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের অন্যতম বিষয় হ'ল রসনিষ্কর্ষতার প্রতিপাদন। রসপ্রস্থানবাদী আলংকারিকগণ রসকেই কাব্যের একমাত্র উপজীব্য ব'লে মেনে নিয়েছেন। এই √রস্ ধাতুর সঙ্গে ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় যোগ ক'রে 'রাস' শব্দটি আসে। তারপর 'স্বার্থে কন্' সূত্রের সাহায্যে 'রাসক' শব্দের সৃষ্টি। রাসনৃত্য *শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ*-এর দশম স্কন্ধের *রাসপঞ্চাধ্যায়ী*-র পেটিকায় একটি মধুর মূর্ছনা। বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের নৃত্যকেই রাস বলা হয়। ধীরে ধীরে এই ভাগবত ধর্মের প্রভাবে রাসনৃত্য ভারতবাসীর

অন্তরে প্রবেশ করে পরম স্বাদু মোড়কে। তাই ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে রাসক ক্রমশঃ নৃত্য থেকে নাট্য হয়ে উঠেছে। গোপস্ত্রীদের মধ্যে কৃষ্ণের বিশেষ ললিত নৃত্যকে ছেড়ে ইতিবৃত্তসমন্বিত একটি নাট্যাবয়ব ধারণ করে। ফলে এর নামকরণে সেই আদি যুগের চিহ্ন থাকলেও তা মোটেই তদনুরূপ নয়। খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতকে এর অর্থ রোচন করা। সহৃদয় সামাজিকের আত্মাকে যা বিশেষভাবে রোচন করবে, আহ্লাদিত করবে এবং রসাভিব্যক্তি ঘটাবে; তা-ই রাসক। তবে উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর রাজ্যের মণিপুরী নৃত্যকলায় 'রাস' একটি উপভোগ্য অনুষ্ঠান। সেই রাস পাঁচপ্রকার; যথা মহারাস, বসন্তরাস, কুঞ্জরাস, নিত্যরাস এবং দিব্যরাস। এর মধ্যে মহারাস হ'ল বৃন্দাবনের কৃষ্ণের গোপিনীদের সঙ্গে মায়ানৃত্য। অর্থাৎ *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*-এ যেমন রাসক-এর বিবরণ পেয়েছিলাম[৩২], অনুরূপ সেই কলা আজও মণিপুরী নৃত্যে সমধিক প্রচলিত। তাই একদিকে যেমন এই উপরূপকের একটি বিবর্তিত রূপ এসে পৌঁছেছে, তেমনই তার প্রাচীনতা বজায় রেখে চলেছে ভারতেরই একটি নৃত্যকলা। তবে এই নৃত্যকলার বিকাশ হয়েছে খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতকে তবুও একটি প্রাচীন ধারার বহমানতার জন্য প্রশংসা করতেই হয়। রাসক উপরূপকের জন্ম নৃত্যকলা থেকেই কিন্তু অপরপক্ষে নাট্যরাসক-এর মধ্যে নৃত্য থাকলেও তা বসন্ত ঋতুকালীন বর্ণনা। রাধাকৃষ্ণের চরিত্রকে উপস্থিত রেখে একটি নৃত্যসমারোহের পটভূমিকা তৈরি করতে হবে এমন কোনও উদ্দেশ্য সেখানে ছিলনা। পরবর্তীতে 'নাট্যরাসক' এবং 'রাসক' দুটি ভিন্নধর্মী নাট্যে রূপান্তরিত হয় এবং দুটিতেই কৃষ্ণকথা প্রায় অবলুপ্ত হয়। *সাহিত্যদর্পণ* -এ রাসক-এর লক্ষণে বলাই হয়েছে যে একজন মূর্খ নায়কের উন্নতি প্রদর্শিত হয়। উদাহরণে রয়েছে *মেনকাহিত* । এই নাট্যগ্রন্থের নামকরণ থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় এটি কৃষ্ণের জীবনাশ্রিত বৃত্তান্ত নয়। তাই একসময়ে কৃষ্ণ ও রাস যেরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল, কালের গতিতে তার পরিবর্তন আসে এবং সহৃদয় নাট্যপ্রেক্ষক তাকেই বরণ ক'রে নেয় নতুন ভাবনায়।

❖ **সংলাপক :**

এটি আরভটীবৃত্তিপ্রধান উপরূপক। যদিও সাত্ত্বিক বৃত্তির চারটি শ্রেণীর একটি হ'ল সংলাপক। এটির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "সংলাপঃ স্যাদ্ গভীরোক্তির্নানাভাবসমাশ্রয়ঃ"[৩৩]। এখানে বলা হয়েছে যে নানা ভাবের ধ্বনি পূর্ণ গভীর গূঢ় উক্তিকে সংলাপ বলা হয়। ভ্বাদিগণীয় √লপ্ ধাতুর আদিতে সম্ নিপাতের ব্যবহার রয়েছে। অর্থাৎ সম্যকভাবে কিছু বলার অর্থ আক্ষরিকভাবে উঠে আসে। *কুসুমপ্রতিমা* টীকায় উক্ত রয়েছে "সংলাপযতি রসবিশেষবত্তয়া আত্মানং পাঠযতি"[৩৪]। এই কথাটিই *লক্ষ্মী* টীকায় বলা হলেও পাঠ করানোর স্থানে 'অধ্যাপযতি' এই ণিজন্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার রয়েছে[৩৫]। অর্থাৎ এখানে একটি শিক্ষার প্রসঙ্গ রয়েছে। এই শিক্ষা আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত। এই শুদ্ধীকরণের ফলে মনের মলিনতা দূর হয়। উপরূপকটির লক্ষণে বিশ্বনাথ কবিরাজের উক্তি হ'ল "ন তত্র বৃত্তির্ভবতি ভারতী ন চ কৈশিকী"[৩৬]। এখানে ভারতী ও কৈশিকী বৃত্তির ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সাত্ত্বতী বৃত্তির ব্যাপারে কোনও নেতিবাচক মন্তব্য নেই। তাই সাত্ত্বিক বৃত্তির সেই অংশটির অনুরূপ অন্তর্ভুক্তির জন্য এর নামকরণেরও একটি সম্ভাবনা থেকে যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে যে যেখানে বাগব্যাপারের প্রাধান্য নেই, সেখানে ধাতুগত ব্যুৎপত্তিতে কিছু উক্তি-প্রত্যুক্তির দৃঢ়তা আসে কীভাবে ? এই সন্দেহমুক্তির জন্যই

শব্দের ব্যঞ্জনা বৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়। এই উপরূপকটি সহৃদয়কে কিছু শিক্ষাদান করে। তা যেন কিছু বলতে চায় এমন একটি অভিপ্রায় এই উপরূপকে নিহিত। পাষণ্ড ব্যক্তিকে ঘিরে এই উপরূপকের ইতিবৃত্ত আবর্তিত। তাই তার চরিত্রকে নজির হিসেবে গ্রহণ ক'রে পরিণাম বা ফলপ্রাপ্তিতে কী ঘটছে, তা সহৃদয় অভিজ্ঞতা অর্জন করলে একটি নীতিশিক্ষা হতে পারে এমনটিই বলা যায়।

❖ **শ্রীগদিত :**

বিশ্বনাথ কবিরাজ এই উপরূপকটির বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা দিয়ে গেছেন। এই উপরূপকটির লক্ষণপ্রসঙ্গে তাঁর উক্তি "ভারতীবৃত্তিবহুলং শ্রীতিশব্দেন সংকুলম্"[৩৭]। অর্থাৎ এখানে 'শ্রী' শব্দটি বারংবার নাট্যোক্তিতে ব্যবহৃত হয় ব'লেই একে 'শ্রীগদিত' বলা হয়। তবে *সাহিত্যদর্পণ*-এর পূর্বযুগে এই প্রযোজনায় শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী বিষ্ণুর গুণকীর্তন করত সংগীতের মাধ্যমে। যেহেতু √গদ্ ধাতুর অর্থ কিছু বলা, তাই সেই রীতি অক্ষুণ্ণ রেখেই বিবর্তন ঘটেছে এই উপরূপকে। তাই শ্রী-র দ্বারা উক্ত এই নিয়মের পরিবর্তে এসেছে 'শ্রী' শব্দের বহুল প্রয়োগ। তাই মাধবভট্টের *সুভদ্রাহরণ*-এর প্রস্তাবনায় পারিপার্শ্বিক বলেছে "শ্রীমৎসুভদ্রাহরণং নাম প্রসিদ্ধনাযকোপেতং শ্রীতিশব্দোপরঞ্জিতং শ্রীগদিতং বিস্মৃতবন্তো ভবন্তঃ"[৩৮]।

❖ **শিল্পক :**

এই উপরূপকটির নামকরণের পূর্বে স্বভাববৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা জানানো প্রয়োজন। সাহিত্যদর্পণকারের মতে এই উপরূপকের অঙ্গসংখ্যা সপ্তবিংশতি। এর মধ্যে আশংসা, তর্ক, সন্দেহ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, বিলাস, আলস্য, প্রদর্শন, শ্বাস, মূঢ়তা, উচ্ছ্বাস, বিস্ময়, চমৎকার ইত্যাদি রয়েছে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে এগুলির জন্য সাত্ত্বিক অভিনয় যেমন দরকার, তেমনই প্রয়োজন ব্যভিচারিভাবের। ভাবানুগ নৃত্যাভিনয়ে এটি অধিক নান্দনিক হতে পারে। তাই টীকাকার বলতে চেয়েছেন নৃত্যাদি শিল্পের বহুলতাই এই উপরূপকের নামকরণের জন্য দায়ী। *লক্ষ্মী* টীকার অংশ উদ্ধৃত করা যাক। "শিল্পকে নৃত্যাদিশিল্পমুখ্যত্বাদেব..."[৩৯]-এ 'আদি' শব্দের দ্বারা কী কী গৃহীত হতে পারে তা জানা কর্তব্য। ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র* -তে পাওয়া যায় যে নাট্যে সকল প্রকার জ্ঞান, শিল্প, বিদ্যা, কলা, যোগ এবং কর্মের মেলবন্ধন ঘটে –

> ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা ।
> ন স যোগো ন তত্ কর্ম নাট্যে'স্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে ।।[৪০]

অর্থাৎ শিল্পাদির সঙ্গে নাট্যের সমবায় সম্বন্ধ। *অভিনবভারতী* টীকায় 'শিল্প' বলতে 'মালাচিত্রপুস্তাদিযোজনম্"-এর উল্লেখ রয়েছে[৪১]। অর্থাৎ নাট্যে ব্যবহৃত আহার্য সামগ্রী 'শিল্প' ব'লেই গণ্য। আবার *অমরকোশ* অনুসারে 'শিল্প' ও 'কলা'-র মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই[৪২]। আবার পাণিণীয় ব্যাকরণে *অষ্টাধ্যায়ী*-র 'শিল্পিনি ষ্বুন' (৩/১/১৪৫) সূত্রের মাধ্যমে নর্তক শিল্পীর মর্যাদা পায়[৪৩]। তাই নৃত্যকলা শিল্পেরই ছত্রছায়ায় রয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রন্থে শিল্প-এর

বিভিন্ন রূপের উল্লেখ থাকলেও যেহেতু উপরূপকগুলির যাত্রাপথে নৃত্যের স্পর্শ প্রতিক্ষণেই অনুভূত হয়। তাই হয়ত টীকায় বলা হয়েছে এটি নৃত্য এবং অন্যান্য শিল্পের সমবায়ে সমৃদ্ধ।

❖ **বিলাসিকা :**

সংস্কৃতে 'বি' নিপাতটি বিশেষ বা বিযুক্ত এই দুই অর্থেই প্রযুক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে বিশেষ অর্থেই গ্রহণ করা সমীচীন। তবে *অলংকারসংগ্রহ*-এ[৪৪] এবং *সংগীতদামোদর*-এ[৪৫] এই অভিনেয় নাট্যশৈলীর নাম 'লাসিকা'। সাহিত্যদর্পণকার বি নিপাতটি যুক্ত করেছেন 'লাসিকা'-র পূর্বে। আবার দশরূপ গ্রন্থে যে 'লাস্য' নামক নৃত্যের উল্লেখ রয়েছে, তার উৎপত্তি সংস্কৃত √লস্ ধাতু। এই নামাঙ্কিত ধাতু দুটি রয়েছে। তন্মধ্যে চুরাদিগণীয় উভয়পদী ধাতুটি শিল্পযোগে প্রযোজ্য[৪৬]। সেখানে একটি চারুকলা এবং তৎসঙ্গে মনোরঞ্জনের ব্যাপারটিও লঘু নয়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'লাসিকা' বলতে নর্তকী এবং গণিকাকে বুঝিয়েছেন[৪৭]। আবার সমান্তরালভাবে একটি উপরূপক ব'লেও শব্দব্যয় করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তাহলে একজন নর্তকীর উপস্থাপনাকেন্দ্রিক নাট্য হ'ল বিলাসিকা যেখানে আমোদপ্রমোদের বিবিধ উপকরণ সুসজ্জিত। সাহিত্যদর্পণকার লক্ষণে "দশলাস্যাঙ্গসংযুক্তা" বিশেষণেরও অভাব রাখেননি[৪৮]। তার ফলে এখান থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে এটি লাস্যনৃত্যের আকর এবং এটি আদ্যোপান্ত কাহিনিনির্ভর দৃশ্যকাব্য নয়। তাই সেক্ষেত্রে কোনও একজন নায়িকাকে অগ্রণী ধরতে হয় এবং সেই নায়িকারই সাঙ্গ লাস্যনৃত্যের মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্যকাব্য পরিবেশিত হবে এমন কথাই স্বীকার করতে হয়। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের উক্তি "লাসযতি সহৃদযেভ্যঃ কামযতীতি. .."[৪৯]।

❖ **দুর্মল্লিকা :**

সাহিত্যদর্পণ-এ এই উপরূপকের বৈশিষ্ট্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩০৩-০৫ তম শ্লোকে পাওয়া গেলেও *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-এর সময়ে এর নাম ছিল 'দুর্মিলিকা'। এই উপরূপকের বিষয়ে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মতামত "দুষ্টা মনোহরত্বে হীনা মল্লী মল্লিকাকুসুমমপি যদ্যাঃ সেতি ব্যুৎপত্তেঃ"[৫০]। সৌন্দর্যহীন নায়িকার কথা এই উপরূপকের বস্তু। সাহিত্যদর্পণকার এই উপরূপকের লক্ষণে কোথাও নায়িকার স্বভাবের প্রসঙ্গ আনেননি কিন্তু টীকাকার তাঁর মনীষার প্রভাবে এর নামকরণের তাৎপর্য অনুসন্ধান করেছেন। যেহেতু এর কোনও লক্ষ্যগ্রন্থ হস্তগত হয়নি, তাই সঠিকভাবে টীকাকারের বক্তব্যের নিরীক্ষা করা অসম্ভব।

❖ **প্রকরণী :**

এই উপরূপকের নামকরণের প্রসঙ্গ ইতঃপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে *নাট্যদর্পণ* গ্রন্থের আলোচনার সময়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে[৫১]। তাই এখানে পুনরুক্তি করা হ'লনা।

❖ **হল্লীশ :**

এটি একটি রূঢ়ি শব্দ। শব্দের বৃত্তিপ্রসঙ্গে *পরমলঘুমঞ্জুষা*-য় বলা হয়েছে যে শব্দের ত্রিবিধ বৃত্তি – শক্তি, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা। পুনরায় শক্তি ত্রিধা – রূঢ়ি, যোগ এবং যোগরূঢ়ি[৫২]। যেখানে ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তির দ্বারা

শব্দের অর্থজ্ঞানের অভাব লক্ষিত হয়, সেখানে শব্দের অর্থনিরূপণ করার জন্যই রূঢ়ি শক্তির প্রয়োজন হয়। তাই এই শব্দটি থেকে এর ব্যবহারিক দিককেই বুঝে নিতে হবে। ইন্দ্রা চক্রবাল 'হল্লীশ' শব্দের ব্যৎপুত্তি প্রসঙ্গে √হল্ এবং √লশ্ ধাতুর উল্লেখ করেছেন[৫৩]। যদিও √লশ্ ধাতু অপেক্ষা √লস্ ধাতুর ব্যবহার ঔচিত্যপূর্ণ হয়। এর সঙ্গে ক্বিপ্ ও অচ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দটি সংস্কৃত রূপধারণ করে। এই ধাতুর অর্থ শ্লেষণ ও ক্রীড়া[৫৪]। তাই আলিঙ্গন করা, তৃপ্তিবিধান করা বা কারোর সঙ্গে সংলগ্ন হওয়ার একটি বিষয় এর মধ্যে নিহিত রয়েছে যার সঙ্গে কিঞ্চিৎভাবে 'হল্লীশক'-এর অনুষঙ্গ রয়েছে। উল্লেখ্য এই বানানটির বিভিন্ন বৈকল্পিক রূপ রয়েছে; যথা – 'হল্লীষক' ও 'হল্লীসক'। তাই শেষোক্ত বানানটিতে √লস্ ধাতুর অন্তর্ভুক্তি গ্রহণযোগ্য। তবে অন্যান্য উপরূপকের ম'ত এটিরও কৈশোর দশা থেকে তরুণ দশার প্রাপ্তি ঘটেছে। তাই কেবলমাত্র বৃন্দাবনের মধ্যেই সীমায়িত নেই হল্লীশক। *সাহিত্যদর্পণ*-এর লক্ষণগুলি যদি কোনও নাট্যে মনোজ্ঞভাবে অনুসৃত হয় এবং তা যদি প্রাচীনরূপের অনুগত হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে হল্লীশক উপরূপক আখ্যায়িত ভূষিত হতে পারে। *কেলিরৈবতক* গ্রন্থটি অধুনা বিলুপ্ত যা এককালে এই উপরূপকের আদর্শ নিদর্শন ছিল। তবে রৈবতকে অর্জুন-সুভদ্রার রঙ্গলীলার কথা প্রচলিত রয়েছে। এমনকি কাশীদাসী *মহাভারত*-এর আদিপর্বেই 'অর্জুনের নিয়মভঙ্গে বনে গমন'-তে বর্ণনায় দেখা যায় –

অর্জ্জুনে লইয়া পরে দেবকী-নন্দন ।
রৈবতক নামে গিরি করেন গমন ।।
গোবিন্দের আজ্ঞায় তথায় যদুগণ ।
রৈবতক-পর্ব্বেতে পূর্ব্বে করেছে গমন ।।
হেনকালে সুভদ্রা যে বসুদেবসুতা ।
প্রথম যুবতী সর্ব্বরূপগুণযুতা ।।
বিচিত্র কবরীভার সুচাঁচর চুল ।
মেঘেতে সঞ্চারে যেন কুরআন ফুল ।।
তার গন্ধে মন্দির ত্যজি অলিকুলে ।
চতুর্দ্দিকে ঝঙ্কারিয়া অনুক্ষণ বুলে ।।[৫৫]

এই উদ্দীপনা থেকেই কাম, ললিত হাব-ভাব-বিলাস, ভোগবাসনার আবহ বুঝতেই পারছি। তাই 'কেলি-রৈবতক' নাম দেখেই অনুমান করাই যায় এখানে গোপিনীদের সাথে কৃষ্ণের নৃত্যকলা এক বিশেষ ভূমিকা রাখে। বাংলা সাহিত্যেও এই শব্দের বিপুল সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। মোহনদাসের পদে পাওয়া যায় –

হল্লীষক-রঙ্গে মৃগ-মৃগী সঙ্গে
পিঞ্ছ পসারি শিখী ।[৫৬]

অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের সাহচর্য থেকে এই নৃত্যধারা বা নাট্যধারাটি কখনওই বিযুক্ত নয়।

❖ **ভাণিকা :**

'নাটক' থেকে 'নাটিকা'-য় লিঙ্গান্তরের ম'তই এখানেও 'ভাণক' থেকে 'ভাণিকা' হওয়ারই নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ার কথা। শারদাতনয়ের *ভাবপ্রকাশ*-এর লক্ষণটিও *সাহিত্যদর্পণ*-এর লক্ষণের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করেনা। এমনকি *সংগীতদামোদর* গ্রন্থে বিশ্বনাথোক্ত ভাণিকা-কে 'ভাণী' শব্দ দ্বারা উল্লিখিত করা হয়েছে[৫৭]। শব্দটি যে ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, তা হ'ল √'ভণ্'। কোনও কিছু শব্দ করা বোঝাতে এই ধাতু বিহিত। অর্থাৎ স্বরপ্রক্ষেপণ বা বাচিক অভিনয়ের প্রাধান্যের জন্যই 'ভাণ' এই শব্দটির উদ্ভব ঘটেছিল একসময়। এই ভাণ দু'প্রকার। একটি রূপকবিশেষ, অন্যটি নৃত্য। দুটির মধ্যে যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তা হ'ল আহার্য অভিনয়কে রিক্ত ক'রে শুধুমাত্র আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের মাধ্যমে একজন নটের বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর অবস্থানুকরণ। ভাণনৃত্যে বিষ্ণুর অবতারাদি বর্ণনার জন্য বিভিন্ন অঙ্গহার, করণ, গতিপ্রচার ইত্যাদি ব্যাকরণসম্মত বিধি আয়ত্ত করার মাধ্যমে সেই অবস্থাকে ভাবাভিনয়ে ব্যক্ত করা হ'ত। কে এইচ ত্রিবেদী কর্তৃক সম্পাদিত *নাট্যদর্পণ* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে "Bhāna is dominated mainly by vigorous action while the latterr is found to be tender and graceful"[৫৮]। অর্থাৎ নাটিকা যেমন স্ত্রীচরিত্রের প্রাধান্য এবং প্রচুর ত্রৌর্যত্রিকের ব্যবহারেই তা নারীপ্রধান অভিনয়কলা হয়ে পড়েছিল, ভাণিকা-ও তেমনই ললিত ও সুচারু অভিনয়ে তা নারীপ্রধান অভিনয় হিসেবেই জনসমাদৃত ছিল। এমনকি *সাহিত্যদর্পণ*-এ ভাণিকা-র লক্ষণেও দেখা গেছে যে নায়িকার প্রাধান্যকে কখনওই খর্ব করা হয়নি। *কামদত্তা* তার নিদর্শন হলেও এই গ্রন্থ অনুপলব্ধ। তবে নামকরণটি প্রমাণ করে এটি নিঃসন্দেহেই নায়িকার নামানুসারেই ধার্য হয়েছে। খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে রূপগোস্বামীকৃত *দানকেলিকৌমুদী* তুলনায় পরিশীলিত। এখানে নায়িকা রাধা। তাছাড়াও ললিতা, বিশাখা, নান্দীমুখী, পৌর্ণমাসী ইত্যাদি সখীগণের স্বল্প উপস্থিতি। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে নায়ক কৃষ্ণ। তাছাড়াও অর্জুন, সুবলও নাট্যফলের জন্যই প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তে স্থানগ্রহণ করেছে। এখানে হাস্যরসের উপস্থাপনাও লক্ষণীয়।

২.২ উপরূপকের শ্রেণিবিভাগ : সমকালীন দৃষ্টিকোণ :

উপরূপকগুলির নামকরণের তাৎপর্য অনুধাবন করতে যথাসাধ্য চেষ্টার পরে এখন গন্তব্য উপরূপকের শ্রেণিবিভাজন। উপরূপকগুলির শ্রেণিবিভাজন ভারতের মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সাপেক্ষেই করা হতে চলেছে বর্তমানের অঙ্গনে। বিশ্বনাথ কবিরাজ কর্তৃক স্বীকৃত অষ্টাদশ উপরূপককে দ্বিধাবিন্যস্ত করতে পারি। তন্মধ্যে প্রথমটি হ'ল গঠনগত শ্রেণিবিন্যাস এবং শেষেরটি হ'ল চরিত্রগত শ্রেণিবিভাগ। এই শ্রেণিবিভাজন পদ্ধতিটি কেবলমাত্র ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের ঐতিহ্য এবং পরম্পরাকে আদর্শ ধরেই করা হয়েছে। উপরূপকব্যাখ্যাতা যথা ভরত, অভিনবগুপ্ত, ধনিক, ভোজদেব, শারদাতনয়, হেমচন্দ্র, রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র, সাগরনন্দী, অমৃতানন্দযোগী, বিশ্বনাথ, শুভঙ্করের ম'ত পণ্ডিতদের দ্বারা প্রদত্ত লক্ষণগুলির প্রেক্ষিতে কৃত হয়েছে।

❖ গঠনগত শ্রেণিবিভাগ :

যদিও ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের পরম্পরায় উপরূপকের কোনও শ্রেণিবিভাজন করা হয়নি তবুও এগুলির বৈশিষ্ট্য অনুসারে বর্তমানে অষ্টাদশ উপরূপকগুলিকে ভিন্ন গোত্রে সজ্জিত করতে পারি। তবে এই শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে দু'টি পদ্ধতিতে। প্রথমতঃ ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* থেকে *সংগীতদামোদর* পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন গ্রন্থের মতাদর্শে এবং দ্বিতীয়তঃ আধুনিককালের কয়েকটি উপরূপকের উদাহরণের সাপেক্ষে। প্রথম পদ্ধতিতে দু'প্রকার উপরূপকের শ্রেণী পাওয়া যায়। যথা সংগীতপ্রধান উপরূপক এবং অভিনয়প্রধান উপরূপক। এই নামদুটি স্বীকরণের সপক্ষে যুক্তি কী ? তার উত্তরে বলা যায় যে প্রথম প্রকার ভেদে এমন ধরনের উপরূপকগুলিকেই নির্বাচন করা হয়হয়েছে যেখানে সংগীত থেকেই উপরূপকগুলির জন্ম। দ্বিতীয় প্রকার ভেদে যে উপরূপকগুলিকে রাখা হয়েছে যেখানে গদ্য ও পদ্য এই মিশ্র পদ্ধতিতে চতুর্বিধ অভিনয়ের ভারবত্ব-ই উপজীব্য। সংগীত থেকে সেই উপরূপকগুলির জন্ম হয়নি। এই দু'টি নির্বাচনের প্রসঙ্গে কয়েক শতাব্দীযাবৎ প্রচলিত পরম্পরাকেই প্রামাণ্য হিসেবে চিহ্নিত করতে পারা যায়। *দশরূপ* থেকে *সংগীতদামোদর* পর্যন্ত উপরূপকগুলির বিবর্তনকে কেন্দ্র ক'রেই এই বিভাগদুটির অবতারণা। এখন এই বিভাগদ্বয় সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

▪ সংগীতপ্রধান উপরূপক :

দশরূপ গ্রন্থে সপ্ত নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায় যা তৎপূর্বের কোনও গ্রন্থে উপলব্ধ নয়। তাই এর পূর্বকালীন কোনও নাট্যশাস্ত্রবিধায়ক গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত থাকার কারণে এটিকেই প্রথম ব'লেই স্বীকার করতে হয়। আবার *শৃঙ্গারপ্রকাশ* গ্রন্থের দ্বাদশ পদার্থাভিনয়ের প্রকারান্তরে নৃত্যকলাকেই দ্যোতিত করে[৫৯]। সেগুলির মধ্যে ভাণক এবং নর্তনক বাদে দশটিই উপরূপক পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। এমনকি *কাব্যানুশাসন* -এ 'গেয়' বিশেষণটিই সাক্ষ্য দেয় যে তৎকালীন সময়ে এগুলির সংগীতময়তার প্রাধান্য[৬০]। আবার *সাহিত্যদর্পণ*-এ উপরূপকগুলির লক্ষণবিধানে একাধিক স্থানে গানের অনুষঙ্গ রয়ে গেছে। নাট্যরাসকের ক্ষেত্রে 'বহুতাললয়স্থিতিঃ'[৬১], প্রস্থানক-এ 'লযতালাদির্বিলাসঃ[৬২], উল্লাপ্য-এ 'অস্রগীতমনোহরম্'[৬৩], কাব্য-এ 'খণ্ডমাত্রাদ্বিপদিকাভগ্নতালৈরলংকৃতম্'[৬৪], শ্রীগদিত-তে 'গাযেত্ কিঞ্চিত্'[৬৫], বিলাসিকা-তে 'দশলাস্যাঙ্গসংযুতা'[৬৬], হল্লীশ-এ 'বহুতাললযস্থিতিঃ'[৬৭] এই পদগুলির গুরুত্বে সহজেই অনুমিত হয় যে তৎকালীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই নাট্যশৈলীগুলির প্রযোজনায় গান ছিল সমবায় সম্বন্ধে। অন্যদিকে শারদাতনয়ের মননে উপরূপকগুলি সেসময় একাধারে নৃত্ত এবং রূপক। সুতরাং উপরূপকমাত্রেই তা নৃত্যনাট্য হবে এরূপ সংশয় এককোটিক সম্ভাবনা থেকে যায় কিন্তু শারদাতনয়ের উত্তরকালে বিশ্বনাথ কবিরাজের সময়ে উপরূপকগুলি শুধু নৃত্তরূপক-ই নয়; বরং তা 'উপরূপক'। তাই বিশ্বনাথ কবিরাজ ও তাঁর পূর্বাচার্যগণের সম্মিলিত ভাবনায় বিচার করতে হবে। নৃত্য থেকে উদ্ভিন্ন হয়ে পরবর্তীতে যেগুলি নৃত্যাত্মকতা অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছে, সেগুকিকেই সাংগীতিক উপরূপকের ছত্রে আনা যায়। আবার পরোক্ষভাবে কৈশিকী বৃত্তি-র প্রাকট্য ধ্বনিত করে দেয় গোষ্ঠী ও দুর্মল্লিকা উপরূপকে। আবার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মতানুসারে নৃত্যশিল্পের অগ্রাধিকার রয়ে যায় শিল্পক উপরূপকে। এমনকি রাসক উপরূপকটিও *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*-এর নিদান

অনুযায়ী নৃত্যে জারিত[৬৮]। তাই প্রস্তাবিত বিভাগে রাখা যায় মোট দশটি উপরূপককে। যথা গোষ্ঠী, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, রাসক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা এবং হল্লীশ। অর্থাৎ মোট দশটি উপরূপক এই পর্বে গ্রহণযোগ্য।

- **অভিনয়প্রধান উপরূপক :**

উপরিউক্ত উপরূপকগুলি ব্যতিরেকে বাকি আটটি উপরূপক নাট্যপ্রধান। এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে ভোজদেব এবং হেমচন্দ্রের বিধানানুসারে নাটিকা, ত্রোটক, সট্টক, প্রেঙ্খণ, সংলাপক, দুর্মল্লিকা, প্রকরণিকা এবং ভাণিকা এই নাট্যপ্রযোজনাগুলিতে সংগীত অবকাশ লাভ করলেও গদ্য ও পদ্যকে অতিক্রম করতে পারেনি। যদিও ভোজদেবের *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-এর অভিধায় দুর্মল্লিকা এবং প্রেক্ষণক (প্রেঙ্খণ) পদার্থাভিনয়েরই যোগ্য তবুও এতে কৈশিকী বৃত্তির একচ্ছত্র আধিপত্য নেই। সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন প্রেঙ্খণ উপরূপক হ'ল 'সর্ববৃত্তিসমাশ্রিতম্'[৬৯]। এমনকি বর্তমানে উপলবদ্ধ কয়েকটি প্রেঙ্খণের আলোকে বিচার করতেই পারি যে এটি নাট্যনির্যাসেই প্রতিষ্ঠিত। আবার নাটিকা ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* থেকে শুরু ক'রে *সংগীদামোদর* পর্যন্ত সর্বত্রই একটি স্বঘোষিত উচ্চাসন অধিকার করতে সক্ষম। নাটিকার লক্ষণেও *সাহিত্যদর্পণ*-এ পাওয়া যায় 'সংগীতব্যাপৃতা' শব্দটি[৭০]। তবে এটিই নাটিকা-র গীতিধর্মিতা বা গীতিপ্রাচুর্যের লক্ষণ নয়। তার কারণ এটি নায়িকার বিশেষণ। নাটিকা উপরূপকের নায়িকা হবে সংগীতকলার সঙ্গে সংযুক্ত। সেটি তার নেপথ্য পরিচয়। *রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা* ইত্যাদি নাটিকাতে গানের মহিমায় উদ্ঘোষিত নয়। পূর্বোক্ত সংগীতপ্রধান উপরূপকগুলির বিশিষ্টতাতেই যেমন তাল, লয় ইত্যাদির অনুষঙ্গ থাকবে ব'লেই বিশ্বনাথ কবিরাজ জানিয়েছেন,সেরূপ কোনও সংযুক্তি নাটিকার লক্ষণে নেই। তাই এটি ওই পর্যায়ে অগণ্য। আবার ত্রোটক নাটকেরই একটি প্রকারভেদ এমন মান্যতাও পূর্বে প্রদর্শিত। তাই নাটকের সুরভি ত্রোটকে এবং নাটিকার সুরভি সট্টকে অনুভব করা যায়। সংলাপক উপরূপকটিও একদা গীতাকারে বা নৃত্তাকারে পরিবেশিত হয়ে থাকলেও নৃত্যকে সঙ্গী ক'রেই যথাযথ রূপকত্বের দাবি জানায় খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে। অর্থাৎ প্রথম পর্বের উপরূপকগুলির সঞ্জীবনী 'আত্মা'-ই হ'ল সংগীত এবং দ্বিতীয় পর্বের উপরূপকগুলির 'অঙ্গ' হ'ল সংগীত। ইন্দ্রা চক্রবাল উপরূপকো কা উদ্ভব ঔর বিকাস গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন –

नाट्यग्रन्थों में रुपक एवं गोण रूपक के विवेचन से स्पष्ट है कि नाटिका, सट्टक, त्रोटक, संचालक और उल्लासमय के विषय में आचार्यों में संश्लिष्ट विवाद रहा है अर्थात कतिपय आचार्य इन्हें रूपकों के अन्तर्गत गिनाते हैं तो अन्य गोण रुपकों के अन्तर्गत।[৭১]

তিনি নাটিকা, প্রকরণিকা, সট্টক, সংলাপক এবং উল্লাপ্যকে সংগীতপ্রধান নাট্য হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চাননি। অর্থাৎ এই গবেষণাকার্যে উল্লিখিত দ্বিতীয় বিভাগের মধ্যে উল্লাপ্য উপরূপকটির বিষয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। তবে লক্ষণগ্রন্থের সঙ্গে লক্ষ্যগ্রন্থের আনুপাতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী তবেই কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত। ইন্দ্রা চক্রবাল তাঁর গ্রন্থের অধ্যায়ে *পার্থপাথেয়* এবং *পঞ্চভাষাবিলাস* নামক দুটি উল্লাপ্য শ্রেণীর উপরূপকের আলোচনা করেছেন[৭২]। এর মধ্যে *পার্থপাথেয়* উপরূপকটি বর্তমানে 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্' (কলকাতা) ভবনের গ্রন্থাগারে

সংরক্ষিত রয়েছে[৭৩]। সেটির পাঠগ্রহণ করার ফলে ইন্দ্রা চক্রবালের উক্তিকে খণ্ডন করা যায়না। সেখানে গান অনেকগুলি থাকলেও তা নাট্যের পরিচালিকা শক্তি নয়। গান সেখানে নাট্যটির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রেখে চলেছে। তাই শাস্ত্রীয় লক্ষণগত বিচারে উল্লাপ্য সংগীতপ্রধান উপরূপকে স্থান পেলেও *পার্থপাথেয়*-র ম'ত লক্ষ্যগ্রন্থের উপস্থিতিতে সেটিকে অভিনয়প্রধান উপরূপকের মধ্যেই ধার্য করা উচিত। তবে একটি বিষয় স্মরণে রাখতে হবে যে আধুনিক কালের কয়েকটি উপরূপক যেমন প্রেঙ্খণ, উল্লাপ্য, শ্রীগদিত এই উপরূপকগুলি হস্তগত হওয়ার ফলে এই শ্রেণিবিভাগ অসিদ্ধ হয়ে যায়।

❖ **চরিত্রগত শ্রেণিবিভাগ :**

এই বিভাগটি নির্ণীত হয়েছে উপরূপকগুলির বস্তু, নেতা এবং রসের সাপেক্ষে। তবে এই বিষয়ে সমীক্ষার পূর্বেই একথা মাথায় রাখতে হবে যে 'বৃত্ত' অর্থে নাট্যের ইতিবৃত্তের কথা বলা হয়েছে। *সাহিত্যদর্পণ* -এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপরূপকের লক্ষণাবলিকে স্মরণে রেখেই বস্তু, নায়কাদি চরিত্র, রস এবং ভাষা এই চারপ্রকার বিষয়কেই এখানে তুলে ধরা হোক। উপরূপকগুলির ইতিবৃত্তের উৎস, বিভিন্ন পাত্রপাত্রী এবং অঙ্গিরসের মাধ্যমে উপরূপকগুলির পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি কী রূপে সম্ভব হয়েছে তা জানা আবশ্যক।

বস্তুকে দু'ভাবে ধরা যায়। একটি হ'ল খ্যাতবৃত্ত (বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ইতিহাস) এবং অপরটি হ'ল কৢপ্তবৃত্ত (কাল্পনিক কাহিনি)। প্রথম ভাগে রয়েছে ত্রোটক[৭৪], উল্লাপ্য[৭৫], প্রেঙ্খণ (*বালিবধ* উদাহরণের দ্বারা অনুমেয়)[৭৬], শ্রীগদিত[৭৭] এবং হল্লীশ (*কেলিরৈবরতক* উদাহরণের দ্বারা অনুমেয়)[৭৮]। দ্বিতীয় বিভাগে রয়ে যায় নাটিকা[৭৯], গোষ্ঠী (*রৈবতকমদনিকা* উদাহরণের দ্বারা অনুমেয়)[৮০], সট্টক (লক্ষণে 'নাটিকাসম' বলা হয়েছে)[৮১], নাট্যরাসক (লক্ষণে খ্যাতবৃত্তের উল্লেখ নেই)[৮২], প্রস্থানক (উদাহরণের দ্বারা অনুমেয়)[৮৩], কাব্য (লক্ষণে খ্যাতবৃত্তের অনুল্লেখ থাকলেও উদাহরণে *যাদবোদয়* থাকায় একটি সন্দেহের জন্ম দেয়)[৮৪], সংলাপক (লক্ষণে এর ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি হবে নগরবিপ্লব, পলায়ন ইত্যাদি বিষয়কেন্দ্রিক)[৮৫], শিল্পক (লক্ষণে বলা হয়েছে যে এটির বর্ণনীয় বিষয় হবে শ্মশানাদির বর্ণনা)[৮৬], বিলাসিকা[৮৭], দুর্মল্লিকা (*বিন্দুমতী* উদাহরণের দ্বারা অনুমেয়)[৮৮], প্রকরণিকা (লক্ষণে রয়েছে 'নাটিকৈব')[৮৯] এবং ভাণিকা (*কামদত্তা* উদাহরণের দ্বারা অনুমেয়)[৯০]। ফলতঃ উপরূপকগুলির বেশিরভাগই কবিকল্পিত ইতিবৃত্তকে গুরুত্ব দেয়।

নায়কের দিক থেকে ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন নায়ক এবং ধীরোদাত্ত ব্যতীত অন্য নায়কের উপস্থিতি অনুসারে ভাগ করব। ধীরোদাত্ত গুণের নায়ক থাকে যে উপরূপকগুলিতে, সেগুলি হ'ল ত্রোটক (*সাহিত্যদর্পণ*-এ প্রত্যক্ষভাবে 'ধীরোদাত্ত' শব্দের উল্লেখ না থাকলেও *নাটকলক্ষণরত্নকোশ* অনুসারে এটি নাটকবৎ নাট্য হওয়ায় এবং *বিক্রমোর্বশী*-র দৃষ্টান্তে এর নায়ক ধীরোদাত্ত হয় বলেই স্বীকার করতে হয়)[৯১], নাট্যরাসক[৯২], উল্লাপ্য[৯৩], কাব্য[৯৪], শ্রীগদিত[৯৫] এবং হল্লীশ[৯৬]। ধীরোদাত্ত গুণরহিত অথবা নীচ ব্যক্তির ভূমিকা থাকে যে উপরূপকগুলিতে, সেগুলি হ'ল নাটিকা - ধীরললিত[৯৭], গোষ্ঠী – একাধিক সাধারণ নায়ক[৯৮], প্রস্থান – দাস নায়ক[৯৯], প্রেঙ্খণ – হীন নায়ক[১০০], রাসক – মূর্খ নায়ক[১০১], সংলাপক – পাষণ্ড নায়ক[১০২], শিল্পক – ব্রাহ্মণ নায়ক[১০৩], বিলাসিকা – হীন

নায়ক[১০৪], দুর্মল্লিকা - ধীরোদাত্ত না হলেও হীন ব্যতীত কোনও নায়ক[১০৫], প্রকরণিকা - বণিক নায়ক[১০৬] এবং ভাণিকা - মন্দ নায়ক[১০৭]। এখান থেকে বোঝা যায় যে উপরূপকগুলির মধ্যে হীন চরিত্রের নায়কের উপস্থিতি অনেকাংশেই প্রমাণিত।

নব রসের ভিত্তিতে নয়; বরং এটিকে শৃঙ্গার রস ও শৃঙ্গার ব্যতীত অন্য রসের মুখ্যতার ভিত্তিতে তৃতীয় প্রকার শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে। শৃঙ্গার রসের অন্তর্ভুক্ত উপরূপকগুলি হ'ল নাটিকা (লক্ষণে 'কৈশিকী বৃত্তি'-র উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত)[১০৮], ত্রোটক (বৃত্তিতে উক্ত 'শৃঙ্গারো'ঙ্গী')[১০৯], গোষ্ঠী[১১০], নাট্যরাসক[১১১], প্রস্থান (*শৃঙ্গারতিলক* নামকরণের দ্বারা প্রমাণিত)[১১২], উল্লাপ্য[১১৩], রাসক[১১৪], শ্রীগদিত (লক্ষণে সামগ্রিক বর্ণনার দ্বারা অনুমেয়)[১১৫], বিলাসিকা[১১৬], দুর্মল্লিকা[১১৭], প্রকরণিকা (নাটিকাতুল্য উপরূপক হওয়ার দরুণ)[১১৮], হল্লীশ (লক্ষণে 'কৈশিকী বৃত্তি'-র উল্লেখ)[১১৯] এবং ভাণিকা (*কামদত্তা* নামকরণের দ্বারা অনুমেয়)[১২০]। শৃঙ্গারভিন্ন রসে পুষ্ট উপরূপকগুলি হ'ল সট্টক - অদ্ভুত রস[১২১], কাব্য – হাস্য[১২২], প্রেঙ্খণ - বীর, রৌদ্রাদির মুখ্যতা (সামগ্রিক লক্ষণের দ্বারা অনুমেয়)[১২৩], সংলাপক - শৃঙ্গার ও করুণ ব্যতীত অন্য যে কোনও রস[১২৪] এবং শিল্পক - শান্ত ও হাস্য ব্যতীত অন্য যে কোনও রস অঙ্গিরস হলেও শৃঙ্গার রসের বিধানে কোনও বাধ্যতামূলক নিয়ম অনুপস্থিত[১২৫]। অর্থাৎ শিল্পককে যদি ঐচ্ছিকভাবে যুক্ত করে, তবে শৃঙ্গাররসপ্রধান উপরূপকের সংখ্যা হয় চতুর্দশ। সুতরাং আরও একটি বিষয় স্বচ্ছ হয়ে যায় যে উপরূপকগুলির মধ্যে কৈশিকী বৃত্তি, কামোপচার এবং শৃঙ্গার রসের আধিক্য রয়েছে।

আরও একটি উপবিভাগ করতেই পারি যা অসঙ্গত হবেনা। সেটি হ'ল ভাষাগত বৈভিন্ন্য। যেমন সট্টক[১২৬] এবং গোষ্ঠী[১২৭] উপরূপকে প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগে কথা বলেছেন বিশ্বনাথ কবিরাজ। আবার রাসকে থাকে সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষার সমপরিমাণ প্রয়োগ[১২৮]। তাই পঞ্চদশ উপরূপক সংস্কৃত ভাষায় রচিত, দুটি উপরূপক প্রাকৃত ভাষায় গ্রথিত একটিতে থাকে মিশ্রভাষা। নিম্নে চারটি ছকের মাধ্যমে উপরূপকের পারস্পরিক ভেদের বিষয়কে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল।

উপরূপক : বস্তুগত ভেদ

প্রখ্যাত বস্তু	কবিকল্পিত বস্তু
ত্রোটক, উল্লাপ্য, প্রেঙ্খণ, শ্রীগদিত এবং হল্লীশ	নাটিকা, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থানক, কাব্য, রাসক, সংলাপক, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণিকা এবং ভাণিকা

উপরূপক : নায়কগত ভেদ

ধীরোদাত্ত নায়ক	ধীরোদাত্ত ব্যতীত নায়ক
ত্রোটক, নাট্যরাসক, উল্লাপ্য, কাব্য, শ্রীগদিত এবং হল্লীশ	নাটিকা, গোষ্ঠী, প্রস্থানক, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণিকা এবং ভাণিকা

উপরূপক : রসগত ভেদ

শৃঙ্গার রস	শৃঙ্গার ব্যতীত অষ্টরস
নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, রাসক, শ্রীগদিত, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ এবং ভাণিকা	সট্টক, কাব্য, প্রেঙ্খণ, সংলাপক এবং শিল্পক

উপরূপক : ভাষাপ্রয়োগগত ভেদ

সংস্কৃত ভাষা	সংস্কৃতেতর ভাষা	মিশ্র ভাষা
নাটিকা, ত্রোটক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ এবং ভাণিকা	গোষ্ঠী এবং সট্টক (প্রাকৃত ভাষা)	রাসক (সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মিশ্রণ)

অর্থাৎ খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের ঐতিহ্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সবদিক বিচার ক'রে উপরূপকের কয়েকটি বিশিষ্টতা পাওয়া যায়। যথা উপরূপকগুলির জন্ম অধিকাংশক্ষেত্রেই কবিকল্পনার বশে। উপরূপকগুলি সংস্কৃত ছাড়াও অন্য ভাষাতে বিরচিত ও প্রযোজিত হতে পারে। উপরূপকের পাত্রপাত্রীর মধ্যে প্রাকৃত চরিত্র, অধম শ্রেণীর নায়ক, নায়িকার কলাকৌশলে পারদর্শিতা লক্ষণীয় এবং সেই সঙ্গে উপরূপকে নৃত্যগীতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উপরূপকগুলির মধ্যে যেমন সম্ভোগ শৃঙ্গার রস ধ্বনিত হয়েছে, তেমনই রতিক্রিয়া, বিবিধ কামোপচার, বৈভব, বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা এই নাট্যপ্রযোজনাগুলি।

২.৩ রূপক ও উপরূপকের পারস্পরিক সম্পর্ক : নবীন ভাবনা :

প্রথম অধ্যায়ে উপরূপকের বিবর্তন বিষয়ে দীর্ঘ বিবৃতিতে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত ডঃ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রণিধানযোগ্য অনুযায়ী একটি বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছি। একাঙ্ক রূপকগুলির উপরূপকের সংস্পর্শলাভের একটি সম্ভাবনার কথা তিনি জানিয়েছিলেন। তাই ভাণ, বীথী রূপক নাকি উপরূপক এ বিষয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েই যায়। তাই এই অধ্যায়ের প্রস্তাবিত 'একাল'-এ এই সন্দেহনিরসনের জন্যই বীথী-র চরিত্র সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা উচিত। এমনকি বীথী-র প্রসঙ্গে আধুনিক সময়ে কী ধরণের মত প্রচলিত তাও দেখার চেষ্টা করা আবশ্যক।

❖ নাটক, ঈহামৃগ ও নাটিকার সম্বন্ধ :

রূপক ও উপরূপকের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, তখন রূপকগুলির লক্ষণের সঙ্গে উপরূপকগুলির লক্ষণের তুলনামূলক বিচার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রূপকের মধ্যে নাটক ও ঈহামৃগকে একপার্শ্বে রাখা যায় এবং উপরূপকের মধ্যে নাটিকাকে আরেক দিকে রাখা যায়। নাটক ও নাটিকার বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে কিছু উদ্ধৃত মতামতের নিরীখে সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এখন ঈহামৃগ সম্পর্কে জানা যাক। *সাহিত্যদর্পণ*-এ কথিত রয়েছে "নাযকো মৃগবদলভ্যাং নাযিকামত্র ঈহতে বাঞ্ছতীতীঘামৃগাঃ যথা কুসুমশেখরবিজযাদিঃ"[১২৯]। অর্থাৎ নির্দিষ্ট রূপকবিশেষে নায়ক নায়িকাকে মৃগের ম'ত অন্বেষণ ক'রে কামনা চরিতার্থ করতে চায় ব'লেই এটির এহেন নামকরণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই রূপকে একজন নায়ক এবং অপরজন প্রতিনায়ক বর্তমান থাকে। সেই নায়ক কোনও দেবতা চরিত্রও হতে পারে তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। মনুষ্য চরিত্রও ঈহামৃগ রূপকে উপস্থিত হতেই পারে। তবে সেই নায়ক হবে ধীরোদ্ধত গুণসম্পন্ন। সেই ব্যক্তি তার প্রতি অনাসক্ত নায়িকাকে নিজের প্রতি আকর্ষিত করতে চেষ্টা ক'রে থাকে। এভাবে চারটি অঙ্কের বাঁধনে মুখ, প্রতিমুখ এবং নির্বহণ এই সন্ধিত্রয়ের আনুকূল্যে এই রূপক প্রস্তুত হয় –

ঈহামৃগো মিশ্রবৃত্তশ্চতুরঙ্কঃ প্রকীর্তিতঃ ।
মুখ-প্রতিমুখে সন্ধী তত্র নির্বহণং স্যাত্ ।।
নরাদিব্যাবনিযমৌ নাযক-প্রতিনাযকৌ ।
খ্যাতৌ ধীরোদ্ধতাবন্যো গূঢভাবাদযুক্তকৃত্ ।
দিব্যস্ত্রীযমনিচ্ছন্তীমপহারাদিনেচ্ছতঃ ।
শৃঙ্গারাভাসমপ্যস্য কিঞ্চিত্ কিঞ্চিত্ প্রদর্শযেত্ ।।[১৩০]

তাহলে ভাবানুবাদে দেখা যাচ্ছে এই রূপকের মৌল ইতিবৃত্তে একজন নায়িকাকে কেন্দ্র ক'রে দুজন পুরুষের দ্বন্দ্ব। আবার, নাটিকা উপরূপকে দেখি একজন ধীরললিত নায়কের প্রতি দুই রমণীর কামাভিলাষ। সেক্ষেত্রে

নায়কের প্রথম স্ত্রীর সমর্থন ও ঘটনাবিন্যাসের পরম্পরা অনুসারে দ্বিতীয় রমণী নায়কের সঙ্গে মিলিত হয়। নাটিকার লক্ষণে বিশ্বনাথের উক্তি –

নাটিকা ক্লৃপ্তবৃত্তা স্যাত্ স্ত্রীপ্রাযা চতুরঙ্কিকা ।
প্রখ্যাতো ধীরললিতস্তত্র স্যান্নাযকো নৃপঃ ।।
স্যাদন্তঃপুরসম্বন্ধা সঙ্গীতব্যাপৃতাথবা ।
নবানুরাগা কন্যাত্র নাযিকা নৃপবংশজা ।।
সম্প্রবর্ত্তেত নেতাস্যাং দেব্যাস্ত্রাসেন শঙ্কিতঃ ।
দেবী ভবেত্ পুনর্জ্যেষ্ঠা প্রগল্ভা নৃপবংশজা ।।[১৩১]

যেহেতু এই উপরূপকে স্ত্রী চরিত্রের বাহুল্য, তাই স্বভাবতঃ ঈহামৃগের আঙ্গিক থেকে অনেকখানি কোমল ও সুকুমার। যেহেতু দুজন পুরুষের একজন নায়িকাকে কেন্দ্র ক'রে বিবাদের সূত্রপাত, তাই সেখানে আত্মশ্লাঘা, মদ, পৌরুষের আস্ফালনের কাঠিন্য ইত্যাদির সুযোগ রয়েছে। তাই নারী ও পুরুষের সেই স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যকে দূরে রেখে যদি কেবলমাত্র বিষয়টির প্রতি অনুধাবন করি, তাহলে দেখা যায় একটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে দুটি একই কোঠায় অবস্থান করে। অলব্ধকে লাভের জন্য নারী বা পুরুষের প্রয়াস। যদিও নাটিকার ক্ষেত্রে ছলনা, কপটতার ভূমিকা নেই অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত জনের প্রতি মনোবাসনাপূরণের জন্য কোনও মিথ্যাচার করতে দেখা যায়না নায়িকাকে। তবে অন্তঃপুরস্থ নায়িকার মান ও মানভঞ্জনের রসদ নাটিকায় লক্ষণীয়। শৃঙ্গাররসপ্রধান নাটকের ক্ষেত্রে এই আধিকারিক বৃত্ত কখনও ঘনীভূত হতে পারে। যেমন *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকে রাজার প্রথমা স্ত্রীর মান বা অভিজ্ঞানশাকুন্তল নাটকে হংসপদিকার মানের উল্লেখ মেলে তবে বীররসপ্রধান নাটকে এই নায়ককে কেন্দ্র করে দুই রমণীর টানাপোড়েন বিরল দৃষ্টান্ত। তাই নাটকের একটি প্রকারভেদের সঙ্গে নাটিকার অন্তরঙ্গতা থাকে। আবার ঈহামৃগের অঙ্কসংখ্যা ও নাটিকার অঙ্কসংখ্যার পার্থক্য নেই। তবে কখনও কখনও একাঙ্ক ঈহামৃগেরও সন্ধান মেলে ব'লে বিশ্বনাথ জানিয়েছেন "একাঙ্কো দেব এবাত্র নেতেত্যাহুঃ পরে পুনঃ"[১৩২]। তবুও যেহেতু চতুরঙ্ক ঈহামৃগ দুর্লভ নয়, তাই সেদিক থেকে নাটিকার সঙ্গে একটি সাদৃশ্য রয়েই যায় । এমনকি পাঁচটি অঙ্কন ঈহামৃগে অপ্রাপ্ত। নাটিকায় অবমর্শ সন্ধির স্থান নেই এবং ঈহামৃগে অবমর্শসহ গর্ভ সন্ধিও অনুপস্থিত। তাই নাট্যদ্বন্দ্ব যা মূলতঃ গর্ভ সন্ধিতেই ক্রমাগত জটিল হয়ে ওঠে, তাও ঈহামৃগের বৈশিষ্ট্যে ধরা দেয়না। তাই বলা যায় এটির আখ্যানভাগ অনেকখানি সরলরৈখিক পথে অগ্রসর। তাই রূপক ও উপরূপকের যে বিভেদ বা দীর্ঘদিনের ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে উভয়ের মধ্যে একটি ব্যবধান রয়েই গেছে, তার সঠিক কারণ নির্ণয় বর্তমান সময়ে যথেষ্টই দুর্বোধ্য। তার কারণ ইতিবৃত্ত যদি নাট্যশরীর হয়, তবে তার ভাবস্পন্দন যেমন রূপকেও বর্তমান তেমনই উপরূপকেও প্রকাশিত।

❖ উপরূপক ও ভাণ :

ভাণ নামক রূপকটিই দশরূপকের মধ্যে সর্বাধিক বিতর্কিত রূপক ব'লেই মনে করা যেতে পারে। সেখানে রূপকের সংজ্ঞার অব্যাপ্তি দোষ এসে পড়ে। এমনকি সাহিত্যদর্পণকৃৎ বলেছেন "অত্রাকাশভাষিতরূপপরবচনমপি স্বযমেবানুবদনুত্তর-প্রত্যত্তুরে কুর্য্যাৎ"[১৩৩]। এখানে পঞ্চধা নাট্যোক্তির মধ্যে উপজীব্য হ'ল আকাশভাষিত। আকাশভাষিতে সাধারণতঃ একজন পাত্র অপর কোনও পাত্রপাত্রীর কথা শুনে তার উত্তর দিয়ে থাকে। যা সহৃদয় প্রেক্ষকের কাছে অশ্রাব্য, তা সেই চরিত্রের কাছে শ্রাব্য। এরকম দৃষ্টান্ত নাটকেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক বসন্তকের একটি আকাশভাষিত নাট্যোক্তির মাধ্যমে অভিনয়ের নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। তাই ভাণ রূপক স্বতন্ত্র রূপকের সমান্তরালে কখনও কখনও কোনও অন্য রূপকেও ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমানে বাংলা বা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত নাট্যে একক চরিত্র দেখা যায়। যেমন ছত্তিসগঢ়ের লোকনাট্য 'পাণ্ডবাণী' একম চরিত্রনির্ভর। সেখানে দ্রৌপদীর ক্ষোভ, অন্তরের ব্যথা প্রকাশিত হয়। সেখানে চরিত্রানুগ চিত্রকল্প তৈরি হয়না আহার্য অভিনয়ের মাধ্যমে। যদিও ভাণে বিট বা কথকের চরিত্রের নিজস্ব পোশাকবিধি রয়েছে। তবুও সে যখন অন্যান্য চরিত্রকে অনুকরণ করে, তখন সহৃদয় সেই উক্ত চরিত্রেরই অনুভব করে। তাই এই রূপক একদিক থেকে বর্তমানের শ্রুতিনাটক ধারারও পূর্বসূরী বলা যায়। যদি গুণমানের দিক থেকে রূপক ও উপরূপকের পার্থক্য নিরূপণ করতেই হয়, তবে ভাণ রূপককে উপরূপকের শ্রেণীতে রাখলেও ক্ষতি হতনা। আচার্য শুভঙ্করের *সংগীতদামোদর* পর্যন্ত কিছু লক্ষণগ্রন্থে রূপকের মধ্যে কয়েকটি উপরূপক যুক্ত হলেও ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এ কথিত দশটি রূপকের কোনওটিই পরিত্যক্ত হয়নি। ভারতীয় নাট্য-ঐতিহ্যের এটিই একটি রীতি। আবার ভাণ এবং নাট্যরাসক দুক্ষেত্রেই দশবিধ লাস্যাঙ্গ অনুসৃত হয়। তাই লাস্যাঙ্গ যদি কিঞ্চিৎ নৃত্যের অনুলেপন হয়ে থাকে, তবে তা রূপক এবং উপরূপক দুক্ষেত্রেই বিদ্যমান।

❖ উপরূপক ও বীথী :

সাহিত্যদর্পণ-এ বীথী-র লক্ষণটি নিম্নলিখিত –

> বীথ্যমেকো ভবেদঙ্কঃ কশ্চিদেকো'ত্র কল্প্যতে ।
> আকাশভাষিতৈরুক্তৈশ্চিত্রাং প্রত্যুক্তিমাশ্রিতঃ ।।
> সূচযেদ্ ভুরিশৃঙ্গারং কিঞ্চিদন্যান্ রসান্ প্রতি ।
> মুখনির্বহণে সন্ধী অর্থপ্রকৃতিযো'খিলাঃ ।।[১৩৪]

অর্থাৎ বীথী হ'ল এমন একটি একাঙ্ক রূপক যেখানে একজন উত্তম বা মধ্যম বা অধম যে কোনও একপ্রকার নায়ক থাকবে, আকাশভাষিত নাট্যোক্তির মাধ্যমে শৃঙ্গারাদি রসের সূচনা থাকবে যা কেবলই সহৃদয়বেদ্য, মুখ এবং নির্বহণ এই দুটি সন্ধি থাকবে কিন্তু তা বীজ-বিন্দু-পতাকা-প্রকরী-কার্য এই পঞ্চম অর্থপ্রকৃতির সমন্বয়ে আত্মতুষ্টি বিধান করবে। সুতরাং বীথীতে একটি আধিকারিক ইতিবৃত্তের সমান্তরালে একটি প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তেরও

সহাবস্থানকে উপেক্ষা করা যাবেনা। এমনকি সাহিত্যদর্পণকার এরই সঙ্গে যুক্ত করেছেন যে বীথী ত্রয়োদশ অঙ্গে আভূষিত হবে। এগুলি হ'ল যথাক্রমে উদঘাত্যক, অবলগিত, প্রপঞ্চ, ত্রিশ, ছল, বাককেলি, অধিবল,গণ্ড,অবস্যন্দিত,নালিকা, অসৎপ্রলাপ, ব্যাহার এবং মৃদব –

অস্যাস্ত্রয়োদশাঙ্গানি নির্দ্দিশন্তি মনীষিণঃ।
উদ্ঘাত্য(ত) কাবলগিতে প্রপঞ্চস্ত্রিগতং ছলম্।।
বাক্কেল্যধিবলে গণ্ডেমবস্যন্দিতনালিকে।
অসৎপ্রলাপব্যাহার মৃদুবাণি চ তানি তু।।[১৩৫]

এগুলির মধ্যে প্রথম দুটি প্রস্তাবনার প্রকারভেদ। নাট্যারম্ভে প্রস্তাবনা বাঞ্ছনীয়। সেই প্রস্তাবনায় ভারতী বৃত্তির আশ্রয় নিতে হয় – "ঋতুং কঞ্চিদুপাদায ভারতীং বৃত্তিমাশ্রযেত্"[১৩৬]। প্রস্তাবনা বা আমুখে সূত্রধার, নটী, পারিপার্শ্বিক এরা সাধারণতঃ কথোপকথনের মাধ্যমে কী নাট্য উপস্থাপিত হতে চলেছে, কোন্ সময়ে অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেই নাট্যের প্রণেতা কে, সেই নাট্যের মূল প্রতিপাদ্য কী প্রভৃতি তথ্য সহৃদয়বর্গের কাছে তুলে ধরেন। তাই সেক্ষেত্রে নটীর বেশভূষা কালোপযোগী হয় ব'লে 'নেপথ্যবিধান' বা আহার্যাভিনয় থাকলেও আঙ্গিক এবং সাত্ত্বিক অভিনয় তুলনায় লঘু হয়ে যায় বাগভিনয়ের ভারে। নাট্য সম্পর্কিত তথ্যাবলির জন্য বাচিক অভিনয়ই একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। তাই বাকপ্রধান ভারতী বৃত্তির আতিশয্য কোনও চমৎকৃত ঘটনা নয়। তবে এই ভারতী বৃত্তির প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন -

ভারতী সংস্কৃতপ্রাযো বাগ্ব্যাপারো নটাশ্রযঃ।
ভেদৈঃ প্ররোচনাযুক্তৈর্বীথীপ্রহসনামুখৈঃ ।।[১৩৭]

চতুর্বিধ বৃত্তির মধ্যে ভারতী বৃত্তি অন্যতম যা কেবলই বাচিক অভিনয়ের দ্বারাই অভিনেয় বৃত্তিবিশেষ। এটির ভেদে রয়েছে প্ররোচনা, বীথী, প্রহসন এবং আমুখ। অথচ ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে প্রহসন ও বীথী 'রূপক' পর্যায়ে অন্তর্গত। তাহলে এখান থেকেই প্রকারান্তরে প্রহসন ও বীথীর গৌরব ম্লান হয়ে যায়। এই দুটি রূপক স্বতন্ত্রভাবে যত না প্রতিষ্ঠিত, তার থেকে প্রস্তাবনার সুবিধার্থে এদের ভূমিকা অধিক হয়ে যায়। এমনকি বীথীর ত্রয়োদশ অঙ্গের প্রয়োগের কথাও বলা হয়েছে "বীথ্যঙ্গান্যামুখাঙ্গত্বাদুচ্যন্তে'ত্রৈব তত্ পুনঃ"[১৩৮]। তাই বীথীর অঙ্গ সম্বন্ধে স্বল্প পরিসরে অবগত হওয়া যাক। উক্ত গ্রন্থেরই ২৫৭-৬৩ নং কারিকায়[১৩৯] এই ত্রয়োদশ অঙ্গ সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

ক) উদঘাত্যক – এক প্রকার প্রস্তাবনা। এখানে শ্লেষ অলংকার থাকে। প্রস্তাবনার শেষে যা উক্ত হয়, সেই শ্লোক বা বাক্যের মধ্যে কোনও একটি পদের অপর একটি অর্থ গ্রহণ করে নাট্যস্থ পাত্র।

খ) অবলগিত – একপ্রকার প্রস্তাবনা। এখানে একটি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ের অবতারণা হয়ে থাকে।

গ) প্রপঞ্চ – পরস্পরের মধ্যে মিথ্যা হাস্যকর বাক্যবিনিময়।

ঘ) ত্রিগত – ত্রি শব্দের অর্থ তিন। এখানে শ্রুতিসাম্যের জন্য একই বাক্যের অনেকগুলি অর্থের সম্ভাবনা থাকে। এখানে কাকু বক্রোক্তির ভূমিকা থেকে যায়। আবার অন্যমতে মূলতঃ তিনপ্রকার বিষয়ে কথার জন্য এই নামকরণ।

ঙ) ছল – এখানে কাউকে প্রলুব্ধ করার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা ছলনা বা কপটতা।

চ) বাককেলি – দুটি বা তিনটি বাক্য থেকে হাস্যরসের ভাব ব্যঞ্জিত হলে তাকে বাককেলি বলা হয় অথবা অনেকগুলি প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর হলে তাও বাককেলি। আবার এই মতও প্রচলিত যে সাকাঙ্ক্ষ বাক্যের প্রয়োগের নৈপুণ্য-ই হ'ল বাককেলি।

ছ) অধিবল – সাধারণতঃ বীর ও রৌদ্ররসোদ্দীপক বাক্য।

জ) গণ্ড – এখানে বস্তুধ্বনির প্রয়োগ দেখা যায়। একটি বাক্যের থেকে অনুক্ত বিষয়ের অনুমান থাকে।

ঝ) অবস্যন্দিত – আত্ম-অভিপ্রায়বোধক কোনও উক্তির অন্যপ্রকার ব্যাখ্যান।অর্থাৎ কোনও উক্তির মাধ্যমে অপরকে কথিত বাক্য যখন নিজেরই অবচেতন মনের গভীর অর্থ তুলে ধরে, তা-ই হয় অবস্যন্দিত।

ঞ) নালিকা – অভিপ্রেত অর্থকে সচেতনভাবে গোপন রেখে প্রহেলিকার সাহায্যে হাস্য রসের দ্যোতনায় পরিবেশন করার নামই নালিকা।

ট) অসৎপ্রলাপ – প্রশ্নবাক্যই এখানে উত্তর। অর্থাৎ প্রশ্নের মধ্যেই এমন তথ্য দেওয়া হয় যা উত্তরের অপেক্ষা রাখেনা। এমনকি মূর্খের সামনে হিতবাক্যের উচ্চারণও এর অন্তর্ভুক্ত যা বাস্তবে মূঢ় ব্যক্তির জন্য বিফল।

ড) ব্যাহার – অপরের জন্য হাস্য এবং মানসিক ক্ষোভ উদ্রেককারী বাক্য।

ঢ) মৃদব – দোষের মধ্যে গুণ এবং গুণের মধ্যে দোষের আভাস এই অঙ্গের কার্য।

এই অঙ্গগুলির বর্ণনা থেকেই প্রমাণিত হয় এগুলি বাস্তবিকপক্ষে বাচিক অভিনয়ের দ্বারাই সম্পাদ্য। এমনকি পরোক্ষভাবে একটি নাট্যরচনাকে আদর্শ মানতে হলে এগুলি নাট্যকারকে সচেতনভাবে মেনে চলতে হবে। তবে বীথীর অঙ্গগুলির বর্ণনার ক্ষেত্রে দশরূপকার এবং সাহিত্যদর্পণকার কোনও বীথী রূপক থেকে উদাহরণ অনুসন্ধান করেননি। *মালবিকা* নামক একটি বীথীর উল্লেখ করলেও বিশ্বনাথ কবিরাজ সেই বীথী থেকে কোনও উদ্ধৃতি দেননি। এমনকি এই নামাঙ্কিত কোনও আদর্শ বীথী বর্তমানে অনাবিষ্কৃত। তাই বীথীর সম্যক ধারণা থেকে সহৃদয় পাঠকবর্গ বঞ্চিত। বীথী রূপকের যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বর্তমানে কোনও প্রযোজনাকে বিচার করতে পারব, সেগুলি হ'ল এটি একাঙ্ক রূপক হতে হবে, এই নাট্যরচনায় যে কোনও একজন নায়ক চরিত্র থাকবে, এই নাট্যরচনার নাট্যোক্তিগুলিকে আলংকারিক দিক থেকে উচ্চ মানের হতে হবে, এখানে বিবিধ রসের ব্যঞ্জনা থাকবে এবং সর্বোপরি এটি এমন একটি সন্দর্ভ হবে যা মূলতঃ বাচিক অভিনয়েই সহৃদয়ের হৃদয়রযঞ্জন করবে। তাই পরিশেষে বলতেই হয় বীথীর ভাষাবিধান সম্পর্কে ভরত, ধনঞ্জয়, বিশ্বনাথ কবিরাজের কেউই কোনও ব্যতিক্রমী মত দেননি। তাই ধরে নিতে হয় এর ভাষা হবে সংস্কৃত।

বর্তমান সময়ে এই রূপকের অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৯৩২ সালে শ্রদ্ধেয় বাণীকুমারের রচনা বসন্তেশ্বরী যা পরবর্তীতে 'মহিষাসুরমর্দিনী' আখ্যা পায় এবং মহালয়া অমাবস্যার প্রভাতে আকাশবাণী কলকাতা থেকে বেতারে সম্প্রচারিত হয়ে আসছে, সেটির পরিচয় একটি 'বীথী' এমন তথ্য স্বয়ং রচনাকার দিয়েছেন। ভবেশ দাসের সম্পাদনায় *কলকাতা বেতার : দ্বিতীয় ভাগ* গ্রন্থের মহিষাসুরমর্দিনী-র উপক্রমণিকা প্রবন্ধে বাণীকুমারের উক্তিটি হ'ল-

সাধারণত সংগীতবহুল অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্য অধিক আদরণীয় ছিল। সেই সূত্রে শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে বসন্তেশ্বরী নামে একটি চম্পূ রচনা করি ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে।... বন্ধুবর সংগীতপণ্ডিত হরিশচন্দ্র বালীর সুর-সর্জনে রাগ বসন্ত এবং দেশী, দেবগিরি, বরাটী, তোড়ী, ললিতা ও হিন্দোলী-এই ছয় রাগিনী বাণী-সংযোগে এক অপূর্ব রসের সঞ্চার হয়।... জনচিত্তে বসন্তেশ্বরী-র অশেষ আবেদন সৃষ্ট হওয়াতে শারদীয়া পূজা উপলক্ষে ষষ্ঠীর ঊষাকালে শ্রীশ্রীচণ্ডী-বর্ণিত মহাদেবীর লীলা-অবলম্বনে রূপিত একটি অভিনব সংগীত-বহুল অনুষ্ঠান-প্রয়োগের সংকল্প গৃহীত হয়। আমি সংস্কৃত রূপকের অন্তর্গত 'বীথী' (বা oratorio) নাট্য&রচনাশৈলী অনুসরণে নবাবের মহিষাসুরমর্দিনী প্রণয়ন করি, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে।... ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে ষষ্ঠীর নির্দিষ্ট ঊষা-লগ্নে এক অভূতপূর্ব রস-মহিমায় মণ্ডিত হয়ে এই বীথী-রূপিকা শরতের আকাশকে শান্ত-পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ করে তুললে।[১৪০]

এখানই থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে বাণীকুমারের সংস্কৃত সাহিত্য, নাট্য পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ছিল। তথাপি তিনি কোনও প্রত্যক্ষ নেতৃচরিত্র উপস্থাপিত না করে কথকতার ভঙ্গিতে বীথীর পরিবেশন করেছেন। বলাই বাহুল্য যে একজন কথক পৌরাণিক আখ্যানটি বাচিক অভিনয়ের মাধ্যমেই পরিবেশন করেছেন। তাই এটিই অনুমিত হয় যে আধুনিককালে যা 'গীতি-আলেখ্য' নামক একটি অনুষ্ঠান জনসমাজে আদৃত, তা বস্তুতঃ বীথী এবং তা আদ্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত না হতেও পারে। যেহেতু বাণীকুমার *মার্কণ্ডেয় পুরাণ*-কে উৎসরূপে ব্যবহার করলেও গদ্যাংশে বাংলা ভাষার ব্যবহার করেছেন। অতএব বাংলা ছাড়াও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় বীথীর গ্রন্থনা সম্ভব। যেহেতু গানের ব্যবহারের ঔচিত্য সম্পর্কে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রমূলক গ্রন্থগুলি কোনও নির্দেশ দেয়নি, তাই 'মহিষাসুরমর্দিনী'-তে একাধিক গানের প্রয়োগ প্রমাণিত করে যে বীথী নাট্যধারায় গান অস্পৃশ্য নয়। 'রূপিকা' এই বিশেষ শব্দটির মাধ্যমে হয়ত বাণীকুমার বীথীকে গৌণ রূপক বলতে চাইলেন যেখান থেকে রূপক এবং উপরূপকের অতিরিক্ত একটি তৃতীয় ভেদ স্বীকৃত হয়। আবার এটি ছিল শ্রব্যকাব্য। বেতারে সম্প্রচারিত হওয়ার কারণে এখানে দৃশ্যমানতার চিহ্নমাত্র নেই। বর্তমানে এটি দৃশ্যশ্রব্যাত্মক ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়। সেখানে কুশীলবেরা নৃত্য তথা আঙ্গিক অভিনয়ের মাধ্যমেই বস্তুর রসব্যঞ্জনা ঘটিয়ে থাকেন। তাই ভাণের ম'ত এখানেও সরাসরিভাবে রূপের আরোপ দেখা যাচ্ছেনা। তাই প্রাচীন বা মধ্যযুগের নাট্যতত্ত্ব অনুসারে ভাণ এবং আধুনিক যুগের নিদর্শন অনুসারে বীথী একটি গোত্র তৈরি করে যা লক্ষণাক্রান্ত উপরূপকের থেকে ভিন্ন।

❖ **ব্যায়োগ, সমবকার, ও প্রেঙ্খণের সম্বন্ধ :**

এরপরে আসতে হয় আরও একটি বিচারে। এক্ষেত্রে দুটি রূপক যথা ব্যায়োগ ও সমবকার এবং একটি উপরূপক প্রেঙ্খণকে গ্রহণ করা যাক। সমবকার এবং ডিম দুটিই বীর-রৌদ্র রসের আকর। প্রথমে বলতে ব্যায়োগের কথা। বিশ্বনাথ বলেছেন –

> খ্যাতেতিবৃত্তো ব্যাযোগঃ স্বল্পস্ত্রীজনসংযুতঃ ।
> হীনো গর্ভবিমর্ষাভ্যাং নরৈর্বহুভিতাশ্রিতঃ ।।
> একাঙ্কশ্চ ভবেদস্ত্রীনিমিত্তসমরোদযঃ ।
> কৈশিকীবৃত্তিরহিতঃ প্রখ্যাতস্তত্র নাযকঃ ।।[১৪১]

অর্থাৎ কৈশিকীবৃত্তিরহিত এই রূপক হবে একাঙ্ক এবং এখানে নারীঘটিত বিষয় ব্যতীত অপর কোনও হেতুবশতঃ যুদ্ধ, সংগ্রাম থাকবে। এটি ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় পুরাণের কোনও আখ্যানের অবলম্বন রচিত হবে এবং নারী চরিত্র এখানে ক্ষীণ।

এরপর গন্তব্য সমবকার। এটির বিষয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণ*-এ বলেছেন-

> বৃত্তং সমবকারে তু খ্যাতং দেবাসুরাশ্রযম্ ।
> সম্বন্ধো নির্বিমর্ষাস্তু ত্রযো'ঙ্কাস্তত্র চাদিমে ।[১৪২]

সমবকার এই রূপকটি একাধিক বিষয়ে নিবদ্ধ। এখানেও পৌরাণিক খ্যাতবৃত্ত প্রাধান্য লাভ করে এবং এটি দেবতা ও অসুরের দ্বন্দ্বমূলক কথার ওপর শায়িত। অর্থাৎ আধুনিক ভাবনায় ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এটি ন্যায়-অন্যায়, সততা-অসততা, শিষ্টতা-দুষ্টতার একটি দ্বন্দ্ব। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই দুটি রূপকই বীর রসে স্নাত এবং কামাচার বা প্রেমমূলক অনুষঙ্গ এখানে দূরীকৃত। এরই সমপর্যায়ের একটি উপরূপক পাওয়া যায় যার নাম প্রেঙ্খণ। সাহিত্যদর্পণকার *বালিবধ* নামক একটি প্রেঙ্খণের উদাহরণ দিলেও এই গ্রন্থ বর্তমানে দুর্লভ। তবে বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এর কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের বানররাজ বালি ও সুগ্রীবের বিরোধ কারোরই অজানা নয়। রামের সহযোগিতায় সুগ্রীব বালির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে বালির চারিত্রিক স্খলনের জন্যই সে নিহত হয়। তাই এখানেও একটি ধর্মের জয় ঘোষিত হয়।

অতএব বলা যায় একদিকে যেমন ব্যায়োগ বীররসপ্রধান যুদ্ধজয়মূলক একটি রূপক, ঠিক তেমনই প্রেঙ্খণও একজন হীন নায়কের পরাজয় তুলে ধরে। এমনকি ন্যায়-অন্যায়ের প্রবল সংগ্রামের রূপক সমবকারও সমাপ্তি পর্বে দেবতার জয়গান গায়। তাই এই তিনটি নাট্যধারাই যেন একটি অলক্ষ্যে সূত্রে আবদ্ধ। অথচ এদের গোত্রের মধ্যে বিভাজন রয়েছে – রূপক ও উপরূপক। ব্যায়োগ যেমন একাঙ্ক রূপক, তেমনই প্রেঙ্খণও একাঙ্কের অধিক অঙ্ককে আশ্রয় করেনা। এমনকি ব্যায়োগ এবং প্রেঙ্খণ উভয়ই গর্ভ ও অবমর্শ সন্ধিকে ত্যাগ করেছে –

গর্ভাবমর্ষরহিতং প্রেঙ্খণং হীননাযকম্ ।
অসূত্রধারমেকাঙ্কমবিষ্কম্ভপ্রবেশকম্ ।।[১৪৩]

তাই এতগুলি সাদৃশ্য বর্ধমান থাকা সত্ত্বেও উভয়ে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তাই আবারও অস্বচ্ছ বিধানের সম্মুখীন হই যা ভারতীয় নাট্যধারার ইতিহাসেরই একটি পরিচ্ছেদ। উপরূপক যে রূপকরূপে স্বীকৃতি পেতে পারে তার বিভিন্ন যৌক্তিক কারণ বর্তমান।

- **ডিম ও সংলাপকের সম্বন্ধ :**

আরও একটি নজির তুলে ধরা যায় ডিম এবং সংলাপকের মধ্যে। ডিমের সংজ্ঞায় বিশ্বনাথ কবিরাজের বচন –

মাযেন্দ্রজালসংগ্রামক্রোধোদ্ভ্রান্তাদিচেষ্টিতৈঃ ।
উপরাগৈশ্চ ভূযিষ্ঠো ডিমঃ খ্যাতেতিবৃত্তকঃ ।।
অঙ্গী রৌদ্ররসস্তত্র সর্বে'ঙ্গানি রসাঃ পুনঃ ।
চতুরো'ঙ্কা মতানেহ বিষ্কম্ভকপ্রবেশকৌ ।।[১৪৪]

অর্থাৎ এর বাংলা ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায় যে এই ডিম নামক রূপকটি প্রসিদ্ধ কোনও পৌরাণিক আখ্যান বা উপাখ্যানেরই নবনির্মাণ। এখানে রৌদ্র রসই মুখ্য। এছাড়াও এখানে আরভটী বৃত্তির উপাদান যথা কুহক, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, কোনও ব্যক্তির ক্রোধ, উদ্ভ্রান্তি, চন্দ্রাদিগ্রহণের ম'ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয় এখানে বিস্তৃত থাকবে। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে যে আদি দুটি রূপকের উল্লেখ রয়েছে, তার মধ্যে *ত্রিপুরদাহ* একটি প্রকৃষ্ট ডিম।[১৪৫] তাই বৈপ্লবিক বিষয়ের ওপরেই এই রূপক আবর্তিত।

এ তো রইল ডিম রূপকের কথা। এরপর যদি সংলাপক উপরূপকের কথা আলোচনায় আনা হয়, সেখানেও দেখি বিশ্বনাথ কবিরাজের উক্তিটি হ'ল –

ভবেযুঃ পুরসংরোধচ্ছলসংগ্রামবিদ্রবাঃ ।
ন তত্র বৃত্তির্ভবতি ভারতী ন চ কৈশিকী ।।[১৪৬]

অর্থাৎ এই উপরূপকটিও বাণীপ্রধান ভারতী এবং ললিতকলাশ্রয়ী কৈশিকী বৃত্তির ব্যবহারকে রিক্ত করেছে। শৃঙ্গার রসে স্পর্শকাতর নয় এই উপরূপক। এখানে নগর-অবরোথ, ছলনা, কপটতা, যুদ্ধ, পলায়ন ইত্যাদি ঘটনা একে একে দেখা যেতেই পারে আরভটী বৃত্তির প্রভাবে। মূল ইতিবৃত্তটি পুরাণপ্রসিদ্ধ হবে এমন কোনও শাস্ত্রীয় বচন নেই *সাহিত্যদর্পণ*-এ। তাই বস্তুগত পার্থক্য রয়েছে। এমনকি ডিমে ষোড়শ নেতা (নায়ক) থাকা বাঞ্ছনীয়। তারা হ'ল দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, উপরগ, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি –

নাযকা দেবগন্ধর্বযক্ষরক্ষোমহোরগাঃ ।
ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যাঃ ষোডশাত্যন্তমুদ্ধতাঃ ।।[১৪৭]

অন্যদিকে সংলাপকে একজন পাষণ্ড ব্যক্তি নায়ক "পাষণ্ডঃ স্যাদ্ রসস্তত্র শৃঙ্গার-করুণেতরঃ"[১৪৮]। ডিম যেমন তিনটি অথবা চারটি অঙ্কের দ্বারা গঠিত হবে, তেমনই সংলাপ সম্পর্কে বলা হয়েছে এটিও চতুরঙ্কবিশিষ্ট।

তাহলে এক্ষেত্রে পূর্বপক্ষ হিসেবে যদি এহেন যুক্তি দেওয়া হয় যে এই ডিম রূপক এবং এই সংলাপক উপরূপকের মধ্যে ইতিবৃত্তের উৎসগত বিস্তর ব্যবধান, তবে উত্তরপক্ষ হিসেবে দাবি জানাতেই হয় যে উভয়ের মধ্যে অঙ্কসংখ্যা, বৃত্তি, রস-ভাব, বিন্যাস ইত্যাদির মিলও উপেক্ষা করা সমীচীন নয়। আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে যেখানে নাট্যবস্তুর পরিবর্তন এবং বিবর্তন স্তর চলেছে, সেই গতি ধারায় পৌরাণিক আখ্যান পূর্বকালের তুলনায় অনেকখানিই কমে এসেছে। বর্তমান সময়ের সমসাময়িক কাহিনিকে কেন্দ্র ক'রে নাটকাদি রূপক রচিত এবং অভিনীত হচ্ছে। তবে যুদ্ধ, ছলনা, পারস্পরিক আক্রোশ, নগরবিপ্লব, বিদ্রোহাত্মক কর্ম ইত্যাদি বিষয় নাট্যে রয়েই গেছে। তাই এরকম কোনও নাট্যের যদি গোত্রনির্ধারণ করতে হয়, তখন তাকে ডিম-এর মর্যাদা দান করা উচিত নাকি সংলাপকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করাই বিধেয়; সে বিষয়ে সন্দিহান হতেই হয়। এই অধ্যায় যেহেতু একালে উপরূপকের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, তাই এই বিষয়গুলি একে একে উঠেই আসে।

তাই এই আলোচনার পরিণামে রূপক ও উপরূপকের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সমাধানে কয়েকটি বিষয় উঠে আসে। খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় নাট্যতাত্ত্বিকগণ ভরতদর্শিত পথেই বিচরণ করেছেন। তাই দশরূপক তত্ত্বের প্রতি অবজ্ঞাজনিত কারণে কোনওরূপ স্পর্ধার আগমন হয়নি। উপরূপকগুলিতে রূপকধর্মের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা গেলেও *সাহিত্যদর্পণ, সংগীতদামোদর*-এর লক্ষণানুসারে উপরূপকের পরিচয় গৃহীত হবে। এমনকি গীতিনাট্য-ই যে শুধুমাত্র উপরূপকের বর্তমান প্রজন্ম এই ধারণারও বিসর্জন দিতে হবে। নাট্যের প্রারম্ভেই আমুখ অংশে যদি উপরূপকের নাম ও পরিচয় না দেওয়া থাকে, তবে সেক্ষেত্রে লক্ষণগ্রন্থগুলির বিধানের প্রতিফলন রয়েছে কিনা একজন গবেষক বা সহৃদয়কে সন্ধান করতে হবে। সংস্কৃত ভাষাতিরিক্ত যে কোনও প্রাদেশিক ভাষাতে নবরূপে উপরূপকের বিকাশ হতে পারে। তাই প্রস্তাবনা, অঙ্কবিভাজনের সনাতন রীতিগুলি অগ্রন্থিত হলেও বস্তু-নেতা-রস ভেদকের আলোকে নাট্যগুলির ব্যাখ্যা করণীয়।

২.৪ রূপক ও উপরূপকের নবরূপে সজ্জীকরণ :

তাহলে প্রাচীন এ মধ্যযুগের উপরূপকের সঙ্গে আধুনিককালের উপরূপকের সম্পর্কস্থাপনে যখন এই অধ্যায় প্রারম্ভেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল, তখন একথা অনস্বীকার্য যে শুধুমাত্র উপরূপকগুলিই নয়; বরং কিছু রূপকেরও আধুনিক রূপান্তরণ সেই গীতিধর্মী ও গীতিপ্রধান দৃশ্যায়নে ধরা পড়ে। তাই আধুনিক সময়ে এই অষ্টাবিংশ নাট্যধারার পুনর্বিন্যাস এবং নবসজ্জীকরণ করলে তিনটি বিভাগ করা যেতে পারে –

- **রূপক**

নাট্যগ্রন্থগুলি অঙ্কসংখ্যার ভিত্তিতে আকারে দীর্ঘ অর্থাৎ ন্যূনতম অঙ্কত্রয়সমন্বিত, এখানে সম্পূর্ণ রূপের আরোপ বর্তমান এবং নাট্যমধ্যে সংগীতের ভূমিকা গৌণ।

❖ রূপিকা

নাট্যগ্রন্থগুলি অঙ্কসংখ্যার ভিত্তিতে আকারে নাতিদীর্ঘ বা ক্ষুদ্র বা একাঙ্কিকা, এখানে সম্পূর্ণ রূপের আরোপ নেই এবং সংগীত এখানে ঐচ্ছিক।

❖ উপরূপক

নাট্যগ্রন্থগুলি অঙ্কসংখ্যার নিরীখে দীর্ঘ তথা একাধিক অঙ্কান্বিত বা একাঙ্কিকা যাই হোক না কেন; এখানে সম্পূর্ণ রূপের আরোপ বর্তমান এবং তৎসঙ্গে পদ্য, সংগীতের ভূমিকা মুখ্য।

প্রথম শ্রেণীতে রাখা হোক কয়েকটি নাট্যসংরূপ, সেগুলি হ'ল নাটক, প্রকরণ, ত্রোটক, নাটিকা, প্রকরণিকা, সট্টক, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, প্রহসন এবং সংলাপক। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাক ভাণ এবং বীথী-কে। তৃতীয় ধারায় উপরূপকের মধ্যে গণ্য হোক গোষ্ঠী, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, রাসক, শ্রীগদিত, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা,হল্লীশ এবং ভাণিকা। বিষয়টিকে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যাক।

রূপক	রূপিকা	উপরূপক
নাটক, প্রকরণ, ত্রোটক, নাটিকা, প্রকরণিকা, সট্টক, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, প্রহসন এবং সংলাপক	ভাণ এবং বীথী	গোষ্ঠী, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, রাসক, শ্রীগদিত, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা,হল্লীশ এবং ভাণিকা

২.৫ প্রাচীন গেয়রূপক : আধুনিক বিশ্লেষণ :

যা গানের যোগ্য বা সুরসহযোগে গীত হওয়ার দাবি জানায়, তা-ই 'গেয়'। প্রথম অধ্যায়ে কাব্যানুশাসন-এর আলোচনসবসরে যখন 'গেয়প্রেক্ষ্যকাব্য' তথা গীতিধর্মী রূপকের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল, তখন থেকেই একটি সন্দেহ গাঢ় হয়ে উঠেছিল যে উপরূপক 'গেয়রূপক' কিনা। তাই এই নাট্যে সাং গীতিকার দিকটি এখন বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। যেহেতু এই অধ্যায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি উপরূপকের প্রতিই, তাই সংগীতধর্মিতা নাট্যে কীভাবে ধরা দেয় এবং তথাকথিত সংগীতের কাঠামোর ব্যতিরেকে কীভাবে নাট্যে সংগীতধর্মিতা বজায় থাকে, তা আলোচনার দাবি রাখে। তাই এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিছু বিদ্বৎ ব্যক্তিত্বের শরণাপন্ন হতে পারি। ড. সঙ্গীতা গুন্দেচা-র গ্রন্থখানি এ বিষয়ে অনেকখানি পথপ্রদর্শন করে। অধ্যাপক ড. সঙ্গীতা গুন্দেচা *ভাস কা রঙ্গমঞ্চ* গ্রন্থের 'ভাস কে রূপকোঁ কা সাঙ্গীতিক শিল্প' অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে *কর্ণভার* একাঙ্কী রূপকের উদাহরণে রূপকটির সাংগীতিকতা নিরূপণ করতে অভিলাষী হয়েছে[১৪৯]। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র যখন কর্ণের কাছে ভিক্ষা চাইতে আসেন, তখন দানবীর কর্ণ একে একে গাভী, অশ্ব, হস্তী, স্বর্ণ, পৃথিবী, অগ্নিষ্টোম যাদের ফল এবং নিজ মস্তক দান করার প্রস্তাব জানায়। পরিশেষে ছদ্মরূপধারী ইন্দ্র কর্ণের কাছে তার আত্মরক্ষার সম্বল কবচকুণ্ডল প্রার্থনা করেন। নাট্যকারের ভাসের নাট্যগ্রন্থনা

এমনই যা সংগীতশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী আরোহের সমার্থক। সপ্ত স্বর ষড়্জ (সা), ঋষভ (রে), গান্ধার (গা), মধ্যম (মা), পঞ্চম (পা), ধৈবত (ধা) এবং নিষাধ (নি) -এর ক্রম ক্রমশঃ স্বরের উচ্চগ্রামের দিকে যাত্রা। তাই কর্ণের প্রস্তাবিত গাভী, অশ্ব, হস্তী, সুবর্ণ, পৃথিবী, যজ্ঞীয় ফল এবং কবচকুণ্ডলের গুণমান সেই ক্ষুদ্রতা থেকে বৃহতের দিকে যাত্রা। যদিও নাট্যকার ভাস কী উদ্দেশ্যে এই রচনা করেছিলেন, তা জানার কোনও উপায় নেই তবে আলোচ্য গ্রন্থটিতে গবেষণার মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে যে এই নাট্যের গঠন সংগীতের অনুগামী। যেহেতু নাট্য মাত্রেই তা অভিনয়, তাই এই নাট্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হলে তখন এই নাট্যোক্তির পরিবেশনাও সংগীতের সহযোগিতা করবে এমনই আশা রাখতে পারি। যদি তদনুরূপ নাট্যপ্রযোজনা ঘটে, তবে এই একাঙ্কী রূপকেও একটি সংগীতের মূর্ছনা অনুভব করতে পারব। তাই স্বরপ্রক্ষেপণের ঔচিত্য একটি নাট্যকে গীতিধর্মিতার আবহে অলংকৃত করতে পারে। তাহলে কাব্যানুশাসনোক্ত 'গেয়রূপক' বা বর্তমানের গীতিনাট্যের সামঞ্জস্যবিধানে উপরিউক্ত মতটিকে আদর্শ করা যায়। অর্থাৎ সুর, তাই, লয়ে নিবদ্ধ কয়েকটি গানের সমাবেশেই গীতিনাট্যের জন্ম হলেও 'গেয়রূপক' তদ্ভিন্ন। সেখানে কয়েকটি গানের মাধ্যমে নাটকীয়তার আনয়নই কর্তব্য নয়; বরং নাট্যস্থিত গদ্য এবং পদ্যসংলাপে যদি সাংগীতিক সুষমা বজায় থাকে, তাহলেও সহৃদয় শ্রোতৃবর্গের কাছে অনুপম সুন্দর একখানি গীতিনাট্য হয়ে উঠতে পারে। অর্থতঃ যখন রূপক ও উপরূপকের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী হই, তখন এই তত্ত্বটি যেন বিস্মৃত না হয়ে যায় তার জন্য খেয়াল রাখা প্রয়োজন। একটি রূপক তার নিজ চরিত্র এবং অভিনয়কৌশল্যে গীতিনাট্য না হলেও গীতিসুলভ বা গীতগন্ধী নাট্যে বিকশিত হতে কোনওরূপ প্রতিকূলতা থাকেনা।

২.৬ উপরূপক নাট্যরচনা : লক্ষণ ও ব্যতিক্রম :

সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে উপরূপকের আলোচনার প্রসঙ্গে যে গ্রন্থগুলি উদাহৃত হয়েছে, তার মধ্যে যেক'টি উপরূপক বর্তমানে পাওয়া যায় সেগুলি হ'ল *রত্নাবলী* (নাটিকা), *কর্পূরমঞ্জরী* (সট্টক) এবং *বিক্রমোর্বশী* (ত্রোটক)। সুতরাং বিশ্বনাথ অষ্টাদশ উপরূপকের যে পৃথজ পৃথক বিশিষ্টতা তুলে ধরেছেন, সেগুলি তাঁর দেওয়া উদাহরণগুলিতে যথাযথভাবেই উপস্থিত ছিল। তবে প্রাচীন যুগের কোনও উপরূপকের পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত। এমনকি এই অপ্রাপ্তি আরও একটি দিককে অনুমিত করায় যে নাটিকা, ত্রোটক, সট্টকের গুরুত্ব জনমানসে অধিক ছিল। বাকি পঞ্চাদশ উপরূপক হয়ত বিদুষী মহলে রূপকতুল্য সমাদর লাভ করতে পারেনি। তাই হয়ত অবহেলায় সেই গ্রন্থগুলি কালগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তবে এটি প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত নয় ব'লেই এই তথ্যের নির্ভুলতার দাবি জানানো যায়না। তবে বিশ্বনাথ কবিরাজের সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য হিদেবে ধরলে এটিও সত্য যে বর্তমানে উপলভ্য নাটিকা ও ত্রোটকের সংখ্যায় গরিষ্ঠতা রয়েছে। *সংগীতদামোদর* গ্রন্থের পরবর্তী সময় থেকে শুরু ক'রে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সংস্কৃত নাটিকা রচিত হয়ে চলেছে। খ্রিস্টিয় বিংশ শতাব্দীতেও মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের *বিরাজ-সরোজিনী* নাটিকা রচিত হয়েছে। তবে এই দুটি উপরূপকব্যতীত যে উপরূপকগুলি বর্তমানে পাওয়া যায়, সেগুলি হ'ল গোষ্ঠী, উল্লাপ্য, প্রেঙ্খণ, শ্রীগদিত, হল্লীশ

ও ভাণিকা। এই উপরূপকগুলি যে সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তবে বাংলা ভাষাতেও কিছু নাট্যকার নাট্যরাসক রচনা করেছেন। এখন করণীয় কার্য হ'ল এই উপরূপকগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই উপরূপকগুলি নাট্যশাস্ত্রের লক্ষণকে মেনে ক'তখানি প্রাচীনতা ও ঐতিহ্য বহন করেছে, কতখানি যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক পরিচ্ছদ গ্রহণ করেছে এবং সর্বোপরি সহৃদয় সামাজিকের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়েছে কিনা এগুলি বিচার ক'রে নেওয়া যাক।

❖ **নবযুগে নবরূপে নাটিকা :**

কবি মথুরাদাস-বিরচিত একটি নাটিকা *বৃষভানুজা* । খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতকে এই নাটিকা রচিত হয়েছে ব'লে অনুমান করেছেন ইন্দ্রা চক্রবাল *উপরূপকোঁ কা উদ্ভব ঔর বিকাস* গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে[১৫০]। তবে এই মত নিঃসংশয়ে তিনি স্বীকারও করেননি। এমনকি পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ, কেদারনাথ কৃপাঙ্গী,শিবদত্ত শর্মা, কাশীনাথ শর্মা কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত হয়ে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে নির্ণয় সাগর প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে কাব্যমালা সিরিজের ৪৬নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, সেখানেও নাট্যকারের কাল সম্পর্কিত কোনও তথ্য পরিবেশিত হয়নি। তাই *সংগীতদামোদর*-এর পূর্বকালে এই গ্রন্থ যদি রচিত হয়ে থাকে এবং তা সহৃদয় সমাজে আদরণীয় স্থান পেয়ে থাকে, তবে ব্যতিক্রমী নির্দশনরূপে শুভঙ্কর আচার্য উল্লেখ করতেন। আবার যদি পঞ্চদশ শতক *সংগীতদামোদর*-এর রচনাকাল হয়ে থাকে, তবে *বৃষভানুজা* নাটিকা পঞ্চদশ শতকের শেষ লগ্নেও রচিত হতে পারে। আবার এই নাটিকার দ্বারা নাটিকার একটি বিবর্তন আনতে চেয়েছেন নাট্যকার এমন সম্ভাবনাও থেকে যায়। তাই *সাহিত্যদর্পণ* বা *সংগীতদামোদর*-এর সঙ্গে মথুরাদাস সম্যকভাবে পরিচিত থাকলেও নতুন কোনও সাহিত্যকলার সৃষ্টি হবেনা একথা বলা যায়না। উপরূপকের ইতিহাসেই দেখা গেছে যে কালের গতিতে পুরাতনের পুনর্জন্ম হয়েছে বারংবার। তাই পঞ্চদশ শতাব্দী বা ষোড়শ শতাব্দী থেকে নাটিকারও চিরায়ত বিশিষ্টতার যদি কোনরূপ পরিবর্তন হয়, তবে তা বিস্ময়কর ঘটনা হতে পারেনা। *বৃষভানুজা* এই নামকরণ থেকেই বোঝা যায় এটি রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধিত কোনও আখ্যানের নাট্যরূপ। নাটিকার লক্ষণে 'ক্লৃপ্তবৃত্তা' এই বিশেষণের অর্থ হ'ল কবিকল্পনার দ্বারা রচিত কোনও ইতিবৃত্ত। নাটকের থেকে নাটিকার প্রধান পার্থক্য এখানেই যে নাটকের ম'ত নাটিকা কোনও প্রখ্যাত বিষয়ের প্রতি নত নয়। অথচ রাধার চরিত্র *শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ*-এ কথিত না হলেও হালের *গাথাসপ্তশতী, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ* ইত্যাদি মহাপুরাণে রাধা স্বমহিমায় বিরাজিত। তাই এক্ষেত্রে নাটিকাটির বিষয় উৎপাদ্য হয়নি। এমনকি দুজন প্রধান নারীচরিত্রও অনুপস্থিত। রাধার মান এবং কৃষ্ণের দ্বারা রাধার মানভঞ্জন-ই এই নাটিকার ফলযোগে দেখা দিয়েছে। তাই এখানে রাধা অনেকখানিই যেন ধীরললিত নায়কের প্রথম স্ত্রীর রূপে অবতীর্ণ আবার যেহেতু রাধা এখানে অপরিণীতা, তাই তার মধ্যে কন্যকা নায়িকার বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। নাট্যকারের এটি একটি অভিনবত্ব যে একজন নায়িকার মধ্যেই দুটি নায়িকার রীতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই একজন নায়ককে ঘিরে দুই নারীর অবস্থানপূর্বক ত্রিকোণপ্রেমের সরস ললিত আখ্যান এখানে অদৃশ্য। তাই প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এই *বৃষভানুজা* নাটিকাটি হল্লীশ উপরূপক ব'লে গণ্য হতে পারে কিনা।

সেক্ষেত্রে বলতে হয় যে নাট্যকার এটিকে নাটিকা বলেই পরিচয় দিয়েছেন-দিয়েছেন "শ্রীমথুরাদাসেন যা বিরচিতা বিদগ্ধজনহৃদযকুমুদানন্দৈককৌমুদী বৃষভানুজা নামাপূর্বনাটিকা সা ভবতাভিনেতব্যা"[১৫১] ব'লে। এছাড়াও নাটিকাটি হল্লীশের ন্যায় একাঙ্কে রচিত নয়; বরং চারটি অঙ্কেই আভূষিত। এমনকি এই নাটিকা 'নটীবহুলা' কারণ এখানে বৃন্দা, বনরক্ষিকা, চম্পকলতা, তমালিকা, নাগরিকা ইত্যাদি স্ত্রী চরিত্র বারংবারই প্রবেশ করে। আবার, ধীরললিত গুণের প্রকাশস্বরূপ চতুর্থ অঙ্কে কৃষ্ণকে চিত্রকলায় পারদর্শী রূপে দেখা যায়। তাই এই নাটিকা *সাহিত্যদর্পণ*-এর নিয়মকে লঙ্ঘন করেও নাটিকাকলার সামগ্রিক নির্যাসকে ছত্রে ছত্রে সুগন্ধপূর্ণ ক'রে তুলতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

❖ **উল্লাপ্যে আধুনিকতার প্রলেপ :**

সংস্কৃত উপরূপকের অন্যতম হ'ল উল্লাপ্য। যদিও নাটিকার ম'ত ব্যাপকতা উল্লাপ্য নাট্যকলার ঘটেনি তবুও বিষয়বৈচিত্র্যে এটি রমণীয়। *সাহিত্যদর্পণ* -এ উল্লিখিত *দেবীমহাদেব* উল্লাপ্যটি বর্তমানে অপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে বিশ্বনাথ কবিরাজের পূর্বকালীন চিত্রটি অগোচরেই রয়ে যায়। তবে আধুনিক কালে ভারতের সংস্কৃত সারস্বত ব্যক্তিত্বগণের কবিত্বশক্তিতে রূপক ও উপরূপক সমভাবেই একই সারিতে আসনগ্রহণ করেছে। উত্তরপ্রদেশের কাশীনরেশ প্রভুনারায়ণ সিং (১৮৮৯-১৯২৫) রচনা করেছেন *পার্থপাথেয়* নামের একটি সংস্কৃত নাট্য যার শাস্ত্রীয় আখ্যা 'উল্লাপ্য'। *সাহিত্যদর্পণ*-এ বিশ্বনাথ কবিরাজের লক্ষণে রয়েছে-

উদাত্তনাযকং দিব্যবৃত্তমেকাঙ্কভূষিতম্ ।
শিল্পকাঙ্গৈর্যুতং হাস্যশৃঙ্গারকরুণৈ রসঃ ।।[১৫২]

তিনি এই হাস্য, শৃঙ্গার বা করুণ রসপ্রধান উপরূপককে একাঙ্ক হিসেবেই মানতে চান কিন্তু অঙ্কত্রয়ের গণ্ডিতেও কিছু উল্লাপ্য বিচরণ করায় তিনি যোগ করেছেন "চতস্রি নাযিকাস্তত্র ত্রযো'ঙ্কা ইতি কেচন"[১৫৩]। অর্থাৎ কোনও কোনও তাত্ত্বিকের মতে এটি তিন অঙ্কবিশিষ্ট। এক্ষেত্রে বোঝাই যায় যে বিশ্বনাথ কবিরাজ মূলতঃ একাঙ্ক উল্লাপ্যকেই যথাবিহিত ব'লেই মনে করেছেন। অথচ প্রবহন সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করার ম'ত দুঃসাহসের নজির গড়তে চাননি। তাই 'কেচন' ব্যবহার ক'রে কোনও বিতর্কের অবকাশ রাখেননি। এখন *দেবীমহাদেব* উল্লাপ্যটিকে তিনি যখন পছন্দ করেছেন, তখন তাঁর অভিধানুসারে এটিতে হয়ত একটি অঙ্ক-ই বর্তমান ছিল। নাট্যটির নামকরণ থেকে অনুমান জাগে যে হয়ত এটি শিব এবং পার্বতীর কোনও পৌরাণিক কাহিনির আশ্রয়ে রচিত ছিল। তবে দেবী অর্থে পার্বতী-র প্রতীতি জন্মালেও বাকি তিনজন নায়িকা কারা হতে পারে সে বিষয়ে কল্পনা ফলপ্রসূ হবেনা এমনকি তা ভুল পথে চালিত হতেই পারে।

পার্থপাথেয় উল্লাপ্যটি তিন অঙ্কে রচিত। এখানে নাট্যকার প্রস্তাবনায় সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন "শ্রীমৎপ্রভুনারাযণসিংনির্মিতং পার্থপাথেযমুল্লাপ্যমভিনেতব্যমিতি তদ্যাবন্নেপায্যং বিধীযতে তাবদেবমারাধযামি সহৃদযসদস্যান্"[১৫৪]। বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর আদিপর্বের দ্রৌপদীর অভিশাপে অর্জুনের বনবাস জীবন এবং তখন উলুপী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রার সঙ্গে প্রণয়ের মধুর কাহিনি অবলম্বনেই এই উপরূপকের সৃজন। আধুনিক কালের

উপরূপক মাত্রেই যে গীতিনাট্য নয়, তার প্রমাণে এটিকে রাখতেই পারি। যদিও এই উল্লাপ্যে বেশ কয়েকটি গানের উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রস্তাবনায় পারিপার্শ্বিকের একটি গানে বর্ষাকালের শ্যামল চিত্রবন্ধ ফুটে ওঠে –

তথেতি গাযতি মল্লরাগেন ।
বিপিনে গাযতি মত্তকলাপী ।।
প্রতিবচনায ঘনে গর্জতি ভবতীব ষড্জপরিলাপী ।
বর্ষতি হৃষ্যতি তরুমারোহতি তপাতপৈরুপতাপী ।।[১৫৫]

বৈদর্ভী রীতি, প্রসাদ গুণ, সুকুমার মার্গের প্রতিফলন পদে পদে অনুভূত হয় এই গানে। নিদাঘকালের তাপের অবসানে মেঘের নাদে বর্ষাকালের আগমনে মল্লার রাগ ধ্বনি শ্রুত হচ্ছে, বৃক্ষল বনে ময়ূরগণ ষড়জ (সা) স্বরে গান ধরেছে। এমনকি তারই সঙ্গে কালিদাসের *মেঘদূত* খণ্ডকাব্যের ছায়াও দেখা যায় যেখানে বলা হয়েছে নববর্ষাজলে কদম্বকানন যেন বৎসরান্তে জাগ্রত হয়ে উঠেছে –

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেসরৈর্ধরুঢৈ-।
-রাবির্ভূত-প্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।।[১৫৬]

বিরহিজন বলতেই পাঠকের মনোদর্পণে ভেসে ওঠে একে একে সেই রামগিরি পর্বতের অভিশপ্ত যক্ষ, কখনও পুষ্পলাবী পথিকবনিতা বা অলকাপুরীর নিঃসঙ্গ একাকিনী যক্ষবধূ।

এছাড়াও দ্বিতীয় অঙ্কে মধুমঙ্গলের, তৃতীয় অঙ্কেও সুভদ্রা, কৌমুদী, বর্গার কয়েকটি গান পাই। কৌমুদীর গানটি অন্ত্যানুপ্রাসতুল্য-

উদ্দিশ্য ভাগ্যবন্তোমহো কং মনোহরং ।
ধৎেস করেণ সুভ্রু কপোলং মনোহরম্ ।।
ঈহেন কো ন লব্ধুমতুল্যং মনোহরং ।
আযাসযস্যথাঙ্গমমার্থং মনোহরম্ ।।[১৫৭]

প্রতিটি চরণেই চতুর্দশ অক্ষর রয়েছে। তাই গানের তালটি যেহেতু উল্লেখ করেননি নাট্যকার, তাই এক্ষেত্রে সমপদী তালে গানটি বাঁধা যেতে পারে। যদিও তালনির্ণয় আলোচনার বিষয় নয় তবুও নাট্যের প্রয়োজনে গানটির ব্যবহার কীভাবে ঘটেছে, তার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। গীতিনাট্য এবং নাট্যগীতি দুটি ভিন্ন বিষয় এবং এদের মধ্যে পরিপূরকতার সম্পর্কও বর্তমান নয়। একটি নাট্যের বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি-প্রত্যক্তিগুলি যদি গান হয়, তবে আদ্যন্ত গানের সুষমতায় সেটি হয় গীতিনাট্য কিন্তু যেখানে একটি নাট্যের মধ্যে কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গান প্রসঙ্গ অনুসারে কোনও চরিত্রের উক্তি হিসেবে গীত হয়, তবে তা নাট্যগীতি। পারিপার্শ্বিকের গানটির সঙ্গে এই উল্লাপ্যের সংযোগ সম্বন্ধ। অর্থাৎ গানটি এককভাবে পরিবেশিত হলেও তার রসহানি ঘটেনা। কোনও একজন শোভনসুন্দর পুরুষকে উদ্দেশ্য করে কোনও নারীর প্রেমবিহ্বল আবেগের কথাই গানটিতে ফুটে উঠেছে। তাই

এই ঘটনা নাট্যটির সীমাকে পিছনে ফেলে যে কোনও মুগ্ধা নায়িকার জন্যই গীত হতে পারে। এটিই বিশেষ থেকে সামান্যের পথে যাত্রা। তাই এই গানগুলি ভরতের মতানুসারে নাট্যের আহ্লাদজনক বিরামস্থান। গদ্য ও পদ্যের কথোপকথন থেকে স্বাদ বদল করতেই গানের বা গানসহযোগী নৃত্যের প্রয়োজন পড়ে। তাই এই নাট্যেও কিছু নাট্যগীতি রচনা করেছেন প্রভুনারায়ণ সিং যা গীত হলে সহৃদয়কে উল্লসিত করতে পারে। সুতরাং *কুসুমপ্রতিমা* এবং *লক্ষ্মী* টীকার মতই আধুনিককালে প্রাসঙ্গিক – "উল্লাপ্যতে রসবত্ত্বাদ্"[১৫৮]। আদিরস শৃঙ্গারের দীপ্তিপ্রকাশই আধুনিক উল্লাপ্যের ধর্ম।

তবে চারজন নায়িকার মধ্যে নাট্যকথাবস্তুর আপেক্ষিকতায় উলুপী এবং চিত্রাঙ্গদা পতাকা বৃত্তের অন্তর্গত হয়। এমনকি পাণ্ড্যকুলকন্যা চিত্রাঙ্গদার ভূমিকা কেবলমাত্র দ্বিতীয় অঙ্কের একটি দৃশ্যেই। এমনকি সরাসরি সশরীরে নাট্যে উপস্থিত না থেকেও যে নাট্যবস্তুকে তরান্বিত বা মন্দান্বিত করেছে তাও বলা যায়। শুধু অর্জুনের সঙ্গে তার পরিচিতি এটুকুই তার কার্য। তাই লক্ষণের পূর্ণ প্রয়োগ ঘটছে না এই উল্লাপ্যে। দ্রৌপদীর জন্যই অর্জুনের গৃহত্যাগ এবং পথিমধ্যে অন্যান্য রমণীদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেহেতু *দেবীমহাদেব* উপলব্ধ নয়, তাই এখানে আধুনিকতার প্রলেপ কতখানি পড়েছে, তা বিচার করা আয়াসসাধ্য। তবে এই উপরূপকের নামকরণের সময় 'উল্লাপ' বলতে বিলাপগাথারূপ অর্থ পেয়েছিলাম। আবার যেহেতু এটি উল্লাপ্য, তাই বলতে হয় যে তা বিলাপগীতির যোগ্য। তবে *পার্থপাথেয়* উল্লাপ্যে শোকজনিত করুণ রস অঙ্গী বা অঙ্গরসরূপে পরিবেশিত হয়নি। এখানে শৃঙ্গার প্রধানতম নাট্যরস। হাস্য ও করুণ রস বৃত্তানুগ নয় বলেই নাট্যকার তা বর্জন করেছেন। শৃঙ্গারব্যতীত অন্য কোনও রসই সজীব নয়। এমনকি যুদ্ধবিগ্রহের কোনও ভূমিকা নেই এখানে। তাই সামগ্রিক বিচারে এই উল্লাপ্য *সাহিত্যদর্পণ*-কে হুবহু অনুসরণ করেনি। এই গ্রন্থের ভিত্তিতে যদি পুনরায় বর্তমানে উল্লাপ্য উপরূপকের লক্ষণ করতেই হয়, তবে বলতে হবে উল্লাপ্য হবে তিন অঙ্কে গঠিত এমন একটি উপরূপক যেখানে নাট্যবস্তু হবে প্রখ্যাত, নায়ক ধীরোদাত্ত এবং সেই ধীরোদাত্ত নায়ককে ঘিরে একাধিক রমণীর কামভাব প্রদর্শিত হবে। এছাড়াও প্রসঙ্গানুসারে নাট্যে গানের পরিবেশনা থাকবে। সুতরাং এখানেও উল্লাপ্যের লাক্ষণিক বিচ্যুতি ঘটতে দেখা গেল।

❖ আধুনিকতার অপেক্ষায় প্রেক্ষণক :

খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতকে দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের রাজা রামের দৌহিত্র তথা বুক্কের পুত্র বিরূপাক্ষদেবের রচনা *উন্মত্তরাঘব* নামক একটি প্রেক্ষণক। এটি বিস্তৃত হলে চলবে না যে এটি তথাকথিত এবং সংজ্ঞায়িত 'প্রেঙ্খণ' নয়। নাট্যকার একে বলেছেন 'প্রেক্ষণক'-"সকলকলাবিলাসিনীস্বয়ংবরপতেঃ কৃতিমুন্মত্তরাঘবং নাম প্রেক্ষণকং প্রযোগতো দর্শযেতি"[১৫৯]। এখন প্রশ্ন হ'ল যে 'প্রেঙ্খণ' এর পরিবর্তে কেন 'প্রেক্ষণক' বলা হয়েছে তার কারণস্বরূপ বলা যায় যে গ্রন্থটি খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতকে রচিত হওয়ার কারণে তৎপূর্বে *শৃঙ্গারপ্রকাশ*, *নাট্যদর্পণ*, *ভাবপ্রকাশন* এবং *নাটকলক্ষণরত্নকোশ* নিবদ্ধ হয়েছে। উক্ত গ্রন্থগুলিতে 'প্রেক্ষণক' শব্দই পেয়ে থাকি। তাই *সাহিত্যদর্পণ*-এ 'প্রেঙ্খণ' পারিভাষিক শব্দটিই ব্যবহৃত হওয়ার ফলে গ্রন্থটি সম্ভবতঃ তার সঙ্গে পরিচিত হতে

পারেনি। তাই এই নামটিই রয়ে গেছে পরম্পরা অনুসারে। *উন্মত্তরাঘব* নামাঙ্কিত আরও একটি প্রেক্ষণক উপলব্ধ হয় কিন্তু সেটির রচনাকর্তা ভাস্কর কবির সময়কাল সম্পর্কে কোনও দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়না। তাই সেটির বিষয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়। বিরূপাক্ষদেবের উন্মত্তরাঘব রচনাটি যদি *সাহিত্যদর্পণ*-এর পূর্বে রচিত হয়ে থাকে এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ যদি সেটির সম্পর্কে অভিহিত হয়ে থাকেন, তথাপি তিনি *বালিবধ* নাট্যকেই উদাহরণে রেখেছেন। এমনকি *সংগীতদামোদর* গ্রন্থটিও উন্মত্তরাঘব প্রেক্ষণক সম্পর্কে কোনওরূপ প্রচার করেননি। এক্ষেত্রে দ্বিবিধ কারণ উপস্থিত হওয়া সম্ভব। প্রথমতঃ এই গ্রন্থটির সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজ এবং শুভঙ্কর কোনও সংবাদ পাননি অথবা দ্বিতীয় কারণ হতে পারে যে এই গ্রন্থটি তাঁদের লক্ষণ অনুযায়ী অসিদ্ধ হওয়ার ফলে এটির সম্পর্কে উদাসীন থেকে গেছেন। *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-এ প্রেক্ষণক সম্পর্কে বলা হয়েছে –

রথ্যাসমাজচত্বরসুরালযাদৌ প্রবর্ত্যতে বহুভিঃ ।
পাত্রবিশেষৈর্যত্ তত্ প্রেক্ষণকং কামদহনাদি ।।[১৬০]

অর্থাৎ এটি প্রেক্ষাগৃহে অনভিনেয় একটি নর্তনকলা। রাজপথ, লোকালয়, দেবমন্দিরাদিতে প্রদর্শিত একটি নর্তনকলাবিশেষ যা বহু শিল্পী একত্র হয়ে নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে কোনও ইতিবৃত্তের বর্ণনা করে থাকে। আবার *ভাবপ্রকাশন* বলতে চেয়েছে -

পদার্থাভিনয়ং যস্য ললিতঞ্চ লযান্বিতম্ ।
কুরুতে নর্তকী যত্র সো'পি নর্তনকঃ পুনঃ ।।
লাস্যং দ্বিধা স্যাচ্ছলিকং সমরথ্যাসমন্বিতম্ ।
সুতালচতুরশ্রাভ্যাং যত্র কর্তুং প্রবর্ততে ।।
গর্ভাবমর্ষরহিতং সর্ববৃত্তিসমন্বিতম্ ।
প্রভূতমাগধীশৌরসেনীকং রসভাভযুক্ ।।[১৬১]

এখানেও ললিত নৃত্যের অনুষঙ্গ রয়েই যাচ্ছে। লাস্য, ছিল, সমরথ্যা ইত্যাদির প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। তবে শুধুই পদার্থাভিনয়বহুল নৃত্য নয়; একটি ইতিবৃত্তেরও পরিবেশনা থাকবে এবং তা, মূলতঃ গর্ভ ও অবমর্শ সন্ধিবিযুক্ত হবে। ভাষার ক্ষেত্রে যখন মাগধী, শৌরসেনী প্রাকৃত ভাষার কথা বলা হয়েছে তখন গান বা পাঠ্যাংশটিতে সেই সেই ভাষার প্রয়োগ থাকবে ব'লেই বোধ জন্মায়।

ইন্দ্রা চক্রবাল *কামদহন* উদাহরণটির সাপেক্ষে বলতে চেয়েছেন যে সাধারণতঃ বসন্ত পূর্ণিমা তিথিতে হোলিকাদহনের উৎসবে বর্তমানেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নৃত্যগীতের অভিনয় প্রচলিত।[১৬২] সেখানে স্বল্পাংশে অভিনয়ও রয়ে যায়। তাই যখন *শৃঙ্গারপ্রকাশ* গ্রন্থটি *কামদহন* এবং *ভাবপ্রকাশন* গ্রন্থটি *নৃসিংহবিজয়* এই দুটি প্রযোজনার কথা বলেছেন, তখন বসন্তকালের এই উৎসবের কথাও অগোচরে থাকেনা। হিরণ্যকশিপু, হোলিকা একই আখ্যানের অংশ। সেই পৌরাণিক চরিত্র হোলিকাকে কেন্দ্র ক'রেই হোলিকার কুশপুত্তলিকা দহনের রীতি

প্রচলিত হয়েছে। আবার, অকালবসন্তের চাঞ্চল্যে শিবের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে গেছিল মদনদেব এমন কথা পুরাণসাহিত্যে পাওয়া যায়। তাই ভারতীয় সংস্কৃতির একটি ইতিহাসও এই প্রেক্ষণকের সঙ্গে জড়িত থাকার অসম্ভব নয়। *শৃঙ্গারপ্রকাশ* যখন মুক্তমঞ্চে জনসমক্ষে এটির প্রযোজনার কথা বলেছেন, তখন একটি লোকসংস্কৃতিও এখানে উঠে আসে। তাই হয়ত তদানীন্তন সময়ে প্রেক্ষণক এমন একটি প্রযোজনা ছিল যেখানে নট, নটীগণ গীত এবং নৃত্যের আশ্রয় নিতেন। অর্থাৎ তারাই গান গেয়ে নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে ভাবার্থকে উপস্থাপন করতেন। বিশ্বনাথ কবিরাজের পূর্বকালে *বালিবধ* প্রযোজনার কথা *ভাবপ্রকাশন* ও *নাটকলক্ষণরত্নকোশ* উল্লেখ করেছে। তাই কয়েক শতাব্দী যাবৎ এই প্রযোজনাটি লোকচিত্তরঞ্জন করেছে ব'লেই ধরে নিতে হয় এবং মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠেয় 'প্রেক্ষণক' যখন 'প্রেঙ্খণ' হয়ে উঠেছে, তখন তার ধ্রুপদীয়ানাও উন্নীত হয়েছে। ধাতুগত ব্যুৎপত্তির দিক থেকে এককালে তার অর্থ ছিল কেবলই মনোরঞ্জনের জন্য দর্শন করা কিন্তু পরবর্তীতে একটু পরিশীলিত ভাবে প্রকৃষ্টভাবে গতি (নৃত্য)-র কথা বলেছে সাহিত্যদর্পণ। স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে বালিবধ আর পথে-প্রাঙ্গণে অভিনয় হয়নি। তাই আদর্শ নাট্যকায়া গ্রহণের জন্যই হয়ত এই বালিবধ প্রযোজনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বিশ্বনাথ কবিরাজ।

বাল্মীকির *রামায়ণ*-এর অরণ্যকাণ্ডের সীতাহরণের পর থেকে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের কিয়দংশ পর্যন্ত রামচন্দ্রের সীতার জন্য বিলাপগাথা রয়েছে, তার আধারেই *উন্মত্তরাঘব* প্রেক্ষণকের গ্রন্থনা। দৃশ্যকাব্যটি একটি অঙ্কেই সমাপ্ত এবং সীতাহরণনিমিত্ত রামের শোকবিহ্বল দশার অনেকগুলি ছন্দোবদ্ধ শ্লোক রয়েছে। ৯৭ টি শ্লোকের মধ্যে ২৯নং শ্লোক থেকে শুরু ক'রে ৮৭নং শ্লোক পর্যন্ত অংশে গদ্যের পরিমাণ নগণ্য। রাম বসন্তপ্রকৃতির কাছে রথোদ্ধতা ছন্দে তার উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেছে। যেমন -

পঞ্চমো'পি তব কোকিল স্বরঃ ষষ্ঠ এবং মদনস্য সাযকঃ ।
শ্লাঘ্যতামিতরদুর্লভামিমাং ধারযাশু মম দর্শয প্রিযাম্ ।।[১৬৩]

মদনদেবের পঞ্চশরের অতিরিক্ত ষষ্ঠ শর হয়েছে কুহুধ্বনি – এমনটিই ব্যথিত রামচন্দ্র মনে করেছে। আবার কখনও রাম আম্রতরুর কাছে প্রার্থনা করেছে সীতাকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার জন্য –

এহি সহকার দেহি প্রতিবচনং দর্শয়াশু বৈদেহীম্ ।
অথবা কথং নু ঘটতামর্থো'যং স্থাবরাদ্ভবতঃ ।।[১৬৪]

আবার কখনও সীতার অলংকারের কথা বসন্ততিলক ছন্দে আবৃত্তি করেছে রাম –

অশোক এষ য চকোরসদৃশো বতংসঃ ।
কর্ণার্পিতেযমপি কেসরমালিকা সা ।।
এতানি তানি খলু গর্ভচম্পকানি ।
সেযং নমেরুকুসুমগ্রথিতা চ কাঞ্চী ।।[১৬৫]

অশোক, কেসরমালিকা, গর্ভচম্পা, নমেরুকুসুম ইত্যাদি ছিল সীতার বনবাস জীবনের ভূষণ। তাই সীতাবিরহে সেগুলি রামের স্মৃতিতে উদিত হয়েছে।

এই প্রেক্ষণক সম্বন্ধে ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে মহাকবি কালিদাসের *বিক্রমোর্বশী* দৃশ্যকাব্যের প্রভাবকে মান্যতা দিয়েছেন –

বাল্মীকি-রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে বর্ণিত রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের পর প্রিয়াবিরহী রামের বিচ্ছেদব্যথার বিলাপবাণী রামায়ণ-পাঠকদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ। উক্ত কাহিনী অবলম্বনে এবং কালিদাসের বিক্রমোর্বশীর অনুসরণে উন্মত্তরাঘব নামে দুটি একাঙ্ক নাটক রচিত হয়েছিল।[১৬৬]

সমগ্র প্রেক্ষণকটি পাঠ করার সময় এটিকে অপর কোনও রূপকের ন্যায় প্রতিভাত হয় কিন্তু প্রয়োগদশায় এটির সেই লিখিত রূপের আবরণ ভেঙে একটি গীতিময় রূপের সান্দ্রতা নজরে আসার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু গদ্যাত্মক পাঠ তুলনায় অনেকখানিই ম্লান, তাই শ্লোকগুলিতে সুরসংযোজনার দ্বারা এটিতে গীতিনাট্যের রূপ দেওয়া যায় বা যেহেতু স্বরযোজনার ব্যাপারে স্বয়ং নাট্যকার কোনও নির্দেশ দেননি তাই যদি শুধু নাট্যটির অভিনয় হয়ে থাকে, তাহলে একটানা শ্লোকাবৃত্তির ফলে পদ্যকাব্যপাঠসদৃশ হয়ে পড়ে যেখান থেকেই বাংলাতে কাব্যনাট্যের ধারা প্রসূত হয়েছে। এটিই যে প্রেক্ষণকের একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে, তবে বুঝতেই হয় যে এটি সাহিত্যদর্পণোক্ত প্রেঙ্খণ অপেক্ষা ভিন্ন প্রাচীন একটি লক্ষ্যগ্রন্থ। এখানে রামচন্দ্রকে হীন নায়ক বলা যায়না, এমনকি রোষভাষণের অবকাশ নেই, ভারতী ও কৈশিকী ব্যতীত অপর বৃত্তিও পরিস্ফুট নয়। বরং লক্ষণীয় *ভাবপ্রকাশন*-এর উক্তি। সেখানে ছলিক নৃত্যের কথা উচ্চারিত হয়েছে এবং যেহেতু এই নৃত্য বীর ও শৃঙ্গাররসপূর্ণ পুংনৃত্য, তাই রামচন্দ্রের অভিনয়ে একাধারে শ্লোকাবৃত্তি (অথবা স্বরলিপ্ত গান) এবং নৃত্যকলা যুগপৎ প্রদর্শিতব্য। তাই *উন্মত্তরাঘব*-এর ক্ষেত্রে একটি পদার্থাভিনয়াত্মক কাব্যের নমুনা দ্বারা উপরূপকগুলির প্রাচীন রূপ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

তবে বর্তমান সময়ে দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিত ভি রাঘবন (১৯০৮-১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ) সাতটি প্রেক্ষণক রচনা করেছেন। এগুলি হ'ল যথাক্রমে *বিজযাঙ্কা, বিকটনিতম্বা, অবন্তীসুন্দরী, লক্ষ্মীস্বয়ংবর, পুনরুন্মেষ, আষাঢস্য প্রথমদিবসে* এবং *মহাশ্বেতা* । এগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি একত্রিত হয়ে প্রেক্ষণকত্রয়ী নামক একখানি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। এই তিনটি দৃশ্যকাব্যই একাঙ্কী এবং পরিসরে ক্ষুদ্র। এগুলির প্রেক্ষাপট ইতিহাসের প্রাচীরে উৎকীর্ণ কিংবদন্তী গাথা। আবার *লক্ষ্মীস্বয়ংবর* পৌরাণিক আখ্যান সমুদ্রমথন এবং *আষাঢস্য প্রথমদিবসে* এবং *মহাশ্বেতা*-র উৎস যথাক্রমে কালিদাসের খণ্ডকাব্য *মেঘদূত* এবং বাণভট্টের কথাকাব্য *কাদম্বরী* । এর মধ্যে *পুনরুন্মেষ* এবং *আষাঢস্য প্রথমদিবসে* ব্যতীত সবক'টিই নারীপ্রধান নাট্যকৃতি। এগুলিতে *সাহিত্যদর্পণ*-এর নিয়মমাফিক সূত্রধার উহ্য রয়েছে। সুতরাং প্রস্তাবনাবিমুক্ত শুধু কথানির্ভর দৃশ্যকাব্য। এগুলি নায়িকাপ্রধান কাব্য এবং স্ত্রীচরিত্র সংস্কৃত ভাষায় পুরুষদের সঙ্গে কথোপকথন এগিয়ে নিয়ে চলে। সুতরাং আধুনিক কালের এটি একটি প্রগতিশীল ভাবনা। চরিত্রগুলি প্রাচীন ভারতের অঙ্গন থেকেই গৃহীত তবুও সমসাময়িক যুগে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কিছু সংকীর্ণ ভেদাভেদের বেষ্টনী ভেঙে তিনি নতুনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিজয়াঙ্কা প্রেক্ষণকের পটভূমিকা কর্ণাটরাজ্য। সেই রাজ্যের অধীশ্বর চন্দ্রাদিত্যের স্ত্রী বিজয়াঙ্কার কারয়িত্রী এবং ভাবয়িত্রীর প্রকাশ ঘটেছে এই নাট্যে। তাই ভরতবাক্যে তার প্রশংসা ধ্বনিত হয়েছে এভাবে –

সরস্বতীব কর্ণাটী বিজয়াঙ্কা জযত্যাসৌ ।
যা বৈদর্ভগিরাং বাসঃ কালিদাসাদনন্তরম্ ।।[১৬৭]

প্রত্যক্ষভাবেই বাগ্দেবী সরস্বতীর উপমা এসেছে তার পাণ্ডিত্যের প্রগল্ভতায়। দণ্ডীর *কাব্যাদর্শ*-এর বহুশ্রুত মঙ্গলশ্লোকে তিনি প্রত্যক্ষ দোষ তুলে ধরেন এবং নিজের সৃজনশীলতার উদাহরণরূপে একখানি শ্লোক আচার্যের সম্মুখে আবৃত্তি করে। আলোচ্য প্রেক্ষণকে গীতিধর্মিতা নেই বললেই চলে এবং আধুনিক একাঙ্ক দৃশ্যকাব্যের আদলেই অনুপ্রাণিত। রোষভাষণের বিষয়ে এখানে বলতে হয় যে সারস্বত আকাশে কাব্যমীমাংসায় যে নানাবিধ প্রস্থানের জন্ম, পূর্বপক্ষের মতখণ্ডন, উ উত্তরপক্ষের সিদ্ধান্ত, কাব্যের উৎকর্ষবিধায়ক বিভিন্ন উপাদানের আলোচনার যে ধারা এবং দ্বন্দ্ব, তারই একটি নাস্তিক আবহ *বিজয়াঙ্কা* প্রেক্ষণকে পাওয়া যায়।

আবার *বিকটনিতম্বা* প্রেক্ষণকে দেখা গেছে সংস্কৃত ভাষার বর্ণ, স্বর, ছন্দ, যতি ইত্যাদি মেনে পাঠের আবশ্যকতা। বিকটনিতম্বা সংস্কৃতজ্ঞ হলেও তার স্বামীর সে বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞান ছিলনা। তাই এখানেও পৌরুষ পরাজিত হচ্ছে স্ত্রীর অমল সারস্বত প্রতিভায়।

তৃতীয় প্রেক্ষণক *অবন্তীসুন্দরী*-র ইতিবৃত্তটিও পূর্ব দৃশ্যকাব্যদুটির সমান্তরাল। এখানে কাব্যতত্ত্ববেত্তা রাজশেখর এবং তার স্ত্রী অবন্তীসুন্দরীর দাম্পত্যজীবনের একটি দিক উঠে এসেছে। রাজশেখর কাব্যতত্ত্বজ্ঞ হলেও তাঁর স্ত্রীও ছিল একই পঙক্তিতে আসীন। তাই *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থের কাব্যনাটক বিষয়ে সমালোচনা করেছে অবন্তীসুন্দরী। এই দৃশ্যকাব্যটি আরও একটি কারণে উল্লেখ্য কারণ এখানে রাজশেখরকৃত সট্টক উপরূপকের কিছু নেপথ্য কাহিনি জানায় সমর্থ হওয়া যায় এই নাট্যপাঠ তথা দর্শনে। রাজশেখর স্ত্রীর জন্যই এই উপরূপক রচনা করেছিলেন একথা ব্যক্ত - "নাট্যধর্মীমনুসৃত্য স্ত্রীযমিতি মামপি কেবলং প্রাকৃতে এব বিজ্ঞাং মতবাদ খলু ভবতেদং প্রাকৃতেন সট্টকং কৃতম্"[১৬৮] এবং নাট্যের ভরতবাক্যে মৃদঙ্গধ্বনির সঙ্গে কর্পূরমঞ্জরী অভিনয় হতে চলেছে এমন একটি সূচনার মাধ্যমে ইতি টানা হয়েছে "অযে মৃদঙ্গশব্দঃ। সজ্জাঃ কুশীলবাঃ। তদেহি কর্পূরমঞ্জরী প্রযোগদর্শনায বযমপি সন্নিহিতা ভবামঃ"[১৬৯] উক্তির মাধ্যমে। তাই এই তিনটিকে যদি উপরূপক হিসেবেই স্বীকৃতি দিতে হয়, তবে বলতেই হয় *উন্মত্তরাঘব*-এর ম'ত পদ্যকাব্যধর্মী কাব্যনাট্যের ছায়া থেকে অনেকখানিই সরে এসেছে ভি রাঘবনের এই তিনটি নাট্যকৃতি। তাই পণ্ডিত ভি রাঘবনের লেখনীদ্বারা আধুনিক সংস্কৃত কাব্যনাট্য বা গীতিনাট্যের আবির্ভাব হয়নি। উপরূপককে তিনি রূপকের চেয়ে কোনও অংশেই খাটো বা লঘু করতে চাননি।

❖ শ্রীগদিতে আধুনিকত্ব :

আরও একটি উপরূপক হ'ল শ্রীগদিত। *সাহিত্যদর্পণ*-এর পূর্ব যুগের কোনও শ্রীগদিত নাট্যকৃতির নির্দশন পাওয়া যায়না। তবে পরবর্তীকালে একটি শ্রীগদিত উপরূপক পাওয়া যায়। সেটি হ'ল মাধবভট্টবিরচিত *সুভদ্রাহরণ*

। ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কবি মাধবভট্টের সময়কাল খ্রিস্টিয় চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী আবার ইন্দ্রা চক্রবাল বলেছেন কবির জীবৎকাল খ্রিস্টিয় ষোড়শ বা সপ্তদশ শতক। তবে যাই হোক না কেন; *সুভদ্রাহরণ* রচনাটিকে সাহিত্যদর্পণ-এর পরবর্তী কালের রচনা ব'লে স্বীকৃতি দিতে কোনও বিপ্রতীপতা থাকেনা। *সাহিত্যদর্পণ*-এর লক্ষণানুসারে 'শ্রী' শব্দের ব্যবহার এতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘটেছে। মোট বত্রিশ বার শ্রী শব্দটি কথিত হয়েছে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর উক্তিতে। যথা 'শ্রীপর্বতে', 'শ্রীকণ্ঠপরিচরণায', 'শ্রীমাধবেন', 'শ্রীমতো', 'শ্রীরিন্দোঃ', 'শ্রীমতে', 'শ্রীনাথস্য', 'শ্রীকান্তস্য' প্রভৃতি। এমনকি শ্রীরঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণ নামের দুটি চরিত্রও বর্তমান। বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর অর্জুন এবং সুভদ্রার পরিণয়ের আখ্যানকে কেন্দ্রবিন্দু মেনে নাট্যটির ইতিবৃত্তি সাধিত। নাট্যকার প্রস্তাবনায় জানিয়েছেন "শ্রীমৎসুভদ্রাহরণং নাম প্রসিদ্ধনাযকোপেতং শ্রীতিশব্দোপরঞ্জিতং শ্রীগদিতং বিস্মৃতবন্তো ভবন্তঃ"[১৭০]। তাই এখান থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায় তিনি *সাহিত্যদর্পণ*-এর দ্বারা যথেষ্টরূপে বৌদ্ধিক কোণ থেকে প্রভাবিত ছিলেন। এমনকি এই উপরূপকের অভিনয়ে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা যে সকলেই নৃত্যে কুশল ছিলেন তাও অবগত হওয়া যায় সূত্রধারের উক্তি থেকেই-

নৃত্যকর্মকুশলাঃ কুশীলবাঃ কাব্যমেতদপি নব্যমীক্ষিতুম্ ।
নাযকশ্চ পুরুষোত্তমো'র্জুনঃ সংগতা চ রসবেদিনাং সভা ।।[১৭১]

অথচ এই উপরূপকের কোনও অংশেই নৃত্যের ভূমিকা নেই বা দীর্ঘ প্রলম্বিত শ্লোকাবৃত্তিও নেই যা গীতাকারে নৃত্যের ছন্দে পরিবেশিত হতে পারে। আধুনিক একাঙ্ক রূপকের যে গতিপ্রকৃতি, তার থেকে ব্যত্যয় ঘটার কোনও সম্ভাবনাও থাকেনা এই রূপক পরিবেশনের সময়।

আবার এরই সমান্তরালে যদি *দ্রৌপদীস্বয়ংবর* নাট্যের কথা বলি, সেখানে তার চারিত্রিকতা নাট্যটি অনেকখানিই কাব্যনাট্য বা লোকধর্মী নাট্যের পারিপাট্য বহন করে। আনুমানিক খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতকের উত্তরার্ধ কবি বিজয়পালের সময়কাল। শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের কবির রচনাসংগ্রহের মধ্যে *দ্রৌপদীস্বয়ংবর* অন্যতম। অণহিলপুরপাটনে রাজা দ্বিতীয় ভীমের আজ্ঞায় বসন্তোৎসবের সময় এই নাট্যটি মঞ্চস্থ হয় এমন তথ্য নাট্যমধ্যে নিহিত রয়েছে –

অভিনবসিদ্ধরাজমহারাজশ্রীভীমদেবেন সমাদিষ্টো'স্মি। যদস্মিন্ বসন্তোৎসবে ত্রিভুবনাদ্ভুতপ্রভাববৈভবানাং শ্রীমত্ ত্রিপুরুষদেবানাং পুরতঃ প্রমোদিতাণহিল্লপাটকং নাটকং ভবতা'ভিনীযতামিতি।[১৭২]

তবে নাট্যকার এটিকে তাঁর অভিধায় শ্রীগদিত উপরূপক বলতে চাননি। তিনি সচেতনভাবেই 'নাটক' শব্দদ্বারা এটিকে শনাক্ত করিয়েছেন। অথচ সেই সময় নাটক-এর মাননির্ণয় প্রশস্ত ছিল। মাত্র সংক্ষিপ্ত দুটি অঙ্কে নিবদ্ধ একখানি দৃশ্যকাব্য কীভাবে নাটকরূপে গণ্য হতে পারে তার জিজ্ঞাসা রয়েই যায়। তবে ইন্দ্রা চক্রবাল এটিকে 'শ্রীগদিত' উপরূপক-ই বলেছেন। সাহিত্যদর্পণোক্ত শ্রীগদিত উপরূপকের লক্ষণ উদ্ধৃত করার সময়েই দেখা গেছে

যে একসময় কোনও এক নটী লক্ষ্মী দেবীর বেশে তার স্বামী বিষ্ণুর গুণকীর্তনমূলক সংগীতাভিনয়ে উপস্থাপনা করতেন। এখানে সেরকম কোনও নাট্যবস্তু নেই। তবে মঙ্গলাচরণে বিষ্ণুর বন্দনা দেখতে পাই –

দৈত্যাদৈত্যপরাঙ্মুখী গুরুগুণগ্রামানুরাগানুগা ।
যং লক্ষ্মীরবৃণোৎস্বয়ং স ভগবাংল্লক্ষ্মীপতিঃ পাতু বঃ ।।[১৭৩]

বিষ্ণুকে যেমন 'দৈত্যাদৈত্যপরাঙ্মুখী' বলার, মাধ্যমে তার বীর্যবত্তাকে সূচিত করা হয়েছে, তেমনই 'লক্ষ্মীপতি' বিশেষণের সঙ্গেই শ্লিষ্ট হয়েছে তার দাম্পত্যজীবন। অর্থাৎ এই নাট্যে অর্জুনের শৌর্য, বীর্যের সঙ্গেই দ্রৌপদীর মিলন আসন্ন। দ্রৌপদী অর্জুনের পৌরুষের দ্বারা মনোমুগ্ধ। তাই এহেন নাট্যসন্দর্ভ শ্রীগদিত গোত্রের উপরূপকের প্রাচীনতার নিকটে উপনীত হয় নবীন অর্ঘ্য নিয়ে।

আবার নাট্যশেষে ভরতবাক্যে 'শ্রী' শব্দ লব্ধ –

কেলিং কলের্মুকুলযন্ সকলা জযশ্রীঃ ।
সৌভাগ্যভঙ্গমভিতো ভবতাং চ ধর্মঃ ।।[১৭৪]

বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর আদিপর্বের অর্জুনের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ-ই নাট্যফলে পরিণত হয়েছে এখানে। তবে চমৎকৃত হওয়ার যদি কোনও বিষয় থাকে, তবে সেটি নাট্যটির গঠন। *উন্মত্তরাঘব* প্রেক্ষণকে যেরকম একাধিক শ্লোকের সংকুলতা লক্ষ্য করেছি, এখানেও অনুরূপ আবহধ্বনি অশ্রুত থাকেনা। প্রথম অঙ্কে নৃপতিগণ এবং কৃষ্ণের উক্তির মধ্যে পদ্যময়তা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এমনকি কর্ণ এবং বেত্রীর কথোপকথনটিও নাট্যধর্মী –

কর্ণঃ। কোটিঃ? / বেত্রী।ন, //কর্ণঃ। প্রযুতম্ / বেত্রী। নৈষ, // কর্ণঃ। লক্ষম্? / বেত্রী। ন, // কর্ণঃ। অপ্যযুতম্? / বেত্রী। নহি। // কর্ণঃ। সহস্রম্? / বেত্রী। ন, // কর্ণঃ। শতম্? / বেত্রী। নৈষ, // কর্ণঃ। দশ? / বেত্রী। নো, // কর্ণঃ। নব? / বেত্রী। ন, // কর্ণঃ। অষ্ট? / বেত্রী। ন, // কর্ণঃ। সপ্ত? / বেত্রী। ন, // কর্ণঃ। ষড? / বেত্রী। নহি, // কর্ণঃ। পঞ্চ? / বেত্রী। ন, // কর্ণঃ। চত্বারঃ? / বেত্রী। ন, // কর্ণঃ। ত্রযঃ? / বেত্রী। নহি, // কর্ণঃ। দ্বৌ? / বেত্রী। ন। //[১৭৫]

ভাসের *কর্ণভার* রূপক সম্পর্কে যেরকম আরোহ-অবরোহের একটি মূর্ছনার কথা আলোচনা করা হয়েছে, এখানেও তদনুরূপ দেখা যায় যে এমনই একটি লয় ক্রমাগত ক্রিয়াশীল। যখন কোটি থেকে সংখ্যার হ্রাস হতে থাকছে, তখন আপাতভাবে অবরোহ মনে হলেও কর্ণের বিস্ময়ের উদ্রেক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এখানে অদ্ভুত রসের একটি ব্যঞ্জনা। তবে দ্বিতীয় অঙ্কে দ্রুপদকন্যা পাঞ্চালীর অর্জুনের প্রতি যে অনুরাগ গাঢ় হয়েছে, তার কারণ অর্জুনের লক্ষ্যভেদ। প্রথমার্ধে তার গুরুকে স্মরণ ক'রে গাণ্ডীবকে নমস্কার ক'রে ক্ষত্রিয় অর্জুন ব'লে ওঠে-

ক্ষত্রব্রতমখণ্ডং চেদ্ ভক্তির্গুরুষু মে যদি ।
ভব তত্ সুকরারোপং ভগবন্ হরকার্মুক ! ।।[১৭৬]

নাট্যটি একটি অঙ্কেই সমাপ্ত হতে পারত কারণ প্রথমাঙ্কেই অর্জুন লক্ষ্যভেদে উত্তীর্ণ হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে দ্রৌপদীর সকলের গুণদোষবিচার, অর্জুনের প্রতি কামশৃঙ্গারের রতিভাব জাগ্রত হওয়া এবং বিবাহ। তাই এই বিষয়টি প্রথম অঙ্কেই সম্পন্ন হলে নাট্যফলপ্রাপ্তিতে কোনও ক্ষতিসাধন হ'তনা। তবুও একই দিনের একটি ঘটনাকে নাট্যকার দুটি অঙ্কে বিভক্ত করেছেন একারণেই যে প্রথমাঙ্কে অর্জুনের শৌর্য, বীর্য, পরাক্রম দর্শিত কিন্তু তুলনায় দ্বিতীয় অঙ্কটি শৃঙ্গার রসে রসোত্তীর্ণ। সেখানে দ্রৌপদী ব'লে ওঠে-

জলধররগোপিতদিনকরসমেন দ্বিজবেষচ্ছন্নতেজসা !
ভিন্না'নেন রাধা বাণৈর্গুণৈর্মম হৃদযম্ ।।[১৭৭]

অর্থাৎ অর্জুনের শর একদিকে যেমন মৎস্যের অক্ষিকে বিদ্ধ করেছে তেমনই সেই বজ্রকঠিন বাণ যেন কামদেবের পুষ্পবাণতুল্য দ্রৌপদীর হৃদয়কে প্রেমাকুল ক'রে তুলেছে। তাই শ্রীগদিত উপরূপকের লক্ষণের মধ্যে প্রখ্যাত ঘটনার একাংশ, গর্ভ-অবমর্শ সন্ধির শূন্যতা, ভারতী বৃত্তির কার্যকারিতা ইত্যাদি দিকগুলি আলোকিত হয়েছে। 'শ্রী' শব্দের প্রাচুর্য না থাকলেও এর পতন ঘটেনি। তবে ভাবতে হয় যে এটি খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতকের পূর্বে রচিত হওয়ার কারণে কি গীতিনাট্যরূপে অবস্থিত ছিল? কারণ প্রস্তাবনায় যদিও পারিপার্শ্বিকের ভাষায় "নিপুণৈর্নটের্নতিতুম্"[১৭৮] শব্দবন্ধ পাওয়া যায় তবে পুরোপুরি নৃত্যাকারে পরিবেশিত হয়নি বলেই পরার্থানুমান হয়। তবে গদ্যাংশের স্বল্পতা, ক্ষুদ্র সংলাপ, অনুপ্রাস অলংকারের প্রাচুর্য এটিকে কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রকের নাট্যকর্ম অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা দান করে। হয়ত বিশ্বনাথের বিধিবিধানহেতুই পরবর্তীকালে নাট্যকারগণ উপরূপককে নাটকের প্রকৃতিতে রচনা করেছিলেন। তাই উপরূপকের সেকাল ও একাল নিয়ে বিশদ আলোচনার ক্ষেত্রে একাধিকবার উঠে আসছে একথা যে একসময়ে নৃত্যধর্মী নাট্য থাকলেও বিশ্বনাথের উত্তরকালে উপরূপকগুলি সংহত ও সংযত ভাবে নাটকের প্রকৃতি অনুসারেই নাট্যজগতে প্রবেশ করেছে।

❖ হল্লীশের আধুনিকতার লক্ষণ :

অষ্টাদশ উপরূপকের মধ্যে হল্লীশের ফল্গুধারাটি বহু প্রাচীন। এটি যে মূলতঃ নৃত্য-ই এবং নৃত্যের বিলাসব্যসনকে ত্যাগ দিতে পারেনি এই উপরূপক, তার প্রমাণ বিশ্বনাথ কবিরাজের 'বহুতালস্থিতিঃ' এই পদের ব্যবহার[১৭৯]। অর্থাৎ এটিকে প্রকারান্তরে নৃত্যের ছলে নাট্য-ই বলা চলে। *সাহিত্যদর্পণ*-এর প্রাক্ যুগের কোনও হল্লীশ নাট্যকর্ম অধুনা লুপ্ত। তাই যদি কোনও এই জাতির উপরূপকের হদিশ মেলে, তবে নবীন-প্রবীণের মেলবন্ধনের তুলনামূলক আলোচনায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী আচার্য অধ্যাপক ডঃ প্রফুল্ল কুমার মিশ্রের তত্ত্বাবধানে 'Contribution of Orissa to Uparupakas' এই বিষয়ে গবেষণা করেন এবং সাফল্য অর্জন করেন।[১৮০] সেই শোধপত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি

কবিডিণ্ডিম জয়দেবাচার্যের *উৎসাহবতীরূপক*-কে হল্লীশ ধারার উপরূপকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। যদিও দুখীশ্যাম পট্টনায়ক কর্তৃক সম্পাদিত *উৎসাহবতীরূপক* একটি বীথী রূপক ব'লে পূর্বেই প্রতিভাত হয়েছে কারণ এই গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ। তবুও উপরিউক্ত গবেষক সেই মতখণ্ডন না ক'রেই পুনরায় এটিকে হল্লীশের মর্যাদা দিয়েছেন। তবে বিশ্বনাথকৃত হল্লীশের লক্ষণের সঙ্গে এর সাযুজ্যনির্ণয় একটি কষ্টকর ও জোরপূর্বক আয়াস। বিশ্বনাথকৃত লক্ষণটি নিম্নলিখিত –

> হল্লীশ এব একাঙ্ক সপ্তাষ্টৌ দশ বা স্ত্রিয়ঃ ।
> বাগুদাত্তৈকপুরুষঃ কৈশিকীবৃত্তিরিজ্জ্বলা ।
> মুখান্তিমৌ তথা সন্ধী বহুতালস্থিতিঃ ।।[১৮১]

অর্থাৎ এটি একাঙ্ক উপরূপক, এখানে সাত, আট বা এমনকি দশ জন নারী চরিত্র থাকবে, একজন শুদ্ধ ভাষায় বর্ণিত উদাত্ত নায়ক থাকবে, কৈশিকীবৃত্তি এখানে সমুজ্জ্বল হবে এবং কেবলমাত্র দুটি সন্ধি যথা মুখ ও নির্বহণ দেখা যাবে। তবে এই সমগ্র বৈশিষ্ট্যের আধার হবে সংগীত। সংগীত এই উপরূপকের ভূমি এবং সেখানেই এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের একমুখী কোনও ইতিবৃত্তের উপস্থাপনা ঘটবে যা নর্মপ্রধান। হল্লীশের অঙ্গিরস সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজ নিশ্চুপ ছিলেন এমন বলা যায়না কারণ বৃত্তি প্রমাণ করে এটির শৃঙ্গার রসের ঔজ্জ্বল্য। উদাহরণে *কেলিরৈবতক* নামের একটি নিদর্শন সেকালে জীবিত থাকলেও বর্তমানে এর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়না।

উৎসাহবতীরূপক নাট্যের গদ্যপদ্যময়তাকে কিঞ্চিৎ অবহেলা ক'রেই পদ্যের সঙ্গলাভ করেছে। এখানে গদ্যাংশ যৎসামান্যই অবস্থান করেছে। তাই নাট্যনির্দেশনায় স্বরযোজিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সংগীতের ভূমি প্রস্তুত থাকলেও এই নাট্যটি বীররসপ্রধান। নায়ক এখানে অর্জুন এবং নায়িকা প্রম্লোচা। নায়ক চরিত্রটি বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর হলেও ইতিবৃত্তটি জৈমিনীয়াশ্বমেধপর্বা থেকেই গৃহীত একথা দুখীশ্যাম পট্টনায়ক জানিয়েছেন। [১৮২] প্রম্লোচার শৌর্য, বীরত্বই এখানে উপজীব্য। একাধিক নারীচরিত্র বলতে মদনলেখা, কর্পূরিকা মুখসন্ধির অংশে উপস্থিত থাকলেও তা প্রম্লোচার সাহায্যকারী। তাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে মূল আখ্যানের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। এমনকি নাট্যের সমাপ্তি অংশেও একাধিক নারীচরিত্রের কোনও অবদান নেই। অন্যদিকে কৈশিকীবৃত্তিও সাত্ত্বতী বৃত্তির কাছে পরাজিত। এমনকি নায়ক অর্জুন ছাড়াও হংস, সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, নারদ ইত্যাদি পুরুষ চরিত্রই কাহিনির চালনা করেছে অর্জুনের সহযোগী হিসেবে। তাই এটিকে *সাহিত্যদর্পণ* -এর মতে অসিদ্ধ বলা যেতেই পারে। একাধিক নারীচরিত্র নাট্যে গৌণভাবে উপস্থিত থাকলেও তাকে হল্লীশের গোত্রে অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে এমন ধারণা সঠিক নয়। যে হল্লীশ একদা গোপবধূদের সঙ্গে কৃষ্ণের রাসলীলার আকর ছিল, তা প্রমাণ করে প্রতি গোপিনীর প্রাধান্য। রাধা মধ্যমণি থাকলেও তার অষ্টসখী বা অন্যান্য গোপবধূও কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট। এমনকি এই ধারণা যে বিশ্বনাথ কবিরাজের সময়ে পরিবর্তিত হয়েছিল তা নয়। কেলিরৈবতকের ইতিবৃত্ত কীরূপ হতে পারে, সে বিষয়ে অনুমান ক'রে নিতেই হয়। পূর্বোল্লিখিত 'অর্জুনের নিয়মভঙ্গে বনে গমন'-তে বর্ণনা থেকেই কাম, ললিত হাব-ভাব-বিলাস, ভোগবাসনা, সংগীতের আবহের ধারণালাভ

অসম্ভব নয়। তাই হল্লীশের যে আস্বাদ, তা *উৎসাহবতীরূপক*-এ পাওয়া যায়না। তাই বিশ্বনাথ কবিরাজের সিদ্ধান্তের লক্ষণগুলির সঙ্গে কোনও নাট্যগ্রন্থের গঠনগত সৌহার্দ্য থাকলেও মনে রাখা প্রয়োজন এটি একজন পুরুষের সঙ্গে বহু নারীর কোমল রসালাপের নান্দনিক অনুলিপি। তবে কি এখানে কেবলই কৃষ্ণের কথাই বিধৃত থাকতে হবে? সেক্ষেত্রে বলা যায় যে বিশ্বনাথ কবিরাজ সেই বিশেষকে সামান্যে উত্তীর্ণ করতে চেয়েছিলেন ব'লেই ভাবতে হবে কারণ তিনি লক্ষণে কৃষ্ণের নাম ব্যবহার করেননি। যদিও বা *কেলিরৈবতক*-এ কৃষ্ণ নায়ক হয়ে থাকে, তাহলেও কৃষ্ণের লালিত্য যদি কোনও উদাত্ত নায়ক গ্রহণ ক'রে তদনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে এবং ললিতোপচারে পারদর্শী নারীগণ সেই রঙ্গকলাবিদ্যার বিবিধ প্রদর্শন করতে পারে, তবে তা 'হল্লীশ' উপরূপক হবে। তবে অনেকের মতেই বর্তমান ভারতের গুজরাত রাজ্যের লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত এই হল্লীশ –

Hallisaka is a group dance native to Gujarat. This dance in the Harivamsa Purana is very significant. The dancers form a circle with their hands joined together to form a chain. The 'tala' is kept by clapping and the dance is accompanied by a melodious song. A young man who acts as Lord Krishna stands in the middle of the damsels. The feet movements, toes, heels and legs first show rhythmic expression measured steps, long, short, quick, and slow accompanied in single, double and triple timings.[১৮৩]

আবার ভারতের মণিপুরি নৃত্যেও রাসরচনার একটি পরিবেশনা হয়ে থাকে। সেখানে বসন্তকালীন রাস, শারদপূর্ণিমার মহারাস ইত্যাদি নৃত্যপ্রযোজনা বর্তমান এবং তা হল্লীশের সেই লক্ষণকে অনুসরণ করে যা *অভিনবভারতী, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*-এ দৃষ্ট। *সাহিত্যদর্পণ*-কে আদর্শ মানলে সেই নৃত্যবিষয়টি 'হল্লীশ' নাট্য হবেনা কারণ সেখানে কৃষ্ণের কোনও উদাত্তবচন থাকেনা এবং ধীরোদাত্ত স্বভাবও লক্ষ্য করা যায়না।

তাই আধুনিককালে রাসলীলানৃত্যে হল্লীশ যতখানি সুলভ এবং নম্র, কোনও আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত নাট্যে ততখানি বিহিত নয়। যদি হল্লীশের বিবর্তন খেয়াল করি, তবে তাকে নৃত্যের মধ্যেই লাভ করা যায়। সেই নৃত্য ধনঞ্জয়কথিত নৃত্য ও নাট্যের মধ্যবর্তী কারণ সেখানে নৃত্যের ভাবাশ্রয়তা রয়েছে, তেমনই নাট্যের অনুকরণাত্মকতাও রয়েছে। সেই অভিনয়ে আঙ্গিক, আহার্য ও সাত্ত্বিকতা বর্তমান কিন্তু বাচিক সেখানে নাট্যস্থিত চরিত্রের মাধ্যমে মূর্ত না হয়ে সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাই হল্লীশের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে হলে মণিপুরি রাসনৃত্য হ'ল নাট্যনৃত্য। সেখানে নাট্যের আভরণে নৃত্যাবয়ব রসিকদের মনোরঞ্জন করে।

❖ **ভাণিকার নবভণিতি :**

সাহিত্যদর্পণ-এর পরবর্তীতে খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতকে শ্রীল রূপগোস্বামী *দানকেলিকৌমুদী* ভাণিকা রচনা করেন। রূপগোস্বামী ছিলেন কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী প্রতিভার একাধার। তিনি *নাটকচন্দ্রিকা*-তে নাট্যশাস্ত্রীয় বিধি

সম্পর্কে সংবদ্ধ সমালোচনা করেছেন। অর্থাৎ পঞ্চম বেদ সম্পর্কে যাঁর সম্যক জ্ঞান রয়েছে, তিনি উপরূপক রচনা করলে যে তা শাস্ত্রানুগ হবে তা বলাই বাহুল্য। ষষ্ঠ শ্লোকে নটের উক্তিতে দেখা যায় –

অবগণিতসন্ধিভূমা নাট্যকলেযং বলিষ্ঠসপ্তাঙ্গা ।
পরমসুবৃত্তিসুগাঢ্যা বররাজ্যশ্রীরিব স্ফুরতি ।।[১৮৪]

অর্থাৎ ভাণিকার সপ্ত অঙ্গ যথা উপন্যাস, বিন্যাস, বিরোধ, সাধ্বস, সমর্পণ, নিবৃত্তি এবং সংহার যে যথাক্রমে প্রসঙ্গানুসারে স্ফুরিত হবে তা নাট্যকার প্রথমেই বিজ্ঞাপিত করেছেন। টীকাকার শ্রীল জীবগোস্বামী তাঁর সমীক্ষায় সেই অঙ্গগুলির অবস্থান সম্বন্ধে পাঠকদের অবগত করিয়েছেন। সুতরাং এই ভাণিকা এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ কর্তৃক প্রদত্ত উদাহরণের *কামদত্তা* একই মুদ্রার দুই পৃষ্ঠ হবে এ বিষয়ে অনেকখানিই সন্দেহমুক্ত হওয়া যায়। এমনকি এই *দানকেলিকৌমুদী* ভাণিকায় কৃষ্ণের একটি উক্তিই যে নাট্যের শাশ্বত বার্তা, তা কামদত্তা নাট্যে কতখানি প্রদর্শিত ছিল তা বলা যায়না। শ্রীল রূপগোস্বামী ছিলেন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে নিষ্ণাত পণ্ডিত। তাই কৃষ্ণের উক্তিতে দেখা যায় "ধর্ম্মেণ দুর্ল্লভো মোক্ষঃ কিন্তু কামপ্রযোগেণ ধ্রুবং লভতে"[১৮৫]। অর্থাৎ পুরুষার্থচতুষ্টয়ের যে ক্রম, তাকে অবহেলা করার উপায় নেই মনুষ্যজনের। ধর্ম, অর্থ, কামের পরিচর্যার মাধ্যমেই কেউ মোক্ষের পথে গমন করে। কামকে উপেক্ষা করে মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। এই জীবনদর্শন পূর্বকালীন উপরূপকে কতখানি মূল সম্পদ হিসেবে রক্ষিত ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায়না। কারণ *রত্নাবলী, পারিজাতমঞ্জরী* ইত্যাদি নাটিকাসহ *উন্মত্তরাঘব* প্রেক্ষণক, *দ্রৌপদীস্বয়ংবর* শ্রীগদিত ইত্যাদি উপরূপকে শৃঙ্গার রস অঙ্গিরস। সেখানে নায়ক-নায়িকার মিলনই সারকথা। ঋজু ভঙ্গিতে আন্দদদানই সেখানে নাট্যোপস্থাপনার করণীয়। পুরুষের বিক্রম, নারীর রতিক্রিয়া, বিচ্ছেদে অতিশয় বিরহ, মিলনে হৃদয়ের উদ্বেলনের অতিরিক্ত সেই ঘটনাটি ঋতের পথে এগিয়ে এগিয়ে যায়না। *দানকেলিকৌমুদী* ভাণিকার রচয়িতা-ই এমন একজন পণ্ডিত যিনি প্রাচীন রীতিকেও অনুসরণ করেছেন। যদি এটিকে *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-এর নিয়মে দেখতে হয়, তবেও তা রসোত্তীর্ণ কারণ সেখানে বলা ছিল হরিচরিতমূলক কোনও গাথা সুকুমার মার্গে প্রদর্শিত হবে। আবার, *সাহিত্যদর্পণ*-এর নিয়ম যে এখানে প্রতিফলিত তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এমনকি টীকাকার শ্রীল জীবগোস্বামী এটিকে 'গেয়নাট্য' বলেছেন "ভাণিকেযং গেযরূপা"[১৮৬]। তাহলে ভাণিকা একটি গীতিধর্মী নাট্য হতে পারে, তা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং এটিও সংগীতাত্মক ভঙ্গিতে পরিবেশিত হতেই পারে এমনও সূক্ষ্ম নির্দেশ রয়েছে। তাই বলা যেতে পারে এই ভাণিকার হাত ধরেই একটি এমন নাট্যগ্রন্থের সৃজন হয়েছে যা সাহিত্য এবং দর্শন দুদিক থেকেই সমভাবাপন্ন। এই ধরণের উপরূপকের অস্তিত্ব উপরূপক শ্রেণীরও উত্তোলন ঘটায়। কী কারণে রূপক এবং উপরূপক এই দুটি ধারা একটি ছত্রেই আসেনি, তা যেহেতু অজানা; তাই যদি ভবিষ্যতেও এমন কোনও ভাণিকা বা কোনও অন্য ধারার উপরূপক রচিত এবং অভিনীত হয়ে সুপ্রসিদ্ধ হয়, তবে হয়ত রূপক এবং উপরূপকের খড়ির গণ্ডি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

২.৭ উপরূপক-সমীক্ষায় আধুনিক পণ্ডিতদের মতামত :

প্রাচীনকালে উপরূপকের লক্ষণনির্ণয়ে নাট্যশাস্ত্রকারগণ যতখানি উদগ্রীব ছিলেন, ততখানি ব্যাকুলতা দেখা যায়না উপরূপকের স্বরূপবিশ্লেষণে। আধুনিকযুগের মনীষীদের সঙ্গে এখানেই তাঁদের পার্থক্য যে একালের

পণ্ডিতবর্গ সংস্কৃত বা ভারতের যে কোনও প্রাদেশিক ভাষায় অষ্টাদশ উপরূপকের লক্ষণ রচনা করেননি। তাঁরা রূপক এবং উপরূপকের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণগুলি যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনই উপরূপকের বর্তমান অবস্থারও কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই এখন সেই মনীষীদের উপরূপকভাবনাগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা কর্তব্য।

- **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) :**

উপরূপক বিষয়ে আলোচনায় বাঙালি মনীষীদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অগ্রগণ্য। **১৮৫৩** খ্রিস্টাব্দে *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব* গ্রন্থে 'দৃশ্যকাব্য' অধ্যায়ে তিনি বলেন –

রূপক নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি দশবিধ। উপরূপক নাটিকা, ত্রোটক প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ। আলঙ্কারিকেরা এই যে দৃশ্যকাব্যের অষ্টাবিংশতি বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষভেদগ্রাহক তাদের কোনও লক্ষণ নাই।[১৮৭]

অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় দৃশ্যকাব্যের এই অষ্টাবিংশি বিভাগের কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি। যেহেতু প্রতিটি রূপক, উপরূপকের বস্ত, নেতা, রস, সন্ধি, বৃত্তি, অঙ্গ নিয়ে নাট্যশাস্ত্রবেত্তাগণ তাঁদের ভাষ্য প্রস্তুত করেছেন, সুতরাং প্রতিটিই 'দৃশ্যকাব্য'। তাই দৃশ্যকাব্যের অষ্টাবিংশতি প্রকারভেদ বিষয়েই একটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ নিবদ্ধ হওয়া উচিত বলেই উনি মনে করেছেন। তাই পরোক্ষভাবে বলতে হয় যে উনি রূপক এবং উপরূপক এই ভেদকে স্বীকৃতি দিতে রাজি নন।

- **বিনয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) :**

বিনয়চন্দ্র মজুমদারের পরিচয় দিতে গেলে একটিই বিশেষণ তাঁর সমগ্রতাকে দ্যোতিত করে। সেটি হ'ল ভারততত্ত্ববিদ। তিনি সংস্কৃত, পালি ভাষায় ছিলেন সুদক্ষ প্রবীণ পণ্ডিত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত *প্রবাসী* পত্রিকার ১৩০৮ বঙ্গাব্দের (১৯০২ খ্রিস্টাব্দ) ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় তাঁর দুটি প্রবন্ধে তিনি রূপক ও উপরূপক বিষয়ে বিস্তর গবেষণালব্ধ তত্ত্বের উপস্থাপন করেছেন। 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন-

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য রূপক ও উপরূপক নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত। রূপক সমধিক পুরাতন। ভরতবিরচিত নাট্যশাস্ত্রে উপরূপকের উল্লেখ নাই.... এই শ্রেণী-বিভাগ ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের বিশেষত্ব-বিজ্ঞাপক।[১৮৮]

এই প্রবন্ধটি একটি প্রস্তাবনামাত্র। পরবর্তী প্রবন্ধ 'নাট্যরুচি'-তে তিনি অধিক সরব। সেখানে তিনি অনেকগুলি বিষয়ের নিষ্পত্তি দেখাতে চেয়েছেন। রূপক ও উপরূপকের ভেদের কারণে তিনিই স্বচ্ছতা এনেছেন। তিনি বলেছেন "রুচিপার্থক্যই উভয় শ্রেণীর নাট্যসাহিত্যের প্রধান পার্থক্য।"[১৮৯] এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই 'রুচি' বলতে কী ধরণের রুচি বলতে চেয়েছেন এবং সেই রুচিগত তারতম্য কাদের মধ্যে বর্তমান। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের তদানীন্তন ইতিহাস এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে মেরুদণ্ড করেছেন। তিমি দুটি রুচির কথা বলেছেন – মার্জিত রুচি এবং স্থূল রুচি। এই রুচিদ্বয়ের আবাস হ'ল সহৃদয়হৃদয়। এক শ্রেণীর ভাবিয়তাগণ কেবলমাত্র রসের

ইঙ্গিতকেই কামনা করে। সেখানে রস অভিব্যক্ত হয়ে আনন্দধারায় বয়ে চলে। এটিই মার্জিত রুচি। এর বিপরীতে যারা স্পষ্ট ভাষা, স্পষ্ট ভাব এবং স্পষ্ট রসকে কামনা করে, তা স্থূল রুচির অধিকারী। তাই প্রথম রুচিতে পড়ে রূপক এবং দ্বিতীয় রুচিতে পড়ে উপরূপক। বিচয়টিকে তিনি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন –

রূপকে অধম শ্রেণীর কামশৃঙ্গার বিরল, তাহা উপরূপকেই সমধিক অভিব্যক্ত। রূপকের নায়ক দুষ্মন্ত নায়িকা শকুন্তলার সহিত সুসঙ্গত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়াও সংযত; উপরূপকের নায়ক রত্নাবলীর রাজা দাসী বলিয়া জানিয়াও সাগরিকাকে সম্ভোগ করিবার জন্য অসংযত, ও ব্যাকুল – শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিতেও সমুদ্যত।[১৯০]

তবে এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে একটি ভ্রান্তি হতে পারে যে রূপক ও উপরূপকের নায়কের চরিত্রগত পার্থক্যের কথাই হয়ত বিনয়চন্দ্র মজুমদার বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তা সত্য নয়। তিনি কেবলমাত্র একজন নাট্যকারের কৌশলকে মানদণ্ডের মর্যাদা দিয়েছেন। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের দুষ্মন্তের চরিত্র বহুপরিচিত। তার লাম্পট্যের কিঞ্চিৎ হ্রাসের জন্যই যে কালিদাস শাপবৃত্তান্তের অবতারণা করেছেন তা পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট। দুষ্যন্ত একাধিক নারীর শয্যাসঙ্গী। পঞ্চম অঙ্কে হংসপদিকার গানে কেবল রাজার চারিত্রিক স্খলন ইঙ্গিতটুকুই বর্তমান। অথচ *রত্নাবলী* নাটিকায় রাজা উদয়নের চরিত্রের কামলোলুপতা প্রকাশ্যে ব্যক্ত। তাই রচনাকৌশলগত পৃথকত্বই নাটক এবং নাটিকা তথা রূপক এবং উপরূপকের ভেদের হেতু। তাই প্রাবন্ধিক রূপকের সীমারেখাও অঙ্কন করেছেন প্রাগুক্ত প্রবন্ধেই –

যে রূপকে রুচিবিকার লক্ষ্য করা যায়, তাহা অধম শ্রেণীর গ্রন্থ। কিন্তু উপরূপকের উত্তম শ্রেণীর গ্রন্থেও রুচিবিকারের আভাস পাওয়া যায়। উপরূপকযুগে ভারতীয় জনসমাজ যে সংযম অপেক্ষা সম্ভোগকেই সমাদর করিতে শিখিয়াছিল, তাহার পরিচয় সর্ব্বত্র পরিস্ফুট।[১৯১]

এখানে একটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকেও তিনি দায়ী করেছেন রূপক এবং উপরূপকের ভেদের জন্য। তিনি বলতে চেয়েছেন যে একদা ভারতের সংস্কৃতি পরিশীলিত রুচিমনস্ক হয়ে থাকলেও পরবর্তীতে এই মনস্তত্ব অনেকখানিই পরিবর্তিত হয়। তাই 'স্পষ্ট রস' এর প্রতি মন আকৃষ্ট হতে থাকে কিছু মানুষের। তাই তাদের জন্যই বিনোদনমূলক উপরূপক দৃশ্যকাব্যের জন্ম। ভারতবর্ষের অবন্তী প্রদেশ, দাক্ষিণাত্যকে তিনি উপরূপকের সূতিকাগার ব'লেই মানতে চেয়েছেন। আর্যাবর্তের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের বিভেদ মূলতঃ আর্য এবং দ্রাবিড় সংস্কৃতির বিভেদ। তাই উভয়স্থানে নাট্য পরিবেশিত হলেও রুচিগত পার্থক্যের জন্যই দাক্ষিণাত্যে উপরূপক বিস্তৃত হয়েছে।

তবে উপরূপকের বিষয়গত পার্থক্যের আলোচনায় একথাও উপেক্ষা করেননি যে কিছু উপরূপক কামশাস্ত্রের লক্ষ্যগ্রন্থ নয়। যেমন উল্লাপ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন তা "দেবতার লীলামৃত", আবার শ্রীগদিত হ'ল "সুললিত সংগীতাঢ্য", ত্রোটক হ'ল "দেবলোক ও নরলোকের প্রেমপরিণাম"। আবার, ইন্দ্রজালপ্রদর্শনমূলক উপরূপকের যে অস্তিত্ব রয়েছে তাও তিনি বলেছেন। এর দ্বারা সংলাপক, শিল্পককে বোঝাতে চেয়েছেন। আবার সট্টক

উপরূপকের অঙ্গিরস 'অদ্ভুত' ব'লেই তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে অভিনবগুপ্ত কর্তৃক সমর্থিত নব রসের মধ্যে অদ্ভুত রস রূপকে মূল রস হিসেবে স্থান না পেলেও উপরূপকের মধ্যে রত্নাসন লাভ করেছে। সর্বোপরি অধিকাংশ উপরূপকেরই অভিলাষ "সম্ভোগের ওপর সম্ভোগ ঢালিয়া দেও"।[১৯২]

তাই একদিক থেকে ভারতীয় লোকচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই রূপক এবং উপরূপক ভেদদ্বয়ের মাধ্যমে পরীক্ষিত হতে পারে। সাধারণ লোকজীবন তদানীন্তন সময়ে কীরূপে অবস্থান করত এবং অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ব্যতীত দৈহিক ও মানসিক চাহিদার উপকরণের প্রকৃতি কেমন ছিল, তা নাটিকাদি উপরূপকের বিবর্তন এবং বিবরণেই সুপ্ত।

তাই বিনয়চন্দ্র মজুমদার নাট্যরুচি প্রবন্ধের দ্বারা উপরূপকের কারণ, উপরূপকের স্থান, উপরূপকের ভেদ, উপরূপকের বিষয় নিয়ে নানবিধ ব্যাখ্যা করেছেন ব'লেই বর্তমানে দাঁড়িয়ে এর ইতিহাস জানা সম্ভবপর হয়েছে।

- **ভি রাঘবন (১৯০৮-১৯৭৯) :**

বহুজ্ঞ পণ্ডিত ভি রাঘবন জন্মসূত্রে তামিলনাড়ু রাজ্যের সন্তান। তাঁর সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র বিষয়ক গবেষণা এবং উপরূপকের রচনা এই আলোচনায় পাথেয়। তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধ 'Uparupakas and Nritya Prabandha'-এ তিনি উপরূপকের সঙ্গে সরাসরি বর্তমান সময়ে ভারতে প্রচলিত ধ্রুপদী নৃত্য ও লোকনৃত্যের তুলনা করেছেন। এমনকি এও দেখিয়েছেন যে কীভাবে আধুনিক কালে সেই প্রাচীন উপরূোকগুলি প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করেছে। উপরূপক সম্পর্কে তাঁর ধারণা –

the uparupakas minor forms of drama in which music and dance predominated and most of which were forms of dance-drama or regular dancers.[১৯৩]

এমনকি নাট্যধর্মী ও লোকধর্মী অভিনয়ের মধ্যে উপরূপককে তিনি বলেছেন 'লোকধর্মী'; কারণ –

uparupakas lacked one or other or more of the four abhinayas, thus minimising the scope for naturalistic features – lokadharmi and resorting increasingly to the resources of natyadharmi.[১৯৪]

অর্থাৎ তাঁর এই প্রবন্ধের জেরে এই তত্ত্বে উপনীত হওয়া সম্ভবপর যে উপরূপক হ'ল সংগীতকলায় আসীন আঙ্গিকসর্বস্ব অভিনেয় এক প্রকার শৈলী যা মূলতঃ বাচ্যার্থের ভাবেই রসসঞ্চার করে।

উপরূপকগুলির ইতিহাসে তিনি কয়েকটি যোজনা করেছেন। যেমন অভিনবভারতীতে উল্লিখিত 'ষিদ্গক' নৃত্তপ্রবন্ধ এবং পদার্থাভিনয়ী 'শ্রীগদিত' যে একই প্রযোজনার নামান্তর তাও তিনি অনুমান করেছেন। 'ষিদ্গাক', 'শিঙ্গক' এতগুলি নামকরণ দেখেই তিনি মন্তব্য করেছেন – "wrong Sanskritisation" অথবা "hyper-Sanskritisation"[১৯৫]। সঠিকভাবে সংস্কৃত ভাষা উচ্চারিত না হওয়ার প্রবণতা থেকেই যুগ থেকে যুগান্তরে

একই প্রজাতির প্রযোজনা ভিন্ন অভিধা গ্রহণ করেছে। *অভিনবভারতী*-তে প্রাপ্ত উদ্ধৃতিতে দেখি যে ষিদ্গকে কোনও এক নারী তার সখীর কাছে তার দয়িতের উদ্ধত আচরণের কথা ব্যক্ত করছে। ইন্দ্রা চক্রবাল 'শিঙ্গক' শব্দের অর্থ দেখিয়েছেন একজন ব্যভিচারী পুরুষ। তাই এমন কোনও ধূর্ত নায়কের বর্ণনা যখন ষিদ্গকে পাই, তখন ধরে নেওয়াই যায় ভি রাঘবন সঠিক তত্ত্বের উদ্ভাসনা ঘটিয়েছেন। আবার শ্রীগদিত উপরূপকের উৎস লক্ষ্মী-বিষ্ণুর দাম্পত্যপ্রণয় থেকে জাত হলেও *ভাবপ্রকাশ*-এর সমকালে নায়িকা নায়কের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার কথাবস্তু উঠে আসত শ্রীগদিতে। এমনকি পরবর্তীতে যেহেতু ষিদ্গক 'উপরূপক' এর মান পায়নি, তাই ধরাই যায় হয়ত শ্রীগদিতেই ষিদ্গক আত্মসাৎ করেছিল। এই প্রযোজনাকে তিনি ভরতনাট্যম্ নৃত্যশৈলীর 'বর্ণম্'-এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন –

Students of dance may at once recognise here the similarity of this theme with that of the recurring theme of Bharata Natya songs, particularly varnas.[১৯৬]

তবে তিনি এটাই প্রমাণ করতে চাননি যে ভরতনাট্যম্ নৃত্যের বর্ণম-ই শ্রীগদিত বা ষিদ্গকের আধুনিক রূপ বা বর্ণম-ই ছিল পুরাকালের শ্রীগদিত বা ষিদ্গক। তিনি কেবলমাত্র দেখিয়েছেন যে উপরূপকের বিষয় ভারতের প্রাদেশিক নৃত্যে কীভাবে অনুসৃত হয়ে চলেছে অর্থাৎ উপরূপকের প্রবাহ মৃত নয়।

এরপর উল্লেখ্য হল্লীশ উপরূপক। হল্লীশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন এটি "circular dance"[১৯৭]। একথা না স্বীকার ক'রে উপায় নেই যে ভি রাঘবন মহাশয়ও এটিকে আদ্যন্ত 'dance' ই হিসেবেই চিনিয়ে আশ্বস্ত করেছেন। এটিই বোধহয় একমাত্র উপরূপক যা দৃশ্যকাব্যের পরেও নৃত্যের দ্বারে তার পুনরাগমন ঘটেছে। এটি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেই প্রচলিত একটি নৃত্য এমন কথাই উক্ত প্রবন্ধ থেকেই পাওয়া যায় –

The circular dance of girls is one of the most widely prevalent folk dances found in all parts of the country: the garba of Gujarat, the achciyarkuravai of ancient Tamil classics, the kummi, kolattam and kudichcuppattu of Tamilnad and kaikuttikalli of Malaber are all varieties of Hollisaka.[১৯৮]

সুতরাং গুজরাত, তামিলনাড়ু, কেরালা রাজ্যে বর্তমানে হল্লীশ এরূপে অবস্থান করছে। তাহলে বিনয়চন্দ্র মজুমদারের মতামতও এখানে মিলে যায় যে উপরূপকের দাক্ষিণাত্যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেকখানি বৃহত্তর ছিল আর্যাবর্তের তুলনায়। আবার, একথাও নাকচ করা যায়না যে উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর রাজ্যের মণিপুরি নৃত্যে 'রাসনর্তন'ও হল্লীশের নাট্যাশ্রয়িতাকে অবলম্বন করে। তাহলে হল্লীশ নৃত্য ও নাট্য উভয় দিকেই ব্যাপ্ত এমন সংবাদই উঠে আসছে।

আবার, কবি জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* কাব্যকে স্বাগত জানিয়েছে ভারতের একাধিক নৃত্যকলা। উপরূপকের মধ্যে 'কাব্য'-এর আলোচনায় সেকথাই তুলে ধরেছেন ভি রাঘবন –

The kavya is here a whole story composed into songs and danced. If the whole song-poem is in one raga, it is just the kavya, if it is in a variety of ragas, it is chitrakavya.[১৯৯]

... .

It could be seen that the celebrated the Geeta Govinda, in the wake of which many musical story-poems arose, belongs to the type, chitrakavya noticed above.[২০০]

তবে এখানে তিনি জয়দেবের কাব্যকে মূলতঃ 'চিত্রকাব্য'-এর রূপে রসে জারিত করতে চাইলেও অন্যান্য উপরূপকের ভঙ্গিতেও এর অনুষ্ঠান সম্ভব। *গীতগোবিন্দ*-এর কাব্যবস্তু অনুসারে এটি হল্লীশ বা শ্রীগদিত আকারেও নাট্যায়িত হতে পারে। এখানে একটি পুরুষ চরিত্র কৃষ্ণ এবং রাধা তার সখীর কাছে কৃষ্ণের গুণ, যশ, বিরহ ব্যক্ত করতেই পারে। সেভাবে উপস্থাপিত হলে তা হবে প্রাচীন 'শ্রীগদিত' এবং যদি *গীতগোবিন্দ*-এর আশ্রয়ে প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য সখীদেরও এই আবহে চিত্রিত করা যায়, তবে তা হল্লীশের সান্নিধ্যলাভ করতে পারে।

প্রেক্ষণককে তিনি মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু রাজ্যের লোকোৎসবের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। বসন্তকালের হোলিকাদহনের সময় যে লাওনি (lavani) গানের প্রথা রয়েছে, তারই সঙ্গে একটি অনুগমন লক্ষ্য করেছেন ভি রাঘবন মহাশয়।[২০১] দুর্মল্লিকা উপরূপককে তিনি বলেছেন "clandestine union" যা একজন নারীর গোপন বা নিষিদ্ধ প্রেমে নিভৃতকথা। এর নায়িকার বিষয়ে তিনি বলেছেন –

The character featured in this type is a female accamplice of a lower type, ... she appears and holds the audience for some time, one of the parties to the love intrigue appear on the stage, and she sets forth her plans and make her demands, bordering on blackmail.[২০২]

এই অধ্যায়ের শুরুতেই উপরূপকগুলির নামকরণের যাথার্থ্যবিচারে দুর্মল্লিকা-তে দেখেছিলাম 'দুষ্টা নারী'র কলাকৌশল। একই কথা ভি রাঘবনের অভিধাতেও শব্দায়িত হয়েছে। ভরতনাট্যম্ নৃত্যে 'পদম্' এর সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে দুর্মল্লিকার বিষয়ের এমনই দাবি জানিয়েছেন ভি রাঘবন। এছাড়াও দণ্ডরাসক, ডোম্বিকার প্রসঙ্গেও তিনি একেকটি নৃত্যের তুলনা করেছেন। সুতরাং ভি রাঘবনের প্রবন্ধটি ভারতের আঞ্চলিক নৃত্য এবং উপরূপকের একটি মৈত্রীবন্ধন তৈরি করে।

- **শান্তিদেব ঘোষ (১৯১০-১৯৯৯) :**

শান্তিনিকেতন এবং শান্তিদেব ঘোষ এ যেন এক অবিচ্ছিন্ন নিবিড় বন্ধন। রবীন্দ্রানুরাগী তথা রবীন্দ্রোত্তর যুগের রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতির অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব শান্তিদেব ঘোষ। তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল *রবীন্দ্রসঙ্গীত*। এটি মূলতঃ একটি প্রবন্ধে-সংকলন গ্রন্থ। এখানে তিনি উপরূপক সম্বন্ধে স্বল্প তথ্য উপস্থাপন করলেও তা একটি আলোকের রশ্মি। 'গীতনাট্যের বৈচিত্র্য' অধ্যায়ে তিনি বলেছেন –

এই ১৮ রকমের উপরূপকের মধ্যে কতকগুলি এযুগে যাকে আমরা গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্য বলি-তাই। 'রূপক' ও 'উপরূপকের' ব্যাপক বিকাশ মুসলমান-পূর্ব যুগেই বেশী হয়। মুসলমান যুগে তার অবনতি হ'তে থাকে এবং ইংরেজ যুগের সঙ্গে সঙ্গে এ-সবের ব্যবহারও আমরা একেবারে ভুলতে লাগলাম। তাই সেই-সব 'রূপক' ও 'উপরূপকে'র হুবহু নমুনা আজ ভারতে প্রচলিত নেই বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু সব রকম না থাকলেও কিছু কিছু যে এখনো বিভিন্ন প্রদেশে আত্মগোপন ক'রে আছে তা হয়তো বলা যায়।[২০৩]

মোটামুটিভাবে তিনি উপরূপকের তারুণ্যের কাল বলতে চেয়েছেন। তাঁর এই বাণীগুলিই প্রমাণ করে উপরূপকের অবলুপ্তি বা আত্মগুপ্তি। এখানে 'আত্মগোপন' শব্দটিই প্রমাণ করে পূর্বোক্ত পণ্ডিত ভি রাঘবনের প্রণিধানের বাস্তবতা। গরবা, লাওনি, রাস, রামলীলা এমনকি ভরতনাট্যম্, কথাকলি, ওড়িশি, মণিপুরি নৃত্যেই এগুলির বীজ নিহিত রয়েছে। বীজ এবং বৃক্ষের যে পার্থক্য, মেঘ এবং বৃষ্টির যে পার্থক্য, তিল এবং তৈলের যে পার্থক্য; তা-ই প্রাচীন উপরূপক এবং বর্তমান ভারতের প্রাদেশিক নৃত্য বা নৃত্যনাট্যের পার্থক্য। ইংরেজ যুগ অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতে শাসন শুরুর সঙ্গেই প্রতীচ্য সংস্কৃতির ভারতায়ন ঘটতে শুরু করে এবং ইতালীয় অপেরার ম'ত বাংলা গীতিনাট্য (lyric-drama) ইতিউতি দেখা দেওয়ার ফলে হয়ত প্রাচীন দেশজ মার্গনাট্য অবদমিত হতে থাকে। শান্তিদেব ঘোষ 'গীতিনাট্য' সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হ'ল "গীতনাট্য বলতে আমি গান-বহুল নাটকের কথাই বলছি, লিরিক নাট্য নয়।"[২০৪] যেহেতু তিনি এ-যুগের গীতনাট্যের অন্দরে উপরূপকের জীর্ণ কাঠামোর অবস্থানের কথা বলেছেন, তাই প্রকারান্তরে এও বলে দিয়েছেন যে উপরূপক মাত্রেই লিরিক-নাট্য নয়; বরং গান-বহুল কোনও প্রযোজনা। যে দৃশ্যেকাব্য সংগীত গদ্য ও পদ্যের শীর্ষে সুরের ইন্দ্রজাল বিস্তার ক'রে জনগণকে মোহিত করতে পারে, তা-ই 'উপরূপক' এমন একটি অভিপ্রেত লক্ষণ বলা যেতে পারে। রসিকসমাজ এখানে নাট্যোপভোগ করে, তেমনই সংগীতের রসতরঙ্গেও অবগাহন করে। অতএব সব মিলিয়ে বলা যায় যে শান্তিদেব ঘোষ উপরূপকের পক্ষে এবং তিনি উপরূপককে ভারতীয় নৃত্যনাট্যের পূর্বপ্রজন্ম হিসেবে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

❖ রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী (১৯৪৯ -বর্তমান) :

মধ্যপ্রদেশের জ্যোতিষ্কস্বরূপ অধ্যাপক রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে অবদান কেবল নত মস্তকে গ্রহণই করতে হয়। তিনি অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার একটি সেতু। এমনকি বহুবিধ সৃজনশীল সাহিত্যও রচনা করে চলেছেন অদ্যাবধি। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারেরই একটি কণিকা 'Uparupakas and Natyasastra' নামক প্রবন্ধ যা *Uparupakas in Indian Performing Arts* গ্রন্থে মুদ্রিত। এখানে তিনি উপরূপককে 'regional theatre-forms' বলার পক্ষপাতী। অভিনবগুপ্ত যে নৃত্তাত্মক প্রবন্ধগুলির কথা তা ওনার মতে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকজ নাট্যবিশেষ –

Abhinavagupta has quoted the definitions of the following regional forms of theatre named as...[২০৫]

প্রেক্ষণকের ব্যাপারে তিনি ভি রাঘবনের থেকে ভিন্ন মতপোষণ করেননি। এছাড়াও সট্টককে তিনি বলেছেন মধ্যদেশীয় সংগীতধর্মী নাট্যবিশেষ, ডোম্বী কাশ্মীরদেশীয় নৃত্যবিশেষ।এছাড়াও উত্তর ভারতে অনুষ্ঠিত বহুখ্যাত রাসলীলা এবং দক্ষিণ ভারতের ভগবতমেলক হল্লীশেরই ক্রমবিবর্তিত রূপ। এমনকি ছত্তিসগঢ়ের পাণ্ডবাণী-র মধ্যে প্রাচীন ডোম্বী নৃত্য লুক্কায়িত অবস্থায় রয়েছে[২০৬]।

অর্থাৎ রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী মহাশয় *সাহিত্যদর্পণ*-এর সমকালীন উপরূপকের বিশ্লেষণ না ক'রে তার প্রাকযুগের পদার্থাভিনয়মূলক দৃশ্যকাব্যের সঙ্গে বর্তমান ভারতের আঞ্চলিক লোকনাট্যগুলির একটি সন্ধিস্থাপন করতে চেয়েছেন।

❖ **অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতাবলি :**

উপর্যুক্ত পণ্ডিত মহোদয়ের মতাবলিকে মান্যতা দেওয়ার পাশাপাশি আরও কিছু ব্যক্তিবর্গের নাম করতেই হয় এই অবসরে। যেমন কেরলা রাজ্যের কৃতী সন্তান কে জি পলোসে 'Uparūpaka-s in Indian Performing Arts Tradition' প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে এই উপরূপকের অভিনয় সমাজের নিম্নবর্তী স্তরের মানুষের জীবনযাত্রা এবং সেই ধরণেরই মানুষের উপভোগ্য। তিনি উপরূপকের সংখ্যা বিষয়ে কোনও সীমাবদ্ধতা পছন্দ করেননি। তিনি জানিয়েছেন যে অষ্টাদশ উপরূপকের অতিরিক্ত কিছু কুশীলবকর্ম সমাজে প্রচলিত ছিল যা হয়ত উপরূপকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি –

The number of uparūpaka-s could not be restricted to eighteen. More and more regional forms emerged in course of time. It will not be an exaggeration to state that they are innumerable.[২০৭]

এরপর আসা যাক শ্রীমতী ঠাকুরের প্রসঙ্গে। *Sangeet Natak Vol XXXVIII No. 4,2004*-এ প্রকাশিত 'Nritta and Nritya varieties in India' প্রবন্ধে শ্রীমতী ঠাকুর বলেছেন –

Rupaka is a perfect drama depicting one continuous theme and having the development of one emotion or rasa, ...The uparupaka is mainly the nritya variety with which we are here concerned.[২০৮]

অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে নৃত্য বা প্রকারান্তরে উপরূপকের মধ্যে গীতি, নৃত্য, পদার্থাভিনয় থাকলেও তা রসনিষ্পত্তির বিষয়ে রূপকের ম'ত উচ্চাভিলাষী নয়। অর্থাৎ নাট্যেরই ভেদবিশেষ উপরূপক হলেও তা ভাবাভিনয়। তাই লাস্য, তাণ্ডবের সঙ্গে তিনি দুর্মল্লিকা, প্রস্থান ইত্যাদিকে একই পঙক্তিবদ্ধ করেছেন। অথচ লাস্য বা তাণ্ডব সঠিক উপরূপকের ভূষণ পায়নি কোনও নাট্যতত্ত্ববিদের থকে উপহারস্বরূপ। সুতরাং তিনি উপরূপককে নৃত্যমালিকার একটি পুষ্পরূপেই গেঁথেছেন।

পরিশেষে বলতে হয় *International Journal of Sanskrit Journal : অনন্তা*-র কথা। এখানে ডঃ সজিশ সিএস 'Folk strands in Sanskrit dramas – a study based on Bhana' প্রবন্ধে উপরূপকের প্রসঙ্গে ভাণ রূপকের অনুষঙ্গ যুক্ত করতে চেয়েছেন এবং উপরূপকের উন্নতিকল্পে ভাণের অবদানকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে করেছেন –

Uparupaka and folk dances had helped the development and evolution of Dasarupaka. Uparupaka had influenced the growth of Bhana. Local and folk dance elements are mixed in Bhanika and Bhana. Thus Bhana become popular since it is only Rupaka that describes the Nritta.[২০৯]

অর্থাৎ উক্ত একাধিক বরিষ্ঠ সমালোচকের মতানুধাবনে যে বিষয়গুলির জন্ম হয়, সেগুলিকে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরলে বলতে হয় যে আধুনিক যুগের সারস্বত সমাজ উপরূপকবিষয়ে আগ্রহী এবং রূপক-উপরূপকের নিশ্চিত মেরুকরণ আধুনিক কালেই ঘটেছে। পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, মধ্যভারতের মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যের বিগদ্ধ ব্যক্তিত্বগণের এই বিষয়ে ভাবয়িত্রী প্রতিভা প্রমাণ করে যে সমগ্র ভারতবর্ষেই উপরূপকবিষয়ে গবেষণা এবং সমীক্ষা চলেছে। রূপকের তুলনায় উপরূপকের রসাস্বাদকবর্গ তুলনায় হীন শ্রেণীর। মনোরঞ্জনার্থেই রসিকগণ এই উপরূপককে উপভোগ (enjoy) করে। এমনকি উপরূপকের দর্শক-শ্রোতাবৃন্দের প্রতি তাঁদের মনোভাব নিরপেক্ষ নয়; বরং নিন্দনীয়-ই। উপরূপকে যেমন সংগীতমাহাত্ম্য বর্তমান, তেমনই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গীতপ্রধান লোকনাট্যে এবং ভরতনাট্যমের মত ধ্রুপদী নৃত্যেই উপরূপকের সুষুপ্তি ঘটে চলেছে। অর্থাৎ নৃত্য এবং উপরূপকের সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয়েছে আধুনিক গবেষকদের মতপ্রকাশের মাধ্যমে। পণ্ডিতগণ উপরূপকের ইতিহাস এবং বিবর্তন বিষয়ে যতখানি গবেষণা করেছেন, তদনুরূপ উপরূপকের ভবিষ্যৎকালের পরিণতি নিয়ে লক্ষ্য করা যায়না। তবে ভারতের ধ্রুপদী নৃত্য এবং লোকায়ত নৃত্যনাট্যগুলিব্যতীত বাঙালি, মরাঠী, তামিল, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষার নাট্যচর্চায় উপরূপকের আঙ্গিককে মর্যাদা দেওয়া উচিত কিনা বা তা দেওয়া হলেও কীভাবে যুগোপযোগী ক'রে তোলা যায় সে বিষয়ে কোনও সম্ভাব্য পথের হদিশ পাওয়া যায়না।

২.৮ প্রাক্-রবীন্দ্রনাট্যযুগে বাংলা সাহিত্যে উপরূপকের সন্ধান :

বাংলায় উপরূপকচর্চার ইতিহাস মলিন নয়। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ রায়ের অবদান নাট্যপ্রেমী এবং সাহিত্য-সমালোচকদের কাছে সদাপ্রণম্য। নাট্যরাসক ধারার উপরূপকের পুনর্জন্ম ঘটান নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে রাজকৃষ্ণ রায় তাকে যথোচিত ব্যাখ্যায় একটি স্থায়ী আসন দান করেন। এমনকি *নাট্যসম্ভব* নামক একটি উপরূপক প্রণয়নও করেন যা উপরূপকের আধুনিকীকরণের প্রামাণ্য নথি। এছাড়াও খ্রিস্টিয় উনবিংশ শতকে অবিভক্ত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির কলিকাতা অঞ্চলে বেশ কিছু নাট্যরাসক রচিত হয়েছে। সেগুলি সাহিত্যদর্পণোক্ত নিয়মাবলিকে অনুসরণ করে হোক বা না হোক; নাট্যগ্রন্থগুলির পরিচয় ছিল একটি 'নাট্যরাসক'

রূপে। সেই সমস্ত নাট্যরাসকের নাম, নাট্যকারের নাম, উপজীব্য নাট্যেতিবৃত্ত এবং সময়কাল উল্লেখ করা হ'ল একটি সারণির মাধ্যমে।

নাট্যরাসকের নাম	নাট্যকার	কথাবস্তু	খ্রিস্টাব্দ
সতী কি কলঙ্কিনী	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মাধুর্য	১৮৭৪
পতিব্রতা	রাজকৃষ্ণ রায়	সাবিত্রী-সত্যবানের আখ্যান	১৮৭৫
মাল্যপ্রদান	নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর	দুর্বাসা ঋষি কর্তৃক দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি প্রদত্ত অভিশাপবৃত্তান্ত	১৮৭৬
অকালবোধন	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	রঘুকুলপতি রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা	১৮৭৭
দোললীলা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	রাধাকৃষ্ণের বসন্তকালীন লীলারস	১৮৭৮
ব্রজলীলা	অমৃতলাল বসু	রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলারস	১৮৮২

এই রচনাগুলি যে শুধুমাত্র গ্রন্থরচনা বা প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমনটি নয়; বরং মঞ্চে অভিনীত হয়ে নাট্যগুলি সফলতা অর্জন করেছে। যেহেতু রাজকৃষ্ণ রায় *পতিব্রতা* নাট্যগীতির ভূমিকায় *সতী কি কলঙ্কিনী*-র সমুল্লেখ করেছেন এবং সেই আদর্শেই যে তাঁর প্রতিভার উন্মোচন ঘটতে চলেছে এমন স্বীকারোক্তি পাই, তাই বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রথম 'নাট্যরাসক'টিকেই বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার গৌরব প্রচারে উদ্যত হওয়া যায়।

❖ **নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলা নাট্যরাসক :**

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে এই নাট্যরচনা করেন এবং বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী দ্বারা সেটি প্রকাশিত হয়। এটির অন্য নাম ছিল *কলঙ্কভঞ্জন* । প্রকাশকালে আখ্যাপত্রে রোমান হরফে লেখা ছিল 'OPERA'। চার অঙ্কের গ্রন্থনায় এটি রাধাকৃষ্ণের সরস আখ্যান অবলম্বনে নির্মিত। প্রথম অঙ্কেই কেবল একটি গর্ভাঙ্ক ব্যতীত বাকি অঙ্কগুলিতে দুটি গর্ভাঙ্ক রয়েছে। ইতিবৃত্তটি এরূপ যে রাধা কুলত্যাগিনী হয়ে কেবলই তার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে প্রার্থনা করে। এমনই সময়ে একদিন কুটীলার প্ররোচনায় রাধার বিরুদ্ধাচরণ করতে উদ্যত হয় আয়ান। নিকুঞ্জবনে রাধাকৃষ্ণের একত্র অবস্থানে পরিবর্তে কৃষ্ণকে কালীরূপে দর্শন করে আয়ান। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ পূর্বেই এই ঘটনার সংকেত পেয়ে তৎক্ষণাৎ কালী অবতারে অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার পরে কৃষ্ণ মূর্ছা যায়। যশোদা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লে জনৈক বৈদ্য আসে এবং তার গণনায় ঔষধ হ'ল যে কোনও সতী নারী কর্তৃক সহস্রছিদ্রযুক্ত কুম্ভে জল আনয়ন করলে সেই বারিস্পর্শেই কৃষ্ণ সুস্থ হতে পারে এবং সেই সতী নারী রাধা ব্যতীত অন্য কেউ নয়।

সখীদের সঙ্গে রাধা যমুনা থেকে সেই পদ্ধতিতেই জল নিয়ে আসে এবং কৃষ্ণ সুস্থ জীবন ফিরে পায়। এভাবেই রাধার 'কলঙ্কভঞ্জন' ঘটে।

এই নাট্যরাসক-এর প্রস্তাবনায় ইমনভূপালী রাগে একটি গানেই নাট্যবীজের উদ্গম হয়েছে –

সুখ-লহরী-বিকাশি- প্রেমছবি, উঠিছে,
সুধী জন বাঞ্ছিত যে ধন ।।[২১০]

এরপরেই মুখসন্ধির বিস্তৃতি নেই। প্রারম্ভিক সংগীতের মাধ্যমেই বোঝা যায় রাধাকৃষ্ণের মিলন নাট্যবস্তুর প্রধান উপজীব্য বিষয়। প্রথম অঙ্ক থেকেই ঘটনা বিপরীত স্রোতে বহমান। রাধার মন দ্বিধাগ্রস্ত –

শ্যাম রূপ আর দেখবো না, প্রাণনাথের নামও মুখে আনব না – কিন্তু মন তো সৈ আমার নয়, সে রূপ মনে হলে মনে আমার মন থাকেনা।[২১১]

আবার পরক্ষণেই সখীরা সুবাসিত মালা এনে পরায় রাধাকে এবং কৃষ্ণ আসে। এখানে বীজ পুনরায় দৃষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে আয়ানের উক্তি পুনরায় বীজকে লুক্কায়িত করে –

চল্ রে কুটীরে চল্ নিকুঞ্জ কাননে ।
কালা কেলী করে বিনোদিনী সনে ।।[২১২]

এখানে তার ক্রোধের অবসান হয়ে যায় কৃষ্ণকালী অবতারদর্শনে। তাই বীজের পুনরুদ্ধার ঘটে। তৃতীয় অঙ্কে কৃষ্ণের রোগে পুনরায় বীজের বিনাশ হলেও বৈদ্যের বিধানে ইষ্টার্থের আভাস দেখা যায়। এরপর থেকে রাধার জল-আনয়নের অংশে সমস্ত প্রতিকুলতা কেটে যাওয়ায় অবমর্শ সন্ধি এবং অবশেষে রাধার ম'ত সতী সাধ্বী রমণীর আনুকূল্যেই কৃষ্ণের জীবনরক্ষা হলে নাট্যের ফলপ্রাপ্তি ঘটে। তাই পরিশেষে ভরতবাক্য "জয় জয় জয় কৃষ্ণ রাধিকারমণ"[২১৩]। কৃষ্ণের চরিত্র এখানে উদাত্ত নায়কের গুণাবলি বহন করে। ধীরোদাত্ত নায়ক সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজের সংজ্ঞা –

অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ ।
স্থেয়ান্ নিগূঢমানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ ।।[২১৪]

অর্থাৎ ধীরোদাত্ত নায়কের আত্মগর্ব থাকবে না, তার মধ্যে ক্ষমাপরবশতার গুণ থাকবে, সে হবে অতি গম্ভীর, সত্ত্বঃগুণের আধার অর্থাৎ আনন্দ, শোকে বিচলিত হবেনা, গর্ব বিনয়ের ভারে আবৃত হবে এবং সেই নায়ক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে কার্য সম্পাদন করে। এখানে কৃষ্ণ রাধার কাছে ক্ষমা চায় নির্দ্বিধায় – "ক্ষম মোরে যদি থাকে অপরাধ"[২১৫]। আবার কৃষ্ণ নিজগাম্ভীর্য বজায় রেখে রাধার সঙ্গে মিলনে অতি উচ্ছ্বসিত নয়। নিজের বিলম্ব হলেও তবু রাধার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিকুঞ্জবনে উপস্থিত হয় সে। আবার, দ্বিতীয় অঙ্কে রাধার কলঙ্ক অপবাদ দূরীকরণের জন্য উপস্থিত বুদ্ধির বলে কালীর রূপগ্রহণ করে। তাই ঔদার্যের সাধারণ ধারণা ও ধীরোদাত্ত নায়কের

শাস্ত্রবিহিত গুণের সমন্বয়ে সে ধীরোদাত্ত নায়কের বৈশিষ্ট্যে অটল। পীঠমর্দ উপনায়কের স্থানে আয়ানের চরিত্রকে উপস্থাপিত করা যায়। প্রস্তাবনায় মুখ সন্ধিসহ ঘটনাক্রমে গর্ভ, অবমর্শ ও নির্বহণ সন্ধিকে একে একে পেয়ে থাকি। প্রথম অঙ্কে মালিকা হস্তে সখীদের ঝিঁঝিট রাগের গানেই রাধার বাসকসজ্জা অবস্থা। সে প্রিয়ের জন্য ললিত শৃঙ্গার করেছে। তবে এখানে অঙ্গিরস হাস্য নয়; রয়েছে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য। তবে *সাহিত্যদর্পণ* অনুসারে দশবিধ লাস্যাঙ্গের প্রয়োগের বিধানও ছিল। সেগুলির উপস্থিতি বিচার করণীয়। দশবিধ লাস্যাঙ্গ হ'ল যথাক্রমে গেয়পদ, স্থিতপাঠ্য, আসীন, পুষ্পগণ্ডিকা, প্রচ্ছেদক, ত্রিগূঢ়, সৈন্ধব, দ্বিগুণ, উত্তমোত্তমক এবং উক্তপ্রত্যুক্ত –

গেযপদং স্থিতপাঠ্যমাসীনং পুষ্পগণ্ডিকা ।
প্রচ্ছেদকস্ত্রিগূঢং চ সৈন্ধবাখ্যং দ্বিগূঢকম্ ।।
উত্তমোত্তমকং চান্যদুক্তপ্রত্যুক্তমেব চ ।
লাস্যে দশবিধে হ্যেতদঙ্গমুক্তং মনীষিভিঃ ।।[২১৬]

এবং এরপরেই ২১৪-২২২ নং কারিকা পর্যন্ত যথাক্রমে এই দশটি লাস্যাঙ্গের সংজ্ঞা এবং উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘসূত্রিতা রোধের জন্যই কারিকাগুলি প্রদত্ত করা হ'লনা এই অধ্যায়ে। গেয়পদ হ'ল দেবতার সম্মুখে আসনে ব'সে বীণা প্রভৃতি তন্ত্রীবাদ্যের প্রয়োগে শুদ্ধ গীতি[২১৭]। এটি পাওয়া যায় বাগেশ্রীতে নিবদ্ধ আয়ানের কালীস্তুতির মধ্যে –

তুমি বিশ্বমোহিনী – জগৎজননী ।
সৃষ্টি স্থিতি তুমি স্বর্ব্ব সুখ মোক্ষ প্রদায়িনী ।।[২১৮]

এরপর যদি বলি স্থিতপাঠ্য অঙ্গের কথা, তবে দেখি মদনতাপিত রাধা কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হয়ে বিলাপগাথা ব্যক্ত করে "শ্যাম রূপ আর দেখবো না, ..."[২১৯]। এই বাক্যগুলিও তারই দ্যোতক। কারণ এই দ্বিতীয় লাস্যাঙ্গে থাকে মদনক্লিষ্ট দশায় নায়িকার প্রাকৃত পদাবৃত্তি[২২০]।

এরপরে বলতে হয় আসীন-এর প্রসঙ্গ। যখন কোনও নায়িকা প্রসাধন ত্যাগ ক'রে বিনা বাদ্যযন্ত্রে গান গায়, তখন এই অঙ্গের স্ফুটন হয়ে থাকে[২২১]। এখানে বৃন্দের বেহাগ রাগের গানটিকে স্মরণ করতে পারি –

বিধুমুখ শুকালো কেনব ।
নয়নের জলে অলকা, তিলকা, ভাষি
গেছে কোথা চলি ।
যত অঙ্গ রাগ অঙ্গেতে মিশিল, তবু
কর চাতুরালী ।[২২২]

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে রাধা আভূষণ ত্যাগ ক'রে বিরহানলে দগ্ধ। তাই সে গানেও বলে ওঠে –

আর নাহি মানে মানা, শুনে না লোকলাঞ্ছনা,
ধায় রে বাঁধিতে প্রেমডোরে সে মন চোরে রে ।।[২২৩]
...
প্রিয় জনে নাহি প্রয়োজন ।।
আমি, জীবনে মিশানো জীবন ।[২২৪]

চতুর্থ লাস্যাঙ্গ পুষ্পগণ্ডিকা হ'ল বিবিধ আতোদ্যবাদ্যের মিশ্রণে বিবিধ ছন্দের গানে নারীপুরুষ বিপরীত আচরণ করা। সাহিত্যদর্পণকার এক্ষেত্রে 'বিপর্যাস' শব্দের ব্যাপারে যত্নশীল।[২২৫] এই অঙ্গের একেবারে স্বচ্ছ উল্লেখ নাট্যমধ্যে পাওয়া যায়না। তবে কৃষ্ণের বংশীধবনির আবহ রয়েছে। এমনকি দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে কৃষ্ণ কাননে উপস্থিত হয়ে জানতে পারা যায় যে রাধা মানিনী হয়েছে। তাই মানভঞ্জনের জন্যই তার কাছে ক্ষমা চায়। তখন সখী বৃন্দে বলে "একেবারে কেঁদে ফেল্লে যে – ভাল ভাই মেয়ে মানুষের পায়ে ধরতে তোমার একটু লজ্জা বোধ হলো না"[২২৬]। এই উক্তিটির মাধ্যমে কৃষ্ণ তথা একজন পুরুষকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। পুরুষ হয়ে একজন নারীর পদে নত হওয়া যেন শৌর্য, বীর্যের ব্যঞ্জক নয়। তাই বাদ্যযন্ত্র বলতে যদি সুষিরবাদ্য বংশীকে ধরি, তবে সেই মধুরধ্বনির সুরেই কৃষ্ণের আত্মসমর্পণ করাকে পুরুষানুগ ব্যবহারের বিপর্যাস ঘটায় এটিকে 'পুষ্পগণ্ডিকা'-র ছায়া বলা যেতে পারে।

এরপরে আসে প্রচ্ছেদক। অন্য রমণীর প্রতি আসক্ত এই অনুমানে প্রেমবিচ্ছেদের আশঙ্কায় বীণাসহকারে নায়িকার গানেই এই অঙ্গের ধারণা হয়ে থাকে।[২২৭] এই নাট্যরাসক-এ রাধা বা ললিতা, বিশাখার উক্তি-প্রত্যুক্তিতে এমন কোনও ইঙ্গিত নেই যেখানে কৃষ্ণ অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট। তার আগমনের বিলম্ব হতে থাকলে সখীরা রাধার প্রতিই দোষারোপ করেছে যে সে কুলকে কলঙ্কিত করছে। বরং কুটীলার আয়ানকে উত্তপ্ত করে রাধার পরকীয়ার দোষের জন্যই। তাই 'প্রচ্ছেদক'কে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়না এখানে।

পরবর্তী লাস্যাঙ্গ হ'ল ত্রিগূঢ়ক। কোনও পুরুষ যদি সূক্ষ্ম আহার্যাভিনয়ের মাধ্যমে স্ত্রীবেশধারণ করে, তখন সেই রূপানুসারী অভিনয়াংশকে বলা হয় 'ত্রিগূঢ়ক'।[২২৮] এখানে কৃষ্ণ কালীরূপে অবতীর্ণ হয়েছে। সেই কালীমূর্তি দর্শন ক'রেই আয়ানের রাধার প্রতি আশঙ্কা কেটে যায়। তবে নাট্যের যে গ্রন্থনা, তাতে কৃষ্ণের স্ত্রীবেশধারণ সম্ভব নয়। আয়ানের আগমন বুঝতে পেরেই সে কালীরূপ ধারণ করে। তাই রঙ্গমঞ্চ থেকে ক্ষণিকের জন্যও বিদায় না নিলে উপযুক্ত নেপথ্যবিধান সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে কেবলই আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের মাধ্যমে সেই ভাবকে অভিব্যক্ত করতে হবে। তবে আয়ানের সেই মূর্তিদর্শনে যেরূপ ভাবাভিনয় এবং বাগভিনয় ঘটে, তাতে তার দৃষ্টিতে কৃষ্ণের কালীরূপগ্রহণে কোনও ত্রুটি ছিলনা। দেবীর প্রতি বিগলিত চিত্ত তার। তাই একটু অন্য রীতিতে এই অঙ্গ প্রদর্শিত।

সৈন্ধব অঙ্গে বলা হয় যে সংকেতে ব্যর্থ নায়ক সুস্পষ্টভাবেই বীণাবাদনের দ্বারা প্রাকৃত বচন প্রয়োগ করতে হবে[২২৯]। এই নাট্যে যখন কৃষ্ণের মঞ্চে প্রবেশ ঘটে, তখন সখীদের বিবিধ সংকেত ছিল। কৃষ্ণ সেগুলির প্রতি উদাসীন থেকেই রাধার মানভঞ্জন করেছে।

এর পরের অঙ্গের নাম দ্বিগূঢ়। চারটি পদে বিভক্ত, পারস্পরিক উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে রসে ও ভাবে সমৃদ্ধ সংগীত এটি[২৩০]। রাধার মনোভাব সখীদের জঙ্গলা রাগিনীতে গানে ফুটে উঠেছে –

বৃন্দে ।। ভালো চতুর রাজে শিখাবো- / প্রাণসখীর পায়ে ধরাবো । // চম্পক ।। প্রেমফাঁসে সে শঠ বাঁধিবো । / ললিতা ।। আঁখি তাহে প্রহরী রাখিব । // বিশাখা ।। মন-চোর-মন কাড়ি লবো । /[২৩১]

সখীচতুষ্টয়ের এই উক্তি-প্রত্যুক্তি মূলতঃ একটি একটি উক্তিরই বিভিন্ন চরিত্রে বণ্টন। এখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে সমর্থন জানিয়ে রাধার কৃষ্ণপ্রেমে মজে থাকা মনটিকেই উদ্ভাসিত করেছে।

কোপ, অনুগ্রহ থেকে জাত তিরস্কারযুক্ত রসবহুল সংগীত 'উত্তমোত্তমক'[২৩২]। এক্ষেত্রে ক্রোধহেতু আয়ানের গানের উল্লেখ লক্ষ্য করা গেছে পূর্বেই। তবে কারোর প্রতি প্রসন্ন দশায় গানেরও উল্লেখ করা আবশ্যক। তাই প্রথম অঙ্কের শেষে কৃষ্ণের দাক্ষিণ্যে রাধার বিরহমোচনে যুগল মূর্তির অবস্থানে সখীদের গানটিকে ধরা যাক –

মরি কি শোভা হইল ।
যুগল রূপে মন মজিল ।।[২৩৩]

শেষ লাস্যাঙ্গ হ'ল উক্তপ্রত্যুক্ত। হাব-হেলাযুক্ত, মনোহর শ্লোকবন্ধের দ্বারা সজ্জিত, মিথ্যা ভর্ৎসনাপূর্ণ, উক্তি-প্রত্যুক্তিতে বিন্যস্ত, নানা বিলাসযুক্ত সংগীত এই অঙ্গে জুড়ে থাকে[২৩৪] এবং এই নাট্যরচনার প্রথমাঙ্কেই এগুলি লক্ষণীয়। অর্থাৎ 'প্রচ্ছেদক'-এর যদি ব্যুৎপত্তিগতভাবে অর্থোদ্ধার করা যায়, তাহলে 'প্রকৃষ্ট ছেদক' বা যেটি প্রেমের বিচ্ছেদের হেতু এই হিসেবে ভাবা হয়, তবে যে কোনও বিপরীত প্রতিক্রিয়াকেই এখানে যুক্ত করা যায়। কৃষ্ণের বিলম্ব বা অসুস্থ হওয়ার ম'ত ঘটনা প্রচ্ছেদকের ভূমিকায় আসতেই পারে। তাই এভাবে আধুনিক মননে দশবিধ লাস্যাঙ্গকেই *সতী কি কলঙ্কিনী* নাট্যমধ্যে প্রমাণ করা সম্ভব।

হাস্যরসের বিভাগ, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব এই নাট্যমধ্যে স্থান পায়নি। যেহেতু বস্তু, নেতা ও রস একত্রে রূপকের ভেদক, তাই সেখানে মুখ্যরস হাস্যের পরিবর্তে সম্ভোগ শৃঙ্গার ব'লে নাট্যরাসক-এর পরম্পরায় এটির স্খলন ঘটে যায়। তবে আবার যদি কালিদাসের *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* বা শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক*-এর শৃঙ্গার রসের সঙ্গে এই নাট্যের তুলনা করি, তাহলে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এখানে ইতিবৃত্তটি গম্ভীর নয়। আমোদ-প্রমোদ,ছদ্ম অভিমান, মান ইত্যাদির ম'ত লঘুত্ব কিঞ্চিৎ হাস্যরসের উদ্রেক ঘটায়। এমনকি সখীদের সঙ্গে রাধার বাক্যবিনিময়ে বাক্যগত হাস্যরসের সূচনা হয়েই যায়। যেমন বৃন্দের "যার বে তার মনে নাই, পাড়া পড়সির ঘুম নাই"[২৩৫] বা "আর তোদের ন্যাকা পোনায় কায নেই, কি হয়েচে তা এখনো কি বুঝতে পারিস না"[২৩৬] -এর ম'ত সংলাপ হাস্যরসের যোগান দেয়। আসলে রাধাকৃষ্ণে প্রেমলীলার ঘটনাকে কোনওভাবেই মধুর বা শৃঙ্গার রসের

কাহিনি নয় ব'লে মানতেই পারেনা রসজ্ঞ সুধীজন। সমগ্র ভারতবাসীর এটিই মনস্তত্ত্বে গাঁথা হয়ে রয়েছে। তাই এখানেও শৃঙ্গার রসকেই অনুভব করতে হয়। তাই হাস্যরসের কিঞ্চিৎ সূচনা থাকলেও তা পরোক্ষ এবং কখনওই অঙ্গিরস ব'লে দাবি জানাতে পারা যায়না। এমনকি এখানে অঙ্কসংখ্যা চার। যদিও সেটি গৌণ ভেদক। তবে রসগত সাযুজ্য না থাকায় সংস্কৃত উপরূপক হিসেবে এটি পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

❖ **রাজকৃষ্ণ রায় ও বাংলা উপরূপক :**

রাজকৃষ্ণ রায় বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে কারিগর এবং সমালোচক। তিনি রচনা করেছেন *পতিব্রতা* নামের একটি নাট্যরাসক এবং *নাট্যসম্ভব* নামক একটি উপরূপক। উপরূপকবিষয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজ অপেক্ষা তিনি *সংগীতদামোদর* গ্রন্থকেই আদর্শ করেছেন। *নাট্যসম্ভব* উপরূপকের প্রচ্ছদপৃষ্ঠায় তিনি *সংগীতদামোদর*-এর একখানি কারিকাংশ উদ্ধৃতিতে রেখেছিলেন "অতঃ সর্ব্বমনোহারি নাট্যং কথ্য ন রঞ্জকং"। এমনকি *পতিব্রতা* নাট্যরীতির ভূমিকাতেও তিনি *সংগীতদামোদর*-এর উল্লেখ করেছেন। তাই এর থেকেই বোদ্ধব্য যে তিনি *সংগীতদামোদর*-এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক *পতিব্রতা* নাট্যরীতির ভূমিকায় তার তীক্ষ্ণ উক্তিগুলি –

বর্তমানে অনেকেরই বিবেচনায় নাটকের ন্যায় নাট্যগীতি বা নাট্যরাসকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অভিনয় আবশ্যকীয়। এই উদ্দেশে আজি কাল দুই একখানি ঈদৃশ গ্রন্থ প্রণীতও হইয়াছে। সাধারণের ইহাতে তাদৃশ অনুরাগ যদি পূর্ণাবয়বে ইহা অভিনীত হয়, তাহা হইলেও এতদ্বারা নাটকাভিনয় অপেক্ষা মনোরঞ্জন হইতে পারিবে। যেহেতু নাট্যগীতিতে সঙ্গীতের প্রাচুর্য্য আদ্যোপান্ত সমুদয় স্থলেই পরিপূরিত। ইতোমধ্যে "সতী কি কলঙ্কিনী"র অভিনয় দেখিয়া অনেকেই তাহার স্বীকার করিয়াছেন। যদিও উহা সর্বাঙ্গসম্পন্ন নাট্যগীতি নহে – একপ্রকার গীতাভিনয় বলিলেই হয়; তথাপি উহাতে তূর্য্যংশ অধিক পরিমাণে থাকাতে দর্শকবর্গের অত্যন্ত আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিল।... নাট্যরাসক বা নাট্যগীতির প্রকৃত অর্থ আদ্যন্ত-স্বরনিবদ্ধ-সঙ্গীতময়-অভিনেয় গ্রন্থ। সঙ্গীতদামোদর প্রভৃতি সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থে সেকালে নাট্যরাসকাদি শব্দের উল্লেখ ও তাদের লক্ষণ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, এবং উহা যেরূপ অভিব্যঞ্জক তাহাতে এক্ষণকার ইউরোপীয় "অপেরার" সহিত তাহার সামঞ্জস্যের ব্যত্যয় সম্ভব না।[২৩৭] সুতরাং এখান থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে *সতী কি কলঙ্কিনী* যথার্থ নাট্যগীতি নয়। নাট্যের মধ্যে সংগীতের প্রাধান্যে সেটি বিশিষ্ট। 'নাট্যরাসক' হতে গেলে সম্পূর্ণভাবে গানে রচিত হতে হবে। অর্থাৎ সংলাপগুলি পরিবেশিত হবে সংগীতের পরিচ্ছদে। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক অভিমতের সম্পূর্ণ প্রতিফলন বাংলা নাট্যসাহিত্যে আবশ্যক নয়। 'নাট্যরাসক'-এর বিশেষ লক্ষণ থেকে "বহুতাললয়স্থিতি" অংশটিকে গ্রহণ ক'রে এর সাধারণীকরণ ঘটাতে হবে।

১২৮৩ বঙ্গাব্দ (১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ)-এ প্রকাশিত তাঁর রচিত উপরূপকটি হ'ল *নাট্যসম্ভব* যার জননী হ'ল ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র* । এহেন গর্ভিতার্থপ্রকাশক নামকরণ দেখেই বোঝা নাট্যের উৎপত্তি বিষয়ে এখানে কোনও ইতিবৃত্ত উপস্থাপিত হয়েছে। পাঁচটি গর্ভাঙ্কে বিন্যস্ত একটি দৃশ্যের কথাবস্তুটি হ'ল এরকম যে দেবরাজ ইন্দ্র স্ত্রী শচীর বিরহে উতলা। এমনই সময়ে ভরতমুনির আগমন ঘটে এবং তার বিনোদনের জন্য সরস্বতী দেবীর কাছে

বর যাচঞ্ঞা ক'রে এক অপূর্ব সৃষ্টি ঘটান – 'নাট্য'। মোট চারটি চরিত্র এখানে বর্তমান। যথা ইন্দ্র, ভরত, ভদ্র এবং সরস্বতী। এছাড়াও অপূর্ব রমণীগণের কিছু সংগীত রয়েছে। অত্যধিক জটিলতার কোনও অবকাশ না থাকায় এটি কেবলমাত্র মুখ ও নির্বহণ এই দুটি সন্ধিতেই সুখী এই 'উপরূপক'। যদিও ভরত-*নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে নাট্যোৎপত্তি বিষয়ে যে আখ্যানটি উপলব্ধ তার সঙ্গে এর কোনওরূপ সাদৃশ্য নেই তথাপি বলতে ভরতমুনি নাট্যোৎপত্তি কী কারণে প্রয়োজন এবং তার ফল কীরূপ হতে পারে, সে বিষয়ের উত্তর দিয়েছিলেন –

দুঃখার্তানাং শ্রমার্থানাং শোকার্থানাং তপস্বিনাম্ ।
বিশ্রামজননং লোকে নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি ।[২৩৮]

দুঃখের পরিত্রাণ, শ্রমের পরে স্বস্তি, শোকের বিসর্জন এবং কর্মের থেকে কিছু সময়ের বিরতিতে এক বিনোদনকারী রম্য চারুকলার প্রয়োজন এবং তা-ই হ'ল 'নাট্য' যেখানে সমস্ত শিল্প, কলার নিবেশ থাকবে। এই ভাবনারই প্রতিবিম্ব লক্ষণীয় *নাট্যসম্ভব* -এর তৃতীয় গর্ভাঙ্কের ভরত ও সরস্বতী দেবীর কথোপকথনের অংশে –

সরস্বতী ।। এই লও, ধর ধর, যতনে গ্রহণ কর/ এই গ্রন্থ – মহাগ্রন্থ – করি রে প্রদান, // শোকেরো শোকেরো ইহা সুখের নিদান । / ভরত ।। কিরূপে ইহাতে তাঁর হবে শোক লয়? // সরস্বতী ।। করানো নটের দ্বারা এর অভিনয় । / নব রস এই গ্রন্থে আছে বিরজিত; // মানসরঞ্জন তরে করিনু রচিত । //[২৩৯]

আবার পঞ্চম গর্ভাঙ্কে পাওয়া যায় –

সরস্বতী ।। দেবরাজ! শচী-শোকে হয়েছে কাতর, / সে শোক ভরত আজি করিবে অন্তর । // ভরত ।। শচীপতি, শোক তব করিতে মোচন, / নাটক-নবীন গ্রন্থ-বাণীর সৃজন- // "নাটক-নবীন গ্রন্থ-মানসরঞ্জন" /[২৪০]

এই নাট্যদর্শনে ইন্দ্র প্রীত হয়ে বলে "বাণীর প্রসাদে আর যতনে তোমার / বিলীন হইল মোর বিষাদ-আঁধার, //[২৪১]। অর্থাৎ ইন্দ্রের চরিত্রটি এখানে সহৃদয়ের প্রতীক। ভরতমুনি নাট্যনির্মাতা হলে ইন্দ্র তার অনুঘটক। কোনও নাট্য সার্থক নাকি বিফল তা নির্ণয় করে রসিক সহৃদয়। যেহেতু ইন্দ্রের মনের শোক দূরীভূত হয় এই ভরতসৃষ্ট নাট্যদর্শনে, তাই নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় একটি বাস্তব সত্যকেই তুলে ধরেছেন।

এই উপরূপকে গানের সংখ্যা ছ'টি। প্রথম গর্ভাঙ্কে খাম্বাজ একতালে গান রয়েছে, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে জয়জয়ন্তী রাগে ঝাঁপতালেও একটি গানে সরস্বতীবন্দনা করা হয়েছে এবং নাট্যপরিণামে অপূর্ব রমণীগণের গান এবং তৎসহ নৃত্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উপরূপকের যে প্রধান আকর্ষণ গান, তাকেও উপেক্ষা করেননি রাজকৃষ্ণ রায়। তবে এই উপরূপকটি অষ্টাদশ উপরূপকের কোন্ রূপে গৃহীত হবে? যেহেতু সম্পূর্ন স্বরনিবদ্ধ নয়, তাই এটি নাট্যরাসক নয়। নাটিকা, সট্টক, ত্রোটক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, হল্লীশ, রাসক, ভাণিকা, শিল্পক, সংলাপক এগুলির আঙ্গিকের সঙ্গে এখানের বিষয়ে ব্যবধান যথেষ্ট। একমাত্র যদি কোনও উপরূপকের সঙ্গে একে মেলানো যায়, তবে তা হ'ল গোষ্ঠী। সেই উপরূপক একাঙ্কিকা, সেখানে গর্ভ-অবমর্শ সন্ধির কোনও স্থান নেই, তা সংস্কৃত ভাষাবিহীন, বৃত্তি থাকে কৈশিকী এবং তা বহুসংখ্যক পুরুষ চরিত্রে পরিচালিত –

প্রাকৃতৈর্নবভিঃ পুংভির্দশভির্বাপ্যলংকৃতা ।
নোদাত্তবচনা গোষ্ঠী কৈশিকীবৃত্তিশালিনী ।।
হীনা গর্ভবিমর্ষাভ্যাং পঞ্চষড্যোষিতান্বিতা ।
কামশৃঙ্গারসংযুক্তা স্যাদেকাঙ্কবিনির্মিতা ।।[২৪২]

নাট্যসম্ভব-এ প্রতিমুখ সন্ধি নেই। তাই এই সামান্য লক্ষণটি না মিললেও এটিকে 'গোষ্ঠী' বলাই যায়। যদিও রাজকৃষ্ণ রায় বোধহয় তথাকথিত কোনও লক্ষণের পিঞ্জরে এটিকে আবদ্ধ রাখতে চাননি। ঘটনার ঘনঘটা নেই, চরিত্রের গুণগত ঔদার্য নেই, রম্যকলার নিধান আছে এমনই একটি ক্ষুদ্র নাট্যকে তিনি 'উপরূপক'-এর অতিরিক্ত বলতে রাজি ছিলেন না। যেহেতু তিনি *সংগীতদামোদর* গ্রন্থকেই সর্বাধিক মান্যতা দিয়েছেন, তাই মানসরঞ্জনের কোনও ত্রুটি রাখেননি কারণ সেখানে বলা ছিল উপরূপকের উৎপত্তি কেবলই আনন্দবিধানের জন্যই।

তাই বলা যেতে পারে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিনাট্যের প্রাক্ যুগে বাংলা নাট্যসাহিত্যে গীতিনাট্যের উদ্ভব ঘটে এবং তা 'নাট্যরাসক' নামে অভিহিত হয়। তবে তিনশত বছর পূর্বে যে সংস্কৃত উপরূপকের প্রবাহ ছিল, ঊনবিংশ শতকে বাংলায় তার অনেকখানিই পরিমার্জিত হয়ে নবরূপে একটি অভিনব নাট্যকলার জন্ম হয় এবং তার পথিকৃৎ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়ের ম'ত জ্ঞানগর্ভ নাট্যকারগণ।

অর্থাৎ খ্রিস্টিয় উনবিংশ শতকে বাংলায় যেভাবে উপরূপকের চর্চা ঘটেছে, সে সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ দিক উঠে আসে। সেগুলি হ'ল উপরূপকতত্ত্বের জন্য বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণ* সর্বাগ্রে মান্যতা পেলেও সেই সময় বাংলায় *সংগীতদামোদর* গ্রন্থটি তদপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য হয়েছিল। উপরূপক বিষয়ে বাঙালি নাট্যকারগণ শিক্ষিত ছিলেন এবং সেকালের সেই ধারাকে পুনরায় একালে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত বাংলা ভাষাতেও যে উপরূপক রচিত এবং অভিনীত হতে পারে, সেকথা এই আলোচনায় ব্যক্ত। নাটিকা প্রভৃতি অষ্টাদশ উপরূপকের যে যে পৃথক পৃথক নামকরণ এবং বৈশিষ্ট্য, সেগুলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ না ক'রেও শুধুমাত্র 'উপরূপক' অভিধায় অনতিদীর্ঘ নাট্যরচনা ক'রে প্রমাণ করেছিলেন যে উপরূপকে একটি সাংগীতিক প্রচ্ছদ থাকা উচিত। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে পরম্পরিত 'নাট্যরাসক' নামক উপরূপকের বিবর্তন এবং আধুনিক যুগে তা গীতিবহুল নাট্যেরই নামান্তর একথাও পরিস্ফুট।

২.৯ উপরূপকের মঞ্চায়ন : অতীত ও বর্তমান :

এই অধ্যায়ে এতক্ষণ পর্যন্ত উপরূপকের নামকরণের সঙ্গে প্রাপ্ত উপরূপকের সাযুজ্য, রূপকের মধ্যে উপরূপকের অনুষঙ্গতা, রূপক এবং উপরূপকের পুনর্বিন্যাস, প্রাচীন এবং আধুনিক উপরূপকের তুলনামূলক আলোচনা, উপরূপক সম্পর্কে আধুনিক পণ্ডিতদের মতবিশ্লেষণ এবং আধুনিক যুগে বাংলায় উপরূপকের চর্চা এই বিষয়গুলি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনার পরে এই অধ্যায়ের শেষ পর্বে যে বিষয়টি আলোচ্য, তা হ'ল প্রাচীনকালের উপরূপকের অভিনয় এবং বর্তমানে উপরূপকের অভিনয়ের কিছু তথ্যের উপস্থাপন প্রয়োজন।

প্রাচীনকালে উপরূপকের অভিনয়ের লিখিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া গেলেও সংস্কৃত সাহিত্যের এমন একটি গ্রন্থ রয়েছে যেখানে *রত্নাবলী* নাটিকার অভিনয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি হ'ল দামোদরের কুট্টনীমত। সময়কাল খ্রিস্টিয় শতাব্দী। এই গ্রন্থটি বারনারীদের জীবিকাবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ নথি। এই গ্রন্থের তৃতীয় 'মঞ্জর্যাখ্যান' অধ্যায়ে *রত্নাবলী* নাটিকাভিনয়ের উল্লেখ রয়েছে[২৪৩]। সাহিত্যকে যদি সমাজের দর্পণ ধরা হয়, তবে একথা বলতে হয় যে সেই সময়ে শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটিকার অভিনয় সমাজে প্রচলিত থাকার দরুণ এই তথ্য নথিভুক্ত হয়েছে *কুট্টনীমত* গ্রন্থে।

এরপরে খ্রিস্টিয় উনবিংশ শতাব্দীতে যে নাট্যরাসকগুলির কথা উল্লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে পতিব্রতা নাট্যপ্রযোজনাটির অভিনয়ের কথা পাওয়া যায় *সাহিত্যসাধক চরিতমালা : চতুর্থ খণ্ড* -তে। সেখানে রাজকৃষ্ণ রায়ের *পতিব্রতা* সম্পর্কে বলা হয়েছে –

পাণ্ডুয়ার কাছে সরাই গ্রামে তিনি নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে "আগমনী ও বিজয়া" নামে একটি গীতাভিনয় হয়। পরে 'পতিব্রতা' নাম পাল্টে 'সাবিত্রী' নামে অভিনীত হয়[২৪৪]।

বর্তমানে খ্রিস্টিয় একবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় 'চিদাকাশ কলালয়' সংস্থার তরফ থেকে ভাণক, ভাণিকা এবং রামাক্রীড় অভিনীত হয়েছে। এর মধ্যে ভাণক এবং রামাক্রীড় উপরূপক না হলেও *অভিনবভারতী* -তে 'নৃত্তাত্মক প্রবন্ধ' রূপে উক্ত হয়েছে যা প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে[২৪৫]। গুরু পিয়াল ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ১৯/৩/২০১৯ তারিখে কলকাতায় রামাক্রীড় অভিনীত হয়েছে। এই প্রযোজনার নাম 'সংবৎসরকথা'[২৪৬]। শীর্ষক নামটি একটি রামাক্রীড়ের জন্য প্রাসঙ্গিক। তার কারণ রামাক্রীড়ের লক্ষণে *অভিনবভারতী*-তে বলা ছিল সেখানে বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা করা হবে। যেহেতু একটি বছর ছয়টি ঋতুর সমন্বয়ে গঠিত, তাই কালচক্রের আবর্তনে ষড় ঋতুর নিজস্ব বৈচিত্র্য উপস্থাপিত হয়েছে এই নাট্যিক প্রযোজনায়। শরৎকালে যেহেতু শারদীয় দুর্গোৎসব পালিত হয়, তাই শরদ্বর্ণনায় ঋগ্বেদের দেবী সূক্ত পঠিত হয়েছে। শীতের আবহরচনায় *পদ্মপ্রাভৃতক* ভাণ থেকে কিছু শ্লোক গৃহীত হয়েছে। বসন্তকালের ক্ষেত্রে কবি জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* কাব্যের "ললিতলবঙ্গলতা.." ইত্যাদি গান ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যবিধানবশতঃ গ্রীষ্মের জন্য কমলা, বর্ষার জন্য নীলাভ ইত্যাদি বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে মত্তকোকিলা বীণা, বিপঞ্চী বীণা প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। তাই এভাবে প্রযোজনাটিতে বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের ঔচিত্যপূর্ণ ব্যবহার এটিকে ধ্রুপদী রামাক্রীড় ক'রে তুলেছে।

এই সংস্থার উদ্যোগেই ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার পদাতিক থিয়েটারে 'ভাণোৎসব' আয়োজিত হয় যার প্রথম দিনে অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারি অভিনীত হয় একটি ভাণক এবং একটি ভাণিকা প্রযোজনা। পাণিনীয় ব্যাকরণের শব্দাদ্বৈতবাদের ওপর ভিত্তি ক'রে এই রাকেশ দাস এই নাট্যটির রূপনির্মাণ করেন। মূলতঃ সায়ক মিত্রের একক অভিনয়ে এটি উপস্থাপিত হয়। এই প্রযোজনাটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট নাট্যসংস্থা থেকে মুদ্রিত প্রচারপুস্তিকায় উল্লিখিত হয়েছে –

The performers would come in a procession with a 'batavriksha' (banyan tree). The sutradhara sits under the banyan tree and talks about the evolution of the 'WWord or sabda-brahma and its manifestation in the human body and its expression in music.

Through the medium of song, danceand dialouge, simultaneously then 7 musical notes (the sapta svara) invoke the seven dimensions of Shiva, the seven dimensions of Consciousness (the sapta lokas) and the seven vortex contres of energy (the sapta chakra) in the body.[২৪৭]

অর্থাৎ ভাণক সম্পর্কে মূলতঃ অভিনবগুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত সেই চিরন্তনী কারিকাকেই আদর্শ ক'রে শব্দব্রহ্মের মাধ্যমে শিবের সপ্ত অবতার, সপ্ত লোক এবং মানবদেহের সপ্ত চক্রকে ব্যঞ্জিত করা হয়েছে। ভাণকে যে অবতারবাদের উল্লেখ রয়েছে, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে এই প্রযোজনাটি। তবে নাট্যাভিনয়ে সংস্কৃতের সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষাও প্রযুক্ত হয়েছে।

উক্ত দিনাঙ্কের দ্বিতীয় প্রযোজনা একটি ভাণিকা। তবে এই ভাণিকাটি সাহিত্যদর্পণোক্ত ভাণিকা অপেক্ষা *অভিনবভারতী* এবং *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-কেই অধিক মান্যতা দেওয়া হয়েছে। ভাণিকার ভাষ্যরচনা করেছেন সায়ক মিত্র।

বর্তমান সময়ে নাট্যগুরু পিয়াল ভট্টাচার্যের সূক্ষ্ম ভাবনাপ্রসূত এই ধরণের 'মার্গ নাট্য'-এর নিরন্তর অভিনয় এবং সাফল্য শুধুমাত্র উপরূপকের ধারাকেই পুনরুজ্জীবিত করেনা; বরং সংস্কৃত ভাষা এবং শাস্ত্র বা সাহিত্যকেও প্রসারিত করে। হয়ত রত্নাবলী বা বিক্রমোর্বশী এই জাতীয় নাট্যাভিনয় এখনও পর্যন্ত এই সংস্থা থেকে মঞ্চায়িত হয়নি কিন্তু উপরূপকের পূর্বাবস্থা ভাবপ্রধান পদার্থাভিনয়ের রীতিকে সহৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য নির্দ্বিধায় প্রশংসার্হ হয়ে ওঠে 'চিদাকাশ কলালয়'-এর প্রাণপুরুষ পিয়াল ভট্টাচার্য।

এই ভাণিকা প্রযোজনাটি সম্পর্কে পূর্বোক্ত প্রচারপুস্তিকায় লিখিত হয়েছে –

A women dominated production, here women deliver 'Udant' or speak of the wisdom concealed with the circle of a human life and say: liberation can be attained if we know ourselves and reflect upon the stages of human life. In this line the saga of Dash-avatars has been chosen to reflect it as the stages of human life, from the birth to demise, which find elucidation in Vajrayana Buddhism... ..

The musical instruments used here, like Kinnari Vina and traditional Shri khol of Bengal, are from post Bharata period and many more Buddhist instruments.[২৪৮]

সুতরাং গীত-বাদ্য-নৃত্যে পরিস্নাত এই ভাবাভিনয়ী প্রযোজনাটি বিষ্ণুর দশাবতারের সঙ্গে মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। তাই *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-এর "হরিচরিতগাথা" বৈশিষ্ট্যটিও এখানে প্রতি মাত্রায় প্রতিফলিত।

অর্থাৎ 'উপরূপক : সেকাল ও একাল' শিরোনামাত্মক এই দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে প্রস্তাবিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভের লক্ষ্যের প্রতি অভিমুখীকরণে যে ক'টি বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, সেগুলি হ'ল –

- পুরাকালে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত পদার্থাভিনয়ী নৃত্য এবং দশরূপকের অতিরিক্ত কয়েকটি নাট্যপ্রযোজনা থেকে পরবর্তীকালে ভারতের মধ্যযুগে 'উপরূপক' সংস্কৃতি প্রসূত হ'লে নৃত্যের সেই পুরাতন নামগুলি ব্যবহৃত হলেও তার নামকরণের যৌক্তিকতা সর্বদা রক্ষিত হয়নি। আধুনিক কালের টীকাকারগণ ব্যুৎপত্তি এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ উভয়ের সাপেক্ষে সেই প্রাচীন নামগুলির ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তৎসহ সাহিত্যদর্পণসহ বিভিন্ন নাট্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থালোকের আদর্শে উপরূপকগুলির চরিত্র নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। তার ফলে উপরূপকের প্রয়োগস্থান এবং উপভোক্তাদের মনস্তত্ত্ব নির্ণীত হয়েছে। সুতরাং এককথায় বলতে হয় উপরূপকের চরিত্রটি মৌলিকভাবে বিনোদনার্থক হলেও সর্বদাই তা গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্য নয়।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যরচনার প্রাক্ যুগে বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে উপরূপকের চর্চা বর্তমান ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'উপরূপক' রচনা করেছেন কিনা বা তাঁর নাট্যে উপররূপকের ধর্ম বিরাজমান কিনা, তা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হওয়ার জন্য এই অধ্যায়ে উপরূপকের স্বরূপ, শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হয়েছে। যে তিনটি রবীন্দ্রনাট্য (*মায়ার খেলা, নটীর পূজা* এবং *শাপমোচন*) গবেষণার জন্য নির্বাচিত হয়েছে, সেই নাট্যত্রিতয়ে কেন শুধুমাত্র গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যেরই একচ্ছত্রত্ব নেই, তা এই অধ্যায়ের শেষেই পরিষ্কার হতে পারে পাঠকের দ্বারে। তার কারণ উপরূপকমাত্রেই তা প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যনাট্য এই ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ।

উল্লেখপঞ্জি

১. *শ্রীমৎপাণিনিমুনিপ্রণীতঃ ধাতুপাঠঃ : ধাত্বর্থপ্রকাশিকয়া টিপ্পণ্যা সমলঙ্কৃতঃ*, টীপ্পণীকার – পণ্ডিত কনকলাল শর্মা, ক্রমিক সংখ্যা ৩১০, পৃষ্ঠা - ৯

২. *তদেব*, ক্রমিক সংখ্যা ১৫৪৫, পৃষ্ঠা - ৪৩

৩. *বঙ্গীয় শব্দকোষ : প্রথম খণ্ড*, পৃষ্ঠা - ১১৮৮

৪. *Daśarūpam with Dhanika's Commentary*, সম্পাদক – F E Hall, ১/৯-এর *অবলোকবৃত্তি*, পৃষ্ঠা - ৫

৫. *A Sanskrit-English Dictionary*, পৃষ্ঠা - ৫৩৪

৬. *বঙ্গীয় শব্দকোষ : প্রথম খণ্ড*, পৃষ্ঠা - ১১৮৮

৭. *শ্রীমৎপাণিনিমুনিপ্রণীতঃ ধাতুপাঠঃ : ধাত্বর্থপ্রকাশিকয়া টিপ্পণ্যা সমলঙ্কৃতঃ*, টীপ্পণীকার – পণ্ডিত কনকলাল শর্মা, ক্রমিক সংখ্যা ১৬৯৮, পৃষ্ঠা - ৪৬

৮. *সাহিত্যদর্পণম্* : দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক – যোগেশ্বর দত্ত পারাশর, পৃষ্ঠা - ২২৩৫

৯. তত্রৈব

১০. *স্কন্দপুরাণম্ সপ্তখণ্ডাত্মকম্ : শ্রীমন্মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্,* সম্পাদক – পঞ্চানন তর্করত্ন, আবন্ত্যখণ্ড, চতুরশীতিলিঙ্গমাহাত্ম্য – সপ্তদশ অধ্যায়, শ্লোকসংখ্যা ১-২৪, পৃষ্ঠা - ২৯৫৬-৫৭

১১. *শ্রীমৎপাণিনিমুনিপ্রণীতঃ ধাতুপাঠঃ : ধাত্বর্থপ্রকাশিকয়া টিপ্পণ্যা সমলঙ্কৃতঃ,* টীপ্পণীকার – পণ্ডিত কনকলাল শর্মা, ক্রমিক সংখ্যা ১৩৭৬, পৃষ্ঠা - ৩৮

১২. দ্রষ্টব্য : প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৪৫

১৩. *সাহিত্যদর্পণম্ : দ্বিতীয় খণ্ড,* সম্পাদক – যোগেশ্বর দত্ত পারাশর, পৃষ্ঠা - ২২৩৮

১৪. *उपरूपकों का उद्भव और विकास*, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১৯১

১৫. *শ্রীমৎপাণিনিমুনিপ্রণীতঃ ধাতুপাঠঃ : ধাত্বর্থপ্রকাশিকয়া টিপ্পণ্যা সমলঙ্কৃতঃ,* টীপ্পণীকার – পণ্ডিত কনকলাল শর্মা, ক্রমিক সংখ্যা ২৬১, পৃষ্ঠা - ৮

১৬. *তদেব,* ক্রমিক সংখ্যা ২৫৪, পৃষ্ঠা - ৭

১৭. *उपरूपकों का उद्भव और विकास*, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৩৮

১৮. দ্রষ্টব্য : প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৩১

১৯. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৭৯, পৃষ্ঠা - ৪১৪

২০. *সাহিত্যদর্পণম্ : দ্বিতীয় খণ্ড,* সম্পাদক – যোগেশ্বর দত্ত পারাশর, পৃষ্ঠা - ২২৪১

২১. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ২২৪৩

২২. *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,* পৃষ্ঠা - ২৬৯

২৩. *সাহিত্যদর্পণম্ : দ্বিতীয় খণ্ড,* সম্পাদক – যোগেশ্বর দত্ত পারাশর, পৃষ্ঠা - ২২৪৪

২৪. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ২২৪৫

২৫. *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,* পৃষ্ঠা - ২৬৯

২৬. *সাহিত্যদর্পণম্ : দ্বিতীয় খণ্ড,* সম্পাদক – যোগেশ্বর দত্ত পারাশর, পৃষ্ঠা - ২২৪৫

২৭. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ১/৩, পৃষ্ঠা - ১৯

২৮. *ভারতের নৃত্যকলা,* দৃশ্যকাব্য কথাকলি, পৃষ্ঠা - ১৪৪-৪৮

২৯. *শৃঙ্গারপ্রকাশঃ [সাহিত্যপ্রকাশঃ] : প্রথম ভাগঃ [১-১৪ প্রকাশঃ], প্রথম ভাগ,* সম্পাদক – রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী ও সদাশিবকুমার দ্বিবেদী, ১১/৩১১, পৃষ্ঠা - ৬৭১

৩০. *সাহিত্যদর্পণম্ : দ্বিতীয় খণ্ড,* সম্পাদক – যোগেশ্বর দত্ত পারাশর, পৃষ্ঠা - ২২৪৮

৩১. *শ্রীমৎপাণিনিমুনিপ্রণীতঃ ধাতুপাঠঃ : ধাত্বর্থপ্রকাশিকয়া টিপ্পণ্যা সমলঙ্কৃতঃ,* টীপ্পণীকার – পণ্ডিত কনকলাল শর্মা, ক্রমিক সংখ্যা ১৯৩১, পৃষ্ঠা - ৫১

৩২. *The Saraswatīkaṇṭhābharaṇa by Dhāreshvara Bhojadeva : with commentaries of Rāmsina (I-III) and Jagaddgara, সম্পাদক – পণ্ডিত কেদারনাথ শর্মা ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পাঁণশিকর,* ২/১৫৬-এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৩০৯

৩৩. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/১৩১, পৃষ্ঠা - ৩৫৮

৩৪. *সাহিত্যদর্পণম্ : দ্বিতীয় খণ্ড,* সম্পাদক – যোগেশ্বর দত্ত পারাশর, পৃষ্ঠা - ২২৫২

৩৫. তত্রৈব

৩৬. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৯২, পৃষ্ঠা - ৪১৭

৩৭. *তদেব,* ৬/২৯৫, পৃষ্ঠা - ৪১৭

৩৮. *Subhadrāharana of Mādhavabhaṭṭa,* সম্পাদক – পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব, পৃষ্ঠা - ১

৩৯. *সাহিত্যদর্পণম্ : দ্বিতীয় খণ্ড,* সম্পাদক – যোগেশ্বর দত্ত পারাশর, পৃষ্ঠা - ২২৫৭

৪০. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol. I,* সম্পাদক – M. Ramkrishna Kavi, ১/১১৬, পৃষ্ঠা - ৪১

৪১. তত্রৈব

৪২. *অমরকোশঃ : শ্রীমদমরসিংহবিরচিতঃ,* প্রকাশক – ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস শ্রেষ্ঠী, ৩/৩/১৯৮, পৃষ্ঠা - ২৬৩

৪৩. *পাণিনিপ্রণীত অষ্টাধ্যায়ী,* সম্পাদক – তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা - ১৩৭

৪৪. *Alamkārasaṃgraha of Amṛtānandayogin,* সম্পাদক – V. Krishnamacharya এবং K. Ramachandra Sarma, ৯/১৫৫, পৃষ্ঠা - ১৫৮

৪৫. *সংগীত দামোদর,* সম্পাদক – মহুয়া মমুখোপাধ্যায়, ৪/২৬৯-৭০, পৃষ্ঠা - ১৭৩

৪৬. *শ্রীমৎপাণিনিমুনিপ্রণীতঃ ধাতুপাঠঃ : ধাত্বর্থপ্রকাশিকয়া টিপ্পণ্যা সমলঙ্কৃতঃ,* টীপ্পনীকার – পণ্ডিত কনকলাল শর্মা, ক্রমিক সংখ্যা ১৭২৮, পৃষ্ঠা - ৪৭

৪৭. *বঙ্গীয় শব্দকোষ: দ্বিতীয় খণ্ড,* পৃষ্ঠা - ১৯৬০

৪৮. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৯৫, পৃষ্ঠা - ৪১৮

৪৯. *সাহিত্যদর্পণম্ : দ্বিতীয় খণ্ড,* সম্পাদক – যোগেশ্বর দত্ত পারাশর, পৃষ্ঠা - ২২৫৯

৫০. *সাহিত্যদর্পণম্ : দ্বিতীয় খণ্ড,* সম্পাদক – যোগেশ্বর দত্ত পারাশর, পৃষ্ঠা – ২২৬১

৫১. দ্রষ্টব্য : প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৫০-৫১

৫২. *পরমলঘুমঞ্জুষা,* সম্পাদক – বিজয়া গোস্বামী, পৃষ্ঠা - ২০

৫৩. *उपरूपकों का उद्भव और विकास,* দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ৭৯

৫৪. *শ্রীমৎপাণিনিমুনিপ্রণীতঃ ধাতুপাঠঃ : ধাত্বর্থপ্রকাশিকয়া টিপ্পণ্যা সমলঙ্কৃতঃ* , টীপ্পণীকার – পণ্ডিত কনকলাল শর্মা, ক্রমিক সংখ্যা ৭১৪, পৃষ্ঠা - ২৯

৫৫. *কাশীদাসী অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত,* পরিশোধক – সুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আদিপর্ব – অর্জ্জুনের নিয়মভঙ্গে বনে গমন, পৃষ্ঠা - ১৯০

৫৬. *বৈষ্ণব পদাবলী,* সম্পাদক – হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, "বাজে ঝনন ঝুনিয়া" পদ, পৃষ্ঠা - ৮৯৫

৫৭. *সংগীত দামোদর,* সম্পাদক – মহুয়া মুখোপাধ্যায়, ৪/৪৫০, পৃষ্ঠা - ১৭০

৫৮. *The Nāṭyadarpaṇā of Rāmacandra and Guṇacandra : A Critical Study,* সম্পাদক – K. H. Trivedi, পৃষ্ঠা - ২০৩

৫৯. *শৃঙ্গারপ্রকাশঃ [সাহিত্যপ্রকাশঃ] : প্রথম ভাগঃ [১-১৪ প্রকাশঃ],* সম্পাদক – রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী ও সদাশিবকুমার দ্বিবেদী, ১১/২৮০-৩১১, পৃষ্ঠা - ৬৬৮-৭২

৬০. দ্রষ্টব্য : প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৪৮

৬১. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৭৭, পৃষ্ঠা - ৪১৪

৬২. *তদেব,* ৬/২৮১, পৃষ্ঠা - ৪১৫

৬৩. *তদেব,* ৬/২৮৩, পৃষ্ঠা - ৪১৫

৬৪. *তদেব,* ৬/২৮৪, পৃষ্ঠা - ৪১৫

৬৫. *তদেব,* ৬/২৯৫, পৃষ্ঠা - ৪১৭

৬৬. *তদেব,* ৬/৩০১, পৃষ্ঠা - ৪১৮

৬৭. *তদেব,* ৬/৩০৭, পৃষ্ঠা - ৪২০

৬৮. *The Saraswatīkaṇṭhābharaṇa by Dhāreshvara Bhojadeva : with commentaries of Rāmsinha (I-III) and Jagaddhara*, সম্পাদক – পণ্ডিত কেদারনাথ শর্মা ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পাঁণশিকর, ২/১৫৬-এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা – ৩০৯

৬৯. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৮৭, পৃষ্ঠা - ৪১৫

৭০. *তদেব*, ৬/২৭০, পৃষ্ঠা - ৪১২

৭১. *उपरूपकों का उद्भव और विकास*, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১৪

৭২. *তদেব*, চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ১৮০-৮২

৭৩. সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে গ্রন্থাগারে উক্ত উপরূপকটির পাঠগ্রহণের তারিখ : ১/১২/২০২৩, সময় : দুপুর ২:৩০ (IST)

৭৪. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৭৩, পৃষ্ঠা - ৪১২-১৩

৭৫. *তদেব*, ৬/২৮২, পৃষ্ঠা - ৪১৫

৭৬. *তদেব*, পৃষ্ঠা - ৪১৬

৭৭. *তদেব*, ৬/২৯৩, পৃষ্ঠা - ৪১৭

৭৮. *তদেব*, পৃষ্ঠা - ৪২০

৭৯. *তদেব*, ৬/২৬৯, পৃষ্ঠা - ৪১৫

৮০. *তদেব*, পৃষ্ঠা - ৪১৩

৮১. *তদেব*, ৬/২৭৬, পৃষ্ঠা - ৪১৩

৮২. *তদেব*, ৬/২৭৭-৭৯, পৃষ্ঠা - ৪১৪

৮৩. তত্রৈব

৮৪. *তদেব*, ৬/২৮৪-৮৫, পৃষ্ঠা - ৪১৫

৮৫. *তদেব*, ৬/২৯২, পৃষ্ঠা - ৪১৬-১৭

৮৬. *তদেব*, ৬/২৯৭, পৃষ্ঠা - ৪১৮

৮৭. *তদেব*, ৬/৩০২, পৃষ্ঠা - ৪১৮

৮৮. *তদেব*, পৃষ্ঠা - ৪১৯

৮৯. তত্রৈব

৯০. *তদেব*, পৃষ্ঠা - ৪২১

৯১. *সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোশ*, সম্পাদক – সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, একবিংশ অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ২৯১

৯২. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ* , সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৭৮, পৃষ্ঠা - ৪১৪

৯৩. *তদেব*, ৬/২৮২, পৃষ্ঠা - ৪১৫

৯৪. *তদেব*, ৬/২৮৫, পৃষ্ঠা - ৪১৫

৯৫. *তদেব*, ৬/২৯৩, পৃষ্ঠা - ৪১৭

৯৬. *তদেব*, ৬/৩০৭, পৃষ্ঠা - ৪২০

৯৭. *তদেব*, ৬/২৬৯, পৃষ্ঠা - ৪১২

৯৮. *তদেব*, ৬/২৭৪, পৃষ্ঠা - ৪১৩

৯৯. *তদেব*, ৬/২৮০, পৃষ্ঠা - ৪১৪

১০০. *তদেব*, ৬/২৮২, পৃষ্ঠা - ৪১৫

১০১. *তদেব*, ৬/২৮৯, পৃষ্ঠা - ৪১৬

১০২. *তদেব*, ৬/২৯১, পৃষ্ঠা - ৪১৬

১০৩. *তদেব,* ৬/২৯৬, পৃষ্ঠা - ৪১৬

১০৪. *তদেব,* ৬/৩০২, পৃষ্ঠা - ৪১৮

১০৫. *তদেব,* ৬/৩০৩, পৃষ্ঠা - ৪১৯

১০৬. *তদেব,* ৬/৩০৬, পৃষ্ঠা - ৪১৯

১০৭. *তদেব,* ৬/৩০৯, পৃষ্ঠা - ৪২০

১০৮. *তদেব,* ৬/২৭২, পৃষ্ঠা - ৪১২

১০৯. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৪১৩

১১০. *তদেব,* ৬/২৭৫, পৃষ্ঠা - ৪১৩

১১১. *তদেব,* ৬/২৭৮, পৃষ্ঠা - ৪১৪

১১২. তত্রৈব

১১৩. *তদেব,* ৬/২৮২, পৃষ্ঠা - ৪১৫

১১৪. *তদেব,* ৬/২৮৫, পৃষ্ঠা - ৪১৬

১১৫. *তদেব,* ৬/২৯৩-৯৫, পৃষ্ঠা - ৪১৭

১১৬. *তদেব,* ৬/৩০১, পৃষ্ঠা - ৪১৮

১১৭. *তদেব,* ৬/৩০৩, পৃষ্ঠা - ৪১৯

১১৮. তত্রৈব

১১৯. *তদেব,* ৬/৩০৭, পৃষ্ঠা - ৪২০

১২০. *তদেব,* পৃষ্ঠা – ৪২১

১২১. *তদেব,* ৬/২৭৬, পৃষ্ঠা - ৪১৩

১২২. *তদেব,* ৬/২৮৪, পৃষ্ঠা - ৪১৫

১২৩. *তদেব,* ৬/২৮৬-৮৭, পৃষ্ঠা - ৪১৬

১২৪. *তদেব,* ৬/২৯১, পৃষ্ঠা - ৪১৬

১২৫. *তদেব,* ৬/২৯৬-৯৭, পৃষ্ঠা - ৪১৮

১২৬. *তদেব,* ৬/২৭৫, পৃষ্ঠা - ৪১৩

১২৭. *তদেব,* ৬/২৭৪, পৃষ্ঠা - ৪১৩

১২৮. *তদেব,* ৬/২৮৮, পৃষ্ঠা - ৪১৬

১২৯. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৪০২

১৩০. *তদেব,* ৬/২৪৫-৪৭, পৃষ্ঠা - ৪০১

১৩১. *তদেব,* ৬/২৬৯-৭০, পৃষ্ঠা - ৪১২

১৩২. *তদেব,* ৬/২৪৯, পৃষ্ঠা - ৪০২

১৩৩. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৩৯৮

১৩৪. *তদেব,* ৬/২৫৩-৫৪, পৃষ্ঠা - ৪০৩

১৩৫. *তদেব,* ৬/২৫৫-৫৬, পৃষ্ঠা - ৪০৩

১৩৬. *Daśarūpam with Dhanika's Commentary,* সম্পাদক – F E Hall, ৩/8, পৃষ্ঠা - ১১২

১৩৭. *তদেব,* ৩/৫, পৃষ্ঠা - ১১৩

১৩৮. *তদেব,* ৩/৬, পৃষ্ঠা - ১১৩

১৩৯. *তদেব,* ৬/২৫৭-৬৩, পৃষ্ঠা – ৪০৪-০৯

১৪০. *কলকাতা বেতার : ২,* সম্পাদক – ভবেশ দাশ, মহিষাসুরমর্দিনী-র উপক্রমণিকা, পৃষ্ঠা - ১৫৬

১৪১. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৩১-৩২, পৃষ্ঠা - ৩৯৮

১৪২. *তদেব,* ৬/২৩৪, পৃষ্ঠা - ৩৯৯

১৪৩. *তদেব,* ৬/২৮২, পৃষ্ঠা – ৪১২-১৩

১৪৪. *তদেব,* ৬/২৪১-৪২, পৃষ্ঠা - ৪০০

১৪৫. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol. I,* সম্পাদক – M. Ramkrishna Kavi, ৪/১০, পৃষ্ঠা - ৮৬

১৪৬. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৯২, পৃষ্ঠা - ৪১৭

১৪৭. *তদেব,* ৬/২৪৩, পৃষ্ঠা - ৪০১

১৪৮. *তদেব,* ৬/২৯১, পৃষ্ঠা - ৪১৬

১৪৯. *भास का रङ्गमञ्च*, भास के रुपकों का साङ्गीतिक शिल्प, পৃষ্ঠা – ৭৮-৭৯

১৫০. *उपरूपकों का उद्भव और विकास*, তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ১৪৬-৪৯

১৫১. *শ্রীমথুরাদাসবিরচিতা বৃষভানুজা,* সম্পাদক – পাণ্ডুরঙ্গ জাবজী,পৃষ্ঠা - ১

১৫২. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৮২, পৃষ্ঠা - ৪১৪

১৫৩. *তদেব,* ৬/২৮৩

১৫৪. *শ্রীপার্থপাথেয়ং নাম উল্লাপ্যম,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩

১৫৫. *তদেব,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৬

১৫৬. *Kālidāaa's Meghadutam : with the commentary of Mallinath*, সম্পাদক – কুমুদরঞ্জন রায়, পূর্বমেঘ – শ্লোকসংখ্যা ২১, পৃষ্ঠা - ৮২

১৫৭. *শ্রীপার্থপাথেয়ং নাম উল্লাপ্যম,* তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা – ৮৩

১৫৮. *সাহিত্যদর্পণম্ : দ্বিতীয় খণ্ড,* সম্পাদক – যোগেশ্বর দত্ত পারাশর, পৃষ্ঠা - ২২৪৪

১৫৯. *Unmattarāghava by Virūpakṣadeva* সম্পাদক – V. Krishnamachaya, পৃষ্ঠা - ২

১৬০. *শৃঙ্গারপ্রকাশঃ [সাহিত্যপ্রকাশঃ] : প্রথম ভাগঃ [১-১৪ প্রকাশঃ], প্রথম ভাগ,* সম্পাদক – রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী ও সদাশিবকুমার দ্বিবেদী, ১১/৩১১, পৃষ্ঠা - ৬৭১

১৬১. *Bhāvaprakāśana of Sāradātanaya,* সম্পাদক – Yaduraja Yatigiri Swami ও K. S. Ramaswami Sastri, পৃষ্ঠা - ২৬৩

১৬২ .*उपरूपकों का उद्भव और विकास*, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৭৩

১৬৩. *Unmattarāghava by Virūpakṣadeva,* সম্পাদক – V. Krishnamacharya, শ্লোকসংখ্যা ২৯, পৃষ্ঠা - ১০

১৬৪. *তদেব,* শ্লোকসংখ্যা ৩২, পৃষ্ঠা - ১১

১৬৫. *তদেব,* শ্লোকসংখ্যা ৮৩, পৃষ্ঠা – ২২-২৩

১৬৬. *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ৩৪৬

১৬৭. *প্রেক্ষণকত্রয়ী : বিজয়াঙ্কা,* পৃষ্ঠা - ৭

১৬৮. *তদেব : অবন্তীসুন্দরী,* পৃষ্ঠা - ৪

১৬৯. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ১২

১৭০. *Subhadrāharana of Mādhavabhaṭṭa,* সম্পাদক – পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব, পৃষ্ঠা - ১

১৭১. *তদেব,* শ্লোকসংখ্যা ৪, পৃষ্ঠা - ২

১৭২. *মহাকবিবিজয়পাল -বিরচিতম্ দ্রৌপদীস্বয়ংবরম্,* সম্পাদক – শান্তিপ্রসাদ, প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ২

১৭৩. *তদেব,* ১/২, পৃষ্ঠা - ২

১৭৪. *তদেব,* দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩৬

১৭৫. *তদেব,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা – ৮-৯

১৭৬. *তদেব,* ১/৩৭, পৃষ্ঠা - ২৪

১৭৭. *তদেব,* ২/৫, পৃষ্ঠা - ৩২

১৭৮. *তদেব,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ২

১৭৯. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৩০৭, পৃষ্ঠা - ৪২০

১৮০. https://hdl.handle.net/10603/129716 viewed at 7:30 pm (IST) on 07/02/2024

১৮১. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৩০৭, পৃষ্ঠা - ৪২০

১৮২. *Kaviḍiṇḍima-Vāhinīpati-Rājāguru-Śrī Jīvadevācārya's Utsāhavatīrūpakam,* সম্পাদক - দুখীশ্যাম পট্টনায়ক, ভূমিকা, পৃষ্ঠা - ১২

১৮৩. https://gujaratindia.gov.in/about-gujarat/hallisaka.htm viewed at 9:42 am (IST) on 12/02/24

১৮৪. *দানকেলিকৌমুদী নাটিকা,* অনুবাদক – রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, শ্লোকসংখ্যা ৯, পৃষ্ঠা - ৮

১৮৫. *তদেব,* শ্লোকসংখ্যা ৩৩৫, পৃষ্ঠা - ১৯৭

১৮৬. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ২৪৪

১৮৭. *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব,* পৃষ্ঠা - ৬৪

১৮৮. *প্রবাসী – ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ,* পৃষ্ঠা - ৪২১

১৮৯. *তদেব – নাট্যরুচি,* পৃষ্ঠা - ৪২৬

১৯০. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৪২৪

১৯১. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৪২৫

১৯২. তত্রৈব

১৯৩. https://archive.org/details/dli.ministry.24337 viewed at 2:30 pm (IST) on 13/01/2023

১৯৪. *Uparupakas and Nritya Prabandhas,* পৃষ্ঠা - ৩৬

১৯৫. তত্রৈব

১৯৬. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৪০

১৯৭. তত্রৈব

১৯৮. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৪৩

১৯৯. তত্রৈব

২০০. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৪১

২০১. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৪৪

২০২. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৪০

২০৩. *রবীন্দ্রসঙ্গীত,* গীতনাট্যের বৈচিত্র্য, পৃষ্ঠা - ১৮৯

২০৪. তত্রৈব

২০৫. *Uparūpaka-s in Indian Performing Arts – Uparūpaka-s and Natyasastra,* পৃষ্ঠা - ৯

২০৬. *তদেব,* পৃষ্ঠা – ১০-১২

২০৭. *Uparūpaka-s in Indian Performing Arts - Uparūpaka-s in Indian Performing Arts Traditions*, পৃষ্ঠা - ২০

২০৮. https://archive.org/details/dli.ministry.17970 viewed at 11:12 pm (IST) on 06/09/2023 , পৃষ্ঠা - ১০৪

২০৯. https://www.anantaajournal.com/archives/2017/vol3issue6/PartC/3-6-17-931.pdf viewed on 7:35 pm (IST) at 07/03/2023, পৃষ্ঠা - ১৬১

২১০. *সতী কি কলঙ্কিনী,* প্রস্তাবনা, পৃষ্ঠাঙ্ক অনুল্লিখিত

২১১. *তদেব,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা – ১

২১২. তদেব, দ্বিতীয় অঙ্ক - প্রথম গর্ভাঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৮

২১৩. *তদেব,* চতুর্থ অঙ্ক – দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩৬

২১৪. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/৩৮, পৃষ্ঠা - ৯১

২১৫. *সতী কি কলঙ্কিনী,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১২

২১৬. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক - হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২১২-১৩, পৃষ্ঠা - ৩৯৩

২১৭. *তদেব,* ৬/২১৪

২১৮. *সতী কি কলঙ্কিনী,* দ্বিতীয় অঙ্ক – দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, পৃষ্ঠা - ২৫

২১৯. *তদেব,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১

২২০. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২১৫, পৃষ্ঠা - ৩৯৩

২২১. *তদেব,* ৬/২১৬, পৃষ্ঠা - ৩৯৪

২২২. *সতী কি কলঙ্কিনী,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৮

২২৩. *তদেব,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ২

২২৪. *তদেব,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩

২২৫. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২১৭, পৃষ্ঠা - ৩৯৪

২২৬. *সতী কি কলঙ্কিনী,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা ১৩

২২৭. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২১৮, পৃষ্ঠা - ৩৯৪

২২৮. *তদেব,* ৬/২১৮, পৃষ্ঠা - ৩৯৪

২২৯. *তদেব,* ৬/২১৯, পৃষ্ঠা - ৩৯৫

২৩০. *তদেব,* ৬/২২০, পৃষ্ঠা - ৩৯৫

২৩১. *সতী কি কলঙ্কিনী,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা – ১০-১১

২৩২. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক - হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২২১, পৃষ্ঠা - ৩৯৫

২৩৩. *সতী কি কলঙ্কিনী,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১৪

২৩৪. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২২২, পৃষ্ঠা - ৩৯৫

২৩৫. *সতী কি কলঙ্কিনী,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১০

২৩৬. *তদেব,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৯

২৩৭. *পতিব্রতা,* ভূমিকা, পৃষ্ঠাসংখ্যা দুর্বোধ্য

২৩৮. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol. I*, সম্পাদক – M. Ramkrishna Kavi, ১/১১৪, পৃষ্ঠা - ১১৪

২৩৯. *নাট্যসম্ভব (উপরূপক),* তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৭

২৪০. *তদেব,* পঞ্চম গর্ভাঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১৩

২৪১. *তদেব,* পঞ্চম গর্ভাঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১৫

২৪২. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৭৪-৭৫, পৃষ্ঠা - ৪১৩

২৪৩. *কুট্টনীমতম্, মঞ্জর্যাখ্যান (৩),* অনুবাদক – ত্রিদিব নাথ রায়, পৃষ্ঠা ১৯০-২০২

২৪৪. *সাহিত্যসাধক চরিতমালা : চতুর্থ খণ্ড,* সম্পাদক – ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃষ্ঠা - ১৬২

২৪৫. দ্রষ্টব্য : প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৩৮

২৪৬. উল্লিখিত নাট্যদর্শনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

২৪৭. দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা - ৩৬৭

২৪৮. তত্রৈব

তৃতীয় অধ্যায়

উপরূপক ও রবীন্দ্রনাট্য : সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের উপরূপকের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। এরপর সেই উপরূপকের বৈশিষ্ট্য সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাট্যে কতখানি ধরা পড়ে তার যথাসম্ভব মনোজ্ঞ এবং তাত্ত্বিক নিষ্কর্ষের জন্যই এই তৃতীয় অধ্যায়ের গ্রন্থনা। এই অধ্যায়ে যে প্রধান দুটি বিষয় বর্ণিত হতে চলেছে, তা হ'ল –

- বিভিন্ন সমালোচকদের দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাট্যের যে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে, সেই বিভাগগুলি ক'তখানি নাট্যানুগ এবং কতখানি সংগীতানুষ্ঠান তার পুনর্বিবেচনা।
- রবীন্দ্রনাট্যের মধ্যে কাব্যিকতা এবং গীতধর্মিতা বা নৃত্যধর্মিতার অভিলেখ রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যকে কতখানি উপরূপকের মর্যাদা দান করেছে, জিজ্ঞাসুচিত্তে তার সম্ভাব্য উত্তর অনুসন্ধান।

যেহেতু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত একটি নামগোত্রহীন উপরূপক রচিত হয়েছে, তাই সেখান থেকেই একটি বিশ্বাস জন্মায় যে নাটিকা, ত্রোটক ইত্যাদি পরিচয়হীন কোনও নাট্য শুধুমাত্র সংগীতোপজীবিতা এবং সংক্ষিপ্ততার জন্যই 'উপরূপক' শিরোপা পেতে পারে। তাই নির্বাচিত রবীন্দ্রনাট্যত্রয়ীতে যেমন বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট উপরূপকের সৌরভ জ্ঞানেন্দ্রিয়বেদ্য হতে পারে কিনা তার বিচার করা হবে, তেমনই সমগ্র রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যকে সাধরণভাবে উপরূপকের ছত্রছায়ায় আনীত হতে পারে কিনা তার জন্যও তৎপর হওয়া প্রয়োজন। তাই এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাট্যের বিশ্লেষণ হবে উপরূপকের প্রেক্ষিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যসম্ভার যেন রসরত্নাকর। সেই সমুদ্রসদৃশ সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণের অধিকারী হতে পারা যায় কিনা তা শাশ্বত প্রশ্ন। রবীন্দ্রসাহিত্য যেমন অমর, তেমনই এই সন্ধানও অশেষ। তবুও এই গবেষণার প্রয়োজনানুসারে নির্দিষ্ট বক্তব্যের পরিধিতেই তার কিঞ্চিৎ সমালোচনায় ব্রতী হই। এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের কথাবস্তু, উৎস, চরিত্রবর্ণন, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়ের সুচিন্তিত মতামত কাঙ্ক্ষিত নয়; বরং রবীন্দ্রনাট্যসন্দর্ভে কাব্য, গীতি এবং নৃত্যের কীরূপ ভূমিকা তার যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে (১২৬৮ বঙ্গাব্দ)। ঊনবিংশ শতকে বাংলায় অভিজাত বাবু সম্প্রদায়ের সৌখীন নাট্যশালায় নাট্যচর্চা জোড়াসাঁকো-ঠাকুরপরিবারেও আন্দোলিত হয়। এ বিষয়ে একাধিক গ্রন্থাবলি,পত্রপত্রিকা দ্রষ্টব্য। তার মধ্যে দর্শন চৌধুরীর *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস* গ্রন্থটির কাছে অধমর্ণের ঋণ গ্রহণ করতে হয়। 'ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালা' অধ্যায় থেকে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথের জন্মের কিছু সময়ের মধ্যেই ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির (৫নং অংশে) নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে কৃষ্ণবিহারী সেন, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এবং যদুনাথ মুখোপাধ্যায়-ও এই অস্থায়ী নাট্যশালায় যুক্ত হন। এই নাট্যশালার প্রথম নিবেদন ছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের *কৃষ্ণকুমারী* নাটক[১]। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন নাট্যপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধিক

সংস্কৃত দৃশ্যশ্রব্যকাব্যের বঙ্গানুবাদমূলক নাট্যপ্রস্তুত করেন। এমনকি *অলীকবাবু*-র ম'ত প্রহসন তাঁরই বিরচনা। এমনকি ঠাকুরপরিবারের অন্যতমা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীও ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন *বসন্ত-উৎসব* নামক একটি গীতিনাট্য। চিত্রা দেবের বহুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল* গ্রন্থে এই নাট্য প্রযোজনার একাধিক তথ্য বর্তমান[২]। পুনরুক্তি দোষ পরিহারের জন্যই লক্ষ্যচ্যুত হওয়া অনুচিত ব'লেই তার বিশদ আলোচনায় অংশগ্রহণ করা হবে না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপ থেকে ফেরার পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *মানময়ী* নাট্যের জন্য একটি গান রচনা করেন "আয় তবে সহচরী"[৩]। এই নাট্যের সাফল্যের পরেই সাহিত্য-সংস্কৃতি-চর্যাকেন্দ্র 'বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বিভিন্ন জনের অক্লান্ত পরিশ্রমে অভিনীত হয় *বাল্মীকি-প্রতিভা* গীতিনাট্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে প্রকাশিত ও অভিনীত এটিই প্রথম গীতিনাট্য। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নাট্যসৌধগুলির প্রারম্ভিক পর্যায়েই গানের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল। এরপর কাব্য এবং নৃত্যের নান্দনিক যোজনা ঘটেছে। রবীন্দ্রনাট্যের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থের দান রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুর পাত্রকে করেছে পূর্ণ। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব নিরীক্ষা এবং সমীক্ষা কীরূপ ছিল, তা এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হবে। সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রাচীন ভারতীয় দর্শন বা অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যুৎপত্তি ছিল অতুলনীয়। তবে তিনি লক্ষ্য গ্রন্থের রচনা করলেও নাট্যশাস্ত্রধর্মী কোনও গ্রন্থপ্রণয়নের দায়ভার নেয়নি। বিভিন্ন নাট্যের আখ্যাপত্র, উৎসর্গপত্র, ভূমিকা বা প্রাককথন, স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র এবং কয়েকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁর নাট্যনন্দনতত্ত্ব ধরা পড়ে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে পারি ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে লেখা একটি পত্রের কথা। সেখানে তিনি বলেছেন –

বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখার শক্তি থাকত তাহলে চেষ্টা করতুম, কেন না, নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।[৪]

অর্থাৎ এখান থেকে দুটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। প্রথমতঃ লেবেদেফ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র এমনকি গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'নাটক'গুলিকেও নাট্যিকতাময় 'নাটক' বা অভিনেয় দৃশ্যশ্রব্যসাহিত্য বলে মানতে রাজি নন। এমনকি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাট্য রচিত, প্রকাশিত এবং অভিনীত হয়েছে। সেই সমস্ত নাট্যের যোগফলেও আত্মতুষ্টি একেবারেই ছিলনা কবির। অর্থাৎ তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ষোড়শী নাটককে আদর্শ বাঙলা নাটক ব'লেই মনে করেছেন। এই পত্রের ওপর ভিত্তি করে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের প্রাকযুগ এবং উত্তরযুগ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, তাহলে দেখা যায় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে *ষোড়শী*-র খাতে রবীন্দ্রনাথের নাট্য বয়ে চলেনি। যদি নতুনত্বের প্রসঙ্গ এসে পড়ে, তবে সর্বাধিক যে রীতিটি রবীন্দ্রনাট্যে অনুসৃত হয়ে দেখা যায়, তা হ'ল নৃত্যনাট্য। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যাঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়না। তবে একথাও নাট্যনন্দিত সহৃদয়বর্গ বিস্মৃত হয়না যে বাংলা গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য এবং নৃত্যনাট্যের বহুব্যাপী প্রসিদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিস্পর্ধী অদ্যাবধি জন্মাননি।

৩.১ রবীন্দ্রনাট্যে রবীন্দ্রচিন্তা :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্য এবং সংগীতজগতের ঋষিতুল্য মানবতাবাদী দ্রষ্টৃস্বরূপ। তাঁর কবিতা এবং গানের বাণীর সংখ্যার অনুপাতে নাট্যসন্দর্ভের সংখ্যা কম হ'লেও নাট্যভাবয়িতৃরূপে বাংলার নাট্যগৃহে রবীন্দ্রনাথের স্থান অনন্য। তিনি শুধু নাট্যরচনা-ই করেননি; তাঁর প্রতিটি নাট্যসৃজনেই সেই নাট্যটির ব্যক্তিগত চরিত্র এবং অবস্থান সম্পর্কে পাঠককে আশ্বস্ত ক'রে গেছেন। তাই 'রবীন্দ্রনাট্যে রবীন্দ্রচিন্তা' এই প্রস্তাবিত নিবন্ধে আলোচিত হতে চলেছে নাট্যবিষয়ে তাঁর মতাবলি। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের সনাতনী প্রথা কীভাবে তাঁর নাট্যসাহিত্যে অধিকৃত হয়েছে এবং তার অবিকৃতির মাত্রা কতখানি রয়েছে, তা-ই উপস্থাপন করা যেতে পারে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের *ভগ্নহৃদয়* গীতিকাব্যের পৃষ্ঠাঙ্কবর্জিত ভূমিকায় তাঁর নিজস্ব স্বীকারোক্তি "নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র এমনকি কাঁটাটি পর্য্যন্ত থাকা চাই।" বাক্যগুলিকে অধ্যাপক ডঃ পবিত্র সরকার *নাটমঞ্চ নাট্যরূপ* গ্রন্থের 'নাটকীয় : রবীন্দ্রভাবনা' অধ্যায়ে এই রবীন্দ্রকথনের ব্যাখ্যায় কিছু অনুমানের সাহায্য নিয়েছেন এবং পাঠকদের জানিয়েছেন যে ফুল অর্থে কবিতা, কাণ্ডের আড়ালে মূল ইতিবৃত্ত, শাখা প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের বহুমুখী প্রসারণ, কাণ্ডসংলগ্ন পত্রের মাধ্যমে পাত্রপাত্রীর নাট্যোক্তি এবং কাঁটার উপমায় নাট্যদ্বন্দ্ব-ই রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় উপস্থিত ছিল[৫]। এ বিষয়ে সংশয়মুক্ত না হলেও অধ্যাপক সরকারের বিশ্লেষণটি যুক্তিসঙ্গত। তিনি *বাল্মীকি -প্রতিভা*-ও গানের সমন্বয়ে গঠন করেছেন এবং *ভগ্নহৃদয়*-ও গানের মাধ্যমে রচনা করেছেন। তথাপি এটিকে তিনি 'নাটক'-এর মর্যাদা দেননি।

বর্তমানে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা থেকে ১৪০৬ বঙ্গাব্দে দুই খণ্ডে প্রকাশিত *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ*-এ মোট ৫৪টি রবীন্দ্রনাট্য সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম খণ্ডে রয়েছে ২৬টি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে ২৮টি নাট্যরচনা। তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে এখানে যে নাট্যগুলি সংকলিত হয়েছে, তার অনেকগুলিই প্রথম রচনার পরবর্তী সংশোধিত এবং পরিমার্জিত সংস্করণ। এমনকি ভূমিকা অংশের রবীন্দ্রোক্তিও পরবর্তী কালের সংযোজন। তবে যাই হোক; এই নাট্যগ্রন্থগুলির আখ্যাপত্র এবং প্রাককথন থেকে দৃশ্যকাব্যের যে যে অভিধাগুলি পাওয়া যায়, তা হ'ল 'নাটিকা' (*রুদ্রচণ্ড*-এর আখ্যাপত্র-১৮০৩ শকাব্দ)[৬], গীতিনাট্য' (*কালমৃগয়া* - ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ)[৭], নাট্যীয় গান' (*প্রকৃতির প্রতিশোধ* -এর প্রাককথন-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ)[৮], 'নাট্য' (*নলিনী* - ১২৯১ বঙ্গাব্দ)[৯], 'নাটক' (*রাজা ও রাণী* সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা - ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ)[১০], 'নাট্য আকার' (চিত্রাঙ্গদা – ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ)[১১], কৌতুকনাট্য (হাস্যকৌতুক শ্রেণীর নাট্যসংকলনের ভূমিকা)[১২], 'নাট্যীকৃত' (*প্রায়শ্চিত্ত*-এর ভূমিকা – ১৩১৬ বঙ্গাব্দ)[১৩], 'নাট্যকাব্য' (*ফাল্গুনী* -র উৎসর্গপত্র)[১৪], 'নাট্য-রূপক' (*অরূপরতন* -এর ভূমিকা – ১৩২৬ বঙ্গাব্দ)[১৫], 'কথিকা' (*শাপমোচন*-এর ভূমিকা)[১৬], 'নাট্যগীতি' (*পরিশোধ* - আখ্যাপত্র)[১৭]। এছাড়াও *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থের 'বাল্মীকি প্রতিভা' অধ্যায়ে *বাল্মীকি-প্রতিভা* এবং *কালমৃগয়া* -র স্বরূপ সম্পর্কে আরও কয়েকটি অভিধা পাওয়া যায়। সেখানে এই দুটি গীতিনাট্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা – "গানের সূত্রে নাট্যের মালা" এবং *মায়ার খেলা* গীতিনাট্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত পূর্বোক্ত দুটি গীতিনাট্যের বিপরীত – "নাট্যের সূত্রে গানের মালা"[১৮]। আবার *বাল্মীকি-*

প্রতিভা গীতিনাট্যকে তিনি আরও একটি পরিচয় দিয়েছেন যা হ'ল 'সুরে নাটিকা'[১৯]। এছাড়াও ফাল্গুন, ১২৮৮ বঙ্গাব্দে (১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ) ভারতী পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে তাঁর পূর্বজ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের *সীতার বনবাস* এবং *লক্ষ্মণ-বর্জন* নাটকদ্বয়ের সমালোচনায় তিনি ব্যবহার করেছেন 'দৃশ্যকাব্য' শব্দটি –"গিরিশবাবু রচিত পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যগুলিতে তাঁহার কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে"[২০]। অর্থাৎ তাঁর লেখনীপ্রসূত 'দৃশ্যকাব্য' শব্দটির প্রাচীনতা লক্ষণীয়। যে সময়ে তিনি গীতিসূত্রে নাট্যমাল্য রচনা করে চলেছেন, সেই সময়ে তিনি ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের 'দৃশ্যকাব্য' শব্দটির প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। অথচ তিনি তাঁর কোনও নাট্যরচনাকে 'দৃশ্যকাব্য' বলেননি। এক্ষেত্রেও একটি প্রমাণ পাওয়া যায় *ফাল্গুনী* নাট্যকাব্যের প্রস্তাবনামূলক অংশে। সেখানে তিনি বলেছেন "তৈরি আছে – কিন্তু সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভান তা ঠিক বলতে পারব না"[২১]। সুতরাং আবারও তিনি বলতে চাইলেন যে তাঁর নাট্যসাহিত্য প্রথাসিদ্ধ সংস্কৃত দৃশ্যশ্রব্যকাব্যের আদলে নির্মিত হয়নি। অথচ তিনি যে *সাহিত্যদর্পণ* সম্পর্কে যথাবিধ অবগত ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে *ছন্দ* নামক প্রবন্ধসংকলন গ্রন্থের পরিশিষ্টতে প্রদত্ত 'মোটকথা : গদ্যছন্দ' প্রবন্ধে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মে কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রে বলা ছিল "আর রসাত্মক বাক্যকেই আলংকারিক পণ্ডিত কাব্য সংজ্ঞা দিয়েছেন"[২২]। এক্ষেত্রে বিশ্বনাথ কবিরাজের নামোল্লেখ না থাকলেও তাঁরই উক্তিকে উদ্ধৃত করেছেন কারণ *সাহিত্যদর্পণ* -এ দেখা যায় "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"[২৩]। কাব্যের সংজ্ঞায় ভরতমুনি থেকে শুরু ক'রে ভামহ, দণ্ডী, রাজশেখর, মম্মটভট্ট প্রমুখ আচার্যগণ নিজস্ব মনোভাবনা জ্ঞাপন করলেও রসাত্মক বাক্যই যে কাব্য এই উক্তি বিশ্বনাথব্যতীত অন্য কোনও আলংকারিক দেননি। তাই *সাহিত্যদর্পণ*-এই রূপক এবং উপরূপকের বিস্তৃত আলোচনা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের ভারবত্ব প্রশ্নাতীত। তাই তিনি উত্তরপক্ষরূপে পূর্বপক্ষের মতখণ্ডন তখনই সম্ভব যখন পূর্বপক্ষীয় মতের সূক্ষ্মতা সম্যকভাবে হৃদয়স্থ হয়ে থাকে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যসাহিত্যের মধ্যে শব্দবন্ধ পাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কোনও নাট্যরচনার নামাঙ্কনে এই ধরণের প্রবীণতা এবং প্রবণতা বজায় রাখেননি। ললিতকলালাবণ্যময়ী গীতি এবং কাব্যকে তিনি নাট্যশরীরে মিশিয়ে দিয়েছেন। তার ফলে কখনও কখনও নাট্যস্থ গানগুলি এককরূপে পরিবেশিত হতে পারেনি। যদি কোনও সমীক্ষক বা পাঠক ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের দশরূপক এবং উপরূপকের লক্ষণ এবং প্রয়োগবিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন, তবে তার রবীন্দ্রনাট্যপাঠে বুদ্ধির জড়তাকে লঙ্ঘন করতে হবে। সুতরাং ভারতীয় নাট্যরূপকল্পের আদর্শ চিত্রেরই সৃজন হয়েছে চিত্রপ্রতিলিপির পরিবর্তে।

৩.২ রবীন্দ্রনাট্যের শ্রেণিবিন্যাস :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যসমগ্রকে কালানুক্রমিকতাকে অগ্রভাগে রেখে নাট্যগ্রন্থনার বিবর্তন অনুসারে নাট্যগুলির বিভিন্ন শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ইহলৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তির পরেই এই ধরণের চিন্তা রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞদের মনে উদিত হয়েছিল। তাই চেষ্টা করা উচিত বিভিন্ন অধ্যাপক তথা পণ্ডিতপ্রবর ব্যক্তিত্বের সেই মতামতগুলিকে সংহতরূপে গণনা করার।

❖ শান্তিদেব ঘোষ (১৯১০-১৯৯৯) :

শান্তিদেব ঘোষ ছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবদীক্ষিত এবং ভাবানুরক্ত মনীষা। তিনি দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতন এবং বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ ১৯৩০-এর দশকে রবীন্দ্রনৃত্যে তাঁর নেতৃত্বই আজ রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যকে আন্তর্জাতিক দ্বারে উপনীত করেছে। তিনি পৌষ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে (ডিসেম্বর,১৯৪২ / জানুয়ারি, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) *রবীন্দ্রসঙ্গীত* নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে এই গ্রন্থ ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ছ'টি সংস্করণের মধ্যে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ কলেবর ধারণ করেছে। এই গ্রন্থের 'শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাট্যের একটি শ্রেণিবিভাগ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাট্যের ইতিহাসের সাপেক্ষে কিছু পরিভাষার আমদানি করেছেন তিনি। এগুলি নিম্নে আলোচিত হ'ল –

▪ গীতনাটক বা গীতনাট্য :

এই পর্যায়ের সময়কাল ১৮৮১-১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়ের ক্ষেত্রস্থল কলিকাতার জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ি। এই পর্যায়ের বর্ণনায় তিনি জানিয়েছেন –

গান গেয়ে এগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনয় করতে হয়েছিল । এইভাবে একটা বিশেষ অভিনয়ধারা তখন প্রবর্তিত হয়। এইগুলি পুরোদস্তুর নাটক – নানা দৃশ্যে বিভক্ত হয়ে ও নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে এগুলির সমাপ্তি।[২৪]

এই পর্যায়ের মধ্যে তিনটি গীতনাট্য অন্তর্ভুক্ত যথা *বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া* এবং *মায়ার খেলা* ।[২৫] প্রথমটি বাল্মীকীয় *রামায়ণ* ও কৃত্তিবাসী শ্রীরামপাঁচালির কাঠামোয় রচিত। আদিকবির চৌর্যবৃত্তির থেকে কবিত্বলাভের একটি কাহিনি নানা দৃশ্যে বিভক্ত হয়ে গানের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। নাট্যসংলাপগুলি গদ্যভাষায় রচিত না হয়ে গান বা সুরেলা পদ্যে রচিত। দ্বিতীয় গীতিনাট্যটি উৎস কালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্য, বাল্মীকীয় *রামায়ণ* এবং কৃত্তিবাসী *শ্রীরামপাঁচালি* । দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ এর সারাংশ। তবে এখানে সুরেলা পদ্যের পরিবর্তে চরিত্রগুলি গানে-গানে সংলাপ বিনিময় করে। *বাল্মীকি-প্রতিভা* থেকে দস্যুদের অংশটি গৃহীত হওয়ার ফলে সেখানেই যতটুকু পুরাতনী রেশ রয়ে গেছে। সেই অংশব্যতীত *কালমৃগয়া*-র নিজস্ব অবয়বে কেবলই সুর-তাল-লয়নিবদ্ধ গানের গরিমা। তৃতীয় গীতিনাট্য *মায়ার খেলা* পূর্বোক্ত দুটি গীতিনাট্য অপেক্ষা গানরচনার দিক থেকে উন্নত। এখানে সুরেলা পদ্য শূন্য। কেবলই সাপেক্ষ অথবা নিরপেক্ষ গানের মাধ্যমে নাট্যবস্তু পরিণতি লাভ করেছে। অর্থাৎ তিনটি গীতিনাট্যের যে সাদৃশ্য, তা হ'ল 'সাধারণ গদ্যভাষা' বিবর্জিত নাট্য।

▪ প্রকৃত থিয়েটারি আদর্শে রচিত নাটক :

এই পর্যায়ের সময়ের ব্যাপ্তি সংক্ষিপ্ত। এই সময়ের নাটকগুলি হ'ল *রাজা ও রাণী* (১৮৯৯), *বিসর্জন* (১৮৯০) এবং *বৈকুণ্ঠের খাতা* (১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ)।[২৬] এর মধ্যে প্রথম দুটি নাটক প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পঞ্চাঙ্ক নাট্যরীতি অনুসরণ ক'রেই রচিত। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র অনুসারে 'নাটক' হবে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আখ্যান, উপাখ্যান ও গাথার নবোন্মেষ। সেখানে কমপক্ষে পাঁচটি অঙ্ক থাকতে হবে এবং তাতে পঞ্চসন্ধি উৎকীর্ণ থাকবে। রাজা ও

রাণী কাশ্মীর, পঞ্জাব দেশের ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর আধারিত এবং বিসর্জন ত্রিপুরা রাজ্যের একটি রাজবংশের জয়গাথা। তাই নাটকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত ধারাকে অনুসরণ করলেও নাট্যোক্তিগুলি ছিল ছন্দে বাঁধা। *বিসর্জন* নাটকের সূচনায় একটিনত্রিপদী কাব্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছিলেন তাঁর *রাজা ও রাণী* নাটকের বিরূপ সমালোচনা –

> কেহ বলে "ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক
> লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি"।[২৭]

এখন 'ড্রামাটিক' এবং 'লিরিকের প্লাবন' থেকেই কি তিনি ভরতোক্ত 'লোকধর্মী' এবং 'নাট্যধর্মী' অভিনয়ের কথা তুলে ধরলেন? *রাজা ও রাণী* -তে কবিতা যেন নাটককে পিছনে ফেলে রেখেছে। নাটকের উক্তি বা সংলাপ শুধু দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ম'ত। নাটকের প্রাণদায়িনী শক্তি হ'ল নাটকীয়তা বা রবীন্দ্রনাথের স্বভাষায় 'কাঁটা'। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষতা যেমন প্রাণের অনুঘটক নয়; তেমনই লিরিকের প্রাবল্যও কখনওই নাটককে অতিসজ্জিত করতে পারেনা। নাট্যভূমি যদি অপক্ক হয়, তবে তার ওপর লিরিকের ইমারতে ধ্বস নেমে আসে।

- **রূপক নাটক :**

শান্তিদেব ঘোষ কর্তৃক স্বীকৃত তৃতীয় প্রকার রবীন্দ্রনাট্যের অভিধা হ'ল 'রূপক নাটক'। বস্তুতঃ এই 'রূপক' শব্দটি প্রাচীন ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের একটি পারিভাষিক শব্দ। আলোচ্য গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়েই এটি উপস্থাপিত হয়েছে। তবে শান্তিদেব ঘোষ 'রূপক' শব্দটিকে তদরূপ মর্যাদায় ব্যবহার করেননি। তিনি 'রূপক' বলতে অনুমিত প্রতীকী ব্যঞ্জনাকেই বুঝিয়েছেন। যে রবীন্দ্রনাট্যগুলি জীবনদর্শন এবং মানবতাবাদী কর্মবাদের সূক্ষ্ম অনতিগম্য তত্ত্বগুলিকে একটি বাস্তব ইতিবৃত্তের মোড়কে পরিবেশন করেছেন, সেই নাট্যগুলিকেই 'রূপক নাটক' বলতে চেয়েছেন। যেমন *মুক্তধারা* নাট্যে একটি জলধারার প্রতীক ব্যবহৃত হলেও তার গভীরে রয়েছে জাগতিক জীবনের আভ্যাসিক সংস্কারজনিত বন্ধন এবং আড়ষ্টতার শৃঙ্খলমোচনে নতুন গতির সঞ্চার। উত্তরকূট থেকে শিবতরাইয়ে জলপ্রপাতের বিন্যাস সেই বন্ধন থেকে মুক্তির পথেই অগ্রসর হওয়া। এই পর্যায়ের সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন **১৯০১** থেকে **১৯১৯** খ্রিস্টিয় বর্ষ পর্যন্ত। এর জন্মভূমি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত পরিবেশ। রচনাগুলি হ'ল *শারদোৎসব, রাজা, অচলায়তন, ফাল্গুনী* ইত্যাদি[২৮]। এই চারটি নাটককেই তিনি উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে করেছেন। এগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন "এই নাটকগুলিতে কথার সঙ্গে গান প্রচুর ও কথার মতনই নাটকে তার মর্যাদা[২৯]। অর্থাৎ এই রূপক-নাটকগুলিতেও গানকে আহ্বান জানিয়েছেন গুরুদেব কিন্তু সাধারণ গদ্যভাষার উক্তি-প্রত্যুক্তিকেই মুখ্য করেছেন। প্রয়োজন অনুসারে চরিত্রদের জন্য গান রচনা করেছেন। তবে এই নাটকগুলির গান স্বতন্ত্র এবং নিরবচ্ছিন্ন। নাটক থেকে এই গানগুলি বর্জন ক'রে পরিবেশন করলেও নাট্যবস্তুর ক্ষতিসাধন হয়না। আবার, নাট্য দেহ থেকে গানগুলির উচ্ছেদ ঘটিয়ে শুধু গানগুলি ক্রমান্বয়ে পরিবেশন করলেও মূল বার্তা ব্যক্ত হয়না। অর্থাৎ গান ছাড়া এই রূপক-নাটকগুলি সচল হলেও গদ্যভাষার নাট্যোক্তির অভাবে গানগুলির নাট্যিকতা থাকেনা। সুতরাং একাধিক গানের উল্লেখ থাকলেও গান এখানে নাট্যফলের গতিতে

লঘু। এই নাটকগুলির সম্পর্কে শান্তিদেব ঘোষের আরও একটি বিশেষণ লক্ষণীয় তা হ'ল "যাত্রা-থিয়েটারের প্রভাবে প্রভাবান্বিত"[৩০]। তাই তিনি এই বিভাগের অপর নাম দিয়েছেন "রাবীন্দ্রিক যাত্রা"[৩১]। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ক আলোচনার জন্য *বাংলার লোকনাট্য-যাত্রা এবং সাতটি রবীন্দ্রনাটক* গ্রন্থ রচনা ক'রে গেছেন। এখানে যে সাতটি রবীন্দ্রনাটকে যাত্রাঙ্গিকতার ছাপ লক্ষ্য করা গেছে, সেগুলি হ'ল *শারদোৎসব, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, ফাল্গুনী, রক্তকরবী* এবং *মুক্তধারা* । তবে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজা এবং ডাকঘরকে লোক-আঙ্গিকে ধরতে চাননি। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের সমসাময়িক হওয়ার ফলে এখানে অধ্যাত্মচিন্তা প্রবল। তাই বহিরঙ্গে যাত্রার সমতুল্য হলেও অন্তরঙ্গে এদুটির মার্গ নিরাকার ঐশ্বরিক –

মনে রাখতে হবে, "রাজা" এবং "ডাকঘর" দুটিই "গীতাঞ্জলি" পর্বের নাটক, যে পর্বে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার গতি মূহুর্তের জন্য থেমে দাঁড়িয়ে অন্তর্মুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।[৩২]

তবে 'বসন্তের পালা' আখ্যায়িত *ফাল্গুনী-ই* এই পর্যায়ের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। *শারদোৎসব*-এও তিনি দেখেছেন প্রস্তাবনাগীতির গানটি বাংলার যাত্রার সূচনায় বন্দনাগানের অনুরূপ। তবে এই প্রসঙ্গে বলে রাখতে হয় যে গীতনাট্যের থেকে রূপক-নাটকের পর্যায়ের অন্তর্বর্তী অংশে *চিত্রাঙ্গদা, কাহিনী* রচিত হয়েছে যেগুলি কাব্য ও নাট্যের সন্ধিতে সাহিত্য (সহিতের ভাব) লাভ করেছে। তাই সেই কাব্যের রেশ যে রাবীন্দ্রিক যাত্রা থেকেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি এমন কথা এই গ্রন্থেই উল্লিখিত হতে দেখা যায় - "সঠিক অর্থে এগুলি এক একটি কাব্য – দৃশ্যত গড়ে ওঠা কাব্য..."[৩৩]। *রাজা ও রাণী* পাশ্চাত্য পঞ্চাঙ্ক পদ্ধতিতে রচনা করা হলেও তা লোকায়ত নয়। এখানে কাব্যাংশটুকুই সহৃদয়বর্গকে রসতৃপ্ত করতে পারেনি। *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ)-র অবতারণা এবং এটি এমন একটি নাট্য যেখানে কাব্য হ'ল নাট্যের অর্ধাঙ্গ। তবে এই নাট্য মঞ্চস্থ না হওয়ার ফলে জনসমাজে প্রচারিত নয়। *রাজা ও রাণী*-র মধ্যে নাট্যক্রিয়া বা dramatic action রয়েছে। অথচ *চিত্রাঙ্গদা* কেবলই কবিতার ভাবরূপিত আবৃত্তি। সেখানে আঙ্গিক অভিনয় দশ শতাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে। তাই এই নাট্যপাঠেও রসজ্ঞ সহৃদয় পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে। *রাজা ও রাণী* শুধু নাট্যপাঠেই সীমিত নয়। তাই নাট্য যে দৃশ্যশ্রব্যকাব্য, সেই সংজ্ঞার পূর্ণতা রক্ষিত হয়না *চিত্রাঙ্গদা*-র ক্ষেত্রে। রূপক-নাটকগুলির ক্ষেত্রে *ফাল্গুনী* একই দেহে বহু রূপধারণ করে থাকে। নাটকপাঠে তা হয় কাব্য এবং প্রয়োগকালে তা হয় যাত্রা। অথচ এখানে ছন্দোবদ্ধ ত্রিপদী, পয়ার, অন্ত্যমিল ইত্যাদির কোনও চিহ্ন নেই। বাংলা কবিতা বা ছড়ার যে রূপ পরিজ্ঞাত, তা *ফাল্গুনী* নাট্যকাব্যে উহ্য। তবুও রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ছন্দের বন্ধনকেই 'কবিতা' বলতে চাননি; বরং ছন্দের মুক্তিকেই 'কবিতা' ব'লে মানতে রাজি। তাই *ছন্দ* গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে তিনি 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধে গদ্যছন্দকে নিমন্ত্রণ করেছেন। কবিতায় ছন্দ থাকে আমন্ত্রিত কিন্তু গদ্যে ছন্দ হয় নিমন্ত্রিত –

গদ্য বলতে বুঝি যে ভাষা আলাপ করবার ভাষা; ছন্দোবদ্ধ পদে বিভক্ত যে ভাষা তাই পদ্য। . .. ছন্দের একটা স্বকীয় রস আছে – সেই ছন্দকে ত্যাগ করে যে কাব্য, সুন্দরী বিধবার মতো তার অলংকার তার আপন বাণীদেহেই,

বাইরে নয়।. .. গদ্যকাব্য একটা আবাঁধা ছন্দ আছে। আন্তরিক প্রবর্তনা থেকে কাব্য সেই ছন্দে চলতে চলতে আপনি উদ্ভাবিত করে,...[৩৪]

অতএব এই পর্যায় থেকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এমন কিছু রবীন্দ্রনাট্য যেখানে গান 'মুক্ত' এবং সে মুক্তি পেয়েছে বলেই তার উছলতায় রূপক অর্থাৎ কোনও ঘটনা বা বিষয়ের প্রতীকরূপ গভীর জ্ঞানের নাটকগুলি হয়েছে সরস এবং সাংগীতিক।

- **ঋতুনাটক ও গীতোৎসব :**

১৯২১ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল এবং পরবর্তীতে কে রবীন্দ্রনাট্যের যুগের খাপছাড়া অধ্যায় বলা যেতে পারে। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রধান উপাস্য ছিল ঋতুবন্দনা। এই সময়ের মধ্যে তিনি সুগ্রন্থিত নাট্যরচনা না ক'রে বরং বর্ষা, বসন্ত ঋতুর বিভাগ এবং বৈভবকেই সংগীতের রূপে ঢেলে দেন। *বর্ষামঙ্গল, বসন্ত* এই পর্যায়ের রচনা। বসন্ত ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত এবং অভিনীত নাট্য। এটি আদৌ নাটক বা নাট্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। রাজা এবং কবির কথোপকথনের অংশটি কি শুধুমাত্র গানগুলির প্রবেশক বা বিষ্কম্ভক ? একই কথা ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এর সমাধান করতে গেলে দেখতে হবে এই *বসন্ত* নাট্যটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন এভাবে - "উৎসর্গ / শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম // স্নেহভাজনেষু / ১০ ফাল্গুন ১৩২৯ //"[৩৫]। বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি ছিলেন একজন কবি। রাজশক্তির পরাজয় যে কবিত্বশক্তির কাছেই সম্ভব তা-ই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন এখানে। তাই প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলি পূর্বাপর সম্বন্ধ বজায় রাখলেও যে রাজতন্ত্র এবং কবির কথোপকথনের আবহ তৈরি হয়েছে, তা একদিকে একটি বিপ্লবাত্মক ইশারা। তাই এটিকে রাজনৈতিক রচনা বললে প্রমাদ ঘটবে না। তবে রাজা ও কবির উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে সেই নাট্যভূমি সবল নয়। মুখসন্ধি এবং নির্বহণসন্ধিতেই এর পরিসমাপ্তি। এমনকি নাট্যক্রিয়ার পরিবর্তে গান এবং গানসহযোগী নৃত্যের মাধ্যমে সমগ্র রচনাটি পরিবেশিত হয়। তাই রাজা-কবির অংশটি সহৃদয়ের মন থেকে কয়েক পলকেই অপ্রকট হয়ে যায় গান এবং নৃত্যের ঔজ্জ্বল্যে। তাই 'গীতোৎসব' নামটিও ঔচিত্য বহন করে।

- **গানমুখ্য নাটিকা :**

রবীন্দ্রনাট্যের পঞ্চম পর্যায়ে রয়েছে এই বিশেষ ধারাটি যেখানে নৃত্য, গীত ও কাব্য সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করেছে। এর মধ্যে পড়ে *সুন্দর,শেষ বর্ষণ* এবং *নটরাজ* ।[৩৬] তবে দুটির মধ্যে বিজাতীয় ভেদ না থাকলেও স্বজাতীয় ভেদ বর্তমান। সুন্দর 'গীতকাব্য'টি গানের সমাহার। সেখানে *বসন্ত*-এর ম'ত কোনও চরিত্র নেই কিন্তু *শেষ বর্ষণ* নাট্যটিও *বসন্ত* -এর পথের পথিক। এই সময়কার নাটিকাগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন –

মূকাভিনয়, গীতাভিনয় এবং দেহভঙ্গিতে একটু ছন্দ লাগিয়ে এই তিনের সাহায্যে অভিনয় করা হত। এর সঙ্গে গুজরাত অঞ্চলের লোকনৃত্যও কিছু কাজ করেছিল ।[৩৭]

অর্থাৎ আঙ্গিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ের সময় গতিবেগে ঘটমান এক নাটিকা। শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রনাট্যের এই পর্যায়ের নামকরণ করেছেন 'নাটিকা' কিন্তু তা উপরূপকবিশেষ নাটিকা নয়। *রাজা, ফাল্গুনী* যদি 'যাত্রা' বা 'নাটক' হয়ে থাকে, তবে এগুলি হ'ল 'নাটিকা'। তাঁর আলোচনা থেকে যতটুকু বোঝা যায় তা হ'ল গদ্যসংলাপ বা বাচিক অভিনয়সমেত নানা দৃশ্যে বিভক্ত চরিত্ররাজি সংবলিত কোনও ইতিবৃত্তের রচনা-ই হ'ল 'নাটক'। অপরপক্ষে যেখানে বাচিক অভিনয়ের পাঠ্য যৎসামান্য বা অনুপস্থিত কিন্তু গানের সমাবেশে কোনও প্রকৃতিবন্দনা বা ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের দিকে যাত্রার একটি বার্তা কতগুলি গানের আকারে পরিবেশিত, তা-ই হ'ল নাটিকা। তবে গীতবাহুল্যের জন্যই 'নাটিকা' শব্দের প্রয়োগ করেছেন এমনটি নয়। নতুবা *বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা* -কেও তিনি গুরুদেবের অভিধায় 'সুরে নাটিকা' বলতে পারতেন কিন্তু তার পরিবর্তে আদ্যন্ত 'পুরোদস্তুর নাটক' বলেছেন এবং নাট্যতত্ত্বের বিধি অনুযায়ী আধিকারিক এবং প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত রয়েছে। যেমন *বাল্মীকি - প্রতিভা* গীতিনাট্যের আধিকারিক ইতিবৃত্তের নায়ক বাল্মীকি এবং প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের মধ্যে একদেশভাক্ নিয়মে ব্যাধের চরিত্রকে দেখা যায়। শুরুতেই বনদেবীগণের গানে বিষ্কম্ভকের ছায়া কারণ বনে পশুপাখিদের ওপর নির্মম অত্যাচারের কথা ব্যক্ত। শুরুতেই বাল্মীকির দস্যুদের নরবলির আদেশে মুখসন্ধি কিন্তু দস্যুদের মদ্যপান এবং উল্লাসে ঘটনাস্রোতের বিপরীতে প্রতিমুখতা লক্ষণীয়। আবার, বালিকার রোদনে বাল্মীকির পাষাণ হৃদয় বিগলিত হওয়ায় বীজ দৃষ্ট, পুনরায় দস্যুগণের বালিকার ওপর রোষভাষণ এবং পূজার আয়োজনে বীজ নষ্ট, বাল্মীকির ব্যাকুল হৃদয়ে ভ্রমণে বীজ দৃষ্ট কিন্তু শিকারের আয়োজনে বীজ নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর ব্যাধগণের ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি শরনিক্ষেপে বাল্মীকির কবিত্বে গর্ভসন্ধির সমাপ্তি। বিমর্ষ সন্ধির অংশে দেখা যায় অলকাপুরীর দেবী কমলার বাল্মীকিকে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস কিন্তু এতদসত্ত্বেও বাল্মীকির সারস্বত চিন্তায় সকল দ্বন্দ্বের অবসান এবং শেষে সুরলোকের দেবী সরস্বতী কর্তৃক বাল্মীকিকে বরদানে উপসংহার। তাই এই গীতিনাট্য গানের সারিতে নিবদ্ধ হলেও 'পুরোদস্তুর নাটক' এবং তার তুলনায় *শেষ বর্ষণ* কিঞ্চিৎ ম্লান। তাই নাট্যে গানের যুক্তীকরণে যে কোনও নাটক নাটিকাতে রূপান্তরিত হতে পারে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাননি শান্তিদেব ঘোষ। আবার, প্রাচীন 'নাটিকা'-র বিধি নিষেধকেও অগ্রাহ্য করেছেন।

তবে এই পর্যায়ের মধ্যেই বিশ্বভারতীতে মণিপুরী নৃত্যের একটি নবযুগের সূচনা হয়। নবকুমার সিংয়ের শিক্ষণে *নটীর পূজা* নাট্যের অভিনয় হয় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে[৩৮]। এই নৃত্যাভিনয় থেকেই রবীন্দ্রনাট্যের একটি নতুন ধারার সূচনা হয়। *নটীর পূজা* -কে 'গীতমুখ্য নাটিকা' বলা সমীচীন হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে যায়। প্রথমতঃ এটি ইতিবৃত্তপ্রধান একটি নাট্য এবং দ্বিতীয়তঃ শ্রীমতী চরিত্রেরই কয়েকটি গানে নৃত্য পরিবেশিত হয়েছিল। তৃতীয়তঃ এই নৃত্য পূর্বেকার *শারদোৎসব, রাজা, ফাল্গুনী*-র ম'ত দেহের চলমান ছন্দসৌষম্য নয়। নৃত্যগুরুর প্রশিক্ষণে (choreography) প্রশিক্ষিত নৃত্য। এমনকি গানের পাশাপাশি নাট্যের চরিত্রগুলির গদ্যভাষাও যথেষ্ট

গুরুত্বপূর্ণ। নৃত্যব্যতীত এই নাট্য পরিবেশিত হতেই পারে। সেখানে ভাবরসের হনন হয়না। যেহেতু ১৯২৬ এবং ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে *নটীর পূজা* ব্যতীত এই নৃত্যসহ অন্য কোনও নাট্য অভিনীত হয়নি তাই হয়ত এর গোত্রনির্ধারণ করতে পারেননি প্রাবন্ধিক শান্তিদেব ঘোষ।

এররপরেই রবীন্দ্রনাট্যে পরিশীলিত নৃত্যের যথোপযুক্ত আসন লক্ষ্য করা গেছে। এমনকি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের রচনা *সুন্দর*-এর দ্বিতীয় সংস্করণের অভিনয় হয় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ রাণী এবং বাসন্তিকা চরিত্রদুটি যুক্ত করেন। জোড়াসাঁকোয় এই অভিনয় সম্বন্ধে শান্তিদেব ঘোষ স্মৃতিচারণায় বলেছেন –

.... গানগুলির অদলবদল করে 'রানী' ও তার সখী 'বাসন্তিকা' নামে দুটি চরিত্র ওর মধ্যে যোগ করে দিলেন। তাদের কথাবার্তার ভিতর দিয়ে গানগুলির মর্মার্থ বোঝানো হয়েছিল।[৩৯]

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে *সুন্দর*-এর ঢঙেই আরও এক গীতমুখ্য নাটিকার রচনা হয়; তার নাম *নবীন* । শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন –

পূর্বের বসন্ত নাটিকার মতনই বসন্তঋতুর নতুন গান তিনি অনেক রচনা করলেন। এর জন্য কোনো নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেননি। রাজা বা রাজসভা ছিল না। গুরুদেব রঙ্গমঞ্চের এক কোণে বসে গানগুলির মর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন নিজকণ্ঠের গানে পাঠে ও আবৃত্তিতে।... 'নবীনে' মণিপুরী নাচের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বাউল, রাইবিশে ও ইউরোপের হাঙ্গেরী দেশের লোকনৃত্য ছিল আরো একটি প্রধান বিশেষত্ব।[৪০]

ফলতঃ বলা যায় যে 'গীতমুখ্য নাটিকা' পর্যায়ের দুটি উপবিভাগ – *নটীর পূজা*-র পূর্বকাল এবং *নটীর পূজা*-র উত্তরকাল। প্রথম উপবিভাগে রয়েছে নাটকীয়তার সূত্রে গানের মালা এবং দ্বিতীয় উপবিভাগে রয়েছে গানের সূত্রে নাটকীয়তার মালা। 'নাট্য' এবং 'নাটকীয়তা'-র স্বরূপগত ভেদ রয়েছে। নাটকীয়তা কেবলমাত্র নাট্যের একটি উপকরণমাত্র। *সুন্দর* (প্রথম সংস্করণ), *শেষ বর্ষণ* -এ গানগুলিকে নাটকীয়তার সূত্রে পরস্পর সংলগ্ন করা হয়েছে এবং *সুন্দর* (দ্বিতীয় সংস্করণ)-এ নাটকীয়তার দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতির চেতনাকে অনুভাবিত ক'রে তুলতেই গানের ক্রমিক সজ্জা। এখানে প্রথম গানের রেশ রেখে যায় পরের গান এবং উত্তরোত্তর এই শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

- **কথিকা :**

শান্তিদেব ঘোষের মতানুযায়ী ষষ্ঠ পর্যায়ের রবীন্দ্রনাট্যগুলি হ'ল কথিকা। এই পর্বে প্রধানতঃ 'শিশুতীর্থ' কবিতা এবং *শাপমোচন* কথিকা।[৪১] *শিশুতীর্থ* সম্পর্কে তাঁর ধারণা "এখানে মনে করিয়ে দিতে হবে যে, 'শিশুতীর্থ' আসলে নাটিকা নয়, এটিকে একটি কথোকা বলা যেতে পারে, 'লিপিকা'র গল্পের মতো"[৪২]। আবার ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি কথিকা হ'ল *শাপমোচন* । এটির সম্বন্ধে শান্তিদেব ঘোষের উক্তি "শিশুতীর্থের মতোই রাজা নাটকের ভাব অবলম্বনে এই কথিকাটি রচিত। তাকেই অবলম্বন করে ব্যালে-নাচের আদর্শে এই নৃত্যনাট্যটি গড়ে ওঠে"[৪৩]। এই প্রসঙ্গে পাঠক বা সমীক্ষকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পাঠ্য *পুনশ্চ* কাব্যগ্রন্থটি। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম গদ্যকবিতার সংকলন। *লিপিকা*-কে

সঠিকভাবে গদ্যকবিতা না বলা গেলেও *পুনশ্চ* -র কবিতাগুলি নিরেট গদ্যকবিতা। এমনকি কিছু কবিতায় একটি আখ্যান বা গল্পের পটভূমি রয়েছে। 'নাটক', 'বাঁশি', 'শাপমোচন' ইত্যাদি কবিতায় কোনও একটি চরিত্রকে কেন্দ্র ক'রেই কবিতাগুলির পঙক্তিবন্ধন। 'শিশুতীর্থ' কবিতায় একটি জীবনসত্যের আভাস রয়েছে কিন্তু 'শাপমোচন' কবিতাটি নাট্যানুগ কাহিনির প্রলেপে মোড়া। তাই এহেন গদ্যকবিতার নাট্যে রূপান্তরিত করা অনেকখানিই সহজ। *শিশুতীর্থ* কথিকাটি তৎকালে যে-আকারে অভিনীত হয়েছিল, তা *শাপমোচন*-এর ম'তই বাচিক অভিনয়ের রেখায় অঙ্কিত। শান্তিদেব ঘোষ উপরিউক্ত প্রবন্ধেই সেই script টি উদ্ধৃত করেছেন[৪৪]। সেখানে দেখা যায় কবিতার মূল ভাবকে অবিকৃত রেখে দশটি সর্গে একটি ইতিবৃত্তের বিবৃতি। তবে সেই বৃত্তটি অভিনয়ের উপযোগী নয়; শুধু বৃত্তটির পাঠের পরের গানগুলির নৃত্যাভিনয় হয়েছিল। এরই পরবর্তী প্রজন্ম বলা যায় *শাপমোচন*-কে। এর কাহিনির অভিনয়ের সুযোগ রয়েছে আঙ্গিকের দ্বারা। মূকাভিনয় বলতে যা বোঝায়, এক্ষত্রে তাই-ই অনুমোদিত। শুধু গানগুলির পরিবেশন করা হ'লে তা বীথী-তে পরিগণিত হয়। অথচ বর্তমানে বিশ্বভারতী সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংগীতপ্রতিষ্ঠানে *শাপমোচন*-এর ভঙ্গিমাটি হয় নৃত্যনাট্যের ম'তই। সেখানে সুরকন্যাদের দেবরাজের প্রতি প্রণতি, উর্বশীর নৃত্য, গন্ধর্ব সৌরসেনের তালভঙ্গ, ইন্দ্রের অভিশাপবর্ষণ, কমলিকার সঙ্গে অরুণেশ্বরের বীণার মালাবদল ইত্যাদি দৃশ্যের অবতারণা হয় আঙ্গিকের মাধ্যমে।*শাপমোচন* -এর ভূমিকায় উক্ত এই শব্দটিকে পরিবর্তিত করতে চাননি শান্তিদেব ঘোষ। সংস্কৃতের √কথ্ ধাতু থেকে এই শব্দের উৎপত্তি। চুরাদিগণীয় কথ্ ধাতুর অর্থ 'বাক্যপ্রবন্ধ'[৪৫]। কোনও কিছু বলা বা বচনার্থে এই ধাতুর প্রয়োগ। ভালো ক'রে লক্ষ্য করলে দেখা যায় *শাপমোচন* -এ একজন অদৃশ্য কথক বা সূত্রধার রয়েছে যে সমগ্র ইতিবৃত্তটি বর্ণনা ক'রে চলেছে। *বাল্মীকি -প্রতিভা, ফাল্গুনী, নটীর পূজা, সুন্দর* -এ যে নাট্যপাত্রপাত্রীর কথোপকথন রয়েছে, তার তুলনায় সেই সময়ে অনুষ্ঠিত 'শিশুতীর্থ' এবং *শাপমোচন* -এর গ্রন্থনা ভিন্ন। এই প্রথম এমন এক ধরণের নাট্যরচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ যেখানে নাট্যবস্তু রয়েছে, নাটকীয়তা রয়েছে, পাত্রপাত্রী রয়েছে, গান রয়েছে কিন্তু পাত্র-পাত্রীর কোনও মৌখিক বচন বা বাগভিনয় নেই। এই গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে 'বীথী'-র আলোচনা রয়েছে, তার সঙ্গে এর প্রভূত সাদৃশ্য বিরাজমান[৪৬]। এমনকি একক অভিনয়মূলক 'ভাণ' রূপকের ছাঁদেও *শাপমোচন* অভিনীত হতে পারে। যদিও এমনভাবে *শাপমোচন* কথিকার অভিনয় প্রচলিত নয় যেখানে একজন সূত্রধার সমগ্র ঘটনাটির উপস্থাপন করছে এবং গানগুলি গাইবে অথবা নৃত্যাকারে অভিনয় করছে। তবে যেহেতু বর্তমানে *রবীন্দ্র-রচনাবলী* বা *রবীন্দ্রনাট্যসংগ্রহ*-তে *শাপমোচন*-এর যে text মুদ্রিত হয়েছে[৪৭], সেখানে অরুণেশ্বর, কমলিকা, ইন্দ্র, উর্বশী চরিত্রের উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র বিবৃতিতে প্রসঙ্গানুসারে কথিকার চরিত্রগুলির নাম উঠে এসেছে। তাই 'ভাণবত্' রূপে উপস্থাপিত হতে পারেনা একথা অমূলক।

- **নৃত্যনাট্য :**

এটিই রবীন্দ্রনাট্যের অন্তিম পর্যায়। এই পর্যায়ের মূল তিনটি নাট্যগ্রন্থ হ'ল *চিত্রাঙ্গদা* (১৯৩৬), *শ্যামা* (১৯৩৮) এবং *চণ্ডালিকা* (১৯৩৮)[৪৮]। তবে এই পর্যায়ের একটি পূর্বপ্রজন্ম রয়েছে যেখানে *চণ্ডালিকা* (গদ্যনাটক) এবং

তাসের দেশ (অদ্ভুত রসাত্মক নাট্য) অন্তর্ভুক্ত। *চণ্ডালিকা* গদ্যনাটক মঞ্চস্থ হয় খ্রিস্টাব্দে এবং তাসের দেশ মঞ্চস্থ হয় যথাক্রমে **১৯৩৩** এবং **১৯৩৮** খ্রিস্টাব্দে। এই দুটি নাট্যেই নৃত্যের প্রচেষ্টা ছিল একান্তভাবেই। তবে এদুটিকে সঠিক নৃত্যনাট্য বলা যায়না কিন্তু **১৯৩৬-১৯৩৯** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অভিনীত *চিত্রাঙ্গদা, পরিশোধ, চণ্ডালিকা* এবং *শ্যামা* সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্য। **১৯৩৯** খ্রিস্টাব্দের **১৪ই** ফেব্রুয়ারি তারিখে কবি অমিয়কুমার চক্রবর্তী-কে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত পত্রে দেখা যায় "সুরে বোঝাই করা তিনটি নাটিকার মাঝিগিরি শেষ করা গেল[৪৯]। অর্থাৎ *চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা* এবং *চণ্ডালিকা*-কে এই কারণেই শান্তিদেব ঘোষ 'নৃত্যানাট্য' পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতির অন্যতম হোতা শান্তিদেব ঘোষের রবীন্দ্রনাট্যবিচারের যে পদ্ধতি, তাতে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায় –

- রবীন্দ্রনাট্যের ক্রমটি হ'ল এইরূপ যে তাঁর নাট্যজীবনের উপোদঘাত পর্বে রয়েছে গীতিনাট্য এবং প্রান্তিক পর্বে রয়েছে নৃত্যনাট্য।
- কাব্যনাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব থাকলেও সেগুলি মঞ্চে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তাই পাঠকের মননেই তার গাম্ভীর্য এবং মাধুর্য বর্তমান। রবীন্দ্রকবিতাপ্রবাহ এবং রবীন্দ্রনাট্যনির্ঝরিণী সমান্তরালে থাকায় নাট্যে তিনি কাব্যত্বকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাই গদ্যনাটকেও অচেতনভাবেই ছন্দের বুনট ধরা দিয়েছে।

তবে শান্তিদেব ঘোষের আলোচনার যে ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করা যায়, তা হ'ল –

- তিনি রবীন্দ্রনাট্যের প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা করলেও নাট্যবস্তুর ধ্বনিবাদে কোনওরূপ পর্যবেক্ষণ করেননি।
- এরই সঙ্গে গীতনাট্য, কাব্যনাট্য, গদ্যনাট্য, নৃত্যনাট্যের কোনওরূপ সংজ্ঞা প্রস্তুত করেননি। এমনকি এই প্রতিটি বিভাগের নামকরণের তাৎপর্য তাঁর অভিধায় ব্যাখ্যাত হয়নি। অর্থাৎ আদর্শ গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের সাপেক্ষে রবীন্দ্রনাট্যগুলি উত্তীর্ণ হয়েছে ক'তখানি তা জানতে পারিনা।

❖ প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫) :

রবীন্দ্রসান্নিধ্যে লালিত আরও একজন রবীন্দ্রসাহিত্যবিশারদ হলেন প্রমথনাথ বিশী। তিনি রবীন্দ্রনাট্যবিষয়ে একটি গ্রন্থরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং কৃতকার্য হয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থটি হ'ল *রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ* যার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় পৌষ, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে (ডিসেম্বর,১৯৪৮/জানুয়ারি ১৯৪৯) এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর,**১৯৫১** খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীতে এই দুটি খণ্ড-ই বহুবিধ সংস্করণের মাধ্যমে **১৯৬৬** খ্রিস্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ বা অখণ্ড সংস্করণ হিসেবে প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে রবীন্দ্রনাট্যবিষয়ী একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও প্রমথনাথ বিশীর মতামত আলোচিত হবে শান্তিদেব ঘোষের পরেই। তার কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ব্যক্তিত্ব এবং

অপরদিকে এই গ্রন্থ রচনার প্রথম প্রয়াস হয়েছে ১৯৪৮/১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের সময়েই। যদিও এখন বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হবে সেই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের সপ্তম সংস্করণ (২০১৭)-এর ভিত্তিতেই।

প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাট্যের যে যে শ্রেণিবিভাগ করেছেন, সেগুলি হ'ল 'গীতিনাট্য' (*বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা*), 'কাব্যনাট্য' (*বিদায়-অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, চিত্রাঙ্গদা, মালিনী*), 'নৃত্যনাট্য' (*শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা*), 'ঋতুনাট্য' (*শেষবর্ষণ, বসন্ত, নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা, নবীন, শ্রাবণ -গাথা*), 'তত্ত্বনাট্য' (*প্রকৃতির প্রতিশোধ, শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা, ডাকঘর, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি, তাসের দেশ, কবির দীক্ষা*), প্রহসন (*চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা, শোধবোধ, বৈকুণ্ঠের খাতা, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক, মুক্তির উপায়*), 'রূপান্তর ও নামান্তর' (*বিদায়-অভিশাপ, চিত্রাঙ্গদা, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ, নরকবাস, বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া, মালিনী, নৃত্যনাট্য শ্যামা, অরূপরতন, গুরু, রথযাত্রা, শিভের ভিক্ষা, তাসের দেশ*), 'ঋতুচক্র' (*অচলায়তন* - গ্রীষ্ম-বর্ষা, *বিসর্জন* – বর্ষা-শরৎ, *শারদোৎসব, ঋণশোধ* - শরৎপ্রারম্ভ, *ডাকঘর* – শরৎশেষ, *রক্তকরবী* – শীতকাল, *রাজা ও রাণী, রাজা, ফাল্গুনী, তপতী* – বসন্ত)।[৫০]

তাঁর বিভাগগুলি থেকে যে সিদ্ধান্তগুলিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া সম্ভব, সেগুলি হ'ল –

- প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাট্যের কালানুক্রমিক শ্রেণিবিভাগ করেননি। 'কাব্যনাট্য' শ্রেণিবিভাগের পরেই 'নৃত্যনাট্য' পর্যায়ের আলোচনা করেছেন। এর কারণ হিসেবে ভাবা যায় যে 'গীতিনাট্য', 'ককাব্যনাট্য এবং 'নৃত্যনাট্য' এই তিনটি বিভাগই রবীন্দ্রনাট্যের চমৎকার। তাই সেই অভিনব বিভাগগুলির আলোচনা প্রথমেই করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন।
- 'তত্ত্বনাট্য', 'ঋতুনাট্য', 'প্রহসন', 'রূপান্তরিত বা নামান্তরিত নাট্য' এই বিভাগগুলির নামোল্লেখ করেছেন যা শান্তিদেব ঘোষের বর্ণনা অপেক্ষা নতুন।
- তিনি নাট্যরীতির সঙ্গে নাট্যবস্তুর ধরণকেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই 'ঋতুনাট্য'-এর একটি পর্যায় বিনির্মাণ করেছেন। আবার, পূর্বোল্লিখিত 'রূপক-নাটক'কেই তিনি বলেছেন 'তত্ত্বনাট্য' যা প্রকারান্তরে অলংকারশাস্ত্রের ধ্বনিতত্ত্বকে স্বীকৃতি দান করে।
- একই নাট্যকে তিনি একাধিক বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তার ফলে তার প্রয়োগ এবং প্রক্রিয়া যুগপৎ আলোচিত হয়েছে। যেমন *রাজা* নাটক তত্ত্বপ্রধান উত্তম মার্গীয় নাট্যরচনা হলেও কোনও একটি বিশেষ ঋতুর আবহের জন্য সে 'ঋতুচক্রমূলক' নাট্যবিভাগেও স্থান অধিকার করেছে।
- 'ঋতুনাট্য' এবং 'ঋতুচক্র' এই দুটি বিভাগের মধ্যে প্রথমটি হ'ল বাচ্যার্থপ্রধান; তার কারণ সেখানে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যের অভিলেখ এবং দ্বিতীয়টিতে দেখানো হয়েছে কোনও একটি ঋতু কখনও 'ধ্বনি' হয়ে উঠেছে। *ডাকঘর* নাটক যদি শরতের বর্ণনা ক'রে থাকে, তবে

সেই শরতের কালিমালিপ্ত মেঘমুক্ত নীল আকাশেরই প্রতীক 'অমল'। সে অমল আকাশের অসীমকেই ধ্বনিত করে।

- প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাট্যের জন্যই গ্রন্থে তাঁর অভিজ্ঞ এবং পরিদৃপ্ত মননের সদ্ব্যবহার করেছেন। তাই নাট্যগুলির বস্তু, ধরণ ইত্যাদি নিয়ে একেকটি অধ্যায়ের গঠন যা শান্তিদেব ঘোষের রচনা অপেক্ষা ভিন্ন। তবে এই প্রসঙ্গে যে ন্যূনতম জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তা হ'ল শান্তিদেব ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের এবং রবীন্দ্রনৃত্যের শিল্পী। তাই তাঁর গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাট্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রকরণ গ্রন্থ নয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্ভাবিত 'আধুনিক ভারতীয় নৃত্য'-এর ইতিহাস এবং বিবর্তনের জন্যই রবীন্দ্রনাট্যের আলোচনায় উৎসাহী। তাই নাট্যে নৃত্যের ভূমিকা এবং ক্রমবর্ধমানতার জন্য যতখানি আলোচনা প্রয়োজন, তার বেড়াকে লঙ্ঘন করতে চাননি। অপরদিকে প্রমথনাথ বিশীর গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাট্যের খুঁটিনাটি বিষয়ের জন্যই প্রস্তুত। তাই নাট্য যদি গীতিধর্মী বা নৃত্যধর্মী হয়, তবেই তিনি 'গীতিনাট্য', 'নৃত্যনাট্য' বিভাগরচনা করবেন। যেহেতু *বাল্মীকি-প্রতিভা* গীতিনাট্য রবীন্দ্রনাট্যের আদিপর্বে অবস্থিত, তাই 'গীতিনাট্য' বিভাগটির উল্লেখ প্রথমেই করেছেন।
- প্রাচীন ভারতীয় 'প্রহসন' পারিভাষিক শব্দটি গ্রহণ করলেও সংস্কৃত প্রহসন রূপকের লক্ষণকে গুরু ক'রে তোলেননি। এক্ষেত্রে প্রাক-রবীন্দ্রযুগের মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি নাট্যকারদের প্রদর্শিত পথেই তিনি বিচরণ করতে চেয়েছেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'প্রহসন' শব্দটি হাস্যরসাত্মক নাট্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্যঙ্গার্থক দৃষ্টিকোণ (satire) থাকলেও wit এবং humor অনাদৃত নয়।

❖ **কনক বন্দ্যোপাধ্যায় :**

রবিরশ্মি গ্রন্থকর্তা অধ্যাপক তথা সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি রবীন্দ্রনাট্যবিষয়ে একাধিক গ্রন্থরচনা করেছেন। তার মধ্যে ১৩৫২ বঙ্গাব্দে (১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশিত *রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক* এবং ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে (১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশিত *রবীন্দ্র-নাট্য-সমীক্ষা* এই গ্রন্থদুটি উল্লেখযোগ্য। *রবীন্দ্র-নাট্য-সমীক্ষা* এমন একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ যেখানে *রাজা ও রাণী, বিসর্জন, মালিনী* এবং *তপতী* নাট্যের করা হয়েছে। তবে অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাট্যের বিশেষত্ব' নামে একটি উপক্রমণিকা অংশে রবীন্দ্রনাট্য বিষয়ে একটি মন্তব্য করেছেন –

তাঁহার ছোটগল্পে যেমন – 'নাহি বর্ণনার ছটা, নাহি ঘটনার ঘনঘটা' তাঁহার নাটকেও তাই। সেখানে ঘটনা অতিশয় ক্ষীণ, ঘটনাকে ছাপাইয়া একটি ভাবব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি। এই যে ভাবব্যঞ্জনা ইহা উৎকৃষ্ট কাব্যেরই একটি প্রধান

লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের নাটকে এই কাব্যলক্ষণ সুস্পষ্ট। তাই রবীন্দ্রনাথের নাটককে কাব্যধর্মী বলিতে হয়- এমনকি কোথাও কোথাও লিরিকধর্মীও বটে।[৫১]

আবার, একই সঙ্গে উচ্চারিত করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের কথা। *চিঠিপত্র : চতুর্দশ খণ্ড*-এর সংকলনে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত ১০৭ নং পত্রে পাওয়া যায় –

কাব্যের একটা বিভাগ আছেআছে যা গানের সহজাতীয়। সেখানে ভাষা কোনও নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করেনা, একটা মায়া রচনা করে,...[৫২]

উদ্ধৃতিটির মধ্যে 'গানের সহজাতীয়' অংশটির ওপর জোর দিতে হয়। পৌনঃপুনিক ন্যায়ে রবীন্দ্রনাট্য যদি 'কাব্যধর্মী' হয় এবং কাব্যের একাংশ যদি গানের সহজাতীয় রূপ পায়, তাহলে রবীন্দ্রনাট্য এবং গীতিধর্মিতার একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হয় যা সমবায় সম্বন্ধ। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে। ধরা যাক বহুশ্রুত "আজি ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়" গানটির প্রসঙ্গ। এখানে শিশুমনস্তত্ত্ব প্রতিফলিত। বালকদের মনে শরতের প্রকৃতি ধরা দিয়েছে শরতের প্রকৃতির কৈশোর স্বরূপ। সেখানে "নীল আকাশে কে ভাসালে।/ সাদা মেঘের ভেলা!" বা "যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি" এগুলি আলংকারিক নৈপুণ্যেই আলিপ্ত। মেঘ রূপ ভেলা-য় রূপক অলংকার এবং নদীর তরঙ্গের ফেনিল আবেশকে যেন মেঘ ব'লে প্রতীতি হওয়ায় উৎপ্রেক্ষা অলংকার। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বসমীক্ষায় অলংকারপ্রস্থানের আচার্য ভামদাহির মতে এটি আলংকারিক পারিপাট্যে শব্দার্থসহিত কাব্য। যেহেতু এই গানটি বাউল-সুরে প্রভাবিত, তাই বলা যেতে পারে যে এটি একাধারে কাব্য এবং গান কিন্তু এই এক্ষেত্রে রবীন্দ্রোক্তির দ্বিতীয় পঙক্তিটি লক্ষণীয়। সেখানে বলা হয়েছে যে ভাষা কেবলমাত্র অর্থজ্ঞাপক হবেনা; তার মধ্যে অলৌকিক আনন্দজনকত্ব থাকতে হবে। তবে আরও একটি জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীত রয়েছে – "অমল ধবল পালে"। *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থের ১২নং কবিতা এটি। এখানে প্রতি শব্দার্থ ব্যাখ্যা কাঙ্ক্ষিত নয়। এটি ঈশ্বরোপলব্ধির আত্মবাণী যা আত্মাঘাতকে পিছনে রেখে অরুণজ্যোতির নিকটে যাওয়ার প্রচেষ্টা। মেঘের অন্ধকারকে সরিয়ে সম্মুখে আলোর রেখায় জীবনতরণীকে এগিয়ে নিয়ে চলা। এখানে রবীন্দ্রনাথ-ই রূপকের আড়ালে রয়ে গেছেন। তাই এখানে এই কাব্যটি গানের সহজাতীয় হয়ে উঠতে পেরেছে। পূর্বের বালকদলের গানটির প্রতি শব্দের অর্থ প্রচ্ছন্ন এবং কিন্তু এই গানে শব্দের অর্থ আচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার কাব্যত্ব এভাবেই নাট্যে ধরা দেয়। আরও একটি বিষয় সম্পর্কে কোনওরূপ সংশয় থাকা উচিত নয় যেটি হ'ল কাব্যপাঠ বা এবং কাব্যপান। রবীন্দ্রনাথের গদ্যনাটকগুলি মঞ্চে অভিনীত হ'লে সেই সময় কুশীলবগণকে পাঠে যত্নশীল হতে হয়। দীর্ঘ সংলাপ-উচ্চারণের স্বরপ্রক্ষেপণগত মাত্রা, যতির জন্যই কাব্যধর্মিতা থেকে যাচ্ছে এমনটি অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে চাননি। তিনি কাব্যপান অর্থাৎ তার রসাস্বাদনে যদি ব্যবহারিক বা প্রাকৃত জীবনের উর্ধ্বে অপার্থিব সুখভোগের কথা বলতে চেয়েছেন। নাট্যসাহিত্য অভিনয়োপযোগী হলেও তার সাহিত্যমর্ম কোনও অংশেই খাটো নয়। রবীন্দ্রনাট্য দর্শনেও যেরূপ রসবোধ ঘটে, তেমনই একান্তে পাঠেও তদনুরূপ রসবোধ ঘটে।

❖ **কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৪-২০০০) :**

অদ্যাবধি রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী ও রবীন্দ্রসংগীতরসজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে যে ক'জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব চিরধ্যাতব্য, তার মধ্যে অন্যতম হলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বভারতীর আশ্রমে বসবাস, গুরুদেবের সঙ্গে প্রাত্যহিক সম্পর্ক এবং অধ্যাপনার ম'ত তাঁর জীবনকথার খণ্ডিতাংশ জানা গেলেও হয়ত *আনন্দধারা* ব্যতীত তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ সম্পর্কে অবগত নই। তিনি রবীন্দ্রসংগীততত্ত্ব যেভাবে উপস্থাপনা করেছেন, তা সাহিত্যগুণাঢ্য এবং শিক্ষণীয়। তবে তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ-ই তাঁর স্বামী বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে রচনা করেছেন। *রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিক* গ্রন্থটিও এমনই একটি প্রবন্ধসংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় 'রবীন্দ্র-নাটকে নৃত্য ও গীত'-এ রবীন্দ্রনাট্য সম্পর্কে বা বলা বলা ভালো গানের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাট্যের জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারি। গ্রন্থকর্তাদ্বয় নাট্যাবলির শ্রেণিবিভাগ রচনা করলেও নাট্যের প্রকৃতি অপেক্ষা নাট্যের প্রবৃত্তি নিয়েই আলোকপাত করেছেন। পরম্পরাগত ছেদ না ঘটিয়েই তিনি যে বিভাগগুলি দেখিয়েছেন, সেগুলি হ'ল 'কাব্যনাট্য', 'গীতিনাট্য', 'নৃত্যনাট্য', 'ঋতুনাট্য', 'সামাজিক নাটক', 'ইতিহাস-ভিত্তিক-নাটক', 'রূপক' এবং 'প্রহসন'।[৫৩] এখানে তিনি দুটি শ্রেণীকে নতুনভাবে উল্লেখ করেছেন যথা সামাজিক নাটক এবং ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক। সামাজিক পর্ব বিষয়ে গ্রন্থকারদ্বয় সরাসরি উল্লেখ না করলেও *গৃহপ্রবেশ, বাঁশরী* ইত্যাদি নাটক অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং ইতিহাসাশ্রিত পর্বে প্রায়শ্চিত্ত, পরিত্রাণ সহজেই চলে আসে একথা উক্ত অধ্যায়েই ব্যক্ত। এখানে 'নাট্য' এবং 'নাটক' দুটি শব্দই সচেতনভাবে নথিবদ্ধ। এর কারণ কী ? এক্ষেত্রে বলতে হয় যে রবীন্দ্রনাথের এই নাট্যগুলির প্রয়োগসাপেক্ষত্ব বাকি ঐতিহাসিক নাটক বা রূপক নাটকের থেকে অনেকাংশেই অধিক। কাব্যনাট্যগুলির দর্শন ছাড়াও পাঠ-অধ্যয়ন করার সময় পাঠক ছন্দ, যতি মেনেই পাঠ করে। তা বৈরী বাকে প্রকাশিত না হলেও মধ্যমা বাকের প্রভাবে নিজের কাছেই শ্রুতি হয়ে ধরা দেয়। তাই কাব্যনাটক না হয়ে 'কাব্যনাট্য'। গীতিনাট্যের ক্ষেত্রে গানগুলির সুর না জানা থাকলেও পাঠের সময় কবিতা-আবৃত্তির সাহায্য নিতে হয় এবং নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা বর্তমান। অর্থাৎ ক্রমটি হয় এরূপ যে শব্দার্থসাহিত্যের আহ্লাদজনক চমৎকারিত্বে কাব্য, সুরসহ গীতিরূপ-কাব্য, গীতিরূপ-কাব্য নাট্যিকতার বেষ্টনে গীতিনাট্য এবং নৃত্যপরিকল্পনায় গীতিনাট্যের নৃত্যনাট্যে রূপান্তর।

অন্যদিকে ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকগুলি পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হয় প্রথমে। রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠ্যক্রমে রূপক-নাটক বা ঐতিহাসিক নাটক সর্বাগ্রে নির্ধারিত হয়। বিশুদ্ধ কাব্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা* সেই পাঠ্যে অন্তর্গত হলেও বাল্মীকি-প্রতিভা, শ্যামা এগুলি উপেক্ষিত হয়ে যায়। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতায় রবীন্দ্রসাহিত্যবিষয়ক দ্বি-বাৎসারিক পাঠ্যক্রমের তৃতীয় পত্রে *চিত্রাঙ্গদা* পাঠ্য হলেও *রক্তকরবী, ডাকঘর, বিসর্জন, তপতী* প্রধানভাবে বিবেচিত। এমনকি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপক-নাটকগুলিই স্নাতক স্তরে পাঠ্যক্রমের জন্য ধার্য হয়। রবীন্দ্রতত্ত্বের বোধনের জন্য কেবলমাত্র এই নাটকগুলিই উদাহরণ একথা স্বীকারের কোনও নির্বিবাদী প্রমাণ নেই। এক্ষেত্রে প্রয়োগবৈচিত্র্যই প্রধান কারণ। *রাজা, অচলায়তন* ইত্যাদির সঙ্গে *ফাল্গুনী* সমবাচী হলেও এটি গীতিবহুল নাট্যকাব্য। তাই এই নির্দিষ্ট ডিগ্রি কোর্সের জন্য এটি বিবেচিত হয়না। হয়ত প্রসঙ্গক্রমে এগুলি পাঠ্য হলেও মুখ্য নয়। তাই

রবীন্দ্রনাট্যের প্রয়োগ বা প্রচারগত দিকের দুটি ভেদরেখা তীব্র হয়ে উঠেছে। সেটি প্রাতিষ্ঠানিকতার জন্যই সুস্পষ্ট। প্রথমটি হ'ল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রবীন্দ্রসাহিত্য বিভাগ পাঠ্যক্রম এবং অনুশীলন। দ্বিতীয়টি হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংস্থার সংগীত বিভাগের পাঠ্যক্রম এবং অনুশীলন। প্রথম ভাগে রূপক-নাটক, ঐতিহাসিক নাটকগুলিই চর্চিত হয় এবং দ্বিতীয় ভাগে *বাল্মীকি -প্রতিভা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা* চর্চিত হয়। বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিতে পাই –

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে মনের চলাটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন!... তাই এগুলি একটু কাব্য-ঘেঁষাকাব্য-ঘেঁষা। ... সেই জন্যই বোধহয় তাঁর কোনও নাটক রঙ্গমঞ্চে রজতজয়ন্তীসপ্তাহ অতিক্রম করেনি এবং তিনিও সেভাবে পেশাদারী মঞ্চে নাটককে টেনে নিয়ে যাননি।[৫৪]

এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে এখানে তিনি গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যের কথা বলতে চাননি। *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য* -এ শান্তিদেব ঘোষ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের *নটীর পূজা*-র অভিনয় থেকে শুরু ক'রে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের *শ্যামা* পর্যন্ত সকল নৃত্যনাট্যগুলির অভিনয়ের স্থান-কাল-পাত্রের বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে এও দেখা যায় বঙ্গে বা বহির্বঙ্গে এমনকি সিংহল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি অভিনীত হয়েছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের ভবলোকের জীবদ্দশায় নৃত্যনাট্যগুলি পেশাদারী মঞ্চেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যর পরে শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় *রাজা, ডাকঘর* অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু বর্তমান সময় পর্যন্ত গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যগুলির মঞ্চায়নগত প্রসার অনেকখানিই বেশি। এর কারণ হিসেবেও বলতে পারা যায় যে সংগীতশিশিক্ষু অধ্যেতার সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সংগীতপ্রতিষ্ঠানে নৃত্যনাট্যগুলির মঞ্চায়নের পূর্বে যে রবীন্দ্রনাথ এবং রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতির প্রস্তাবনামূলক পাঠদান করা হয় এমনটি নয়। কোথাও তার ব্যবস্থা বা পরিকাঠামো থাকলেও নৃত্যের প্রশিক্ষণকেই গুরুতর ক'রে তোলা হয়। তারও একটি সামাজিক কারণ হ'ল রসজ্ঞ প্রেক্ষক সেই নৃত্যনাট্যের দর্শন করতে আসেন গান এবং নৃত্যের সুশীল উপস্থাপনার জন্যই; রবীন্দ্রমননের অনুধ্যানের জন্য নয়। তাই রূপক-নাটকগুলি রূপকনাট্যরূপে যতখানি জনসমর্থন লাভ করেছে, তার থেকে গীতিনাটকের 'গীতিনাট্য' রূপে বিকশিত হওয়ার পথখানি অপেক্ষাকৃত মসৃণ ছিল।

তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিক গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাট্যের বিশ্লেষণে একটি দ্বারের উদ্ঘাটন করে। সাহিত্য এবং প্রয়োগ যা ভরত মুনির ভাষায় 'দৃশ্যশ্রব্যকাব্য', তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হতে পেরেছে রবীন্দ্রকাননে প্রস্ফুটিত নাট্যকুসুমের সমারোহেই।

❖ **উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৯৯-১৯৭০) :**

রবীন্দ্রসাহিত্যানুসন্ধানী আরও একজন গবেষক তথা প্রাবন্ধিক হলেন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা* তাঁর অতুলনীয় রবীন্দ্রব্যাখ্যাসন্দর্ভ গ্রন্থ। বৈশাখ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দে (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম প্রকাশিত এই গ্রন্থটি ১৪১৯ বঙ্গাব্দে (২০১২ খ্রিস্টাব্দে) সপ্তম পরিমার্জিত সংস্করণের মাধ্যমে যাত্রা সম্পূর্ণ করে। এই গ্রন্থটির

লক্ষ্য রবীন্দ্রনাট্যের পরিক্রমণ। তাই যে অক্ষরেখায় এর রবি-পরিক্রমা চলেছে, সেই পথেই রবীন্দ্রনাট্যের শ্রেণিবিন্যাস, নাট্যবস্তু, নাট্যসংরূপ ইত্যাদি বিষয় অবলোকন করা গেছে। গ্রন্থসূচনায় 'রবীন্দ্রনাট্যের স্বরূপ' নামের ভূমিকায় তিনি সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপ যথা কাব্যের সঙ্গে নাট্যের প্রভেদ বর্ণনা করেছেন। এই বিলক্ষণতার কারণ সাহিত্যে নাট্যদর স্থাননির্ণয়ের জন্য নয়; বরং রবীন্দ্রনাট্যের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের জন্যই এই বক্তব্যের আরম্ভ। তিনি কাব্য সম্পর্কে বলেছেন –

কাব্য কবিমনের ভাব-কল্পনা ও অনুভূতির রূপায়ণ। মহাকাব্যে চরিত্রসৃষ্টির প্রসার আছে বটে, কিন্তু চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া কবির নিজস্ব ভাবাবেগ ও কল্পনাই উৎসারিত হয়।[৫৫]

অর্থাৎ কাব্য হ'ল প্রাকৃতবাদ (naturalism) শিল্পের পরাকাষ্ঠা। সেখানে কবিগত বৈদগ্ধ্য ভঙ্গীভণিতি-ই উৎকর্ষতার হেতু। অপরদিকে নাট্যসাহিত্য হ'ল –

নাটকের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, পরিবেশ নির্দিষ্ট, অভিব্যক্তির দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একটা চলমান ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া নর-নারীর ভাষণ ও কার্য দ্বারা যে রূপটি ফুটিয়া ওঠে, তাহাই নাটকের নির্দিষ্ট রূপ। নাট্যকারের কোনও স্থান নাই-কোনও বিশ্লেষণ, মন্তব্য বা অসংবদ্ধ কল্পনাবিলাসের অবসর সেখানে নেই।[৫৬]

অর্থাৎ নাট্যসাহিত্য হ'ল যথাস্থিতবাদের (realism) উদাহরণ। সেখানে কবিত্ববিকাশের অবকাশ নেই। এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ক'তখানি অনুধাবন করেছিলেন, তার জন্য পূর্বেই উল্লিখিত *বিসর্জন* নাটকের ভূমিকায় *রাজা ও রাণী* সম্পর্কে সমালোচকদের "লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি" মন্তব্যটিকে গ্রহণ করতে পারি। তাই বস্তুজগতের চরিত্র যেরূপে জৈবিক ক্রিয়া সম্পাদন করে, সেরূপে যদি নাট্যসাহিত্যের চরিত্ররাও বিচরণ করে, তবে তাকে 'লিরিক'-এর মিতব্যয়ী দৃষ্টান্ত ব'লে গণ্য করতে পারি। একথাই গ্রহণ করতে হ'লে নাট্যে কাব্য, গানকে বর্জন করতে হবে। পরিদৃশ্যমান জগতে কোনও ব্যক্তি কথ্যভাষার সঙ্গে অবিচ্ছেদী কবিতা আবৃত্তি করেনা। তাহলে এই নিয়মানুযায়ী অধিকাংশ রবীন্দ্রনাট্য-ই 'নাট্য' বা 'নাটক'-এর শংসাপত্র লাভে ব্যর্থ হয়। তাই উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞগণ এটিই বলতে চেয়েছেন যে রবীন্দ্রনাট্যের বাস্তবিক অভিধা হওয়া উচিত – রবীন্দ্র-নাট্যকাব্য। 'কাব্যনাট্য' নামাত্মক বিভাগটি কি তবে বৈধ ? তার উত্তরে বলতে হয় রবীন্দ্র-নাট্যকাব্যের গাঠনিক সূত্র অনুসারেই এই বিভাগগুলি বৈধ। *মানসী* কাব্যগ্রন্থের 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতাটির সাপেক্ষে *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যের তুলনা করলে যে সাদৃশ্যটি দেখা যায়, তা হ'ল উভয় ক্ষেত্রেই একাধিক চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি বর্তমান। তাহলে কবিতাটিকে নাটক' বলতে বাধা কোথায়? তার প্রত্যুত্তরে বলতে হয় *ভগ্নহৃদয়* -এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অতিশয়োক্তি অলংকারের প্রয়োগগুলি। 'কাঁটা' বা দ্বন্দ্ব নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ কবিতায় লক্ষ্যিত হয়না। বর এবং কনের মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান এর বিষয়। আবার এও মনে হয় যে কবিত্ব এবং বাস্তবিক বোধের একটি প্রাচীর এই কবিতা। তাই *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যে একটি নির্দিষ্ট পরিণতির উদ্দেশ্যসাধনেই চিত্রাঙ্গদা, অর্জুন, মদন, বসন্ত এবং অন্যান্য চরিত্রের আগমন। অনঙ্গকল্যাণে চিত্রাঙ্গদা ললিললাবণ্যময়ী রূপশ্রী লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় তার আচরিত ব্যক্তিত্ব। তাই নাটকীয় দ্বন্দ্বের চরমতম অবস্থা যা ভারতীয় নাট্যতত্ত্বে 'গর্ভসন্ধি'

নামে পরিচিত, তার রেখাজাল বিস্তৃত। নিয়তিকৃতনিয়মরাহিত্য-ই যে শাশ্বত কাব্য, তা মম্মটভট্ট জানিয়েছেন *কাব্যপ্রকাশ*-এর মঙ্গলাচরণ শ্লোকেই – "নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরন্ত্রাং"[৫৭]। তাই বস্তুজগতের থেকে ব্যতিক্রমী এই সৃষ্টি উত্তম কাব্যকৃতি। যেহেতু বাংলা নাট্যে রবীন্দ্রনাথের প্রাক্কালেও তারাচরণ শীকদারের *ভদ্রার্জ্জুন* নাটক উপস্থিত ছিল যা আগাগোড়া ছন্দোবদ্ধ কবিতায় রচিত, তাই রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে এই ধারার উত্তরসূরি। তিনি নাট্যবস্তুকে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। যদিও *চিত্রাঙ্গদা*-র মূল উৎস বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর আদিপর্বের 'অর্জুনবনবাস অধ্যায়', তবুও রূপের পরিবর্তনের ম'ত নতুন উপাদানের সংযোজনে এটি কাব্য আখ্যায়িত হলেও "নাটকের মত নাটক" থেকে বহুযোজন দূরবর্তী। তাই রবীন্দ্রনাট্যের কোন্ বিভাগে *চিত্রাঙ্গদা*-কে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা সমীক্ষণসাধ্য। এর উৎস *মহাভারত* একটি ইতিহাসবেদ হয়েও শ্লোকবদ্ধকাব্য। সেখান থেকে কয়েকটি চরিত্রের ম'ত প্রাথমিক উপাদানের আনুকূল্যে ঘটিত বৃত্তমুখী নাট্যদ্বন্দ্ব বর্তমান। সেই নাট্যদ্বন্দ্বের পরিবেশনরীতি কাব্যধর্মী। *চিত্রাঙ্গদা* কবিতায় রচিত হলেও তা গদ্যত্মক পদ্যে রচিত। যেমন ধরা যাক শেষ দৃশ্যের চিত্রাঙ্গদার আত্মপ্রকাশের উক্তিটি –

আমি চিত্রাঙ্গদা । রাজেন্দ্রনন্দিনী ।
হয়তো পড়িবে মনে, সেই একদিন
সেই সরোবরতীরে শিবালয়ে দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আভরণে
ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তনু ।[৫৮]

এখানে ক্রিয়াপদ 'পড়িবে' যদি 'মনে'-র পরে বসত তবে পদ্যগন্ধ থাকত না , আবার 'করি' শব্দটির স্থানে 'ক'রে' ব্যবহার করা হ'লে এবং বাক্যের শেষে থাকলে পুরোপুরিই পদ্যাত্মকতাকে কাটিয়ে উঠতে পারত। আবার *ডাকঘর* রূপক-নাটকের ঠাকুরদার উক্তিতে ক্রৌঞ্চদ্বীপের নীল পাহাড়ের বর্ণনা দেখা যায় এভাবে –

নীল পাহাড়েই তো তাদের বাসা। সন্ধের সময় সেই পাহাড়ের উপর সূর্যাস্তের আলো এসে পড়ে আর ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ রঙের পাখি তাদের বাসায় ফিরে আসতে থাকে – সেই আকাশের রঙে পাখির রঙে সে এক কাণ্ড হয়ে ওঠে।

...

বিলক্ষণ! ঝরনা না থাকলে চলে! একেবারে হীরে গালিয়ে ঢেলে দিচ্ছে। আর, তার কি নৃত্য! নুড়িগিলোকে ঠুং-ঠাং ঠুং-ঠাং করে বাজাতে বাজাতে কেবলই কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ করতে করতে ঝরনাটি সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। কোনো কবিরাজের বাবার সাধ্য নেই তাকে একদণ্ড কোথাও আটকে রাখে। পাখিগুলো আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ একটা মানুষ বলে যদি একঘরে করে না রাখত তা হলে ঐ ঝরনার ধারে তাদের হাজার হাজার বাসার একপাশে বাসা বেঁধে সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিতুম।[৫৯]

এই ধরণের গদ্যের সঙ্গে *লিপিকা* -র তুলনা করতে পারি। *লিপিকা* কাব্যগ্রন্থ **১৯২২** খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও কবিতাগুলি **১৯১৮-১৯২২** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত। *লিপিকা* -র প্রথম ভাগের প্রথম কবিতা 'পায়ে চলার পথ'-এ দেখা যায় –

এই তো পায়ে চলার পথ।

এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে, খেয়া-ঘাটের পাশে বটগাছ-তলায়; তার পরে ও পারের ভাঙা ঘাট থেকে বেঁকে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে; তার পরে তিসির খেতের ধার দিয়ে, আমবাগানের ছায়া দিয়ে, পদ্মদিঘির পাড় দিয়ে, রথতলার পাশ দিয়ে, কোন্ গাঁয়ে গিয়ে পৌঁচেছে জানি নে।[৬০]

এগুলি গদ্যে লেখা হলেও আসলে যে এগুলি কবিতা-ই; তা জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ *পুনশ্চ* কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় – "ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি - বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ[৬১]। *ডাকঘর* -এর ক্ষেত্রে ভীরুতা না থাকলেও শান্তিনিকেতনে অভিনয়সুবিধার্থেই হয়ত এই বাক্যবন্ধগুলিকে প্রত্যক্ষ কবিতায় রূপ দেওয়া হয়নি। ঠাকুরদা চরিত্রে অভিনয় করতেন স্বয়ং কবিগুরু। তাই তাঁর পক্ষে কবিতার আবৃত্তি আয়াসসাধ্য না হলেও কাব্যনাট্যের পুনরাবৃত্তি চাইতেন না ব'লেই হয়ত তিনি রূপক-নাটকগুলিকে পদ্যকাব্যাত্মকের ছাঁচে প্রস্তুত করেননি। তবুও কাব্য-অনুষঙ্গ রয়েই গেছে এই নাটকগুলিতে। তাই তাঁর মতে শ্রেণিবিভাগগুলি হ'ল যথাক্রমে ক) সংগীতপ্রধান গীতিনাট্য, খ) কাব্যপ্রধান কাব্যনাট্য, গ) কাব্য ও নাটকের সমন্বয়ে রোমান্টিক ট্র্যাজেডি, ঘ) ভাব বা তত্ত্বপ্রধান রূপক-সাংকেতিক নাটক, ঙ) সামাজিক পরিবেশমূলক সামাজিক নাটক, চ) কৌতুকপ্রধান কৌতুকনাট্য, ছ) ঋতুআশ্রয়ী ও গীতপ্রধান ঋতুনাট্য এবং জ) নৃত্যপ্রধান নৃত্যনাট্য[৬২]। এখানে চতুর্থ বিভাগটি একেবারেই নতুন একটি বিভাগ। ইতঃপূর্বে প্রমথনাথ বিশীকৃত রবীন্দ্রনাট্যবিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে *রাজা ও রাণী, বিসর্জন* এবং *মালিনী*-কে কোনও বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। শান্তিদেব ঘোষ এগুলিকে 'থিয়েটারি আদর্শে রচিত নাটক' বলতে চেয়েছেন। অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাট্যচতুষ্টয়কে একত্রিত ক'রেই গ্রন্থপ্রবর্তনা করেছিলেন কিন্তু এগুলিকে কাব্য এবং নাটকের মিলনে সৃষ্ট 'রোমান্টিক ট্র্যাজেডি' নামক বিভাগের নির্মাণের জন্য উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিশেষত্ব রয়েছে। *রাজা ও রাণী* এবং *চিত্রাঙ্গদা* যে একই গোত্রীয় নয় তার প্রমাণ এখান থেকে পাওয়া যায়। এই পার্থক্য রসগত-ই, নয়; বস্তুগত-ও। *রাজা ও রাণী, বিসর্জন* পঞ্চাঙ্ক রীতি মেনে রচিত। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের রূপক বিশেষ 'নাটক'-এর লক্ষণগুলি এখানে অনুসৃত বা পাশ্চাত্য রীতির Aristotle-এর ট্র্যাজেডি ভাবনার অনেকখানিই কাছাকাছি[৬৩]। তার সাপেক্ষে *চিত্রাঙ্গদা, গান্ধারীর আবেদন* এগুলি অনেকখানিই ভিন্ন। এই ভিন্নতার কারণ 'কাব্যনাট্য' বিভাগভুক্ত নাট্যগুলির নাট্যবীজকে কেন্দ্র ক'রেই ইতিবৃত্তের অবতারণা। *কর্ণকুন্তীসংবাদ*-এ কর্ণের দানবীরত্বের জন্যই কুন্তী চরিত্রের আনয়ন। *চিত্রাঙ্গদা* -তে রূপ-অরূপের দ্বন্দ্বের জন্যই কাহিনির অবতারণা কিন্তু *বিসর্জন* নাটকে লক্ষ্য করা যায় যে ট্র্যাজেডি-র নায়ক রঘুপতি নয়। তার ভাগ্যবিপর্যাস ঘটেনি। দুরাচারী এই চরিত্রের পরিণাম অবশ্যম্ভাবী ছিল কিন্তু জয়সিংহ অপর্ণার সান্নিধ্যে মুক্ত হতে পারত রঘুপতির পাশবিক একতন্ত্রপরায়ণতার থেকে। তবুও তার প্রথাবদ্ধ সংস্কার তাকে মুক্ত করতে দেয়নি।

তাই ট্র্যাজেডি-র নায়ক সে নিজেই। এখানে unity of plot, time and action ধরা দিয়েছে। তাই এই নাটকটি পদ্যে রচিত হওয়ার কারণে বাহ্যগত দিক থেকে *চিত্রাঙ্গদা*-র সঙ্গে মিল থাকলেও অন্তঃপ্রকৃতি অনুসারে পৃথক। তাহলে আবারও একটি বিষয়ের সমাধান প্রয়োজন যে কাব্যনাট্য কি প্রাচ্য বা প্রতীচ্য নাট্যতত্ত্বের লক্ষণবহির্ভূত কোনও বিশেষ নাট্যকলা ? যেহেতু পঞ্চাঙ্ক পদ্ধতিতে *বিসর্জন* উত্তীর্ণ, তাই সেটি কাব্যনাট্য হয়েও 'থিয়েটারি আদর্শ' এই বিশেষণটি লাভ করবে ? সেক্ষেত্রে বলতে হয় চতুর্বিধ অভিনয়ের প্রসঙ্গ। আঙ্গিকের ব্যবহার রূপকে আবশ্যক। এই আঙ্গিক অভিনয় বা রসসূত্রের অনুভাব হ'ল ক্রিয়া (action) । *বিসর্জন* নাটকে সেটি যেভাবে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ রয়েছে, *চিত্রাঙ্গদা*-তে তা নেই। সেটির স্তম্ভ বাচিক অভিনয়। তাই উভয়ের একমার্গে বিচরণ করা সম্ভব নয়।

তাই *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা* গ্রন্থটির সৌজন্যে রবীন্দ্রনাট্যের বিভিন্ন বিভাগের একটি সামগ্রিক ধারণা যেমন হয়, তেমনই নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে আসা যায় –

- রবীন্দ্রনাট্যের মধ্যে নাটকীয়ত্ব এবং কাব্যের গৌরব উপস্থিতি।
- রবীন্দ্র-কাব্যনাট্য দু'ভাগে বিভক্ত – শাস্ত্রীয় এবং আহ্লাদনীয় বা অভিনেয় এবং পঠনযোগ্য।

❖ অমিয়কুমার সেন (১৯১৯-১৯৭৭) এবং নীলিমা সেন (১৯২৮-১৯৯৬) :

পাঠভবন, বিশ্বভারতীর পূর্বতন অধ্যক্ষ অমিয়কুমার সেন এবং রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী নীলিমা সেনের যৌথভাবে রচনা *সুরের গুরু* । ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থে দুটি অধ্যায় এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক – রবীন্দ্রনাট্যের গানে আশ্রম পরিবেশ এবং রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যনাট্য। অবশ্য প্রথমেই ব'লে রাখা দরকার যে এখানে গীতিপ্রধান রবীন্দ্রনাট্যের সাংগীতিক গুণাগুণের বিচার-ই প্রবন্ধদুটিতে ধরা দিয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাট্যের স্বরূপ ও বিশ্লেষণ এখানে ব্রাত্য। তবে উপরিউক্ত অধ্যায়দুটির মধ্যে প্রথমটিতে রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যকে 'গীতিনাট্য' বলা হয়েছে – "“নবীন”, “ফাল্গুনী”, “বসন্ত” – এই গীতিনাট্যগুলির গানের মধ্য দিয়ে বসন্তের উচ্ছল বর্ণসম্ভারকে ধরে রাখা হয়েছে।... “শেষ বর্ষণ” গীতিনাট্যের সর্বশেষ গানে বর্ষার বিদায় এবং শরতের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়”[৬৪]। এক্ষেত্রে অনুমান করা যায় যে কোনও নির্দিষ্ট তত্ত্বব্যাখ্যার লক্ষ্য না থাকার জন্যই গ্রন্থকারদ্বয় 'গীতিনাট্য' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। যদি রবীন্দ্রনাট্যের গোত্রবিচার তাঁদের করণীয় থাকত, তবে এই বিশেষণ প্রয়োগ করতেন না। এর তুলনায় উল্লিখিত দ্বিতীয় অধ্যায়টি অনেকখানিই সংহত এবং পরিমিত। সেখানে গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যের পূর্ণ প্রভেদ দর্শিত – "“নৃত্যনাট্য” কথাটি যেমন তাঁরই উদ্ভাবিত, “নৃত্যনাট্য” রূপে নতুন সাহিত্যসৃষ্টিও তাঁরই প্রতিভার দান[৬৫]। এই বাক্যদ্বয়ের অপরিসীম গুরুত্ব। কারণ, গীতিনাট্য বা গানপ্রাচুর্যের নাট্যশৈলী বাংলাতে প্রাক্-রবীন্দ্রকালেও বর্তমান ছিল কিন্তু নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব স্বাক্ষর রয়েছে। তাই বলা যেতে পারে *চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা* এবং *মায়ার খেলা* এই চারটি নৃত্যনাট্যের জন্যই হয়ত রবীন্দ্রনাথের বহুদিনের প্রয়াস ছিল। তাই সেই অভিলাষ ঋতুনাট্য, কথিকায় আকার পেয়েছে। তাই বলা যেতে পারে যে ঋতুনাট্য একটি বিশেষ বিভাগ

হলেও এটি নৃত্যনাট্যের বিবর্তনের ইতিহাসের একটি অধ্যায়। অর্থাৎ নৃত্যনাট্যের ঐকান্তিক প্রয়াস জন্ম দিয়েছে ঋতুআশ্রয়ী সাংগীতিক নাট্য।

❖ **পবিত্র সরকার (১৯৩৭-বর্তমান) :**

বহু ভাষাবিদ, সাহিত্য-সমালোচক অধ্যাপক তথা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকার বর্তমান সময়ের অন্যতম রবীন্দ্রতত্ত্ববিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তাঁর *নাটমঞ্চ নাট্যরূপ* গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ পর্বে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধজুড়ে রবীন্দ্রনাট্য সম্পর্কে তত্ত্বপ্রধান (theoretical) আলোচনা ব্যাখ্যাত হলেও প্রয়োগবিষয়ে (practical) নীরব থেকেছেন। 'নাটকীয় : রবীন্দ্রভাবনা' অধ্যায়ের তাঁর উপজীব্য ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি নাট্যের সূচনা অংশের রবীন্দ্রবচনের ঔচিত্যবিচার। তিনি সেখানে রবীন্দ্রনাট্যকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন কালানুক্রমিকতার রেশ ধরেই। প্রথমটি হ'ল প্রাথমিক নাট্যাদর্শ যা শেক্সপিয়ারের দ্বারা প্রভাবিত এবং দ্বিতীয়টি হ'ল মৌলধর্মের গীতিকবিতা। প্রথমটির মধ্যে রয়েছে *রাজা ও রাণী বিসর্জন, মালিনী* জাতীয় নাটক। দ্বিতীয়টি *শারদোৎসব* থেকে শুরু ক'রে *রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, গৃহপ্রবেশ, রক্তকরবী, কালের যাত্রা পর্যন্ত*।[৬৬] তবে এই দ্বিতীয় পর্বের কয়েকটি হ'ল 'গীতিবহুল ভাবসত্যমূলক নাটক' বা 'পালা'। কয়েকটি নাটকের আভ্যন্তরীণ নজির থেকে প্রমাণ করেছেন যে এগুলি বাংলার যাত্রাগানের সমতুল্য 'পালা'। এর মধ্যে *ফাল্গুনী* (বসন্তের পালা), *রক্তকরবী* (মানবীর পালা), *বসন্ত* (পলাতকার পালা), *নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা* অন্যতম। এ সম্পর্কে পবিত্র সরকার মনে করেন "গদ্য সংলাপ পালাগুলির ফ্রেমের মতো"[৬৭]। আবার 'রবীন্দ্রনাথের নাটক' প্রবন্ধে তিনি আরও এক প্রকার শ্রেণিবিভাজন করেছেন। যথা ব্যক্তি ও ব্যক্তির সংঘাতমূলক নাটক (*মায়ার খেলা, রাজা ও রাণী, চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, রাজা* ইত্যাদি), ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শের সংঘাতমূলক নাটক (*অচলায়তন, রক্তকরবী, নটীর পূজা, কালের যাত্রা* ইত্যাদি) এবং ব্যক্তি ও বিশ্বনিসর্গের দ্বন্দ্বমূলক নাটক (*শারদোৎসব, ডাকঘর, ফাল্গুনী, বসন্ত, শেষ বর্ষণ* ইত্যাদি)[৬৮]। এই বিভাগে প্রাবন্ধিক কালানুবর্তিতাকে অননুসরণ করলেও দেখা যাচ্ছে এই তিনটি পর্যায়ও তাঁর জীবনরেখার সমীকরণেই অবচেতন মনের ফসল। জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির শৃঙ্খলময় জীবনের প্রতিফলন এসে পড়েছে এক ব্যক্তির সঙ্গে আরেক ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক বিভেদমূলক নাটকে। সেখানে প্রশ্নহীন আনুগত্যের বাতাবরণ *বিসর্জন*-এ লক্ষণীয়। আবার, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের নীতিগত আদর্শ *অচলায়তন, রক্তকরবী* নাটকে একটি সত্তা তৈরি করেছে। একই সঙ্গে ঋতুপ্রধান নাটকগুলি যা পবিত্র সরকারের ভাষায় বিশ্বনিসর্গের সঙ্গে ব্যক্তির ব্যবধানমূলক নাটক সেগুলি শান্তিনিকেতনের উদার প্রকৃতির মন্দ্রধ্বনি ব্যতীত সম্ভব ছিলনা। তাই তাঁর জীবনবেদ-ই বিভিন্ন সময়ের উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নাট্যসৃজনশীলতায়। সুতরাং বলা যায় যে তিনি তথাকথিত 'ঋতুনাট্য', 'গীতিনাট্য' শব্দগুলিকে কিঞ্চিৎ বিরতি দিয়ে একটি স্বাধীন অভিধা দিয়েছেন। অর্থাৎ গানের প্রতুলতায় এগুলিকে গীতিনাট্য হিসেবে মঞ্চায়িত করা হলেও রবীন্দ্রবার্তা কোনও অংশেই হীন নয়। *ডাকঘর* এবং *ফাল্গুনী* -র মধ্যে গঠনশৈলীর বিরূপতা থাকলেও মৌল ভাবনা একই পন্থী।

❖ **সৌমিত্র বসু :**

বর্তমান সময়ের বহুশ্রুত অভিনেতা তথা নাট্যসংগঠক ব্যক্তিত্ব হলেন সৌমিত্র বসু। তাঁর রবীন্দ্রনাটকের নির্মাণ শৈলী: উনিশ শতক এই আলোচনায় হৃদয়ঙ্গম গ্রন্থ। তবে এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাট্যের মধ্যে গীতিনাট্য, পঞ্চাঙ্ক-রীতি-অনুসৃত নাটক, কাব্যনাট্য এবং হাস্যরসাত্মক নাট্যগুলিই আলোচিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বিরচিত রবীন্দ্রনাট্যগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে – 'উন্মেষ পর্ব' (*রুদ্রচণ্ড, বাল্মীকি-প্রতিভা* – ১ম সং, *কালমৃগয়া, প্রকৃতির প্রতিশোধ, নলিনী, বাল্মীকি-প্রতিভা* – ২য় সং), 'প্রথানুগত্যের পর্ব' (*মায়ার খেলা, রাজা ও রাণী, বিসর্জন*) এবং 'প্রত্যাবর্তন পর্ব' (*চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ, মালিনী, বৈকুণ্ঠের খাতা*)[৬৯]। এই বিভাগের আভাস পূর্বেই পেয়ে থাকলেও লক্ষণীয় তিনি তিনটি গীতিনাট্যকে একই পর্যায়ে রাখতে চাননি। তবে এক্ষেত্রে সৌমিত্র বসুর প্রতিটি বিভাগের নামকরণ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি বিভাগের উপসংহার অংশে কিছু তথ্য এবং তত্ত্বজ্ঞান করতে পারি। 'উন্মেষ' পর্বে তিনটি গীতিনাট্যের আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি *বাল্মীকি -প্রতিভা* -র দুটি সংস্করণকে দুটি পৃথক রচনারূপেই স্বীকার করতে চান। এক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় হ্বাগনরের প্রভাবকে মানতেই উৎসাহী। 'বাল্মীকি-প্রতিভার ১ম সংস্করণ' পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন –

'সুরে নাটিকা' স্পষ্টতঃই হ্বাগনাগারের Music drama-র অনুবাদ। ১৮৭৬ সালের অগস্ট মাসে ন্যুরনবার্গের কাছে ব্যেরুথে হ্বাগনাগারের থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়, শুরু হয় অসামান্য জনপ্রিয় প্রযোজনা The Ring । ১৮৭৮-৭৯ সালে, রবীন্দ্রনাথ যখন ইংল্যণ্ডে, তখন হ্বাগনাগারীয় অপেরা য়ুরোপে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই জনপ্রিয়তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ না করার কোন কারণ নেই। 'বাল্মীকি প্রতিভা' যে হ্বাগনাগারীয় ধরণে কথা, সুর ও শরীরের সুসমঞ্জস প্রয়োগের কথা মনে রেখে লেখা তাই শুধু নয়, এই নাট্যাচার্যের মতই তিনি বিষয় হিসেবে বেছে নিচ্ছেন কোন পুরাণকথা বা কিংবদন্তী,..[৭০]

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র থেকে জানতে পারি তিনি পাশ্চাত্য নর্তনকৌশলের অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন। তার মধ্যে ছিল round dance, square dance, lancers, valse, quadrille, gallop, polka[৭১]। অথচ তাঁর উন্মেষ পর্বের গীতিনাট্যগুলিকে অপেরার বঙ্গীকরণ ব'লে উল্লেখ করেননি। তাই *বাল্মীকি-প্রতিভা* এবং *কালমৃগয়া*-র তৎকালীন পরিবেশনা থেকে বর্তমানের গবেষকরা মনে করেন যে এগুলিতে অপেরার বহুমুখী অনুসরণ ঘটেছে।

তবে যেহেতু 'উন্মেষ পর্ব'-এ *রুদ্রচণ্ড, প্রকৃতির প্রতিশোধ*-এর রচনাও অন্তর্ভুক্ত, তাই এই সবক'টি নাট্যরচনার বিষয়ে গ্রন্থকারের মতসংগ্রহ প্রয়োজন। এই পর্বের পাঁচটি নাট্যকৃতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য –

'উন্মেষ পর্বে'র প্রত্যেকটি নাটক নির্মাণেশৈলীতে অন্যের থেকে আলাদা। এর কারণ হ'ল, এই বিশেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ নানা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বুঝে নিতে চাইছিলেন, নাটকের নির্মাণে কোন্ শৈলী তাঁর পক্ষে গ্রহণীয় হবে।[৭২]

রুদ্রচণ্ড, বাল্মীকি-প্রতিভা এবং *কালমৃগয়া* -তে ভারত-ইতিহাস এবং আদিকবি বাল্মীকির কাব্য *রামায়ণ* উৎস না হয়ে নাট্যনির্মাণের ভিত্তিবেদী হয়েছে। *কালমৃগয়া* গীতিনাট্যে তিনি যতখানি বাল্মীকীয় রামায়ণকে মান্যতা দিয়েছেন, ততোধিক ঋণী হয়েছেন মহাকবি কালিদাসের কাছে। কালিদাসের মহাকাব্য *রঘুবংশ* -এর নবম সর্গ 'মৃগয়াবর্ণন'-এর ঘটনাক্রম *কালমগৃয়া* গীতিনাট্যে অনুসৃত হয়েছে। রাজা ও অনুচরদের মৃগয়ার জন্য বেশধারণ, বনদেবতাদের সেই রূপদর্শন, অরণ্যে প্রবেশ, মৃগয়া, মুনিপুত্রের প্রতি বাণনিক্ষেপ, তার মৃত্যু এবং দশরথের প্রতি অভিসম্পাত।[৭৩] তাই এই উন্মেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনার নেপথ্যে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা একটি বৃহত্তর ভূমিকা পালন করেছে। সৌমিত্র বসু যেভাবে এই পর্বের প্রাথম্য স্বীকার করেছেন, সেভাবে দেখলে দেখা যায় –

- নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য অপেরার দ্বারা অনুপ্রাণিত।
- নাট্য-উৎস নির্বাচনে তিনি প্রাচীন ভারতের আলংকারিক মহাকাব্য, ইতিহাস ইত্যদি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন।
- নাট্যের প্রয়োগবিষয়ে নানা পরীক্ষামূলক অভিক্রিয়ার সাহায্য নিয়েছেন।
- গান এবং "গানের ছাঁচে ঢালা নয়" এমন নাট্যকৃতি - এই দুটিকেই সম গুরুত্ব দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাট্যের দ্বিতীয় পর্বের নাম দিয়েছেন 'প্রথানুগত্যের পর্ব'। এই পর্বের সারকথা তিনি এই পর্বের উপসংহারে এভাবে বলেছেন "এই পর্বে দেখি, নাটককে মঞ্চোপযোগী ক'রে তোলার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ"[৭৪]। নাট্যকারের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন এই পর্বে নেপথ্যচারণার ভূমিকা পালন করেছে ব'লেই গ্রন্থকারের বিশ্বাস। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু, সমাজ এবং ধর্ম বিষয়ক নানা মনান্তর ঘটেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। তাই প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার একটি স্তর এই পর্বের মঞ্চোপযোগী নাটকে দেখা দিয়েছে। পবিত্র সরকার অবশ্য এ বিষয়ে পূর্বেই আপন মত প্রকাশ করেছেন। তাই ব্যক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিকতার সংঘাতমূলক নাটকে মানববাদের জয়গান-ই এই পর্বের আকর। এখানে সৌমিত্র বসু 'ছদ্ম-ঐতিহাসিক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন *রাজা ও রাণী* এবং *বিসর্জন*-এর কথাবস্তুর জন্য[৭৫]। তবে তিনি এও বলেছেন যে –

দ্বিতীয় পর্বের বিষয় প্রথম পর্বের তুলনায় অনেক বেশি সামাজিক। বাল্মীকি বা সন্ন্যাসীর তুলনায় বিক্রম, রঘুপতি বা গোবিন্দমাণিক্য পরিচিত হয়ে উঠতে পারেন।... 'উন্মেষ পর্বে'র চরিত্রগুলিকে তৈরিই করা হয়েছে একটি তত্ত্ব প্রচারের জন্য, এবং তত্ত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় তাঁদের গায়ে রক্তমাংস লাগে না; আর দুই, 'উন্মেষপর্বের'র প্রধান চরিত্রদের জীবনবিমুখতা প্রকাশ করবার জন্য তাঁদের মানবসমাজের বাইরে স্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু 'মায়ার খেলা' বাদে 'প্রথানুগত্যের পর্বে'র দু'টি নাটকেই চরিত্রদের জীবনবিচ্যুতি ঘটেছে সমাজের মধ্যে থেকেই,..[৭৬]

এছাড়াও নরনারীর 'প্রেম'কে তিনি দ্বিতীয় পর্বের অভিনবত্ব ব'লেই মানতে চান। *রাজা ও রাণী* -তে বিবাহ পরবর্তী প্রেম এবং *বিসর্জন* -এ বিবাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রেম এই দুই-ই সমপদী ছন্দে আবর্তিত। তবে *মায়ার খেলা* এমনই একটি 'গানের মালা' যেখানে প্রেম এবং প্রেমের পাত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রেম 'নিরাকার' এটি রবীন্দ্রনাথ

মানেননি এই গীতিনাট্যে। শান্তার প্রেমের পাত্র ছিল তলদেশে গভীর কিন্তু প্রমদার প্রেমের পাত্র ছিল চতুষ্কোণাকার। সেখানে যে কোনও একটি দিক থেকেই পাত্রের শুরু এবং শেষকে চিহ্নিত করা যায়। পূর্বের গীতিনাট্য দুটিতে দেখা যায় গানের সঙ্গে অঙ্গাভিনয়ের নিবিড় সম্পর্ক। *বাল্মীকি-প্রতিভা* গীতিনাট্যের দস্যুদলের গানের মধ্যে "এখন করব কি বল্", "তবে আয় সবে আয়", "কালী কালী বলো রে আজ", "এত রঙ্গ শিখেছ কোথা" ইত্যাদি গানের একটি প্রকাশভঙ্গিমা রয়েছে সুপ্তভাবে শব্দগুলির মধ্যে কিন্তু মায়ার খেলা-য় "আমার পরাণ যাহা চায়", "দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি" গানগুলি বিমূর্ত। তাই এই ধরণের গানের সঙ্গে অভিনয় হয় সংযত এবং সংহত। কাহিনির মধ্যে অমরের হৃদয় দ্বন্দ্ব-ই এটিকে নাট্যিক ক'রে তুলেছে। শান্তা এবং প্রমদার তুলনায় অমরের দ্বিধা প্রবল। তাই এখানে অমর-শান্তা-প্রমদার দ্বন্দ্ব সংঘাতে পরিণত হয়নি। যদি প্রাতিষ্ঠানিকতার কথা বলতেই হয়, তবে তা কি *মায়ার খেলা* -র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন পুরুষের দ্বিচারিতা দিক নিত্য তথা সাধারণ ঘটনা। তাই অমরের দু'দিকে শান্তা এবং প্রমদাকে দাঁড় করালে সেই তৎকালীন সমাজের একটি ঘৃণ্য চিত্র ফুটে ওঠে। তাই প্রাতিষ্ঠানিকতা যদি জড়ত্বপ্রাপ্ত কোনও অযৌক্তিক অধিকরণ হয়, তবে তা *মায়ার খেলা* গীতিনাট্যেও বর্তমান। *বিসর্জন*-এ গোবিন্দমাণিক্য এবং গুণবতীর একটি সংঘাত তৈরি হয়েছে এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী। আবার, রঘুপতি এবং অপর্ণার সংঘাত-ই ক্রমে দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হয়েছে। "এত রক্ত কেন" অপর্ণার এই উক্তি চিরায়ত প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে একটি ভীষণ কষাঘাত। সেই কষাঘাতে রঘুপতি বিচলিত না হলেও জয়সিংহের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। তাই এই সংঘাত ক্রমে প্রাচীন এবং নবীনের দ্বন্দ্বের আকার লাভ করেছে। অর্থাৎ সৌমিত্র বসুর ভাবনায় দ্বিতীয় পর্বের নাট্যনির্বাচন থেকে পাওয়া যায় –

- গীতিনাট্য এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবৃত্তিমূলক নাটকীয় বিস্তার।
- রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের নাট্যগুলি মঞ্চায়নের জন্যই নির্মিত।
- এখানে গানের বাণী অমূর্ত এবং 'সংগীতরস'-এর অমৃতপানে বিভোর।

সৌমিত্র বসুর মতে তৃতীয় ভাগটি হল 'প্রত্যাবর্তনের পর্ব'। এই পর্বের ব্যাপারে তাঁর অভিমত –

'চিত্রাঙ্গদা', 'মালিনী', এমন কি 'গোড়ায় গলদ' বা 'বৈকুণ্ঠের খাতা'তেও ঘটনা প্রাবল্য থেকে সরে এসে জোর দেওয়া হচ্ছে অন্তর্নাট্যের দিকে।[৭৭]

এই পর্বের দুটি উপবিভাগ করা যায় যার একদিকে থাকে *চিত্রাঙ্গদা* ও *মালিনী* এবং অন্যদিকে থাকে *গোড়ায় গলদ* ও *বৈকুণ্ঠের খাতা* । গানের পরিমাণের দিক থেকে *গোড়ায় গলদ* ব্যতীত বাকি নাট্যরচনা গীতশূন্য। তাই *চিত্রাঙ্গদা, মালিনী* এবং *বৈকুণ্ঠের খাতা* -য় রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্টতা লক্ষণীয় যা গানের অনুল্লেখ। অর্থাৎ এই পর্বে রবীন্দ্রনাট্যে গান হয়েছে ক্ষীণ। *মালিনী* অন্ত্যমিলের কাব্যনাট্য হ'লে *চিত্রাঙ্গদা* হয় অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাট্যবিশেষ। পাঠক সন্দেহপ্রকাশ করার আশঙ্কায় গ্রন্থকৃৎ রাজা *ও রাণী, বিসর্জন* -এর সঙ্গে *চিত্রাঙ্গদা*-র পার্থক্য দেখিয়ে দিয়েছেন –

পদ্য বটে, কিন্তু ‘চিত্রাঙ্গদা’ বা ‘মালিনী’র সংলাপকে ‘রাজা ও রাণী’ বা ‘বিসর্জনে’র সঙ্গে মেলালে চলবে না। প্রচলিত অর্থে নাটকীয় দ্বন্দ্ব এদের মধ্যে কম, এমন কি ঘটনার বর্ণনাও কম, চরিত্রগুলি বলছে তাদের গভীর উপলব্ধির কথা। তার ফলে সেইসব সংলাপ অনেক সময়েই শুদ্ধ কবিতার যতটা কাছাকাছি, নাটকের ততটা নয়।[৭৮]

উদাহরণসহযোগে বিষয়টি পরিস্ফুট করা প্রয়োজন। *বিসর্জন* নাটকের প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই মন্দিরে গুণবতী এবং রঘুপতির একটি দীর্ঘ পদ্যাকারে কথোপকথন রয়েছে। তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক –

গুণবতী ।। কুমারজননী মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃসর্গ হতে ?
...
মোর স্বামী মহাদেবসম-তবে, কোন্
দোষ দেখে আমারে করিল মহামায়া
নিঃসন্তানশ্মশানচারিণী ?
...
রঘুপতি ।। মা’র খেলা!
কে বুঝিতে পারে বলো ! পাষাণতনয়া
ইচ্ছাময়ী, সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা। ধৈর্য
ধরো! এবার তোমার নামে মা’র পূজা
হবে। প্রসন্ন হইবে শ্যামা।[৭৯]

রাণী গুণবতী একজন ভক্তের আকুতি নিয়েই মন্দিরের দ্বারে উপনীত। সেখানে রাজ্ঞী গুণবতী দেবীকে একবার বলেছে ‘কুমারজননী’, অন্যদিকে রঘুপতি বলেছে ‘পাষাণতনয়া’। এখানেই বৈপরীত্য এবং নাটকীয় দ্বন্দ্বের বীজ বপন করা হয়েছে। দেবী একাধারে কার্তিকের জননী এবং হিমালয় তথা পর্বত বা পাষাণের কন্যা। এখানে ‘পাষাণ’ শব্দের দ্বারা নির্মমতা বোঝাতে চেয়েছেন নাট্যকার। তাই মাতৃরূপ কৌশল্যা এবং কাঠিন্যের একটি ইঙ্গিত তুলে ধরা হয়েছে এই পদ্যে। অন্যদিকে *চিত্রাঙ্গদা* -য় দ্বিতীয় দৃশ্যে নবরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুনের উক্তি–

কাহারে হেরিনু ? সে কি সত্য, কিম্বা মায়া ?
নিবিড় নির্জন বনে নির্মল সরসী –
এমনি নিভৃত নিরাপদ, মনে হয়,
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সেথা বনলক্ষ্মীগণ
স্নান করে যায়, গভীর পূর্ণিমারাত্রে
সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শষ্পতটে

শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে

স্খলিত-অঞ্চলে।[৮০]

এখানে বহুবিধ ঔপম্যবাচী অলংকারের প্রয়োগ। এই অকারণ সৌন্দর্যভাবুকতা কাব্যের লক্ষণ হলেও তা নাট্যলক্ষণ নয়। যদিও কালিদাসের *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের প্রথম অঙ্কে দুষ্যন্তের শকুন্তলাকে দেখামাত্রই এরকম উপমা অলংকারযুক্ত শ্লোকাবৃত্তি করে। তবুও *বিসর্জন*-এর পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের বর্ণনা নাটকের গতিকে শ্লথ করে। গুণবতীর সংলাপ দীর্ঘ হলেও তা নাট্যবৃত্তের জন্য প্রাসঙ্গিক। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের নিয়মানুসারে তা 'বিষ্কম্ভক'। গুণবতীর সংলাপ থেকেই জানা যায় যে রাজ্যে পূজার্চনার ত্রুটি নেই কিন্তু ভক্তিপরায়ণা রাণী নিঃসন্তান। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দব্যয় এখানে নেই। তাই *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্য একারণেই 'কাব্য'। অর্থাৎ তৃতীয় পর্ব থেকে একে একে পাওয়া যায় –

- এই পর্বের নাট্যরচনায় গানের খর্বতা।
- এখানে পূর্বতন পদ্যসংলাপ থাকলেও তা নাট্যানুগ নয়; বরং কাব্যানুগ।
- শেক্সপিয়ারের কমেডির প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের কিছু সামাজিক কাহিনিমূলক নাট্যরচনা হয়েছে।

❖ **অশ্রুকুমার শিকদার :**

রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য পুস্তকের রচনাকার অধ্যাপক অশ্রুকুমার শিকদারের রবীন্দ্রনাট্যব্যাখ্যার প্রয়াস ছিল স্বতন্ত্র। উক্ত গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাট্যের শ্রেণিবিভাগ করতে চাইলেও পূর্বপদ্ধতির অনুসরণ করেননি। রবীন্দ্রনাথ একটি নাট্যরচনা ক'রে তার বিভিন্ন সংস্করণ এবং রূপান্তর সাধন করেছেন। সেই রূপান্তরগত ব্যাখ্যায় কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্যের আলোচনা উপস্থিত হয়েছে। তিনি তাঁর এই গ্রন্থে যে যে রূপান্তরগুলি দেখিয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে ছোটগল্প থেকে নাটক, উপন্যাসের নাট্যরূপান্তর, কাব্যকবিতা থেকে নাটক, গদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটক, পদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটক, গদ্যনাটক থেকে পদ্যনাটক, গীতিনাট্যের রূপান্তর এবং নৃত্যনাট্যের রূপান্তর।[৮১] এখানের মধ্যে দুটি বিভাগ নিয়ে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। কাব্যকবিতা থেকে নাটকের রূপপরিবর্তনে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন *ভগ্নহৃদয়, কবিকাহিনী* এবং *নলিনী* রচনার। তিনি মনে করেছেন *ভগ্নহৃদয়, কবিকাহিনী*-তে প্রত্যক্ষ ভাবেই একজন কবি চরিত্র উপস্থিত কিন্তু নলিনী নাট্যে এমনতর কোনও প্রত্যক্ষ কবির সন্ধান মেলে না। তবে *নলিনী* -ও যে কাব্যগন্ধশূন্য এমনটি বলা যায়না। নীরদের স্বগতোক্তির মধ্যে তিনি প্রাকৃতবাদের উপাদান পেয়েছেন। গদ্যসংলাপ হলেও শব্দজাত অর্থ জীবলোক থেকে কল্পলোকে নিয়ে যায়। তাই এখান থেকেই প্রমাণিত হয় যে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়ার বিন্যাস এবং পদ্যাত্মক কিছু শব্দ যথা 'তারি' (তার), 'লাগি' (জন্য) ইত্যাদির জন্যই একটি রচনা কাব্য হয়না। বাহ্যিকতাকে ভেদ ক'রে অন্তরে প্রবেশ করলে নাট্যস্থ পাত্রপাত্রীর উক্তির ভাববস্তু-অনুসারে গদ্যত্ব বা পদ্যত্ব নির্ণীত হয়। অথচ যদি এমনতর হয় যে কবিতা শুধুই ভাষাসৌষ্ঠবে ললিত কিন্তু কল্পিত জগতের ব্যাপারে নিরাসক্ত, সেক্ষেত্রে কী হবে? যেমন *চিত্রা* কাব্যের অন্তর্গত

'স্বর্গ হতে বিদায়' কবিতাটির উদাহরণ দিলে দেখা যায় যে সেখানে উর্বশীর আত্মকথনে কল্পলোকের আভাস নেই–

> ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা
> হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টীকা
> মলিন ললাটে।
> ....
> সে বেদনা বাজিত যদ্যপি, বিরহের
> ছায়ারেখা দিত দেখা, তবে স্বরগের
> চিরজ্যোতি ম্লান হত মর্তের মতন
> কোমল শিশিরবাষ্পে; নন্দনকানন
> মর্মরিত উঠিত নিশ্বসি, মন্দাকিনী
> কূলে কূলে গেয়ে যেত করুণ কাহিনী [৮২]

এখানেও উর্বশীর স্মৃতিপটে চিত্রিত হয়ে উঠেছে অতীতের সম্ভোগবিলাস। নন্দনকাননের ম'ত রম্যবন, পুণ্যতোয়া মন্দাকিনীর তট ইত্যাদির মাধ্যমে নিসর্গ চেতনার সুর ধ্বনিত হচ্ছে কিন্তু সেই নন্দনকানন বা মন্দাকিনীর প্রলম্বিত বিশেষণে কবিতাটির মূল লক্ষ্য অন্তরালে চলে যায়নি। এখানে 'উঠিত', 'নিশ্বসি' এগুলি পদ্যাত্মক শব্দ এবং এখান থেকে এই গদ্যরূপ বুঝে নিতে পাঠকের ক্লেশ থাকেনা। তাই এটিকে শুধুমাত্র চরণ, সমিল পঙক্তির জন্যই 'কবিতা' নামে পরিচিত করতে হবে ? এর উত্তরে বলা যায় এটি মুদ্রণ বা প্রকাশনাগত একটি প্রভিন্নতা। তাই আদর্শ নজির লিপিকা কাব্যগ্রন্থের কবিতা। আবার, পদ্য এবং কাব্য সম্পর্কে বলতে হয় উল্লিখিত *কাব্যপ্রকাশ*-এর কারিকাটি। *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যের উক্তিগুলি বস্তুজগতে বিরল হলেও কবিব্রহ্মার জগতে তার নিত্য আনাগোনা। *রাজা ও রাণী* নাটকের পরবর্তী রচনা *চিত্রাঙ্গদা* । রবীন্দ্রনাথ যদি লিরিকের প্লাবনকে বর্জন-ই করতে চাইতেন, তবে তিনি এমনতর কাব্যনাট্য রচনা করতেন না। তাই *চিত্রাঙ্গদা* প্রকৃততঃ 'কাব্য'। সেখানে পুনরায় তিনি লিরিকের প্লাবন ঘটিয়েছেন এবং তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে নাটক এবং কাব্যনাট্য দুটি জাতিগত সমীক্ষায় পৃথক।

আবার গদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটক অধ্যায়ে তিনি *রাজা -অরূপরতন -শাপমোচন* এই তিনটি রূপান্তরকে প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। *পুনশ্চ* কাব্যগ্রন্থের 'শাপমোচন' কবিতা এবং কথিকা *শাপমোচন*-এর মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন পদ্যকে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ গদ্যের রূপসজ্জা দিয়েছেন। "গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সঙ্গীতসভায় কলানায়কের অগ্রণী" এটিকে কথিকায় তিনি বলেছেন "গন্ধর্ব সৌরসেন সুরসভায় গীতনায়কদের অগ্রণী"। এটির সম্পর্কে তাঁর ধারণা –

'শাপমোচন' গদ্যকবিতায় উচ্চারণ-সৌকর্য এবং অর্থবোধের জন্য বাক্যের মাঝখানে যেখানে ক্ষণকালের জন্য বিরাম গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে বিরামস্থান পর্যন্ত এক-একটি পর্ব হিসাবে গ্রহণ করে বাক্যগুলিকে একাধিক চরণে বিন্যস্ত করা হয়েছিল।[৮৩]

অর্থাৎ 'শাপমোচন' কবিতাটিকে আপাতঃদৃষ্টিতে গদ্য হিসেবে পাঠ করা গেলেও কথিকাংশের বাক্যগঠনে বা মুদ্রণের সময় তাকে কবিতার আকার দিতে ইচ্ছুক রচনাকার একটি বাক্যের মূল বিষয়সূচক একাধিক শব্দকে একেকটি চরণে স্থান দেন। তাই সুরলোকের সংগীতসভা গন্ধর্বের অধিকরণ ব'লে সেটি প্রথম চরণে এবং সকল কলাকোবিদের মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের জন্য সেই অংশটিকে দ্বিতীয় চরণে স্থান অধিকার করে। তাই, কবিতা গদ্যে বা পদ্যে যেভাবেই রচিত হোক না কেন; সাহিত্যিককে খেয়াল রাখতে হবে তার মৌল ভাবনা রূপায়িত হচ্ছে কিনা। এভাবে বিচারে হয়ত রবীন্দ্রনাথের *রাজা, অচলায়তন* ইত্যাদি নাটকগুলিরও একটি পদ্যরূপান্তর আবিষ্কার করা সম্ভব।

তাই রবীন্দ্রনাট্যের কাব্যত্ববিচারের জন্য এবং রবীন্দ্রনাট্যে কবিতার ভূমিকা কতখানি এবং তার অভিনয়কৌশল কীরূপ হওয়া উচিত সেই জ্ঞানলাভের জন্য এই গ্রন্থ তথা গ্রন্থকারের কাছে চিরঋণী।

❖ অশোককুমার মিশ্র :

ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজের অধ্যাপক ড. অশোককুমার মিশ্রের *রবীন্দ্রনাট্যে রূপ অরূপ* গ্রন্থটিই এই পর্বের শেষ সমালোচ্য গ্রন্থ। তিনি রবীন্দ্রনাট্যের বিভাজনে যেটুকু স্বকীয়তার আশ্রয় নিয়েছেন, তা হ'ল কাব্যনাট্যের পরিবর্তে 'নাট্যকাব্য' নামের একটি বিভাগ নির্বাচন। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে রয়েছে গীতিনাট্য, ঐতিহাসিক ও রোমান্সধর্মী কাব্যনাট্য, কৌতুকনাট্য : প্রহসন, নৃত্যনাট্য, সামাজিক নাট্য এবং ঋতুনাট্য। [৮৪] রূপক-নাটকগুলিকে 'রবীন্দ্রনাট্যে অরূপ' পর্বে রাখলেও এগুলিকে একত্রিত ক'রে কোনও শ্রেণীগত অভিধা দেননি। তিনি 'নাট্যকাব্য'-এর মধ্যে *ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, সতী, নরকবাস, গান্ধারীর আবেদন* এবং *কর্ণকুন্তী-সংবাদ* -কে উপযুক্ত ব'লে মনে করেন। আবার, 'কাব্যনাট্য'-এর সম্মান তিনি দিয়েছেন *রাজা ও রাণী, বিসর্জন, মালিনী, মুকুট* এবং *প্রায়শ্চিত্ত* -কে। নাট্যবিচার যদি লক্ষ্য হয়, তবে 'নাট্যকাব্য' শব্দটিতে দোষ এসে পড়ে। এখানে কাব্যের বিশেষণ হয়েছে নাট্যধর্মী। তাই *চিত্রাঙ্গদা* বা *কাহিনী* -র কবিতাগুলি তাঁর অভিভাবনায় 'নাট্য' নয়; সেগুলি 'কাব্য'-ই।

তাই এই প্রসারিত আলোচনার শেষে যে ক'টি বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি তা হ'ল –

- রবীন্দ্রনাট্যে কাব্য এবং সংগীতের উপনদী এসে মিশেছে। গীতের ধারা নদী-উৎসেই কলকল বেগে প্রবাহে উছলিত হয়ে বয়ে চললেও কাব্যের ধারাটি পার্বত্য প্রবাহে যুক্ত হয়ে মূল ধারাস্রোতে সমভূমি প্রবাহে বয়ে চলেছে। তাই গান নদীর গতিপথে কোনও বিরোধ না ঘটিয়েই কাব্যনদীকে আত্মস্থ ক'রে মোহনায় নৃত্যোৎসব ঘটিয়েছে।

- রবীন্দ্রনাট্যে গদ্যত্ব এবং কাব্যত্ব দুটি পৃথক আলোচ্য বিষয়। কাব্যনাট্যে কাব্যের সরবতার পাশাপাশি গদ্যনাট্যশরীরে কাব্যভাবনার অলংকরণ উপস্থিত।
- রবীন্দ্রনাট্যে গানের পরিবেশনায় নাট্যাত্মকতা এবং গীয়িময়তার সমবায় সম্বন্ধ স্থাপিত নয়; কখনও কখনও রবীন্দ্রনাট্যে নাটিকতার প্রয়োজনে গানের সঙ্গে সংযোগ সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে।
- রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যে কাব্যধর্মিতা বর্তমান।

৩.৩ উপরূপক ও রবীন্দ্র-কাব্যনাট্য :

উপরূপকের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের সম্বন্ধে কতখানি আত্মিকতা রয়েছে, তার জন্য উপরূপকগত যে যে বিষয়কে মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়েছে, সেগুলি হ'ল-

- উপরূপকের মধ্যে বাগাড়ম্বরতা যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছন্দোবদ্ধ চারটি পাদে বিন্যস্ত শ্লোকের দ্বারাই পরিচালিত।
- উপরূপকের শ্লোকের মধ্যে কবিকল্পনার অপরিমিতিবোধ লক্ষণীয়। তার ফলে তা পাঠ্যরূপে যতখানি শ্রুতিমধুর, দৃশ্যরূপে ততখানিই মানসিক খেদজনক। অনাবশ্যক আবেগপ্রবণতা মূল ঘটনাস্রোতকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সৌন্দর্যপিপাসা বা প্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্যজীবনের সম্মিলনের ইঙ্গিত দেয়। এই বিষয়টিকেও প্রামাণ্যরূপে গণ্য করা হয়েছে।
- উপরূপকের মধ্যে কামমনস্কতাকে বিভিন্ন পণ্ডিতগণই স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং জৈবিক কামনা চরিতার্থে উপরূপকের নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে বিশেষ চারিত্রিক দ্যোতনা রয়েছে, তাকেও তৃতীয় বৈশিষ্ট্যরূপে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

তাই উপরিউক্ত বৈশেষিকতাত্রয়ীর ওপর ভিত্তি ক'রেই রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের মধ্যে উপরূপকত্ব বিচার করা হ'ল।

এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে *উন্মত্তরাঘব* (প্রেক্ষণক), *সুভদ্রাহরণ* (শ্রীগদিত), *দ্রৌপদীস্বয়ংবর* (শ্রীগদিত) ইত্যাদি উপরূপকের অবয়বের সন্নিধান করা হয়েছে। তার থেকে উপরূপকগুলির মধ্যে গদ্য নাট্যোক্তির স্বল্পতা, শ্লোকের আধিক্য এবং শ্লোকরাজির মধ্যে বাচ্যার্থপ্রধানতা, ঔপম্যবাচক অলংকারের প্রয়োগ দর্শিত হয়েছে। আবার, উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা গেছে যে রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যে যে এই ধরণের প্রয়োগের দীর্ঘতা। তাই এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে রবীন্দ্রকাব্যনাট্যাবলি উপরূপকের সংস্রব লাভ করেছে কিনা। এমনকি নাট্যেতিবৃত্তের সঙ্গেও তার সংযোগস্থাপনে উদ্যোগ নেওয়া পারে। অর্থাৎ খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিশ্বনাথের *সাহিত্যদর্পণ*-এ উপস্থিত উপরূপকগুলির কথাবৃত্তগুলির মাধ্যমে যে 'লোকোপদেশ' দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, তার সঙ্গেও রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের কোনওরূপ সাদৃশ্য রয়েছে কিনা তাও নির্ণয় করতে ব্রতী হওয়া যায়। উপরিকথনে দেখেছি *রাজা ও রাণী*,*বিসর্জন* নাটকগুলিকে 'প্রকৃত থিয়েটারি আদর্শে রচিত নাটক' ব'লে মেনেছেন শান্তিদেব ঘোষ। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তারই গোত্র করেছেন 'ইতিহাসভিত্তিক নাটক' এবং উপেন্দ্রনাথ

ভট্টাচার্যের মতে এগুলি হ'ল 'রোমান্টিক ট্র্যাজেডি'। তাই নির্দ্বিধায় এই পঞ্চাঙ্ক রীতির নাট্যদ্বয়কে এই আলোচনা থেকে মুক্ত করতে পারলেও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষের ম'ত বিদগ্ধ জনের অসাধারণ বৌদ্ধিক তাৎপর্যে সেগুলি পুনর্গৃহীত হয়। সেগুলিই নিম্নে আলোচিত হবে। তাই *চিত্রাঙ্গদা* ব্যতীত *রাজা ও রাণী, বিসর্জন-সহ বিদায়-অভিশাপ, কাহিনী* কাব্যগ্রন্থের গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস ইত্যাদি কাব্যনাট্যগুলিও প্রাচীন সংস্কৃত উপরূপকের সমর্থন জানাচ্ছে কিনা তা পরখ ক'রে দেখতে হবে। তাই এ প্রসঙ্গে বাংলা কাব্যনাট্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অবগতির প্রয়োজন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৭০) *রবীন্দ্র -সৃষ্টি -সমীক্ষা* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাট্যের দ্বিতীয় পর্ব – নাট্যকাব্য নামের সপ্তম অধ্যায়ে একখানি মার্জিত এবং সহজবোধ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন যা হ'ল –

যেখানে কাব্যগুণ নাট্যগুণকে অতিক্রম না করিয়া হয় উহার সমশক্তিসম্পন্ন সহযোগিতা অথভা আনুগত্য-সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছে সেখানে কাব্যনাট্য অভিধাই বিধেয়। [৮৫]

এবং এই কাব্যনাট্য বিষয়ে তিনি অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনার প্রসঙ্গে *রাজা ও রাণী, বিসর্জন এবং মালিনী* -কেই নির্বাচন করেছেন। অর্থাৎ *চিত্রাঙ্গদা* এবং *কাহিনী* কাব্যগ্রন্থের রচনানির্মিতিগুলি তাঁর ভাবনায় কাব্যরসের পাকে অভিভূত।

আবার অধ্যাপক তথা রবীন্দ্রতত্ত্ববিশারদ শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১) *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক* গ্রন্থে নাট্যমূহুর্ত ও ভাষার সন্ধান অধ্যায়ে *রাজা ও রাণী* -র গঠনবিন্যাস সম্পর্কে তিনি একটি প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন–

পদ্যভাষাই এই সময়ে ব্যবহার করলেন তিনি, কিন্তু রচনার অভ্যন্তরীণ দিক থেকে তার কোন অনিবার্যতা আজ বুঝতে পারি না।[৮৬]

তিনি রবীন্দ্রকাব্যনাট্য সম্পর্কে ক্রুটির অনুসন্ধান না ক'রেও নাট্যবন্ধনের দৌর্বল্য জ্যামিতিকভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন 'বৃত্তের বাইরে' এই কাব্যনাট্যের চরিত্রগুলির অবস্থান। সেখানে পরস্পরকে স্পর্শ করলেও তা সংসৃষ্টিমাত্র। যথা ইলা-কুমারের প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তটি। এই উপবৃত্তটি আধিকারিক ইতিবৃত্তের উপকারক হয়নি বলেই শঙ্খ ঘোষ মনে করেছেন। তিনি চরিত্রগুলির অবস্থান বা বাস্তবভিত্তিকতাকে অস্বীকার করেননা বরং এটিই বলতে চান যে এই ধরণের প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের নায়ক-নায়িকার অংশটি নাট্য প্রয়োজনে মন্দা ঘটায় – "পদ্যভাষার সুযোগ নিয়ে অন্যায়ভাবে কবিতাই আত্মপ্রকাশ করতে চায়"[৮৭]। অর্থাৎ নাট্যস্থ পাত্রপাত্রীগণের অন্তর্লোকের ভাব একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়না। আবার, আরও কিছু কাব্যনাট্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন -

চরিত্রের অংশমাত্র দেখতে পাই বৃত্তের ভিতরে, বাকিটা ধরা পড়ে দূরাভাসে, আর এদের সঞ্চার কেন্দ্রমুখী বলেই চূড়ান্তমূহুর্তে পৌঁছাবার আগেও অনেকবার তারা ঢেউ তুলে দেয় বৃত্তের অন্তশ্চাঞ্চল্যে। 'রাজা ও রাণী'তে এই সংঘাত চঞ্চলতা যেন উপযুক্ত রকম গড়ে তুলতে পারেননা রবীন্দ্রনাথ।[৮৮]

রাজা ও রাণী, বিসর্জন সম্পর্কে যে কয়েকটি ছিদ্রের অনুসন্ধান তিনি পেয়েছেন, সেগুলি হ'ল 'আত্মপ্রক্ষেপ', 'দীর্ঘবিস্তার বর্ণনাবলি' এবং 'স্বগতকথন'। তিনি এও বলতে চেয়েছেন যে এই কুয়াশা সরিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী

ধাপে 'নাট্যকাব্য'-এর স্থপতিরূপে পরিচিত হয়েছেন – "কাব্যনাট্য অবশেষে নাট্যকাব্যের সান্ত্বনায় এসে বিরাম নিল,.."[৮৯] এবং এই 'নাট্যকাব্য' হ'ল কাহিনী কাব্যগ্রন্থভুক্ত রচনাগুলি। অর্থাৎ কালের *মাত্রা এবং রবীন্দ্রনাটক* গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের *রাজা ও রাণী* কাব্যনাট্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছে, তা হ'ল *রাজা ও রাণী* বা *বিসর্জন* এগুলি পঞ্চাঙ্ক রীতির নাটক, এখানে আধিকারিক ইতিবৃত্ত এবং প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত সহাবস্থান করছে, আধিকারিক ইতিবৃত্তের পরিপোষণ করেনা প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত এবং প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের রচনার ধর্ম স্বয়ংক্রিয় 'কবিতা'।

রবীন্দ্রনাথ যেমন আত্ম-সমালোচনার কর্কশ ঘাতে *রাজা ও রাণী*-কে দগ্ধ করেছেন এবং সেই গঠনপ্রক্রিয়াকে সংশোধিত রূপে প্রস্তুত করতে চেয়েছেন *বিসর্জন*-কে, তেমনই পরবর্তী সময়ে *চিত্রাঙ্গদা*-য় কেন 'লিরিকের প্লাবন' ঘটালেন? যেহেতু তাঁর প্রথম থেকে সমাপ্তি জীবন পর্যন্ত কবিতা রচনা অব্যাহত রয়ে গেছে, সেজন্যই কি কবিতার অনুপ্রবেশ ঘটছে নাট্যে? যদি এটিই মানা হয় তবে গদ্যভাষার *গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, বাঁশরী* ইত্যাদির ক্ষেত্রে তার অব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায়। এই *চিত্রাঙ্গদা* -ই প্রমাণ করে 'কাব্যনাট্য'-এর মণ্ডন। *রাজা ও রাণী*-কে কাব্যনাট্যরূপে স্বীকৃতি দিতে চাননি রবীন্দ্রনাথ। তাই নাট্যসংরূপের ঈষৎবিকৃতি-ই তাঁর মনে একটি প্রতিজ্ঞার জন্ম দেয় যে তিনি কাব্যের মাধ্যমে এমন কোনও রচনায় প্রবর হতে পারেন কিনা। *চিত্রাঙ্গদা*-য় দেখা যায় স্বল্প চরিত্রের উপস্থিতি, নাট্যক্রিয়া (action) প্রায় উহ্য, চরিত্রগুলির উক্তিতে 'লিরিকের বাড়াবাড়ি' এবং পরিণতি করুণ রসাত্মক নয় বা নাট্যের অঙ্গিরস করুণ হয়ে যায়নি। এমনকি গ্রিক ট্র্যাজেডি-র আদর্শে এর রূপকল্প লীলায়িত হয়নি। *চিত্রাঙ্গদা* শৃঙ্গার রসাত্মক নাট্য। তাই তার অভিমুখনে যথাসাধ্য উদ্দীপন বিভাবের উপচার। তাই এক্ষেত্রে চিত্রাঙ্গদার স্বর্গীয় কান্তি, কামগন্ধময় সম্ভোগের চিত্র রসানুপাতে অনুকূল। *বিসর্জন* নাট্যের করুণ রসের জন্য ওজোগুণসংবলিত উক্তির অনুকম্পা লাভ করা গেলেও তার গাম্ভীর্যকে আহত করে। তাই, রবীন্দ্রনাথের *রাজা ও রাণী* বা *বিসর্জন* খর্বিত হওয়ার অন্যতম হেতু রসের অনৌচিত্য। তাই উপরূপকের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের নিবন্ধীকরণে অবশেষে *রাজা ও রাণী* এবং *বিসর্জন*-কে অনায়াসেই বিদায় জানানো যায়। প্রধানতঃ *চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ* এবং তৎসহ *কাহিনী* কাব্যগ্রন্থগত রচনাগুলিকে নির্বাচন করা হ'ল।

প্রাচীন ভারতের উপরূপক নাট্যকলার সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে কিনা এখন তা বিচার্য। তবে এই সমীক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের সঙ্গে অষ্টাদশ উপরূপকের লক্ষণের সমীকরণ অনাবশ্যক। রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের যে গঠনকৌশল এবং অভিনয়োপযোগিতা, তার সঙ্গেই প্রাচীন উপরূপকের প্রাকরণিক সম্বন্ধনির্ণয়ই গন্তব্য। পরস্পর-সাপেক্ষ এই বিষয়ে অনুপ্রবেশের পূর্বেই একথা ঘোষণা করতে হয় এখানে রবীন্দ্রকাব্যনাট্য বলতে *চিত্রাঙ্গদা* এবং *কাহিনী* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলিকেই ধার্য করা হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের মধ্যে *রাজা ও রাণী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা* এগুলিতে দেখি পদ্যভাষার আড়ম্বর। নাটিকা, সট্টক এবং ত্রোটক ব্যতীত অন্যান্য প্রাচীন উপরূপকগুলিতে পদ্যের পরিমিতি কীরূপ ছিল, সে প্রসঙ্গে বলতে হয় এই

গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত বিরূপাক্ষদেবের *উন্মত্তরাঘব* প্রেক্ষণক, মাধবভট্টের *সুভদ্রাহরণ* প্রভৃতি উপরূপকের কথা। যেহেতু অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকের নিদর্শন অনুপলব্ধ, তাই প্রতিটি উপরূপকেই যে পদ্যের আধিক্য ছিল এমন তত্ত্ব উপস্থাপিত করার পথ সংকীর্ণ। তবুও যেক'টি উপরূপকের অস্তিত্ব রয়েছে, তার সাপেক্ষে দেখাতে পারি যে উপরূপকের মধ্যে কখনও পদ্যের প্রাধান্য ছিল কিনা এবং সেই পদ্য ব্যঙ্গ্যার্থপ্রধান ছিল কিনা। *উন্মত্তরাঘব*-এ রামের উক্তিতে ছন্দোময় শ্লোকের বারংবার যাতায়াত। তবে দেখতে হবে যে এই শ্লোকমালার শব্দগুলি কী রকম, কী ধরণের বক্তব্য রাখা হয়েছে এবং সেখানে আবেগপ্রবণতার স্থান কতখানি।

উন্মত্তরাঘব -এর ৩৯নং শ্লোকে দেখা যায় –

ইযং হি নবমালিকা তরুরযং নবশ্চম্পকো ।
যথোচিতমিমাবুভৌ দযিতযা কৃতৌ দম্পতী ।।
মিথঃ সতি সমাগমে মধুমিষাদ্বধুঃ স্বেদিনী ।
পতিঃ পুলকজালকং বহতি কোরকব্যাজতঃ ।।[৯০]

এখানে নবমালিকা লতা এবং চম্পক বৃক্ষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক কবিকল্পনায় ধরা দিয়েছে। সীতার বিরহে রামের এহেন অনুভূতির দ্বারা এখানে নবমালিকা লতা সীতার প্রতিচ্ছবি এবং চম্পক বৃক্ষ রামের প্রতিমূর্তি। তাদের সঙ্গমে রামের সীতাসঙ্গলাভের আকুতিই ধ্বনিত হয়েছে। আবার, বনবাসকালে রাম নির্ভূষণ সীতার গণ্ডতলে পত্রাবলী রচনা করত সেকথাও জানা যায় ৫৭নং শ্লোক থেকে –

তস্যা গণ্ডতলে মযা বিলিখিতা পত্রাবলী ধাতুন ।
বাসন্তীং পুলকে সতি স্মিতবতীং সা বচ্চন সখীম্ ।।[৯১]
আবার, পম্পা সরোবরের নিকটে রাম বলে ওঠে –
পম্পা কৃতানুকম্পা সংপ্রতি সীতাবিযোগাতপ্তং ।
কহ্লারচরবিকীর্ণৈরাশ্বাসযতীব শীকরৈঃ শীতৈঃ ।।[৯২]

এই ধরণের অপ্রাপ্তি *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যের ছত্রে ছত্রে ব্যক্ত। যেমন দ্বিতীয় দৃশ্যে অরণ্যে শিবালয়ে অর্জুনের উক্তি–

কী অপূর্ব রূপ। কোমল চরণতলে
ধরার কেমন নিশ্চল হয়ে ছিল?
উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব পর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকশিত, তেমনি বসন তার

মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে। নামি ধীরে সরোবরতীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া;[৯৩]

আবার তৃতীয় দৃশ্যে তরুতলে চিত্রাঙ্গদা আসীন। কিয়ৎক্ষণ পূর্বেই দ্বিতীয় দৃশ্যে সে অর্জুনকে বলেছে –

কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
কী জান আমারে। কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত। মূহুর্তকে সত্যভঙ্গ
করি অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন [৯৪]

অর্থাৎ অর্জুনকে প্রবঞ্চনার জন্য সে নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছে। মায়ালোভী অর্জুনকে সতর্ক করেও সে কামাসক্ত হয়ে ব্রহ্মচর্যবেশী কুরুবংশীয় অর্জুনের জন্য স্বগতোক্তি –

হায়,হায়, সে কি ফিরাইতে পারি! সেই
থরথর ব্যাকুলতা বীরহৃদয়ের
তৃষার্ত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গনিশ্বাসী
হোমাগ্নিশিখার মতো; সেই নয়নের
দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে কেড়ে
নিতে আসিছে আমায়;[৯৫]

এখানে অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার মনস্তত্ত্ব রামের সঙ্গে একাকার হলেও উপমালংকারনৈপুণ্যে রবীন্দ্ররচনার তুলনায় উন্মত্তরাঘব অনুত্তম। চম্পক, নবমালিকার উদাহরণে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলংকারের কান্তি থাকলেও কবিবাঙ্নির্মিতি অপরিণত। অর্জুন কেবল চিত্রাঙ্গদার দেহজ সৌন্দর্যের আস্বাদন করেছে। তাই উষার রক্তিমাভ মেঘ এখানে উপমান এবং রূপসী চিত্রাঙ্গদা উপমেয়। উষাকাল অন্তরিত হলেই যেমন সেই লালিমার আভা মুছে যায়, তেমনই ক্ষণকালের জন্য চিত্রাঙ্গদার দর্শন পেয়েই তার প্রতি মোহানুরাগ জন্মেছে ব্রহ্মচারী অর্জুনের। এখানেও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের ধ্বনন কিন্তু সরোবর, বৃক্ষ, লতার সঙ্গে ক্রমান্বয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ উপমার প্লাবন ঘটাননি রবীন্দ্রনাথ। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত রূপক এবং উপরূপকের মধ্যে এই ধরণের আলংকারিক বাহুল্যে পাঠক অভ্যস্ত। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের প্রথমাঙ্কে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে দেখামাত্রই নানাবিধ উপমান চিন্তা করতে থাকে। তাই কখনও শৈবলাঙ্কিত পদ্ম, হ্লাদদীপ্তিময় চন্দ্র, নীলোৎপলপত্রধার, অযত্নে লালিত উদ্যানলতিকা প্রভৃতি উপমান সারিবদ্ধভাবে নান্দনিকতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রকাব্যনাট্যে উসমানের ব্যবহার থাকলেও এককভাবে তার প্রয়োগ নেই। শুধুমাত্র মেঘের উপমা দিয়েই ভাবের অন্তর্লোকে পৌঁছে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। মানুষের রূপের শোভা প্রকৃতির নিয়মেই একদিন জীর্ণ হয়ে যায় সেকথা তিনি মেঘের নিদর্শনে বোঝাতে চেয়েছেন। উষাকালীন শোভা

দিভাভাগে আকাশের অন্য বর্ণে লীন হয়ে যায় নৈসর্গিক নিয়মেই। তার কোনও ব্যত্যয় ঘটেনা। তাই এর জন্য একাধিক উপমানের প্রয়োজন নেই। অর্জুনের উক্তিতে সরোবরের বর্ণনা, চিত্রাঙ্গদার কার্যক্রমের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে কিন্তু একটি অনুভূতিকে ব্যক্ত করার জন্য তিনি শব্দের অপচয় পছন্দ করেননি। অন্যদিকে বিজয়পালের *দ্রৌপদীস্বয়ংবর* শ্রীগদিত উপরূপকের প্রথম অঙ্কে কৃষ্ণের একটি বচনে পাই –

কামারিকার্মুকারোপগলিতং নিজদোর্বলম্ ।
পতিতো'যমধোগ্রীবো নিরীক্ষিত ইব ক্ষিতৌ ।।[৯৬]

এখানে কামকে বৈরিভাবে দূষণরূপে প্রতিপাদিত করা হয়েছে। দুঃশাসন এর পূর্বেই সগর্বে বলে উঠেছিল –

উদ্দণ্ডমদ্ভুজাদণ্ডচণ্ডতাকুণ্ডলীকৃতম্ ।
খণ্ডেন্দুমণ্ডনস্যেসং কোদণ্ডং যাতু খণ্ডতাম্ ।।[৯৭]

এখানেও দেখা যাচ্ছে যে এই ধরণের ণ, ড এর বারংবার একই ক্রমানুসারে আবৃত্তিতে ছেকানুপ্রাস অলংকারের ব্যবহার হয়েছে। বিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণ*-এর দশম পরিচ্ছেদে এর লক্ষণে বলেছেন "ছেকো ব্যঞ্জনসঙ্ঘস্য সকৃৎসাম্যমনেকধা"[৯৮]। অর্থাৎ এই ধরণের ওজোগুণসম্পন্ন পরুষ বর্ণের ঝংকারে শব্দালংকর শোভাকর হলেও মম্মটের দৃষ্টিতে এটি অবর কাব্য। এ প্রসঙ্গে তাঁর সুবচনখানি হ'ল "শব্দচিত্রং বাক্যচিত্রমব্যঙ্গ্যং ত্ববরং স্মৃতম্"[৯৯]।এখানে তার চরিত্রের ধৃষ্টতা এবং অকারণ আস্ফালনের জন্যই নাট্যকার এই ধরণের শ্লোক রচনা করেছেন। এর মধ্যে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা বৃত্তির অবকাশ নেই। কামাসক্ত দুঃশাসন লব্ধবাসনায় দ্রৌপদীর সঙ্গে সম্ভোগে লিপ্ত হতে চায়। তার পরাক্রমকেই সে চরমতম বল বা সম্পদরূপে ভাবতে চায়। রবীন্দ্রনাথের *গান্ধারীর আবেদন* রচনাতেও দুর্যোধনেরও দেখা যায় এহেন ভঙ্গী –

সুখ চাহি নাই মহারাজ –
জয়! জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।
ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি ! দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা
জয়রস, ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত,
সদ্য করিয়াছি পান – সুখ নাহি তার,
অদ্য আমি জয়ী ।[১০০]

আরও একটি দিক হ'ল অতীতচারণা। *বিদায়-অভিশাপ, কাহিনী*-র 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' এই ধরণের রচনায় লক্ষণীয় যে এখানে নাট্যগতি অতীতের সঙ্গে ঘর্ষণে বিকল হয়ে পড়ছে। *বিদায় -অভিশাপ* কাব্যনাট্যে একটি দিনের একটি বেলার কয়েক মূহুর্তের ঘটনা। সেখানে বর্তমানের গালিচা বিছানো হয়েছে অতীতের মৃত্তিকায়। কচের আশ্রমিক

জীবনের স্নিগ্ধগম্ভীর দিনপঞ্জিকা পঙক্তিতে পঙক্তিতে উচ্চারিত। তপোবনের বনস্পতির প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলে –

ওগো বনস্পতি,
আশ্রিতজনের বন্ধু, করি নমস্কার ।
কত পান্থ বিবেক ছায়ায় তোমার,
কত ছাত্র কতদিন আমার মতন
প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়তলে নীরব নির্জন
তৃণাসনে পতঙ্গের মৃদুগুঞ্জস্বরে
করিবেক অধ্যয়ন,[১০১]

আবার স্রোতস্বিনী বেণুমতীর উদ্দেশ্যে জানায় –

তারে ভুলিব না ।
বেণুমতী, কত কুসুমিত কুঞ্জ দিয়ে
মধুকণ্ঠে আনন্দিত কলগান নিয়ে
আসিছে শুশ্রুষা বহি গ্রাম্যবধূসম
সদা ক্ষিপ্রগতি, প্রবাসসঙ্গিনী মম
নিত্যশুভব্রতা ।[১০২]

আবার দেবযানীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের চিত্রল বর্ণনা রয়েছে এভাবে –

তুমি সদ্য স্নান করি
দীর্ঘ আর্দ্র কেশজালে নবশুক্লাম্বরী
জ্যোতিস্নাত মূর্তিমতী উষা, হাতে সাজি,[১০৩]

তাই এই ধরণের নিসর্গ চেতনা একটি তপোধন আশ্রমের নিষ্কলঙ্ক উদাত্ত জীবনের প্রাত্যহিকতাকেই নান্দনিক ক'রে তোলে। সেখানে মূল নাট্যফলের সঙ্গে তার বিকর্ষণ ঘটে। এখানে কচের প্রতি দেবযানীর অভিশাপটিই রচনার শিরোনাম। তাই রচনাটি যদি অতীতচারণার পরিবর্তে কচের শুক্রাচার্যের গৃহে আগমন, শিক্ষাগ্রহণ, দেবযানীর তার প্রতি প্রণয় এবং পরিশেষে অভিশাপের করুণ রসাত্মক ইতিবৃত্ত পরিবেশিত হ'ত, তবে তা নাট্যিকতায় সমৃদ্ধতর হতে পারত। তাই *চিত্রাঙ্গদা*-কে রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের আদর্শ রূপ ব'লে অঙ্গীকার করা গেলে তার তুলনায় এর গঠনগত প্রভেদ ধরা পড়ে কিন্তু এই ধরণের বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের মৌল আদর্শে আঘাত দিলেও ভারতীয় উপরূপকের ধারাকেই যেন সমর্থন জানায় বর্তমানকালে। তার কারণ *উন্মত্তরাঘব*-এ রামের এই ধরণের স্মৃতিবিলাসবিভ্রম লক্ষ্য করা গেছে। ভবভূতির *উত্তররামরচিত* নাটকের 'চিত্রদর্শন' নামক প্রথমাঙ্কেও

রাম-লক্ষণ-সীতার বনবাস জীবনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু তা নাট্যরসের ঘনীভবনের জন্যই।। রামের সীতাবিয়োগের পূর্বে সীতার সঙ্গে তার দাম্পত্য সম্পর্ক কীরূপ ছিল তা পাঠকদের তথা রসজ্ঞ রসিকদের কাছে তুলে ধরা গুণবান নাট্যকারের দায়িত্ব কিন্তু *উন্মত্তরাঘব*-এ রামের বিলাপগাথা-ই নাট্যবস্তু। তাই সীতাস্মৃতি-ই সেই উপরূপককে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছে। একই বিষয় *কর্ণকুন্তী-সংবাদ* -এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেখানেও কুন্তীর উক্তিতে রয়েছে –

দ্বেষ করিয়ো না বৎস! আজো মনে পড়ে
অস্ত্রপরীক্ষার দিন হস্তিনানগরে
তুমি ধীরে প্রবেশিলে তরুণ কুমার
রণস্থলে, নক্ষত্রখচিত পূর্বাশার
প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মতো ।[১০৪]

কিন্তু কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত, কুন্তীর তাকে পরিত্যাগ, পুনরায় কর্ণের সম্মুখে সেই সত্যপ্রকাশের মধ্যে একটি নাট্যিক দ্বন্দ্ব উত্তপ্ত হয়েছে। এখানে কুন্তীর যা অভিলাষ ছিল, তা-ই চরিতার্থ হয়েছে। দাতার কর্ণের দানবীরত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। কুন্তীর ছলনা এবং কর্ণের প্রতি ব্যাজস্তুতির দ্বারা যে প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডবপক্ষের জয়লোভী, সেই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তটিই চরিত্রদ্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্ত। *গান্ধারীর আবেদন, নরকবাস* -এ চরিত্রের আধিক্য এবং নাট্যমুখিতাও *বিদায়-অভিশাপ* অপেক্ষা উন্নত। *কর্ণকুন্তীসংবাদ* -এ অনুভাব (action) এবং আঙ্গিক অভিনয়ের স্থান নেই। তুলনায় গান্ধারীর আবেদন-এ চর, প্রতিহারীর প্রবেশে যুক্ত হতে পারে নতমস্তকে প্রণামের আঙ্গিক অভিনয়, আবার ধৃতরাষ্ট্রের "ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ" উক্তিতে ব্যবহৃত হতে পারে অঙ্গুলিনির্দেশ। যেহেতু ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ব্যক্তি, তাই দুর্যোধনের উক্তি যেদিক থেকে আসছে, সেদিকে এই নির্দেশ প্রযুক্ত হবে। আবার, "অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে" উক্তিতে বক্ষপার্শ্বে দুবাহু প্রসারিত দ্বারা আত্মগ্লানির অভিনয় প্রদর্শিত হতে পারে। গান্ধারী "মাতা আমি নহি?" উক্তির সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের অধিক সন্নিকটে গমনে তার উদ্যত মনোভাবের অবস্থা সূচিত হতে পারে। এমনকি সে মঞ্চে স্থির থাকবে না। প্রতিটি সংলাপে তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটবে মানসিক স্থিতিশীলতার হানি বোঝাতে। তাই এটিতে আঙ্গিক অভিনয়ের অনেকখানিই অবকাশ রয়েছে। ধনিক 'পদার্থাভিনয়' তত্ত্বটিকে কেবলমাত্র নৃত্যের জন্য মনোনীত করেছেন। কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রে সেই পদার্থাভিনয় অসম্ভবপর। যেমন দুর্যোধনের একটি উক্তিতে রয়েছে –

যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র, পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল ।
ব্যাঘ্রসনে নখে দন্তে নহিকো সমান,[১০৫]

এখানে 'ব্যাঘ্রসনে', 'নখে', 'দন্তে' প্রতিটি শব্দের অর্থ সকলেরই জানা কিন্তু এই প্রতিটিকে আঙ্গিকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশের প্রয়োজন পড়েনা। এখানে 'নহিকো' শব্দটিই সর্বোচ্চ গুরুত্ব লাভ করেছে। তাই হস্তের দ্বারা

নিষেধার্থসূচক আঙ্গিক ব্যবহৃত হলে সহৃদয়ের রসবোধে কোনও বাধা ঘটেনা। *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যেও এই পদার্থাভিনয় বা বলা ভালো অর্থাভিনয়ের স্থানও উন্মুক্ত নয়। প্রথম দৃশ্যের অনঙ্গ আশ্রমে মদন-বসন্ত-চিত্রাঙ্গদার কথোপকথনে মদনের প্রশ্নসূচক একটিমাত্র বাক্যেই তার অবকাশ –

কল্যাণী, কী লাগি
এ কঠোর ব্রত তব ?[১০৬]

এখানে বক্ষস্থান থেকে চিবুক কিঞ্চিৎ উত্তোলনের দ্বারাই 'কী' ব্যক্ত হওয়ার সুযোগ। আবার, চিত্রাঙ্গদা বলে ওঠে–

দয়া কর যদি,
শোনো মোর ইতিহাস। জানাব প্রার্থনা
তার পরে।[১০৭]

এখানে সংযুক্ত হস্তের দ্বারা ভিক্ষাপাত্রের আকারে 'দয়া' শব্দের অর্থ পরিস্ফুট হতে পারে। এরপর যেখানে সে তার জন্মেতিহাস এবং তার শৈশব জীবনের বৃত্তান্ত উপস্থাপন করছে, সেখানে কেবলমাত্র 'ধনুর্বিদ্যা'-র প্রতীকের ব্যবহার প্রয়োজন। তার বীর্যের চিহ্ন এই ধনুর্বিদ্যা। তাই বাকি শব্দগুলির অর্থানুসারে আঙ্গিক অভিনয়ে পরিমিতিবোধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই কাব্যনাট্যগুলির প্রায়োগিকতার দিক থেকে *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-এ ভোজদেবকথিত 'পদার্থাভিনয়প্রধান অভিনেয় কাব্য'-এর তলে অনুপযুক্ত। তবে *উন্মত্তরাঘব*-কে উপরূপক রূপে ধার্য করলে সেখানেও রামের উক্তির প্রতিটি শ্লোকেই পদার্থাভিনয় নিষ্প্রয়োজন বলেই ধরতে পারি। তবে নাট্যকার প্রতি শ্লোকের অভিনয়ের কিছু নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন কোথাও নির্দেশে রয়েছে অঞ্জলিবদ্ধমুদ্রার প্রয়োগ। তার কারণ সেখানে সহকার বৃক্ষের প্রতি প্রণতি লক্ষণীয় – "এহি সহকার দেহি প্রতিবচনং দর্শযাশু বৈদেহীম্"[১০৮]। আবার রক্তাশোকবৃক্ষের সঙ্গে সীতার সম্পর্ক কীরূপ ছিল, তার বর্ণনায় পরিক্রমণ করার বিধান রয়েছে ৩৪নং শ্লোকের সঙ্গে। যেহেতু রক্তাশোকবৃক্ষের পুস্ত (আহার্য) মঞ্চে প্রস্তুত নাও থাকতে পারে, তাই সেই ভাবটির অভিব্যক্তির জন্য এক্ষেত্রে পরিক্রমা করতে হবে রামকে। আবার পূর্বোক্ত ৩৯ নং শ্লোকে কাল্পনিক নবমালিকা এবং চম্পকতরুর সুখময় দাম্পত্যের কথা বলেছে রাম। তাই সেটির অভিনয় প্রসঙ্গে বলা রয়েছে 'সদৃষ্টিক্ষেপ'। যেহেতু এটি নাট্য, তাই প্রকৃতির বর্ণনায় রামকে নাট্যকার-নির্দেশিত অভিনয়বিধি অনুসরণ করতে হবে। তবেই বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করবে সহৃদয় সামাজিক।

তাই সংস্কৃত নাট্যের ছন্দোযুত শ্লোক এবং বাংলা কবিতা-কে যদি একই শ্রেণীতে রাখা যায় কাব্যনাট্যের প্রেক্ষিতে, তবে উভয়ের মধ্যে প্রয়োগগত একটি সাদৃশ্য উপেক্ষিত হতে পারেনা। যদিও সেকালের সংস্কৃত নাট্যস্থ শ্লোক এবং রবীন্দ্রকবিতার গঠনগত বৈষম্য রয়েছে, তবে তার প্রয়োগকৌশলগত বিষয়ে একটি সাদৃশ্য রয়েছে। সেটি হ'ল উভয়ক্ষেত্রেই 'পদার্থাভিনয়'-এর পরিবর্তে 'বাক্যার্থাভিনয়' প্রয়োজনীয়। এর থেকে এটিএ প্রমাণিত হয় যে সাহিত্যদর্পণোক্ত অষ্টাদশ উপরূপকের পূর্ব রূপ খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীতে ক'তখানি ভিন্ন স্বাদের ছিল।

তবে এখানেই শেষ নয়। এরপর দেখতে হবে উপরূপকে পদ্যের আবৃত্তি কখন কোন্ পরিস্থিতিতে রসায়ন ঘটাচ্ছে। প্রাচীন বা মধ্যযুগের উপরূপকে আত্মানুভবের উক্তিগুলিই কেবল পদ্যাত্মক। নাটকাদি রূপকের এক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম ঘটে তা কিন্তু নয়। সেখানেও পাত্র-পাত্রীর উক্তিবিনিময়ে যখন কোনও তথ্য পরিবেশিত হয় বা কোনও ঘটনার কার্যক্রম চলতে থাকে, তখন গদ্যোক্তির ব্যবহার করেছেন নাট্যকারগণ। বিষয়টিকে কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যাক। যেমন *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণের প্রথম অঙ্কে বসন্তসেনা তার অলংকার চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রাখলে সেই মূহূর্তে ব'লে ওঠে "পুরুষেষু ন্যাসা নিক্ষিপ্যন্তে ন পুনর্গেহেষু"[১০৯]। অতঃপর চারুদত্ত গহনা রাখতে রাজি হলে বিদূষক গচ্ছিত বস্তুর চুরি যাওয়ার কথা ভাবে এবং সেই মূল্যবান ধনরত্নে তার বা চারুদত্তের কোনওরকম অধিকার না থাকায় তার রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ যত্নবান হতে দেখা যায়না বিদূষককে। এরপর বসন্তসেনাকে তারা রাত্রির গাঢ় তমসায় গৃহে পৌঁছে দেয়। এখানেও বিদূষকের গদ্যোক্তিতেও অলংকারপ্রয়োগ - "ত্বমেবৈতাং কলহংসগামিনীমনুগচ্ছন্ রাজহংস ইব শোভসে"[১১০]। বিদূষকের মানসকল্পলোকে এই রাজহংসী হ'ল বসন্তসেনা এবং তার অনুগামী রাজহংস হ'ল চারুদত্ত। তাই শ্লোকগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতেই যে কেবল অলংকারের ব্যবহার করা হয়েছে এমনটি নয় কিন্তু বিদূষকের সঙ্গে চারুদত্ত গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে রাত্রির নিন্দনীয় বর্ণনা করেছেন শ্লোকের মাধ্যমে –

রাজমার্গো হি শূন্যে'যং রক্ষিণং সংচরন্তি চ ।
বঞ্চনা পরিহর্তব্যা বহুদোষা হি শর্বরী ।।[১১১]

সেই সময় রাজপথ ছিল শূন্য, রক্ষিপুরুষেরা ইতস্তত সঞ্চরণ করলেও দুষ্কৃতীর অভাব নেই। তাই সতর্ক থাকতে হবে। অপহরণ এড়িয়ে যেতে হবে দুজনকেই। এই ভাবনা চারুদত্তের একান্ত ব্যক্তিগত। তাই এই ধরণের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ছন্দের নর্তনে। অনুরূপভাবে *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের পঞ্চম অঙ্কে সানুমতীর গান শুনে দুষ্যন্তের জননান্তর আনন্দে আবিল হওয়াও নাটকে প্রদর্শিত হয়েছে শ্লোকের যথাযথ পরিমাপে –

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্ ।
পর্যুৎসুকো ভবতি যং সুখিতো'পি জন্তুঃ ।।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং।
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।।[১১২]

কিন্তু ষষ্ঠ অঙ্কে নেপথ্যচারিণী সানুমতীর কোনও পদ্যবাক্য পাওয়া যায়না। এই সানুমতী রাজা দুষ্যন্তেরই অবচেতন মন। তাই সানুমতী বলতে পারে "অথবা ঈদৃশঃ অনুরাগঃ অভিজ্ঞানম্ অপেক্ষতে"[১১৩]। এখানে তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য যে পরিশুদ্ধ প্রেমানুরাগ কোনও চিহ্ন বা অভিজ্ঞানকে বহন করেনা। দুর্বাসার অভিশাপে বলা ছিল যে কোনও স্মারক প্রদর্শিত হ'লে রাজার স্মৃতি জাগ্রত হবে এবং শকুন্তলাকে চিনতে পারবে। অর্থাৎ ব্যঞ্জনা বৃত্তির দ্বার বোধ্য যে উভয়ের মিলন হবে নানা বর্ণে, নানা রঞ্জনে খচিত কিন্তু কালিদাস এই আড়ম্বরকে নস্যাৎ করে

দিয়েছেন সানুমতীর উক্তিতে। তাই তিনি সানুমতীর মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন প্রেম হোক বিবর্ণ। তাই রাজা চিত্রাঙ্কনের সময় শকুন্তলার তাপসকন্যার রূপ ফুটিয়ে তুলতে চাইলে বলে –

কৃতং ন কর্ণার্পিতবন্ধনং সখে ।
শিরীষমাগণ্ডবিলম্বিকেসরকম্ ।।
ন বা শরচ্চন্দ্রমরীচিকোমলং ।
মৃণালসূত্রং রচিতং স্তনান্তরে ।।[১১৪]

বৃন্ত কর্ণে লগ্ন, গণ্ডস্থলে সুশোভন কেসরমালিকায় দোদুল্যমান একটি শিরীষকুসুম অঙ্কিত হতে বাকি রয়েছে। এমনকি একটি পেলব মৃণালসূত্রও স্তনদেশে স্থান পাবে যা হবে শরতের শুভ্রকান্তি চন্দ্রিমাতুল্য। এই রূপের পরিচয় সানুমতীর কণ্ঠে গদ্যে কথিত হয়েছে "বনবাসস্য সৌকুমার্যস্য বিনযস্য চ যত্ সদৃশং ভবিষ্যতি"[১১৫]। এখানে শুধু বনবাসের সুকুমারতার ইঙ্গিতটুকুই দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেয় দুষ্যন্ত বংশস্থবিল ছন্দনন্দিত শ্লোকের দ্বারা। এই ধরণের বিবৃতিমূলকতা উপরূপকের প্রধান আকর্ষণ। *উন্মত্তরাঘব* প্রেক্ষণকে তেমন প্রতিচ্ছবি দৃশ্যমান। *রত্নাবলী* নাটিকাতেও প্রথম অঙ্কে মদনমহোৎসবে চেতন-অচেতন সকলেই মোহানুরাগে অতিরঞ্জিত। তাই বেশ কয়েকটি শ্লোক সেখানেও রয়েছে। এছাড়াও দ্বিতীয় অঙ্কে সুসঙ্গতা-সাগরিকার বাক্যালাপে গদ্যোক্তির ভূমিকা থাকলেও তা আবেগতাড়িত উক্তি। একাধিক বাক্য মিলে তবে একটি নাট্যোক্তির সৃজন হয়েছে সেখানে। যেমন "এষা মে প্রিযসখী"[১১৬] সাগরিকার সঙ্গে আরও পাঁচটি বাক্যের সমন্বয়ে একটি নাট্যোক্তির নির্মাণ। আবার সাগরিকার "হৃদয, প্রসীদ প্রসীদ"[১১৭] ইত্যাদিতেও লক্ষ্য করা যায় দীর্ঘসূত্রিতা। এখানেও সে মদনবশা হয়ে কামাবেগে প্রার্থিত পুরুষকে চিত্রফলকদর্শনেই ভোগ করতে ব্যাকুল। সেজন্য তার বাস্তব জ্ঞানের লোপ ঘটেছে। কখনও সে কুসুমায়ুধ মদনকে দোষারোপ করেছে মন্দভাগ্যের জন্য আবার কখনও নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে। তাই এই ধরণের মানসিক অসংলগ্নতাও সেই *উন্মত্তরাঘব* -এর রামের বিবরণ, অচল হওয়ারই প্রতিরূপমাত্র। অথচ *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে বসন্তোৎসবের আয়োজনেও রাজা উন্মনা। তবুও তার ধীরোদাত্ত স্বভাবের ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রমদবনে বিহারকালে শোকসন্তপ্ত হওয়া সত্ত্বেও রাজকার্যে কোনওরূপ আলস্য দেখা যায়না। সে পুরবাসীদের সংবাদ জানতে আগ্রহপ্রকাশ করে "যত্ প্রত্যক্ষবেক্ষিতং পৌরকার্যমার্যেণ তত্ পত্রমারোপ্য দীযতামিতি"[১১৮] ব'লে। আবার বিদূষকও তার মধ্যে রাজদীপ্ত তেজ সঞ্চার ক'রে বলে ওঠে "কদাপি সৎপুরুষাঃ শোকবাস্তব্যাঃ ন ভবন্তি। ননু প্রবাতে অপি নিষ্কম্প গিরযঃ"[১১৯]। প্রবল ঝঞ্ঝাতেও যেমন পর্বতমালা বিচলিত হয়না, তেমনই দুষ্যন্তের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব যেন তাকে অতিমাত্রায় শোকসন্তপ্ত না করে এমনই নির্দেশ দেন কালিদাস বিদূষকের দ্বারা। এখানে *রত্নাবলী*-র ধীরললিত রাজা উদয়নের ম'ত সে পুরবাসীগণের প্রমোদক্রীড়ায় উদ্বেলিত হয়ে যায়নি। কঞ্চুকীর একটি শ্লোকোক্তিতে জানা যায় যে বসন্তকাল সমাগত হলেও আম্রকলিকায় পরাগরেণু অদৃশ্য, কুরবক কোরক দশাতেই বর্তমান, পুরুষ কোকিলের গানও স্তব্ধ। এহেন পরিবেশরচনা ব্যঙ্গ্যধর্মী। শকুন্তলাজনিত অপরাধে রাজা নির্বাক হয়ে পড়েছে। তাই তার শোকে যেন সমগ্র

প্রকৃতিও নীরবতা পালন করছে। এক্ষেত্রে কালিদাসের দ্বারা দুষ্যন্তের শোককেই উপজীব্য ক'রে একাধিক অবিচ্ছিন্ন শ্লোকরচনা করতে পারতেন কিন্তু রূপকের পরম্পরা বা আভিজাত্যে তিনি কলুষতা দান করেননি। এখানেই রূপক এবং উপরূপকের পার্থক্য। তাই রবীন্দ্রকাব্যনাট্য উপরূপকের এই স্বভাব থেকে দূরবর্তী। সেখানেও উপরূপকসদৃশতা লক্ষ্য করা যায়না তা নয়। উপরিউক্ত কয়েকটি উপরূপকে যেভাবে দেখান গেল যে আত্মবিবৃতি, আত্মবিরচন, আত্মগ্লানি মুখ্য ভূমিতে কর্ষণ করেছে, তেমনই *চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন* ইত্যাদিতে প্রাণবায়ুর রসদ জুগিয়েছে। তবে সেই নিজ-বক্তব্যের আলংকারিক শোভাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তাঁর অলংকাররচনার পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের রঙ্গমঞ্চ হয়ে ওঠেনি এই কাব্যনাট্যগুলি। এখানেই রাবীন্দ্রিকতার কৃষ্টি উজ্জ্বল। সুতরাং উপরূপকের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের গঠনগত মিলে যা যা ধরা পড়ে তা হ'ল-

- উপরূপক সম্পর্কে বিনয়চন্দ্র মজুমদারের ভাবনা যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, তার সঙ্গে *চিত্রাঙ্গদা*-র একটি সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কামশৃঙ্গার যেমন *উন্মত্তরাঘব*-এ রাম, *দ্রৌপদীস্বয়ংবর*-এ দ্রৌপদীর মধ্যে রয়েছে; তেমনই *চিত্রাঙ্গদা*-য় অর্জুন, চিত্রাঙ্গদার উক্তিতে পরিস্ফুট।
- উপরূপক এবং কাব্যনাট্যের মধ্যে ঔপম্যমূলক অলংকারের প্রয়োগের আবিলতা।
- উভয়ক্ষেত্রেই 'বাক্যার্থাভিনয়' প্রযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা।
- উপরূপক এবং রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের গঠনের মধ্যে যে বিষয়ে প্রাচীর রয়েছে, তা হ'ল উপরূপকের তুলনায় *চিত্রাঙ্গদা*-য় আলংকারিক প্রয়োগে স্থিতিশীলতা। উৎপ্রেক্ষাদি অলংকারের মাধ্যমে নায়ক বা নায়িকার বিরহ চিত্রিত হলেও তা একটি নির্দিষ্ট স্থানেই তার প্রবেশ এবং প্রস্থান।

উপরূপক পদার্থাভিনয়মুখী নৃত্যসঞ্জাত। তাই *উন্মত্তরাঘব*-এ রামের দ্বারা আঙ্গিকসর্বস্ব ক্রিয়ানুগামী নৃত্যের সম্ভাবনা থাকলেও *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যটি নৃত্যাকারে পরিবেশিত হতে পারেনা। একথার প্রমাণ পাই **১৯৩৬** খ্রিস্টাব্দে অভিনীত *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্য। রবীন্দ্রনাথ জীবনসায়াহ্নে *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যটির ইতিবৃত্ত অবিকৃত রেখে গানের সাহায্যে একটি নতুন নাট্যরচনা করেন। সেটিই নৃত্যের মাধ্যমে প্রযোজিত হওয়ার দরুণ তা 'নৃত্যনাট্য' আখ্যা পায়। অর্থাৎ তিনি বুঝেছিলেন এই কাব্যনাট্যটির কবিতাগুলিতে সুরযোজনা করা সম্ভব নয়। তাই অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার আখ্যানাশ্রিত এই কাব্যনাট্যটি নৃত্যাভিনয়ের উপযুক্ত নয়। এমনকি 'কাব্যনাট্য', 'গীতিনাট্য', 'নৃত্যনাট্য' এই বিভাগগুলি থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে 'কাব্যনাট্য' এবং 'নৃত্যনাট্য' সমগোত্রীয় নয়। উপরূপকের সঙ্গে কাব্যনাট্যের তুলনামূলক নিষ্কর্ষ উত্থাপনের এটিই উদ্দেশ্য যে উপরূপকে পদ্যের গরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সেগুলি বর্তমান সময়ের যে কোনও ভাষার কাব্যনাট্যের ম'ত বাচিক অভিনয়েই মঞ্চস্থ হতে পারেনা। নাট্যপ্রেমী, নাট্যকলাকোবিদ এবং সহৃদয়বর্গ উপরূপক এবং কাব্যনাট্যের প্রভেদ সম্পর্কে অদ্যাবধি যথাযথ অবগত না থাকলেও ভবিষ্যতে সেই বিষয়ে জ্ঞানার্জন করবেন তার জন্যই এই আলোচনার প্রয়োজন।

গঠনগত দিক আলোচনার পরে যদি নাট্যবৃত্তের প্রসঙ্গে যাই, তবে *চিত্রাঙ্গদা*-র ক্ষেত্রে শ্রীগদিত উপরূপকের ছায়াতলে *চিত্রাঙ্গদা*-কে বিশ্রান্তি নিতে লক্ষ্য করি। *চিত্রাঙ্গদা*-র উৎস বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর

আদিপর্বের 'অর্জুনবনবাস' নামক অধ্যায়। অর্থাৎ এটি প্রখ্যাত বৃত্তচ্যুত কোনও নাট্যরচনা নয়। উপরূপকের মধ্যে প্রখ্যাত বৃত্ত যেগুলিতে দেখা যায়, তার মধ্যে ত্রোটক, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, শ্রীগদিত এবং হল্লীশে লক্ষ্য করি। এমনকি শ্রীরূপগোস্বামীর *দানকেলিকৌমুদী*-র সৌজন্যে ভাণিকাকেও তৎপর্যায়বর্তী বলাই যায়। অর্থাৎ এই উপরূপকগুলিতে *ঋগ্বেদ*, বাল্মীকীয় *রামায়ণ*, বৈয়াসিক *মহাভারত, হরিবংশ* ইত্যাদির নিঃসরণহেতু *চিত্রাঙ্গদা* - সহ *বিদায় -অভিশাপ, কর্ণকুন্তীসংবাদ, গান্ধারীর আবেদন*-কে বলা যায় প্রখ্যাতবৃত্তাশ্রয়ী রচনা। তাই এই গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিনয়চন্দ্র মজুমদারের উদ্ধৃতি নথিভুক্ত করার সময় উপরূপক সম্পর্কে যে হীনতা বা ভ্রষ্টতার পরিচয় পেয়েছি, তার প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে এগুলি নিম্নরুচির পরিচায়ক হলেও কিছু উপরূপকের পাত্র-পাত্রী কিন্তু ছিল ভারতীয় সাহিত্যের পারম্পরিক ঐতিহ্যের স্তম্ভ। যেমন *বিক্রমোর্বশী* ত্রোটকের পুরুরবা-উর্বশী, *উন্মত্তরাঘব* প্রেক্ষণকের রাম-লক্ষ্মণ, *দানকেলিকৌমুদী* ভাণিকার রাধা-কৃষ্ণ, *সুভদ্রাহরণ* শ্রীগদিতের অর্জুন, *দ্রৌপদীস্বয়ংবর* শ্রীগদিতের অর্জুন-দ্রৌপদী-কর্ণ, *পার্থপাথেয়* উল্লাপ্যের অর্জুন-উলুপী-চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি।

তাই রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের মধ্যে দেখছি এই চরিত্রগুলিরই উপস্থিতি। এক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট অবশ্যই দায়ী। সেই সময় রামায়ণ, মহাভারত এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরাণসাহিত্যকে তখনকার সাহিত্যিকরা উপেক্ষা করতে পারেননি। যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ* মহাকাব্য বাল্মীকীয় রামায়ণের অবলম্বনে রচিত। এছাড়াও রয়েছে গিরিশচন্দ্র ঘোষের একাধিক নাট্যরচনা। যথা *দক্ষযজ্ঞ, জনা, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস* প্রভৃতি। তাই রবীন্দ্রনাট্যও সেই সাহিত্যতীর্থপথের যাত্রী। তবে যেহেতু রবীন্দ্রনাথ *চিত্রাঙ্গদা* রচনার পূর্বে *প্রকৃতির প্রতিশোধ, মায়ার খেলা* ইত্যাদি ক্লৃপ্তবৃত্তাশ্রয়ী নাট্যরচনা করেছেন, তাই সেক্ষেত্রে কাব্যনাট্যরচনার ক্ষেত্রেও কি তিনি কবিকল্পনার স্বপ্নিল চিত্রকে শব্দে-অর্থে রূপ দিতে পারতেন না? *কাহিনী* কাব্যগ্রন্থার্গত রচনাগুলিতে রাজতন্ত্রের পরিচালনার দায়বদ্ধতা, শর্ত, ভব্যতা এমনকি কূটনৈতিকতার প্রসঙ্গ রয়েছে। আবার, *বিদায় -অভিশাপ* নাট্যে শ্রেয় এবং প্রেয়ের দ্বন্দ্ব। *চিত্রাঙ্গদা* সম্পর্কে তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

অনেক বছর আগে রেল-গাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে; তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেল-লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে, যে, আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে; তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল, সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে, তা হলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে।[১২০]

তাই মানবজীবনে ঘটিত সমস্যাগুলির প্রতিফলন এই কাব্যনাট্যগুলি। তাই শুধু রচনার উৎসগত সাদৃশ্য-ই নয়; বরং *বিক্রমোর্বশী* ত্রোটকে যেখানে কর্তব্যতায় বিচ্ছেদ যে স্বরাজ্য থেকেও বহিষ্কৃত করতে পারে কোনও অমোঘ অভিশাপে, তার সঙ্গে ভাবনাগত একটি মিল রয়েছে *চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ* নাট্যে। কচ সত্যধর্মাচরণ করেছে।

সে গুরুকন্যা দেবযানীর লালসার শিকার হতে চায়না। তাই দেবযানীর অভিশাপের বিরুদ্ধে কোনও দাম্ভিকতা প্রকাশ করেনা। এই নাট্যে দেবযানী চরিত্রটিই নিন্দ্যার্হ। সত্যসুন্দর মঙ্গলময় যে প্রেম, তাকে অনুসরণ করেনা দেবযানী। সে চায় তার নর্মসহচররূপে কচ তার বাহুপাশে ধরা দিক। তাই কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবনার গুণমান সমতুল্য। আবার, *সুভদ্রাহরণ* শ্রীগদিতে অর্জুনের পরাক্রমতা তথা একজন ক্ষত্রিয় রাজার আচরিত ধর্মের ইঙ্গিত *চিত্রাঙ্গদা*-তেও পাওয়া যায় –

অর্জুন, গাণ্ডীবধনু, ভুবনবিজয়ী।
সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম,[১২১]

তাই যদি উপরূপকের প্রকারবিশেষের কথাবস্তু, অঙ্ক, নায়ক-নায়িকার মনস্তত্ত্ব, সন্ধি, বৃত্তি, সাংগীতিক প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের সমমাত্রিকতা রবীন্দ্রকাব্যনাট্যে অনুসন্ধান করি, তবে হয়ত কোনও একপ্রকার উপরূপকের সঙ্গে কোনও একটি কাব্যনাট্যের সমীকরণ ধরা দিতে পারে। তবে এই অধ্যায়ের এই উপবিভাগে মূলতঃ সম্পাদ্য হ'ল রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের বিষয়, জনকল্যাণার্থে বিষয়ানুগ ঘোষিত বার্তা এবং গঠনগত শৈলীর সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যনাট্যাবলির তুলনামূলক আলোচনা। সুতরাং উপরিকথনে রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী নাট্যগুলির সঙ্গে উপরূপকতায় পাওয়া গেছে খ্যাতবৃত্তের পাত্র-পাত্রীর কোনও একটি কথাংশের উপস্থাপনা, কবিকল্পনার চাতুর্য, বাগভিনয়ের অগাধ সৌলভ্য এবং কান্তাসম্মিত পদ্ধতিতে সহৃদয়কে শিক্ষাদান।

৩.৪ উপরূপক ও রবীন্দ্র-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য :

উপরূপকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের রচনা এবং পরিবেশনাগত সাম্যের জন্য পুনরায় আধ্যান করতে হয় হেমচন্দ্রের *কাব্যানুশাসন* গ্রন্থে। প্রথম অধ্যায়েই দেখা গেছে যে তিনি 'গেয়প্রেক্ষ্যকাব্য' শব্দের ব্যবহার করেছেন। তাহলে দ্বাদশ শতাব্দীতে হয়ত পঞ্চদশ প্রকার গীতিনাট্যের প্রচলন ছিল এমনটি অনুমান করা যেতে পারে। সেই অধ্যায়েই ভোজদেবের পদার্থাভিনয়মূলক দ্বাদশ প্রকার দৃশ্যশ্রব্যাত্মক কাব্যের উল্লেখ পেয়েছি। এমনকি নর্তনক ইত্যাদির বিবরণ থেকেই বোঝা যায় সেগুলি নৃত্যের বিস্তৃত কার্যক্ষেত্র ছিল। তাই খ্রিস্টিয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে যে সংস্কৃত গীতিনাট্য বা নৃত্যপ্রধান নাট্যের গৌরবময় অবস্থান ছিল তার প্রমাণপত্রিকার খণ্ডচিত্র উঠে এসেছে নাট্যশাস্ত্রমূলক লক্ষণগ্রন্থগুলির বদান্যতায়। তবে বিশ্বনাথের *সাহিত্যদর্পণ* -এ উক্ত বর্ণনাবলি থেকে এমন সিদ্ধান্তের দ্বার উন্মোচিত হয়না যেখানে সগর্বে বলা যায় যে খ্রিস্টিয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর গীতাত্মক এবং নৃত্যাত্মক কাব্যগুলিরই নামান্তর 'উপরূপক'। এই গবেষণা কার্যের প্রথম অধ্যায়ে তা দর্শিত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যের সঙ্গে যথাক্রমে 'গেয়প্রেক্ষ্যকাব্য' এবং 'পদার্থাভিনয়াত্মক দৃশ্যশ্রব্যকাব্য'-এর অন্তরঙ্গতার অনুসন্ধান করা হবে নাকি 'উপরূপক'-এর বিষয়গত এবং পরিবেশনগত ঐক্যের সম্বন্ধস্থাপনা করা হবে তা জিজ্ঞাস্য। তার উত্তরের জন্যই রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যের আরেকবার পুনঃপর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রকার নাট্যগুলির সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজে দ্বিমত থাকলেও গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্য বিষয়ে সকলেই সহমত পোষণ করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যকে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাতেই দু'ভাগে করা যায়। যথা "গানের সূত্রে নাট্যের মালা" এবং "নাট্যের সূত্রে গানের মালা"। প্রথম উপবিভাগে রয়েছে *বাল্মীকি-প্রতিভা* ও *কালমৃগয়া* এবং দ্বিতীয় প্রকারটি হ'ল *মায়ার খেলা* । অন্যদিকে নৃত্যনাট্যের মধ্যে রয়েছে চারটি রচনা – *চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা* এবং মায়ার *খেলা* । এক্ষেত্রে পাঠকের ভ্রান্তিনিবৃত্তির জন্যই বলতে হয় যে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে মায়ার খেলা গীতিনাট্যটিকেই ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন। শান্তিদেব ঘোষের *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য* গ্রন্থ থেকে জানা যায় –

গীতিনাট্য "মায়ার খেলা"-কে নৃত্যে অভিনয় করবার কথা প্রতিমা দেবীর কাছে শুনে, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে, তাকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করবার কাজে গুরুদেব হাত দিলেন।

... ...

মায়ার খেলার মহড়ায় মাঝে মাঝে বড় রকমের ছেদ পড়ত, নানা কারণে। তার জন্যে নাটকটি পূর্ণরূপ গ্রহণ করতে না পারায়, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে দোলের দিন সংক্ষেপে কেবল মাত্র প্রথম অংশটি অভিনীত হয়েছিল।[১২২]

তাই বর্তমানে *মায়ার খেলা* নামের একটি গীতিনাট্য এবং একটি নৃত্যনাট্য বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত *রবীন্দ্রনাট্যসংগ্রহ*-তে বঞ্চিত হলেও *গীতবিতান* (অখণ্ড সংস্করণ)-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এমনকি ২০১২ খ্রিস্টাব্দের দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় বিশ্বভারতী আয়োজিত বসন্তোৎসব-এ আশ্রমপ্রাঙ্গণে *মায়ার খেলা* নৃত্যনাট্যটি অভিনীত হয়েছে। তবে এই নৃত্যনাট্যগুলি যদি একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করে, তবে সেই চতুষ্কোণের সংযোগসাধক রেখাগুলিতে অবস্থান করছে আরও কয়েকটি রবীন্দ্ররচনা। বর্তমানে সেই রচনাগুলির পরিবেশনরীতি রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের বিভঙ্গানুসারী হলেও সেগুলি প্রকৃতিগতভাবে নৃত্যনাট্য নয়। এগুলি হ'ল *ফাল্গুনী, বসন্ত, নটীর পূজা, নবীন, সুন্দর, শাপমোচন* এবং *তাসের দেশ* । একথা বিস্মৃত হওয়ার অবসর নেই যে প্রতিমা দেবীর নবোদ্যোগে এবং পূর্ণোদ্যমে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে *চিত্রাঙ্গদা*-র রচনা এবং অভিনয়ের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের যুগ শুরু হয়। যেহেতু *নটীর পূজা* থেকে *তাসের দেশ* পর্যন্ত রবীন্দ্রনাট্যে নৃত্যের ব্যবহারিক দিকের বিভিন্ন অভিক্রিয়া চলেছে, তাই এগুলিকে পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য বলা চলেনা। রবীন্দ্রনাট্যের শ্রেণিবিন্যাসে এগুলি যে বিভাগেই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন; রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের প্রেক্ষিতে এগুলিকে বলা যায় সগীত গদ্যনাট্য। নৃত্যনাট্যের শরীরে রয়েছে বাক্-অর্থ-তাল-সুরের চতুষ্পাদ বা 'চতুরঙ্গ' গান। রবীন্দ্রনাথের গান গ্রন্থে সুকুমার সেন মনে করেছেন *রবীন্দ্রনাথের গান : অধরা মাধুরী – রূপের সন্ধানে* গ্রন্থে–

রবীন্দ্রনাথের অনেক চতুরঙ্গ গানে, কবি নিজের সংবেদন একটা জড়িয়ে থাকে যে তার সঙ্গতি কবি ছাড়া আর কারো কাছে সহসা বোধগম্য নয়।[১২৩]

তাঁর এই ভাবনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা যায় এই গবেষণাপত্রে। তাই রচনাগতদিক থেকে সেগুলি 'গীতিনাট্য' এবং প্রযোজনাগত দিক থেকে সেগুলি 'নৃত্যনাট্য'। এমনকি বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলির অভিনয় হয় নৃত্যনাট্যেই। ১৮৮০-র দশকে *বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া* এবং *মায়ার খেলা*-তে কুশীলবগণই মঞ্চে গান গেয়ে অভিনয় করেছিলেন। এই পরিকাঠামো বর্তমানে পরিবর্তিত হয়ে নেপথ্য থেকে গানগুলি পরিবেশিত হয় এবং নৃত্যশিল্পীরা মঞ্চে নৃত্যাভিনয় করে থাকে। তাই সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের সংখ্যা হবে সাতটি। যেহেতু নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হলে গায়ক, বাদকরাও সমানভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে, তাই একটি গীতিনাট্যও যবনিকার অন্তরালে অনুষ্ঠিত না হয়ে মঞ্চোপরি নৃত্যের পশ্চাতে অভিনীত হবে এমনটি বলা চলে। সহৃদয় প্রেক্ষক তাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করতে না পারলেও গীতিরসে প্লাবিত হয়। একই সঙ্গে নৃত্যানুষ্ঠানটি রচনা করে একটি নৃত্যনাট্যের। তাই গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যের যুগপৎ অভিনয় হয় বলেই এগুলিকে 'সাংগীতিক নাট্য' পরিচয়েও অভিহিত করা যেতে পারে ব'লেই অনুমান।

তবে এই গবেষণার যেহেতু বর্তমান সময়কালকে নির্দেশ করছে, তাই একবিংশ শতাব্দীর আধারকে গৌণ করবে না। বিশ্বভারতী তথা যে কোনও প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, ঋতুনাট্য, *শাপমোচন* কথিকা, *তাসের দেশ* এবং নৃত্যনাট্যগুলির একই অভিকরণ লক্ষণীয়। এই প্রতিটিই নৃত্যনাট্যের কৌশলে অভিনীত হয়। শ্রীমতী অলকানন্দা রায়ের পরিচালনায় *বাল্মীকি-প্রতিভা* গীতিনাট্যের প্রশংসা বাঙালি সমাজের সর্বস্তরে অভিনন্দিত। সেখানেও প্রাচীনতাকে অনুসরণ করা হয়নি। নৃত্যশিল্পীগণ নৃত্যের সঙ্গে মঞ্চে গান পরিবেশন করেনি। কণ্ঠস্বর, বাদ্যযন্ত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে অপরাপর কুশীলব। এমনকি ২০১৮ এবং ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী-তে দোলপূর্ণিমার প্রাক রজনীতে অভিনীত হয়েছে যথাক্রমে *নবীন* এবং *সুন্দর* । সেই প্রযোজনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী থেকেই বলা যায় যে তা ছিল নৃত্যনাট্যের সমতুল্য। যিনি রবীন্দ্রসাহিত্যবিশেষজ্ঞ নন বা যার রবীন্দ্রনাট্যের শ্রেণিবিভাগ বিষয়ে কোনও ভাবনার অবকাশ নেই, তিনি এগুলিকে নৃত্যনাট্য ভাবতে দ্বিধা করবেন না। এক্ষেত্রে একবিংশ শতাব্দীর কিছু সময়ে বিশ্বভারতী-তে বসন্তোৎসবে অভিনীত রবীন্দ্রনাট্যের একটি সারণি প্রস্তুত করা হোক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে –

খ্রিস্টাব্দ	প্রযোজনা
২০০০	*বাল্মীকি - প্রতিভা*
২০০৪	*মায়ার খেলা (গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মেলবন্ধন)*
২০০৫	*শ্যামা*
২০০৬	*ভানুসিংহের পদাবলি*
২০০৭	*শাপমোচন*
২০০৮	*কালমৃগয়া*

২০০৯	*চণ্ডালিকা*
২০১০	*(পরিকল্পিত) বসন্ত*
২০১১	*চিত্রাঙ্গদা*
২০১২	*মায়ার খেলা*
২০১৩	*শাপমোচন*
২০১৪	*শ্যামা*
২০১৫	*বসন্ত*
২০১৬	*চিত্রাঙ্গদা*
২০১৭	*তাসের দেশ*
২০১৮	*চণ্ডালিকা*
২০১৯	*শ্যামা*

এই তালিকা থেকে বোঝা যায় এর মধ্যে *ভানুসিংহের পদাবলি, কালমৃগয়া, শাপমোচন, বসন্ত, তাসের দেশ* রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। এমনকি *ভানুসিংহের পদাবলি* মূলতঃ একটি কাব্যগ্রন্থ (১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত) এবং মুদ্রিত কালে তার নাম ছিল *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী* । তবে এই পদগুলির স্বরলিপি স্বরবিতানের একবিংশ খণ্ডে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে (১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশিত হওয়ায় এবং এই কাব্যের পদগুলির পারম্পর্য সম্পাদনা করলে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের আখ্যান পাওয়া যায়। তাই এভাবে একটি নবনির্মিতিবশতঃ এটিও নৃত্যনাট্যের সমমর্যাদা লাভ করেছে। রাধা, কৃষ্ণ এবং রাধার সখীগণের মাধ্যমে এর নৃত্যনাট্যাত্মক অভিনয় একটি পরম্পরায় পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ সমীক্ষায় প্রাপ্ত রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের সঙ্গে সমকালকে যুক্ত করলে যেক'টি 'নৃত্যপ্রধান রবীন্দ্রনাট্য' পাই তা হ'ল *ভানুসিংহের পদাবলি, বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা (১), বসন্ত, নবীন, শাপমোচন, সুন্দর, তাসের দেশ, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা এবং মায়ার খেলা* (২)।

অর্থাৎ উপরূপকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের তুলনামূলক সম্পর্ক বিচারে উপরিউক্ত নৃত্যপ্রধান রবীন্দ্রনাট্যের উল্লেখ প্রয়োজন। কাব্যনাট্য ও রবীন্দ্রনাট্যের পারস্পরিক সাদৃশ্যে যেরূপ বিষয়গত, গঠনগত এবং পরিনেশনাগত এই বিন্দুত্রয়ের আশ্রয় গৃহীত হয়েছিল, এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হওয়া উচিত নয়। তবে যেহেতু 'নৃত্য' এখানে কর্তৃত্বপূর্ণ, তাই প্রথমে এই নৃত্যপ্রধান নাট্যগুলির নৃত্যের প্রয়োগবৈচিত্র্য বিষয়ে আলোকপাত করতে পারি।

এখন বিচার্য বিষয় হ'ল রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের নৃত্যের প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা কতখানি। এ প্রসঙ্গে ২৭শে অগাস্ট, ২০১৯ তারিখে দুপুর ১২টায় 'রবীন্দ্রগীতিনাট্য এবং রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের সমগ্রতা' শিরোনামে বিশ্বভারতী-র নাট্যবিভাগের অধ্যাপক ডঃ অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়ের থেকে একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হ'লে তিনি

জানান যে *নটীর পূজা*-য় যে চরিত্রটির জন্য নৃত্যকলা ব্যবহৃত হয়েছিল, সেই চরিত্রটি একজন 'নটী'। সে নিবেদন করে নৃত্যের মাধ্যমেই। ঘৃণিত, সংকুচিত, সুসভ্য সমাজবহির্ভূত শিল্পকলার সে একজন প্রতিনিধি। তার মৃত্যুর কারণও হয় 'পূজা'। রবীন্দ্রনাট্যে সেটিই প্রথম যেখানে কোনও নৃত্যপ্রাণ চরিত্রের প্রণাম রয়েছে। আবার, *শ্যামা* নৃত্যনাট্যের নায়িকা শ্যামা-ও একজন নটী। তাই এ যেন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের পালা রবীন্দ্রনৃত্য এবং রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের ইতিহাসে। অধ্যাপক ডঃ মুখোপাধ্যায়ের এই মনন থেকেই পরিস্কৃত হয়ে যায় যে *শাপমোচন* - এর নায়ক অরুণেশ্বর ছিল পূর্বজন্মে স্বর্গীয় গন্ধর্ব। *শাপমোচন*-এর প্রথম দৃশ্যের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ তার পরিচয় দিয়ে বলেছেন "গন্ধর্ব সৌরসেন সুরসভায় গীতনায়কদের অগ্রণী"[১২৪]। আবার ধীরললিত নায়ক অরুণেশ্বরের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –

অন্ধকারে বীণা বাজে। অন্ধকারে গন্ধর্ব কলার নৃত্যে বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে। সেই নৃত্যকলা নির্বাসনের সঙ্গিনী হয়ে এসেছে তার মর্ত্যদেহে।[১২৫]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বোধহয় চেয়েছিলেন যে এই কথিকা নৃত্যাকারে পরিবেশিত হওয়ার জন্য চরিত্রের মধ্যেও নৃত্যের একটি অনুষঙ্গ থাকুক। তাই অরুণেশ্বরের সঙ্গে নৃত্যই মর্ত্যলোকের সহচারিণী হয়েছে এমন একটি বিবরণ দিয়ে গেছেন।

আবার ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্য যখন ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ধরা দিল *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্যে, সেখানে তাঁর পক্ষে একটি একটি সুবিধা ছিল। বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর বিরাট পর্বে অর্জুনকে বৃহন্নলা রূপে আবির্ভূত হতে দেখেছে পাঠকবর্গ। ছদ্মবেশী অর্জুন ছিল উত্তরার সংগীতপ্রশিক্ষক। এমনকি *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যে যে প্রকৃতিতে অর্জুনকে নাট্যমধ্যে উপস্থিত হতে দেখি, সেখানে তার ধীরোদাত্ত গুণের সমানুপাতে তার ললিত হাবভাব প্রত্যক্ষ করি। *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদাকে তিরস্কার এবং পরে তার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যেই তার গাম্ভীর্যপূর্ণ আচরণ প্রকাশ পেলেও নবরূপে চিত্রাঙ্গদার আবির্ভূত হওয়ার সময় থেকেই তার মধ্যে সৌকুমার্য, মোহান্ধতার একটি মসৃণ আলিম্পন অঙ্কিত হয়ে যায়। তাই এখানেও অর্জুনের নৃত্য প্রাসঙ্গিকতাকে নস্যাৎ করেনা। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সংস্কৃতিতে এরকম ভদ্রস্থ নৃত্যনাট্যের অস্তিত্ব ছিলনা। তাই কলিকাতার নিউ আম্পায়ার থিয়েটারে চিত্রাঙ্গদা মঞ্চস্থ হওয়ার পরে সাফল্য অর্জন করায় তিনি পরবর্তী নৃত্যনাট্যে লেখনীকে প্রসারিত করেন। বাংলা নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে কোনওরূপ বাদ-প্রতিবাদের সপক্ষে তাঁত উত্তর ছিল প্রস্তুত। তিনি নাট্যচরিত্রগুলির প্রেক্ষাপটবিচারে যুক্তিসহকারে প্রমাণ করতে পারতেন যে এই চরিত্রগুলির অবস্থানবশতঃ কথিকাটি বা নৃত্যনাট্যটি ঔচিত্যের বাহক। *চিত্রাঙ্গদা*-র পরে তিনি রচনা করেছিলেন *পরিশোধ* নৃত্যনাট্য। তবে এটিই ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শ্যামা নামে আত্মপ্রকাশ করে[১২৬]।

সমাপ্তি পর্বে রয়ে যায় *চণ্ডালিকা* এবং *মায়ার খেলা* । *চণ্ডালিকা* গদ্যনাটককে তিনি রূপান্তরিত করেছেন নৃত্যনাট্যে। সেখানে প্রকৃতি বা মায়ার কোনও নেপথ্য কাহিনি বা অনুষঙ্গ নেই যা নৃত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই

সময়ে রবীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস নিশ্চিত ছিল। তিনি জানতেন তাঁর নৃত্যনাট্য জয়ী হয়েছে সহৃদয়বর্গের আশীর্বাদে। *মায়ার খেলা*-র ক্ষেত্রেও একই ভাবনা কার্যকর।

রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যে নৃত্যের প্রাসঙ্গিকতার সম্পর্কে আলোচনা করার পরে পরবর্তীত সূচি হয় উপরূপকের সঙ্গে তার তুলনা। এর জন্য *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্যটির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যে সখীদের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার শিকার দৃশ্যের গানটির উল্লেখ করা যাক –

গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্বতশিখরে,
অরণ্যে তমশ্ছায়া ।
মুখর নির্ঝরকলকল্লোলে
ব্যাধের চরণধ্বনি শুনিতে না পায় ভীরু
হরিণদম্পতি ।
চিত্রব্যাঘ্র পদনখচিহ্নরেখাশ্রেণী
রেখে গেছে ওই পথপঙ্ক-'পরে,
দিয়ে গেছে পদে পদে গুহার সন্ধান ।[১২৭]

এই গানটি বিশ্বভারতী-র প্রযোজনায় ২০১১ খ্রিস্টাব্দে *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্যে কীভাবে প্রযোজিত হয়েছিল, সে বিষয়ে ৮ই জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে দূরাভাষে গৃহীত একটি সাক্ষাৎকারে বিশ্বভারতী-র সংগীতভবনের প্রাক্তন ছাত্রী ডঃ তমালিকা দে যে তথ্যগুলি দিয়েছেন, সেগুলির আশ্রয়ে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করা যেতে পারে।

বিশ্বভারতী-র সংগীতভবনে অধ্যাপকদের সম্মতিক্রমেই রবীন্দ্রনৃত্যে এবং রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যে ভরত-নাট্যশাস্ত্র-তে উল্লিখিত মুদ্রা, করণের অতিরিক্ত কিছু লৌকিক মুদ্রার ব্যবহার করা হয় প্রয়োজন অনুযায়ী। উপরিউক্ত গানটির মধ্যে একটি কাঠিন্য প্রকাশিত হয় এবং গানটিতে বীররসের ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়েছে। প্রথম চরণেই "গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে"-অংশের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে আকাশে মেঘের গর্জন শুরু হয়েছে। এখানে 'গুরু গুরু' শব্দদ্বৈত্য লক্ষ্য করা যায়। তাই মোট চারটি 'গুরু' শব্দ রয়েছে। এছাড়াও 'ঘন' (জমাটবাঁধা) 'মেঘ' এবং 'গরজে' (গর্জন) এই তিনটি শব্দও দেখা যায়। এই চারটি 'গুরু' এবং 'ঘন মেঘ'-কে বোঝানো হয় আকাশসূচক অঙ্গভঙ্গির দ্বারা। এখানে 'loud entry'-ই আকাশে ঘনীভূত মেঘের প্রতীক কিন্তু 'গরজে' বা গর্জনকে বোঝানোর কোনও উপায় নেই। যেহেতু গানটির মধ্যে একটি দ্রুতগতিতে কার্যনিষ্পন্নতার কথা বলা হয়েছে, তাই এক্ষেত্রে সহৃদয়ের বুঝতে অসুবিধা হবেনা যে মেঘের সঙ্গে তার গর্জন-ও থাকবে। তাই 'গরজে' শব্দটির 'পদার্থাভিনয়' থাকেনা। পরের অংশে রয়েছে 'পর্বতশিখরে'। অর্থাৎ সেই মেঘের ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে পর্বতের চূড়ার ওপরে দৃশ্যমান আকাশে। তাই এই অংশটি গুরত্বপূর্ণ। মেঘকে বোঝানো হ'লে তার দৃশ্যগত অবস্থানও বোঝানো কর্তব্য। তাই 'ত্রিপতাক' মুদ্রার দ্বারা 'পর্বত' অভিপ্রেত হয়ে থাকে। "অরণ্যে তমশ্ছায়া" এই অংশে বন, অন্ধকার ইত্যাদিকে মুদ্রার ব্যবহারে বোঝানো সম্ভব নয় ব'লেই এখানে সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারস্থ হতে

হয়। এর দ্বারাই ভয়ের ভাবকে ফুটিয়ে তোলা হয়। অরণ্য বৃক্ষের সমাহার। তাই বৃক্ষবাচক কোনও আঙ্গিক বা মুদ্রার ব্যবহারে কেবলমাত্র একটি বৃক্ষকেই দেখানো যায়। তাই অন্ধকার ছায়ায় যে ত্রাস উৎপন্ন হয়, তাকেই সহৃদয়ের সামনে উপস্থাপিত করা হোক এমনই সংগীতভবনের সিদ্ধান্ত। এরই সঙ্গে গতি বা footsteps কেও প্রাধান্য দেওয়া হয় গানের এই অংশের বক্তব্যে। এরপরে আসে "মুখর নির্ঝরকলকল্লোলে"। এখানে বৃষ্টির জলধারাকে ব্যক্ত করা হয় 'কলকল্লোলে' এই শব্দবন্ধের জন্য। তবে বৃষ্টির জলধারার গতি হয় উল্লম্বভাবে কিন্তু নদী বা সাগরের তরঙ্গ হয় আনুভূমিক। তাই আঙ্গিকটি হওয়া উচিত নির্ঝরিণীবৎ। তাই অঙ্গুলির কম্পনে বৃষ্টির নৃত্যালু ভাবকে ফুটিয়ে তোলা হয় এবং সঙ্গে থাকে তরঙ্গের অভিব্যক্তি হস্তাভিনয়ে। গানের কথায় এরপরেই এসে যায় ব্যাধের হরিণশিকার। হরিণমিথুন ব্যাধের চরণধ্বনি শুনতে পাচ্ছেনা। তাই 'চরণধ্বনি'কে অব্যক্ত রেখে কেবলমাত্র ব্যাধের আঙ্গিকটুকুতেই অর্থবোধ সম্ভব। তবে ব্যাধকে কীভাবে বোঝানো যাবে? তার জন্য ব্যাধের অস্ত্রশস্ত্র-ই দ্যোতক। বাম হস্ত প্রসারিত ক'রে শিখর এবং বক্ষসংলগ্ন দক্ষিণ হস্তে কটকমুখ মুদ্রার ব্যবহার ধার্য হয়। অর্থাৎ ব্যাধের চিত্রকল্পকে উপস্থিত করা হয় এই অংশে নৃত্যের মাধ্যমে। আবার, হরিণদম্পতির একটি বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে – 'ভীরু'। সেই বিশেষণকে উহ্য রেখে মৃগশীর্ষ মুদ্রার দ্বারাই হরিণকে সূচিত করা হয়। গানের সঞ্চারী অংশে বলা হচ্ছে "চিত্রব্যাঘ্র পদনখচিহ্নরেখাশ্রেণী"। এখানে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ গানের রসকে স্মরণে রেখেই। এই অংশ থেকে বোঝা যায় যে হিংস্র ব্যাঘ্রের চরণচিহ্ন পথে অঙ্কিত রয়েছে। তাই ব্যাঘ্রের পরিবর্তে তার 'থাবা'র প্রদর্শন হয়ে থাকে লৌকিক মুদ্রার দ্বারা। আবার, সেই চরণচিহ্ন রয়ে গেছে পথে। তাই এখানে চরণচিহ্নসংবলিত পথের মধ্যে বিশেষণকে রিক্ত ক'রে পথকেই লৌকিক মুদ্রার দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে গুহার কথা। নৃত্যমুদ্রার দ্বারা গুহার দ্বার প্রদর্শিত হয় প্রেক্ষক-অভিমুখে। হস্তদ্বয় সংযুক্ত ক'রে পুনরায় দুদিকে হস্তপ্রসারণ ঘটে এবং পদাভিনয়ে এক্ষেত্রে একটি step পিছিয়ে যাওয়া হয়।

এটি যেমন একটি উদাহরণ, তেমনই আরেকটি নিদর্শন হ'ল *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্যের ষষ্ঠ দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদার আত্মপরিচয়ের গানটি –

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী ।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী ।[১২৮]

এই গানের ক্ষেত্রে ডঃ তমালিকা দে তাঁর অভিজ্ঞতাটি যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা প্রথম গানটির নৃত্যযোজনা অপেক্ষা অনেকখানিই স্বতন্ত্র। এখানে প্রথম চরণের 'আমি'-র বোধক মুদ্রা হ'ল অলপদ্মক ও দোলহস্ত। এদুটি যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম হস্তে সম্পাদিত হয়। 'চিত্রাঙ্গদা' তার নাম। তাই সেটিকে অভিব্যক্ত করার যতখানি অপ্রয়োজন, ঠিক ততখানিই প্রয়োজন 'রাজেন্দ্রনন্দিনী' শব্দের ব্যাখ্যা। আবার, এরই মধ্যে 'নন্দিনী' শব্দটির অর্থ কন্যা। তাই লিঙ্গসূচক এই শব্দাংশের ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা নেই। 'রাজেন্দ্র' শব্দটিকে হস্তমুদ্রার দ্বারা পরিচালিত করা হয়। বামহস্তে কটকমুখ এবং দক্ষিণ হস্তে সূচী মুদ্রার গ্রহণ করা হয় এক্ষেত্রে। যেহেতু সে রাজপরিবারের

সংশ্লিষ্ট কোনও এক রমণী, তাই তার সেই পিতৃপরিচয়টির মর্যাদা ক'তখানি তা বোঝানোর জন্যই এই শব্দাংশের ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। এরপরে আসে তার আরেক স্বীকারোক্তি। সে পূজনীয় দৈবীশক্তির পরাকাষ্ঠা নয়। তাই এক্ষেত্রে 'দেবী' বোঝানোর যে উপায় অবলম্বিত হয়, তা ঈষৎ উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত। দেবতার স্থান মর্ত্যলোকের উর্ধ্বে। তাই সেটুকুই অভিব্যঞ্জিত হয়। এই সরল সূক্ষ্মতা-ই রবীন্দ্রনৃত্যের চারুতা। 'সামান্যা নারী'-র ক্ষেত্রে দক্ষিণ হস্তে অনুসৃত সূচী মুদ্রার তর্জনী অঙ্গুলিকে বামহস্তে কৃত কটকমুখ মুদ্রার সন্নিকটে আনতে হয় এবং শিরঃস্পন্দনের দ্বারা 'নহি' সূচিত হয়। এরপরে গানে বলা হয়েছে –

পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি ।[১২৯]

এই দুই ক্ষেত্রেই অর্জুনের তার প্রতি মনোভাবকে জ্ঞাপিত করার নির্দেশ রয়েছে। 'পূজা'-র জন্য পরিচিত অঞ্জলিমুদ্রা এবং 'ঊর্ধ্বে'-র জন্য দু বাহু নান্দনিকভাবে উত্তোলিত করে কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করা হয়। তারই সঙ্গে 'নহি নহি'-তে থাকে পতাকহস্ত এবং শিরঃস্পন্দন। 'হেলা' অর্থাৎ অবহেলার জন্য পশ্চাতে দৃষ্টি এবং এই চরণের 'নহি নহি'-র প্রকাশভঙ্গি পূর্বাপেক্ষা ভিন্ন। এখানে দুটি হস্তেই নঞর্থক ইঙ্গিত প্রকাশিত হয় পৃথকভাবে। এরপর গানে চিত্রাঙ্গদা বলে –

যদি পার্শ্বে রাখ মোরে
সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে,
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে ।
আজ শুধু করি নিবেদন –
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী ।[১৩০]

এখানে 'পার্শ্বে' শব্দে অর্জুনের দিকে গমন, 'সংকট'-কে দেখানো হয় এখানে 'পার্শ্বে' শব্দে অর্জুনের দিকে গমন, 'সংকটে সম্পদে'-কে দেখানো হয় সম্পূটমুদ্রার মাধ্যমে। এটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্থবহ মুদ্রা। সম্পুটমুদ্রা সংযুক্ত হস্তমুদ্রা। তাই চিত্রাঙ্গদা এবং অর্জুনের উভয়ে একত্র অবস্থানের প্রকাশকারক এই মুদ্রা। যেহেতু চিত্রাঙ্গদা এখানে প্রতিশ্রুতি দান করছে যে সে অর্জুনের সংকটে, সম্পদে তার ছায়াসঙ্গিনীরূপে অবস্থান করবে, তাই সংযুক্ত মুদ্রার ব্যবহার লক্ষণীয়। এরপরে 'সম্মতি' অংশে পুনরায় পতাকমুদ্রা গৃহীত হয়। আবার, 'কঠিন ব্রতে' যা করণীয় থাকে, তা হ'ল বাম হস্তে শায়িত পতাকভঙ্গির ওপর দক্ষিণ হস্তে মুষ্টির প্রয়োগ। এরপরে নিজেকে চেনানোর কথা বলতে ৩৬০ ডিগ্রি ঘূর্ণনে নিজেকে দেখানো। 'নিবেদন' অর্থে এখানে সমর্পণ। তাই কিঞ্চিৎ নতমস্তক প্রযুক্ত হয়।

এক্ষেত্রে ডঃ তমালিকা দে জানিয়েছেন যে এই নিবেদন এবং চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের শেষ দৃশ্যে প্রকৃতির নিবেদনে পার্থক্য থাকা আবশ্যক। সেখানে প্রকৃতি তার আত্মসর্বস্বতার বিসর্জন দিচ্ছে। সেহেতু ভূমিতে নত হওয়া। এখানে চিত্রাঙ্গদা 'রাজেন্দ্রনন্দিনী' এবং সে অর্জুনের কাছে আত্মনিবেদিত হলেও তার নিজ বীর্যবত্তাকে ত্যাগ করতে চায়না। সে কেবলই তার যোগ্য সঙ্গিনী হতে চায়। তাই তার নিবেদনে প্রকাশভঙ্গির পৃথকতা হতে হতে সাহিত্যানুগ। এভাবেই ডঃ তমালিকা দে-র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই গানের নৃত্যাভিনয়ের তথ্যটি লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে ? *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যের "আমি চিত্রাঙ্গদা" কবিতাটি নৃত্যনাট্যের সঙ্গে প্রায় সমরূপাপন্ন এবং সমভাবাপন্ন। শুধু শেষের সন্তানের প্রসঙ্গটি বর্জিত হয়েছে নৃত্যনাট্যে। এক্ষেত্রে কবিতাবৃত্তির সময়ে অঙ্গবিক্ষেপ অপ্রত্যাশিত। এখানে 'আমি','নহি','পূজা', 'মাথায়','পিছে','পার্শ্বে', 'ব্রতের', 'মোরে', 'গর্ভে', 'বীরশিক্ষা', 'নিবেদি' এই শব্দগুলিই মুদ্রা এবং মৃদু অঙ্গচালনার দ্বারা উপস্থাপিত হতে পারে। তার অধিক অঙ্গাভিনয় নিষ্প্রয়োজন। সেখানে রসচর্বণার জন্য বাচিক এবং সাত্ত্বিক অভিনয়-ই কাম্য। তাই কাব্যনাট্যের উপস্থাপনে 'বাক্যার্থাভিনয়' অনেকখানিই প্রার্থিত কিন্তু নৃত্যনাট্যের উপস্থাপনায় প্রথম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত 'পদার্থাভিনয়'[১৩১] ফলপ্রসূ হয়ে দাঁড়ায়।

আবার *সুভদ্রাহরণ* শ্রীগদিতের মঙ্গলাচরণ শ্লোক এবং প্রস্তাবনা অংশটিও গুরুত্বপূর্ণ। এই উপরূপকের অভিনয়ে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা যে সকলেই নৃত্যে কুশল ছিলেন তাও জানতে পারি সূত্রধারের উক্তি থেকেই-

নৃত্যকর্মকুশলাঃ কুশীলবাঃ কাব্যমেতদপি নব্যমীক্ষিতুম্ ।
নায়কশ্চ পুরুষোত্তমো'র্জুনঃ সংগতা চ রসবেদিনাং সভা ।।[১৩২]

অথচ এই উপরূপকের কোনও অংশেই নৃত্যের ভূমিকা নেই বা দীর্ঘ প্রলম্বিত শ্লোকাবৃত্তিও নেই যা গীতাকারে নৃত্যের ছন্দে পরিবেশিত হতে পারে। আধুনিক একাঙ্ক রূপকের যে গতিপ্রকৃতি, তার থেকে ব্যত্যয় ঘটার কোনও সম্ভাবনাও থাকেনা এই রূপক পরিবেশনের সময়। তবে এই উপরূপকের মঙ্গলশ্লোকে যে একবিংশাক্ষরা ছন্দোবদ্ধ স্তুতিটি পাই তা হ'ল-

শৃঙ্গারং হৈমবত্যা প্রথযতি ধনুষা বীরমাস্যেন হাস্যং ।
বীভৎসং স্রক্কপালৈর্ভযমহিপতিনা ভ্রূবিজৃম্ভেণ রৌদ্রম্ ।।
কারুণ্যং প্লুষ্টপত্ন্যাদ্ভুতমরুণবিধূপর্বুধৈর্যো'ক্ষিভাগ্ভিঃ ।
শান্তং চিত্তেন ভূয়াত্ স নবরসময়ঃ শংকরঃ শর্মণে বঃ ।।[১৩৩]

এখানে নবরসময় শিবের স্তুতি করা হয়েছে। উমা হৈমবতীর রতিক্রিয়ার সংশ্লেষে শৃঙ্গার রস, (পিনাক) ধনুর্ধারী অবতারে বীরবল, মুখমণ্ডলের স্মিত হাস্যরস, গলে নরকপালধারণে বীভৎস রস, নাগভূতির দ্বারা ভয়ানক রস,

সূর্য-চন্দ্র-অগ্নির রূপক ত্রিনেত্রের ভাবপ্রকাশে অদ্ভুত রস এবং নির্মল চিত্তহেতু শান্ত রসের অভিব্যঞ্জনা ঘটেছে। আলোচ্য শ্লোকে ভরতোক্ত রসসূত্রের প্রতিফলন লক্ষণীয়। ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র*-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ" বচন থেকে জানা যায় যে বিভাব, অনুভব এবং ব্যভিচারী ভাব এই ভাবত্রয়ের সঙ্গে স্থায়ীভাবের সংযোগে রস ধ্বনিত হয় সহৃদয়সমাজে। বিভাব রসের কারণস্বরূপ। এই বিভাব দু'প্রকার – আলম্বন বিভাব এবং উদ্দীপন বিভাব। আলম্বন শব্দের অর্থ আশ্রয়; তাই যাকে আশ্রয় করে প্রথমে রসের উদগম ঘটে তাই হ'ল আলম্বন বিভাব। শিবপার্বতীর যুগল অবস্থানে শৃঙ্গারের প্রকাশ হ'লে সেই রসের আলম্বন বিভাব হ'ল পাত্রপাত্রী হ'ল শিব এবং হৈমবতী। একইভাবে করুণ রসের ক্ষেত্রে দেখি সতীবিয়োগ হ'ল প্রধান হেতু। সেক্ষেত্রে সতীর মৃত্যুজনিত শোক-ই করুণ রসে পরিণত হয়েছে। আবার, ধনুকের উত্তোলন অনুভাব বা কার্যবিশেষ। আবার, ভ্রূদ্বয়ের জৃম্ভণ বা বিস্তারে রৌদ্র রস উদ্দীপ্ত হয়। আবার তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিভাবের একটি হ'ল মৃত্যু। এখানে বস্তুধ্বনির মাধ্যমে মৃত্যু নামক ব্যভিচারিভাব অনুমিত হয়। চতুর্বিধ অভিনয়ের মধ্যে আঙ্গিক অভিনয়ের একটি অঙ্গ ভ্রূকর্ম। আবার, আহার্য অভিনয়ের মধ্যে নরকপাল, সর্পভূষণ রয়েছে। অর্থাৎ এখানে যথাক্রমে বীভৎস এবং ভয়ানক রস দ্যোতিত। অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ে আঙ্গিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা নাট্যকার বুঝিয়ে দিয়েছেন বলেই ধারণা হতে পারে।

মঙ্গলশ্লোকটি গীত হলেও তার সঙ্গে নৃত্যযোজনা বাধ্যতামূলক নয়। এমনকি পুরাকালে এই উপরূপকের অভিনয় হয়েছে বা জনসমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা ক'তখানি ছিল তা জানার সঠিক উপায় নেই। তবে বর্তমান সময়ে যদি এই নান্দীশ্লোকটি সুরারোপিত হয়ে নৃত্যাভিনয়ে উপস্থাপিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে পদার্থাভিনয়ের পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েই যায়। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাক। ভরত-*নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের অষ্টম, নবম এবং দশম অধ্যায়ের আঙ্গিকাভিনয়ের নির্দেশাবলি প্রদত্ত রয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে বলা হয়েছে অঙ্গাভিনয় তিন প্রকার। যথা শারীর অভিনয়, মুখজ এবং শাখাযুক্ত অভিনয় এবং অঙ্গোপাঙ্গসংবলিত অভিনয় –

ত্রিবিধস্ত্বাঙ্গিকো জ্ঞেয়ঃ শারীরো মুখজস্তথা ।
তথা চেষ্টাকৃতশ্চৈব শাখাঙ্গোপাঙ্গসংযুতঃ ।।[১৩৪]

অঙ্গসংখ্যা ষট্ যথা মস্তক, হস্ত, বক্ষ, পার্শ্ব, কটি এবং পাদ। অন্যদিকে উপাঙ্গগুলি হ'ল নেত্র, ভ্রূ, নাসিকা, অধর, গণ্ডস্থল এবং চিবুক। এর মধ্যে হস্তাভিনয় বিশেষভাবে আলোচিতব্য। নৃত্যোপস্থাপনে হস্তাভিনয় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। এই হস্তাভিনয় সম্পর্কে নবম অধ্যায়ে দেখি মুদ্রা এবং করণের সৌষ্ঠব তাৎপর্য। এই অধ্যায়ের প্রথমেই নাট্যহস্তকর্ম সম্পর্কে কয়েকটি মুদ্রার নাম এবং ব্যবহারের ঔচিত্য দর্শিত হয়েছে। এর মধ্যে পতাক, ত্রিপতাক, মুষ্টি, শিখর, সর্পশীর্ষক, অলপদ্ম, ইত্যাদি অসংযুক্ত হস্তমুদ্রা[১৩৫] এবং অঞ্জলি, স্বস্তিক, দোল, পুষ্পপুট ইত্যাদি মোট ত্রয়োদশ সংযুক্ত হস্তমুদ্রার ব্যবহার পরিকল্পিত হতে দেখা যায়।[১৩৬] এগুলি ছাড়াও কয়েকটি নৃত্যহস্তের উল্লেখও লক্ষ্য করা যায়।[১৩৭] তবে নাট্যহস্ত এবং নৃত্যহস্তের এই পৃথকীকরণ পরবর্তীতে লুপ্ত হয়েছে এবং বর্তমান সময়ে নাট্যহস্তমুদ্রাগুলি ভারতের ধ্রূপদী নৃত্যাভিনয়েই প্রযোজিত হয় যথা পতাক, ত্রিপতাক,

সর্পশীর্ষক, অলপদ্ম, অঞ্জলি, দোল প্রভৃতি। উপরিউক্ত সংযুক্ত এবং অসংযুক্ত মুদ্রা সর্বদাই লোকব্যবহার অনুসারে প্রযুক্ত হবে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে এটিও একপ্রকার অনুকরণ। বস্তুজগতের বিবিধ ক্রিয়া এবং স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি বস্তুকে যদি ভাষার অনুপস্থিতিতে কেবলমাত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সহৃদয়গণের রসবোধ ঘটানো হয় তবে এই মুদ্রাব্যবহার অবশ্যই পালনীয় –

করণং কর্ম স্থানং প্রচারযুক্তিং ক্রিযাং চ সমবেক্ষ্য ।
হস্তাভিনযঃ কার্যস্তজ্জৈর্লোকোপচারেণ ।।[১৩৮]

বরং আধুনিক কালে নাট্যপ্রযোজনায় হস্তকর্ম বর্জিত বললেও অত্যুক্তি হবেনা। তাই সমসাময়িক কালের প্রেক্ষিতে মঙ্গলসচরণ শ্লোকটিকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হতে পারি।

শ্লোকের প্রথম পাদের প্রথমেই শিবপার্বতীর চিত্রকল্প রয়েছে। আঙ্গিক এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ে সেটি প্রদর্শনীয়। কোনও নৃত্যকুশীলব আহার্যব্যতিরেকে উমার অবয়ব প্রস্ফুটিত করবেন। এরপর ধনুকের জন্য নির্দিষ্ট করণের ব্যবহার করা আবশ্যক এবং দেহভঙ্গিমায় বীরত্বব্যঞ্জক চিহ্ন রয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসে একটি হস্তমুদ্রাবিশেষের কথা। বীর্য, গাম্ভীর্যের জন্য প্রথম অঙ্গুলি হবে ধনুসদৃশ এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হবে কুঞ্চিত –

আদ্যা ধনুর্নতা কার্যা কুঞ্চিতো'ঙ্গুষ্ঠকস্তথা ।
শেষা ভিন্নোর্ধ্ববলিতা হ্যরালে'ঙ্গুষ্ঠস্তথা স্মৃতাঃ ।।
এতেন সত্ত্বশৌণ্ডীর্যবীর্যকান্তিধৃতিদিব্যগাম্ভীর্যম্ ।[১৩৯]

হাস্য রসের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডলে কিঞ্চিৎ হাসি ধরা দেবে। অতঃপর কপালমালার বীভৎসতাও ব্যক্ত হবে। নাগভূষণের জন্য সর্পশীর্ষক মুদ্রা ব্যবহৃত হতে পারে। ভ্রূকর্মের দ্বারা ক্রোধাগ্নি বর্ষিত হওয়ার কারণ উপস্থিত রয়েছে। এরপর আসে সতীদহনের প্রসঙ্গ। অগ্নির প্রজ্জ্বলিত শিখার জন্য দুই হস্ত সংযুক্ত হবে এবং অঙ্গুলিগুলি হবে বিশ্লিষ্ট এবং চালিত –

এষো'গ্নিবর্ষধারানিরূপণে পুষ্পবৃষ্টিপতনে চ ।
সংযুতকরণঃ কার্যঃ প্রবিরলচলিতাঙ্গুলির্হস্তঃ ।।[১৪০]

সেক্ষেত্রে অশ্রুপাতের আভাস থাকবে মুখজ অভিনয়ে। এমনকি সতীর অগ্নিতে ভস্মীভূত হওয়ার ইঙ্গিতও থাকা আবশ্যক শরীরী আবেদনে। আবার অলপদ্মক মুদ্রায় নিষেধার্থ বিজ্ঞাপিত হয় "প্রতিষেধকৃতে যোজ্যঃ কস্য ত্বন্নাস্তি শূন্যচরণেষু"[১৪১]। সংযুক্ত চতুর হস্ত মুদ্রার দ্বারা প্রতিটি নেত্র পরিস্ফুট হবে এবং তৎসহ নৃত্যশিল্পীর মুখজ অভিনয়ে বিস্ময়ের ভাবপ্রকাশন ঘটতে পারে –

নযনৌপম্যং পদ্মদকরূপণং হরিণকর্ণনির্দেশঃ ।
সংযুতকরণেনৈব চতুরেণৈতানি কুর্বীত ।।[১৪২]

যেহেতু সূর্যচন্দ্রাগ্নিরূপ শিবনেত্রত্রিতয়; তাই সেই নয়নৌপম্য এই মুদ্রার সাহায্যে ব্যঞ্জিত হলে ভাবহানি ঘটবে না। সর্বশেষে শান্ত রসের অভিব্যক্তির জন্য স্থৈর্য, প্রশমিত চিত্ত উদিত হবে আঙ্গিক অভিনয়েই। ধ্যানাসীন শিবের রূপটির জন্য প্রচলিত বরদানের হস্ত নির্দেশিত করতে পতাকা হস্তের প্রয়োজন হতে পারে। এমন নবরসময় শংকরের প্রসিদ্ধি এবং জগৎবাসীর মঙ্গলবিধানের জন্য পুনরায় অঞ্জলিমুদ্রার প্রয়োগ হতে পারে। অঞ্জলিমুদ্রা দেবতা, গুরু এবং মিত্রের অভিবাদনে প্রযুক্ত হওয়ার বিধি রয়েছে ভরতমুনির বচনে –

পতাকাভ্যাং তু হস্তাভ্যাং সংশ্লেষাদঞ্জলিঃ স্মৃতঃ ।
দেবতানাং গুরূনাং চ মিত্রানাং চাভিবাদনে ।।[১৪৩]

রূপক এবং উপরূপকের পরিবেশনার যে পার্থক্য, তা অনেকখানিই আভাসিত হয় এই প্রারম্ভিক শ্লোকের মাধ্যমে। শিবের স্তুতি *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকেও দেখা যায়। সেখানে শিবের অষ্টমূর্তির কল্পনা করা হয়েছে। তবে সেই আটটি অবান্তর বাক্য (বা বাক্যাংশ)-এর পদানুযায়ী ভাবনৃত্য সম্ভব নয়। "যে দ্বে কালং বিধত্ত" এই অংশে সূর্য এবং চন্দ্রকে কালনিরূপণবিদ্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে কিন্তু এটি অভিধেয় অর্থে পরিস্ফুট নয়। আবার "শ্রুতিবিষয়গুণ যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্" এই অংশেও শব্দরূপ মূর্তির নৃত্যাঙ্গিকে উপস্থাপন করা অসম্ভব। এই কারণেই নৃত্য এবং নাট্যের মধ্যে পদার্থাভিনয় এবং বাক্যার্থাভিনয়গত পার্থক্য। যে, দ্বে, কাল, বিধত্ত এগুলির প্রতিটি পদ অপেক্ষা বাক্যার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যা নাটকাদি দশ রূপকের নির্যাস। আবার, অভিনয়দর্পণ-এর সঙ্গে তুলনা করি তাহলে মঙ্গলাচরণশ্লোকে দেখি চতুর্বিধ অভিনয়ের সঙ্গে শিবমূর্তির সাযুজ্য রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে ভুবনলীলা তার আঙ্গিকাভিনয়, বাঙ্ময় সংসার তার বাচিকাভিনয়ের প্রকাশ, চন্দ্র-তারকা যেন তারই আহার্যাভিনয়ের দ্যোতক এবং তার শান্ত-দান্ত শিবস্বরূপ-ই সাত্ত্বিকাভিনয় –

আঙ্গিকং ভুবনং যস্য বাচিকং সর্ববাঙ্ময়ম্ ।
আহার্য্যং চন্দ্রতারাদি তং নুমঃ সাত্ত্বিকং শিবম্ ।।[১৪৪]

গ্রন্থটির নামে 'অভিনয়' শব্দ থাকলেও মূলতঃ এটি নৃত্যশাস্ত্রের জগতে বিপুল সমাদর লাভ করেছে। তাই ভাবাশ্রিত নৃত্যকলার জন্যই হয়ত শ্লোকটির মধ্যে নৃত্যভাবনা জড়িত। এটি বাচ্যার্থপ্রধান একটি শ্লোক। তাই সমস্ত পদকেই হস্তকর্ম, ভ্রূবিভঙ্গ, গতির দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

এই উপরূপকের সপ্তম শ্লোকে অর্জুনের উক্তিতে উপবনের বিবৃতিতে দেখি –

নানাকৌসুমসৌরভিণ্যুপবনে সখ্যং সুখৈর্মারুতৈ-
-ভৈক্ষ্যে ভোজ্যরুচিঃ সদোপনিষদি প্রীতিঃ প্রিয়াযাং পরা।
সৌহিত্যং সরসাং জলৈঃ সুলভযা ভূর্জত্বচাচ্ছাদনং
নিদ্রা নির্মলসৈকতে কিমপরং রাজ্য স্বতন্ত্রস্থিতিঃ।।[১৪৫]

একটি রম্যবনে সুগন্ধি পুষ্প বিকশিত, মৃদুমন্দ পবন বয়ে চলেছে, কেউ কেউ নির্মল সৈকতে নিদ্রারত হয়ে রয়েছে এরকম একটি চিত্রকল্প তৈরি হয়েছে স্বভাবোক্তি অলংকারে গ্রথিত এই শ্লোকে। এই ধরণের শ্লোক নাটকাদি রূপকেও দুর্লভ নয়। এমনকি সেক্ষেত্রেও পদার্থাভিনয়ের সম্ভাবনা থাকে তবে রূপক এবং উপরূপকের ভেদদণ্ড প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। জাতিগত তারতম্যের কারণেই *সুভদ্রাহরণ*-এর চরিত্র স্বতন্ত্র।

তবে *সুভদ্রাহরণ* উপরূপকের দৃষ্টান্তেই কি বর্তমানে উপলব্ধ যে কোনও উপরূপকের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে? কারণ মাধবভট্টের এহেন শ্লোকরচনার কী উদ্দেশ্য, তা লিখিত আকারে পাওয়া যায়না। গবেষণার সূক্ষ্মতায় শুধু ধরা পড়ে যে নান্দীর মাধ্যমে এই উপরূপকটির যথার্থতা বজায় থাকে। তাই অন্য কয়েকটি উপরূপকের মঙ্গলাচরণের আলোচনা উপসংহার অংশে করে নিতে পারি। বিরূপাক্ষদেবের *উন্মত্তরাঘব* নামাঙ্কিত প্রেক্ষণক-এ দেখা যায় আদিকবি বাল্মীকি এবং সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেবের দ্বারা রচিত সুললিত বাণীস্তুতি-

হেরম্বায নমস্তস্মৈ যদ্গণ্ডগৃহমেধিনাম্ ।
মধুব্রতানাং সংগীতবৈখরী ভবতি ত্রযী ।।
অম্ভোজসংভবমুখাম্বুজরাজহংসী ।
বাল্মীকিকোকিলবিলাসবসন্তলক্ষ্মী ।।
দ্বৈপাযনাম্বুধিবিজৃম্ভণচন্দ্ররেখা ।
বাগ্দেবতা বিজযতাং কবিকামধেনুঃ ।।[১৪৬]

এখানে গণেশ (হেরম্ব) , সংগীত, পদ্ম, রাজহংসী ইত্যাদি শব্দার্থ অঙ্গাভিনয়ে ব্যক্ত করা গেলেও শ্রীময়ী সুললিত বাণীর আক্ষরিক অনুকরণ দুঃসাধ্য কর্ম। আবার, কামধেনুরূপ কবি বেদব্যাস এটিও সঠিকভাবে রূপায়িত হয়না আঙ্গিক অভিনয়ের মাধ্যমে। শ্লোকদুটি প্রসাদ গুণে পরিপূর্ণ বৈদর্ভী রীতির আদর্শ উদাহরণ। তাই নান্দীর মাধ্যমে উপরূপকের নৃত্যময়তার ইঙ্গিত সর্বক্ষেত্রেই প্রশস্ত নয়। তবে কবি মাধবভট্টের গ্রন্থটি ব্যতিক্রমী না হলেও একটি জীবন্ত দলিল। অর্থাৎ এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের মাধ্যমে পরিশেষে বলতে পারি যে উপরূপক যে একদা পদার্থাভিনয়ী নৃত্যকলা থেকে সম্ভূত হয়ে পরবর্তীতে নাট্যিকতাকে আয়ত্ত করেছে এবং তার পরিবেশনায় নৃত্যের ভূমিকা অপরিহার্য তাই-ই যেন *সুভদ্রাহরণ* উপরূপকের নান্দীর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কথিত হয়েছে।

তবে এই উপরূপকে এবং নৃত্যপ্রধান রবীন্দ্রনাট্যে নৃত্যের যুক্তীকরণের মধ্যে মিল থাকলেও *চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা* এবং *মায়ার খেলা (২)*-র সমগোত্রীয় এই উপরূপক নয়। বরং *তাসের দেশ* -এর ম'ত সগীত নৃত্যপ্রধান গদ্যনাট্যের পর্যায়ে এটিকে রাখা যেতে পারে। *বসন্ত, শেষ বর্ষণ* -এ ঋতুর বিচিত্র লীলার লহরী গীতদ্বারা ব্যক্ত হলেও আদি-মধ্য-অন্ত্য-সমন্বিত কোনও নাট্যেতিবৃত্ত ক্ষীণস্রোতা। তুলনায় *তাসের দেশ* -এ নাট্যবস্তু গানের ভূতলে শায়িত হয়ে থাকেনি। তাই সেই ইতিবৃত্তের প্রয়োজনেই নৃত্যের আগমন ঘটেছে। *তাসের দেশ* রবীন্দ্রনাথের কথায় 'কাঠের কুঞ্জবন'। সেখানের জাড্যতার অবসানে নৃত্যের প্রয়োজন ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাই রাজপুত্র সেখানে যে গানের সঙ্গে নৃত্যপরিবেশনা করে তা হ'ল –

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি,
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই – আমরা বিদ্যুৎ।[১৪৭]

আবার *সুভদ্রাহরণ* শ্রীগদিতের সঙ্গে নৃত্যের রসায়ন ঘটলেও এমনটিই নয় শ্রীগদিত উপরূপক নৃত্যের গর্ভ। *দ্রৌপদীস্বয়ংবর* শ্রীগদিতে নৃত্যের আভাস পাওয়া যায়ন। সেটির বর্গফল কাব্যনাট্যের আকার নিলেও নৃত্যনলিনীতে কোনও পঙ্কজকে বিকশিত করতে পারেনা। তাই বলা যায় যে কিছু উপরূপককার তাঁদের রচনায় নৃত্যকে অবধারিতভাবে স্থান দিয়েছেন। যেহেতু বিজয়পাল *দ্রৌপদীস্বয়ংবর*-কে উপরূপক বলেননি প্রস্তাবনায়, তাই তিনি সেখানে নৃত্যের বিকাশে অনুকূল বাতাবরণ গড়ে তোলেননি। ইন্দ্রা চক্রবাল এটিকে শ্রীগদিত উপরূপকের মর্যাদা দিয়েছেন একথা দ্বিতীয় অধ্যায়েই বলা হয়েছে। নাট্যকার মাধবভট্ট শ্রীগদিতের সংজ্ঞা-র কোনও অবমাননা করেননি। তাই তাঁর রচনায় যেহেতু নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাই বলতে পারি যে অন্ততঃ শ্রীগদিত উপরূপকের প্রকাশভঙ্গি নিঃসংকোচে নৃত্যাত্মক। তাই সেই ধরণের উপরূপকের ঘ্রাণ যদি রবীন্দ্রনাট্যে পেতে চাই, তবে *তাসের দেশ*-এর ম'ত 'অদ্ভুত রসাত্মক নাট্য' তার নির্ভরযোগ্য সংরূপ।

এরপরে আসতে হয় উপরূপক এবং নৃত্যপ্রধান রবীন্দ্রনাট্যের মধ্যে বিষয়গত মৈত্রীর প্রসঙ্গে। এই প্রসঙ্গে বার্ণিক রায়ের *হ্বাগনের এবং রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য* গ্রন্থের 'দেশী পাঁচালি ও গীতিনাট্য' অধ্যায়ের সজোর ভাষণটিও স্মরণমার্গে উদিত হয় –

সংস্কৃতের উপরূপকশ্রেণীর নাটিকা ত্রোটক গোষ্ঠী সত্তক নাট্যরাসক উল্লাপ্য কাব্য সংলাপক শ্রীগদিত দুর্মল্লিকা বিলাসিকা প্রস্থান ভাণিকা রাসক প্রকরণিকা হল্লীশ প্রেঙ্খন – রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের পর্যায়ের নয়। সংস্কৃত সাহিত্য ও জীবনের অবনতিকালের সময়, মানুষের পঙ্ক আনন্দের বহিঃপ্রকাশই নাচে গানে, অশ্লীল কথাবার্তায় যৌন ব্যভিচারিতায় রূপ পেয়েছে উপরূপকে। নাচ ও গানের অস্তিত্বই গীতিনাট্যের অস্তিত্ব প্রকাশ করে না।[১৪৮]

একথাটি একদিক থেকে সত্য। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মধ্যে শ্রীহীনতা প্রথম থেকেই সচেতনভাবে বর্জিত। তাই *লোকসাহিত্য* গ্রন্থের 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে বলেছেন –

'ভর্তৃখাদিকা' বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্তন করিয়া নিয়ে ছন্দপূরণ করিয়া দিলাম।[১৪৯]

তাই তিনি যে আদিরসাত্মক বাচ্যার্থনির্দেশিত রসে স্নান করাবেন সহৃদয়বর্গ তা দুঃস্বপ্নেও ভাবা যায়না। নৃত্যপ্রধান রবীন্দ্রনাট্যে প্রায়শঃ দেখা যায় যে কোনও ঋতু নেপথ্যচারী হয়ে পাত্র-পাত্রীকে আহ্বান জানাচ্ছে। যদি বসন্তের কথা ধরি, তবে সেক্ষেত্রে *মায়ার খেলা (১),বসন্ত, নবীন, সুন্দর, চিত্রাঙ্গদা, মায়ার খেলা (২)* আসতে পারে।

অন্যদিকে সংস্কৃত নাটিকার মধ্যে শ্রীহর্ষের *রত্নাবলী,* মদনকবির *পারিজাতমঞ্জরী* ইত্যাদি বসন্ত ঋতুৎসবের বিবরণ দেয়। এই ধরণের নাটিকার প্রথমাঙ্কটিই হয় বসন্তোৎসব বা মদনোৎসবের রঙ্গমঞ্চ। তবে নৃত্যপ্রধান নরবীন্দ্রনাট্যগুলিতে তার ভাষা এবং ব্যঙ্গ্যার্থ সম্পূর্ণতঃ বিপরীত মেরুর। *রত্নাবলী* নাটিকার প্রথম অঙ্কে দেখা যায় বৎসরাজ উদয়ন তার প্রিয়সখাকে নিয়ে বসন্তোৎসবের দিন নগরভ্রমণে বেরিয়েছে। পথে দেখা যায় বারবণিতার তাদের প্রিয়জনের সঙ্গে আবির, কুঙ্কুমে রাঙা; কেও বা আবার সুরাপানে নেশাগ্রস্ত। হঠাৎই রাজা দেখতে পায় মদনিকা ও চূতলতিকা নামের দুই কামিনী গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে। সেই গানের কথা ছিল-

কুসুমাযুধপ্রিযদূতকো মুকুলাযিতবহুচূতকঃ ।
শিথিলিতমানগ্রহণকো বাতি দক্ষিণপবনকঃ ।।[১৫০]

পঞ্চশর মদনদেবের প্রভাবে দখিনা বাতাস বইছে, আমগাছের শাখায় শাখায় সুগন্ধি মুকুল ধরেছে, এমন সময়ে অভিমানিনীদের মানভঞ্জন হয়ে গেছে। শুধু উপরূপকেই নয়; ভাণাদি রূপকেও এই রতিমুখীনতা সমভাবে বাচ্য। *পদ্মপ্রাভৃতক* ভাণে বিটকে বলতে শুনি "অহো নু খল্বযং লঘুরূপো'পি বলবান্ মদনব্যাধিঃ"[১৫১]। অর্থাৎ বসন্তসময়ে নিদারুণ কামপীড়া উৎপন্ন হয়; কারণ অশোক, কুরবক ফুলের দোলা, কোকিলের পঞ্চম স্বরে গানের ভেলা বয়ে যাওয়া, আমের মুকুলের মধুগন্ধে মাতোয়ারা বাতাসের আবহাওয়ায় মদনদেব তার পুষ্পবাণ নিয়ে বনে বনে কৌতূহলী হয়ে বিচরণ করছে। প্রকৃতির মধ্যে মানবজীবন ও মানবজীবনের মধ্যে প্রকৃতির অনুসন্ধানই করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। বসন্তের কয়েকটি গানের নমুনা দেওয়া যাক। "আজি কমলমুকুলদল খুলিল" ও "আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে" এই ২টি গান-ই ১৯১০ সালের রচনা। ১ম গানে রয়েছে বসন্তের আগমনে প্রকৃতির বিকশিত হওয়া ; কিন্তু পরের গানটিতে সেই সূত্র ধরেই বলা হয়েছে –

আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,[১৫২]

কমলদলের প্রস্ফুটিত হওয়ার সঙ্গে মানবচিত্তের অবরুদ্ধ বাতায়নকে উন্মুক্ত করার সরল ও সরস উপমা কবি এঁকেছেন। কবির অভিনবত্ব *বসন্ত, সুন্দর, নবীন, শেষ বর্ষণ, শ্রাবণগাথা*-র পরিবেশনায়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে *বসন্ত* নাটিকায় তিনি প্রথম বসন্তপ্রকৃতিকে কিছু চরিত্রের মাধ্যমে রূপদান করান- আম্রকুঞ্জ, করবী, বেণুবন, শালবীথিকা, নদী প্রভৃতি। প্রথমেই রয়েছে বসন্তের কাছে আত্মনিবেদনের গান "সব দিবি কে সব দিবি পায়/আয় আয় আয়//"[১৫৩]। একথা শুনেই আম্রকুঞ্জ নির্দ্বিধায় মুকুল ঝরিয়ে দিতে চাইল, পথের ধারের বেণুবন ব্যাকুল হয়ে উঠল বন্ধনমুক্ত করতে। এরপর যথাসময়ে ঋতুরাজ আসে। সকলের থেকে নৈবেদ্যগ্রহণ করে প্রেমের তরঙ্গ জাগিয়ে তুলে বিদায় নেয়। রূপের মায়া ও মোহ যে চিরস্থায়ী নয়, ক্ষণেকের আবেশ যে পরক্ষণেই উধাও হয়ে যায় এই জীবনদর্শন-ই বসন্ত-এর মূল বক্তব্য। পরবর্তীতে *শেষ বর্ষণ, শ্রাবণগাথা* প্রভৃতিতেও এই সুর ধ্বনিত হয়েছে। একইভাবে *শেষ বর্ষণ*-এ কবি বর্ষার স্বরূপে নটরাজের হয়ে বলেছেন "সে তো আসে বাইরের আকাশে। অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয়"[১৫৪]। *প্রাচীন সাহিত্য* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে (পৌষ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন –

কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলাকে একত্র তুলনা না করিয়া থাকা যায়না। দুটিরই কাব্যবিষয় নিগূঢ়ভাবে এক। দুই কাব্যেই মদন যে মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে; সে মিলন অসম্পন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া আপনার বিচিত্রকারুখচিত পরমসুন্দর বাসরশয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে। তাহার পরে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত-দ্বারা যে মিলন সম্পন্ন হইয়াছে তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ, তাহা সৌন্দর্যের সমস্ত বাহ্যাবরণ পরিত্যাগ করিয়া বিরহনির্মল বেশে কল্যাণের শুভ্র দীপ্তিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।[১৫৫]

এই প্রবন্ধরচনার কিছু বছর পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্য। সেখানে এবং পরবর্তীতে *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্যেও দেখি মদন দেব মিলন সংসাধন করতে চেয়েছে বা বলা ভালো চিত্রাঙ্গদা মদনদেবের কাছে প্রার্থনা করেছে যে যেন সেই দেবতার বরদানে তার প্রিয়তমের সঙ্গে সম্ভোগ সম্পন্ন করতে পারে কিন্তু বর্ষভোগ্য সেই বরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই ভ্রান্তিবিনাশ ঘটে অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা উভয়েরই। তাই এক্ষেত্রেও 'কামদহন' হয়েছে কিন্তু এই মদনের চরিত্রও রবীন্দ্রভাবনায় শাশ্বত সত্যকামস্বরূপ। *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্যে পঞ্চম দৃশ্যে মদনের উক্তি শ্রুত হয় –

মায়া ছেড়ে দিক পথ,
প্রেমের আসুক জয়রথ,
রূপের অতীত রূপ
দেখে যেন প্রেমিকের চোখ-
দৃষ্টি হতে খসে যাক, খসে যাক
মোহনির্মোক ।।[১৫৬]

এখানে মদনের দহন হয়নি। প্রাচীন ভারতে বসন্তকালে বিভিন্ন নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হ'ত এবং সংস্কৃত নাটিকা উপরূপকেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বসন্তোৎসবে মদনতপ্ত নরনারীর সানন্দ ভোগলিপ্সার রেখাচিত্র অঙ্কিত থাকত। যেমন *বিক্রমোর্বশী* ত্রোটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারের উক্তিতে বলা হয়েছে যেন এটি বসন্তকালেই অভিনীত হতে চলেছে যে সময় মধুকর কুসুম পান করে এবং কামিনী বনিতাগণ গীতে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে–

মত্তানাং কুসুমরসেন ষট্পদানাং
শব্দো'যং পরভৃতনাদ এষ ধীরঃ ।
আকাশে সুরগণসেবিতে সমন্তাত্
কিং নার্যঃ কলমধুরাক্ষরং প্রগীতাঃ ।।[১৫৭]

যদিও এই শ্লোকটি সব সংস্করণে পাওয়া যায়না।তথাপি যেহেতু ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে নির্ণয় সাগর প্রেস (মুম্বই) থেকে সুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত *বিক্রমোর্বশী*-র প্রথম সংস্করণে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়, তাই এটিকে এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করা অনৌচিত্যপ্রবর্তিত হবেনা ব'লেই আশা করা যায়। উক্ত *রত্নাবলী, পারিজাতমঞ্জরী, মৃগাঙ্কলেখা* নাটিকায় প্রথম অঙ্কেই মদনোৎসবের বর্ণনার অবাধ নিস্যন্দী ধারা। তবে রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* এবং *মায়ার খেলা*

নৃত্যনাট্যে বসন্তঋতু যথেষ্টই লীলাবিস্তার করেছে। তবে এখানে বসন্তকাল কেবল অধিকরণরূপেই রয়ে গেছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বসন্ত নাটিকায় সম্পূর্ণভাবেই প্রকৃতির উপচারগুলিকে ঋতুরাজের রথে জয়যাত্রায় দিগ্বিজয় করতে দেখি। বসন্ত 'নৃত্যনাট্য' না হলেও বা নৃত্যনাট্যরচনার কারিগরি রবীন্দ্রনাথ সেখানে না দেখালেও বর্তমানে বিশ্বভারতী-তে এটির প্রযোজনা *চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা* ইত্যাদি নৃত্যনাট্যের ধরণেই হয়ে থাকে। নিরপেক্ষ সহৃদয়গণ এর সঙ্গে তন্ময়ীভূত হয়ে পারে তার নৃত্যরসেই। এই ধরণের ঋতুনাট্যকে *অভিনবভারতী*-তে 'রামাক্রীড়' নামে উল্লিখিত হতে দেখি – "ঋতুবর্ণনসংযুক্তং রামাক্রীডং তু ভাষ্যতে"[১৫৮]। যেহেতু রামাক্রীড় 'নৃত্তপ্রবন্ধ', তাই তার নাট্যগত অঙ্ক,সন্ধি,বৃত্তি ইত্যাদির কোনও উল্লেখ নেই। তাই রবীন্দ্রনাথের *বসন্ত, শেষ বর্ষণ,শ্রাবণগাথা,নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা*-কে রামাক্রীড়ের সঙ্গে উপমিত করা যায় কিন্তু *চিত্রাঙ্গদা, মায়ার খেলা (১), মায়ার খেলা (২)*-কে সেই পর্যায়ে স্থান দেওয়া যায়না। সেখানে বসন্ত ঋতু-ই নায়ক নয়; বসন্তে নরনারীর হৃদয়বৃত্তির কথা-ই নাট্যমধ্যে বয়ে চলে। আবার, এই গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত 'কামদহন' নাট্যানুষ্ঠান প্রেক্ষণকের সঙ্গে জড়িত। ভোজদেবের সময়ে খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীতে সেটি উপরূপক পর্যায়ে উত্তীর্ণ না হলেও একটি নৃত্যাত্মক অভিনয়রূপে জনসমাজে প্রচলিত ছিল। এমনকি ভি রাঘবন-ও এই মদনদহন বিষয়কেন্দ্রিকতাকে যে প্রেক্ষণকের সঙ্গেই একীভূত করার জন্য সম্মতি দান করেছেন, তাও সেখানে উক্ত হয়েছে। সুতরাং বিশ্বনাথকৃত প্রেক্ষণ-এর সঙ্গে সরাসরি বা তির্যক দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাট্যকৃতিকে শনাক্ত করা যায়না। তবে যেহেতু তদানীন্তন সময়ের কোনও প্রামাণ্য লেখ্যাগার নেই, তাই কামদহনাদি প্রেক্ষণকের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়না। সেই নৃত্যের সঙ্গে গান থাকত কিনা, গানের ভাষা কীরূপ ছিল, সেখানে কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে উল্লিখিত শিব, পার্বতী, মদন, রতি ইত্যাদি চরিত্র থাকত কিনা, গানের বাণীর মধ্যে গুণ-রীতি-ধ্বনি ইত্যাদির অবস্থান কীরূপ ছিল, সেগুলি না জানতে পারায় তার সঙ্গে রবীন্দ্রসন্দর্ভের তুলনার বিচার যথার্থ হয়না। তবে এখান থেকে যে বিষয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পারি, সেটি হ'ল *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-এর যুগে *কামদহন* -এর ম'ত প্রেক্ষণক রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের কাঠামো অনুসারে গঠিত না হলেও কাম এবং প্রেমের মধ্যে যে নিষ্কাম প্রেম বিজয়ী হতে পারে এবং দেহসর্বস্বতার ত্যাগের রূপক কামদেবের দেহের বিনাশ-ই প্রকৃত প্রেমের আদর্শ রত্ন তা যুগ থেকে যুগান্তরে বয়ে এসেছে।

এছাড়াও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মাধুরী প্রধানভাবে পাওয়া ভোজদেবোল্লিখিত হল্লীশ-এ। গোষ্ঠী-তে রাধাকৃষ্ণের রম্যকথা অনুপলব্ধ হলেও কৃষ্ণের লীলার কথাংশ প্রদর্শিত হয়। ভানুসিংহের পদাবলি-কে তার সঙ্গে এক তন্ত্রে বাঁধা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সমগ্র ভাবনৃত্যাভিনয়ে কৃষ্ণের নৃত্য থাকেনা। শেষের দিকে "সজনি সজনি রাধিকা লো" গানের মধ্যেই কৃষ্ণের রাধা-অভিসারের ইঙ্গিত রয়েছে –

> মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে,
> মৃদুল গান গাহিয়া।[১৫৯]

তাই মণিপুরি নৃত্যে কৃষ্ণ আসে এবং মণ্ডলকারে থাকা সখীদের মধ্যে কৃষ্ণের তালাশ্রয়ী 'নৃত্ত' এবং শেষে সকলের "আজু সখি মুহু মুহু" গানে ললিতশৃঙ্গারনৃত্য। ভানুসিংহের পদাবলি-র সবক'টি গানের মধ্যে কৃষ্ণ মঞ্চোপরি

উপস্থিত না থাকলেও রাধার কৃষ্ণপ্রেমা এবং সখীদের দৌত্যের মধ্যে কৃষ্ণ অলক্ষ্যে থাকলেও অনুক্ত নয়। তাই এটি গোষ্ঠী বা হল্লীশ-এর সঙ্গে সহমর্মী হয়েছে। উপরূপকের রূপে হল্লীশ নাট্যধারা ভানুসিংহের পদাবলি-কে সমর্থন না করলেও বিশ্বনাথের উক্তি-অনুযায়ী গোষ্ঠী নাট্যধারা তাকে স্বাগত জানাতেই পারে। এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের উক্তি থেকে বহু চরিত্রের গোষ্ঠীবদ্ধভাবে অবস্থানহেতুত্বেই 'গোষ্ঠী' উপরূপক এবং এখানে কোনও সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ থাকেনা। তাই ভানুসিংহের পদাবলি সেদিক থেকে নির্ণায়কতাকে মেনেছে। তবে *বৃষভানুজা* নাটিকা এবং *দানকেলিকৌমুদী* ভাণিকাতেও রাধাকৃষ্ণের চরিত্র রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে যেন এমন মতিভ্রমের দৃষ্টান্ত না ঘটে যে ভানুসিংহের পদাবলি -কে নাটিকা বা ভাণিকারূপে স্বীকার করার বিপুল প্রয়াস। উক্ত উপরূপকদ্বয়ের নাট্যবস্তু বা নাট্যগঠনের মনোবিজ্ঞান ভানুসিংহের পদাবলি-র ম'ত নয়। ভাণিকা নায়ক-নায়িকার বাকযুদ্ধ এবং বাকচাতুর্যের প্রতিযোগিতা। সেখানে রাধা কমনীয় হলেও নমনীয় নয়। এমনকি শ্রীরূপগোস্বামী তাঁর ভাণিকায় রাধাকৃষ্ণের কথাবস্তুকে স্থান দিয়েছেন ব'লে এটিই নয় যে ভাণিকা রাধাকৃষ্ণের প্রেমমাধুর্যের রম্যকানন। বিশ্বনাথ কবিরাজ ভাণিকা-র উদাহরণ দিয়েছেন *কামদত্তা* যা রাধকৃষ্ণকেন্দ্রিক নয়। একই যুক্তি সনাতনী নাটিকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। *বৃষভানুজা*-র উদাহরণ প্রমাণ করেনা নাটিকায় রাধাকৃষ্ণের আধিপত্য একটি পরম্পরায় বহমান। তাই উক্ত উপরূপকদুটিকে 'ব্যতিক্রমী' বলা যেতে পারে। অন্যদিকে গোষ্ঠী, হল্লীশ এগুলিতে কৃষ্ণের উপস্থিতি চিরন্তনী সংস্কৃতি।

এ তো গেল বস্তুগত সাদৃশ্যের প্রসঙ্গ। তবে এই আলোচনায় এটিও দেখা উচিত যে উপরূপকের কী কী নাট্যবিষয়কে রবীন্দ্রনাথ প্রাধান্য দেননি। প্রথমেই বলতে হয় হাস্যরসাত্মক তিনি কোনও নৃত্যপ্রধান নাট্য রচনা করেননি। উপরূপকাবলির মধ্যে কাব্য,নাট্যরাসক হাস্যরসাত্মক। কাব্যের লক্ষণে বিশ্বনাথ *সাহিত্যদর্পণ*-এ বলেছেন "হাস্যসংকুলম্" (৬/২৮৪)[১৬০]। তিনি হাস্যরসকে হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক নাট্যাবলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখলেও গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের অঙ্গিরসে হাস্যকে সম্মতি দেননি। এছাড়াও সাত্ত্বিক এবং আরভটী বৃত্তিবহুল সংলাপক, শিল্পক এবং দাস-দাসীর কামকলাকল্লোলরূপ প্রস্থানের ম'ত উপরূপকের বিষয়কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যপ্রধান নাট্যে ক'তখানি সম্মান দিয়েছেন, তা দেখা যাক। উপরূপক বিশেষ প্রস্থানের ম'ত বিষয় নৃত্যপ্রধান রবীন্দ্রনাট্যে নেই কিন্তু প্রস্থান উপরূপকের আদিকালের তারুণ্য কোনও একটি নৃত্যনাট্যে দেখা না দিলেও বিভিন্ন নৃত্যনাট্যের নায়িকাদের মধ্যে স্থানে-স্থানে ব্যক্ত হয়েছে। *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-এ প্রস্থানের স্বরূপ প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। তাই তার মধ্যে দেখা গেছে যে বিভিন্ন ঋতুতে কামোত্তেজক দশায় নায়িকার কথন[১৬১]। সেখানে বীররসের বর্ণনাও থাকবে। এখানে *চিত্রাঙ্গদা*-র "রোদন ভরা এ বসন্ত" গানটির উল্লেখ করা যেতে পারে। চিত্রাঙ্গদা মদনপীড়িত হয়ে বলে –

দক্ষিণসমীরে দূর গগনে
একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো ।
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত
আবরণবন্ধন ছিঁড়িতে চাহে ।[১৬২]

এবং তখনই তার সখীরা বারংবার তার তেজকে জাগ্রত করতে চায়। তাই বলে –

যে ছিল আপন শক্তির অভিমানে

কার পায়ে আনে হার মানিবার ডালা, হায় হায় হায় ।[১৬৩]

তাই *শৃঙ্গারপ্রকাশ* -এর যুগের প্রস্থান নৃত্যের মর্মার্থ *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্যে ধরা দিয়েছে এক বিশেষ নাট্যদ্বন্দ্বে।

এরপর বলতে হয় *বাল্মীকি-প্রতিভা* গীতিনাট্যের কথা। সেখানে বিশ্বনাথোক্ত সংলাপক-এর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। সংলাপকের লক্ষণানুসারে এই উপরূপক হবে অঙ্কত্রিতয়ে সমন্বিত যেখানে কোনও একজন পাষণ্ড ব্যক্তি নায়ক, শৃঙ্গার ও করুণ ব্যতীত বাকি রসের ব্যঞ্জনা রয়েছে, ভারতী ও কৈশিকী বৃত্তি লেশমাত্রও নেই এবং নগর-অবরোধ, যুদ্ধ, ভয়, পলায়ন ইত্যাদি ঘটনার প্রাধান্য থাকবে। এই উপরূপকের সঙ্গে *বাল্মীকি -প্রতিভা* গীতিনাট্যের বেশ কয়েকটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাল্মীকি এখানে একজন ব্যক্তি যে দেবীবকালীর পূজক এবং দেবীর সন্তুষ্টির জন্য নরবলি দিতে চায়। এমনকি নিরপরাধ বালিকার প্রতিও তার হৃদয়ের অনুকম্পা থাকেনা। ঘটনাচক্রে তার অন্তঃস্থলে জলের ক্ষরণ হয় এবং শুধু মানুষ-ই, নয়; যে কোনও হিংসাবৃত্তির থেকে নিজেকে সরিয়ে সারস্বত কবিত্বের সাধক হয়ে ওঠে। এখানে দস্যুদের মদ্যপান,উল্লাস,বালিকার প্রতি ছলনা,বাল্মীকির সঙ্গে বাগ্‌দন্দ্ব এবং শেষে দলত্যাগ ইত্যাদি ঘটনা সংলাপক উপরূপককে স্মরণ করায়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এর পরিবেশনাগত আঙ্গিক ইতালীয় 'অপেরা'-র প্রভাব থাকলেও নাট্যবিষয়টি আরভটী এবং সাত্ত্বতী বৃত্তিপ্রধান। তবে পরিশেষে সংস্কৃত শ্লোকজন্য ভারতী বৃত্তি শুভ্রতায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে দেখতে হবে সংলাপকগত বিষয়মূখীনতা *বাল্মীকি -প্রতিভা* গীতিনাট্যে ধরা দিয়েছে কিনা এবং সেই পরীক্ষায় *বাল্মীকি-প্রতিভা* অনেকখানিই সফল। আবার, *শ্যামা* নৃত্যনাট্যেও বজ্রসেনের কারাগারে বন্দি, শ্যামার উত্তীয়ের প্রতি কপটতা, বধ্যভূমিতে অন্যায়ভাবে উত্তীয়ের হত্যা, বজ্রসেনের সঙ্গে শ্যামার পলায়ন ইত্যাদি ঘটনা নাট্যমধ্যে স্থান নিয়েছে। চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে দেখি ঐন্দ্রজালিক প্রয়োগ। বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দের বশীকরণ জন্য প্রকৃতি তার মা-কে অনুরোধ জানায় এবং মঞ্চেই তালবাদ্যের সঙ্গে আঙ্গিকাভিনয়ের মাধ্যমে মায়ার জাদুবিদ্যা প্রদর্শিত হয়। তাই তথাকথিত তিনটি রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যেই নায়িকাদের নায়ককে বশীকরণের উপায় অসাধু উপায় অবলম্বন করতে দেখা যায়। চিত্রাঙ্গদার অস্ত্র হয়ে ওঠে তার ক্ষণস্থায়ী রূপজ লাবণ্য, শ্যামা নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণহরণ করে এবং প্রকৃতি ইন্দ্রজালের আশ্রয় নেয়। তাই মোটের ওপর সংলাপকের রেশ তিনটি নৃত্যনাট্যেই আভাসিত। তাই উপরিউক্ত বার্ণিক রায়ের মতটি পুনঃপরীক্ষিত হওয়ার যথাযথ সুযোগ রয়েছে। চিত্রাঙ্গদার উৎস বৈয়াসিক *মহাভারত* হলেও রূপপরিবর্তনের কথাবৃত্তটি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। তাই সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দায়বদ্ধ ছিলেন ইতিবৃত্তের কাছে। তবে যাই হোক; নৃত্যপ্রধান রবীন্দ্রনাট্যে আরভটী বৃত্তি বা নরনারীর কামোপভোগ যে ধরা দেয়নি, তা নয়। বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রভাষা এবং রবীন্দ্রমানস এতই নন্দনবোধের স্থিরভূমি ছিলেন যে সেখানে বাচ্যার্থের দ্বারা পরিস্ফুট হয়নি রস।

তাঁর গীতিনাট্যগুলির মধ্যে *মায়ার খেলা* ব্যতীত *বাল্মীকি-প্রতিভা* এবং *কালমৃগয়া*-য় রামায়ণী সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে আদিকবি বাল্মীকি, মহাকবি কালিদাস,কবি কৃত্তিবাস, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী-র ভাবনাপ্রসূত বাল্মীকি এবং রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের অংশগ্রহণ ঘটেছে। *কালমৃগয়া*-র উৎস সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে। সেখানে দেখেছি *রঘুবংশ* মহাকাব্যের অনুরণন ক'তখানি ব্যক্ত হয়েছে। *বাল্মীকি-প্রতিভা* গীতিনাট্যের ক্ষেত্রে তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ *শ্রীরাম পাঁচালি* -র কাছে যতখানি ঋণী, ততখানিই কৃতজ্ঞ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী-র *সারদামঙ্গল* কাব্যের কাছে। *সারদামঙ্গল* -এর প্রথম সর্গের প্রথম গানে শোনা যায় –

এষ মা উষার সনে,
বীণাপাণি চাননে,
রাঙা চরণ দুখানি রাখ হৃদয়কমলে ।[১৬৪]

এবং নৃত্যনাট্যের মধ্যে তিনি বৈয়াসিক *মহাভারত, শার্দূলকর্ণাবদান* এবং *মহাবস্তু-অবদান* গ্রন্থের 'শ্যামাজাতক' নামক কাহিনির ভার গ্রহণ করেছেন। এমনকি *শাপমোচন* -এও দেখি *রাজা* নাটকেরই একটি গীতিময় নান্দনিক পাঠ। তাই রাজা নাটকের উৎস বৌদ্ধগ্রন্থ 'কুশজাতক' হলে পরোক্ষভাবে *শাপমোচন* কথিকাতেও তার সাহচর্য রয়েই যায়। শান্তিদেব ঘোষের অভিধামাফিক 'ঋতুনাটক' বা প্রমথনাথ বিশীর আখ্যায়িত 'ঋতুনাট্য' যা নৃত্যের পাত্রেই লীলায়িত, তা সরাসরি কোনও গ্রন্থাশ্রিত না হলেও প্রাচীন ভারতে ঋতুকথামূলক কাব্যের রেওয়াজ ছিল। মহাকবি কালিদাসের *ঋতুসংহার* খণ্ডকাব্যটি তার প্রমাণ। তাই তাঁর নৃত্যোপজীবী নাট্যগুলি ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃত সাহিত্য এবং নাস্তিক্যবাদী বৌদ্ধধর্মদর্শনের সংযুক্তি থেকে মুক্ত নয়। এমনকি যদি এই ধরণের নাট্যগুলির দৃশ্যাবলির স্থান-কাল বিবেচনা করি তবে দেখা যায় তিনি কানন, সরোবর, রাজ-অন্তঃপুরকেই অধিক মান্যতা দিয়েছেন যা উপরূপকের ঘটনাবলিতেও ঘুরেফিরে আসে। *রত্নাবলী* নাটিকা কোনও প্রখ্যাত বৃত্তগন্ধী না হলেও রাজা উদয়ন, তার বিদূষক, কুসুমিত কানন উপেক্ষিত নয়। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকে যে স্থানগুলি নাট্যঘটনার কেন্দ্রভূমি, সেই স্থানগুলির মধ্যে শুদ্ধ তপোবন সাধারণতঃ নাটিকা জাতীয় উপরূপকে লক্ষ্যিত হয়না। তেমনই *কালমৃগয়া* ব্যতীত কোনও নৃত্যপ্রধান রবীন্দ্রনাট্যে তপোবনের উল্লেখ নেই। রম্যকবন, সরোবরের ম'ত নর্মক্রীড়ার চিহ্নস্বরূপ স্থানগুলি উপরূপকে অতিমাত্রায় উল্লিখিত। *রত্নাবলী, পারিজাতমঞ্জরী, মৃগাঙ্কলেখা, বৃষভানুজা* নাটিকা এবং *কর্পূরমঞ্জরী* সট্টকের প্রথমাঙ্কেই মদনোৎসবের মঞ্চ হয়ে ওঠে সুরম্য প্রকৃতির উদ্যান। *বৃষভানুজা*-য় স্থানটির নাম 'মাধবী মণ্ডপ'। *পার্থপাথেয়* উল্লাপ্যের তৃতীয় অঙ্কে বর্গা নামক রমণীর সরোবরে স্নানের কথা পাওয়া যায়। আবার, 'চিত্রফলক' উপরূপকের একটি অন্যতম নাটকীয় উপাদান। *রত্নাবলী* নাটিকার দ্বিতীয় অঙ্কে চিত্রফলকের উল্লেখ পাই, *পার্থপাথেয়* উপরূপকের প্রথমাঙ্কেই চিত্রাঙ্কনের উল্লেখ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যপ্রধান নাট্যগুলিতেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই স্থানগুলিকেই ঘটনার ঘটক হিসেবে বেছে নিয়েছেন। *মায়ার খেলা* গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্য উভয় স্থানেই দেখি একটি প্রমোদকানন নায়ক-নায়িকার অপেক্ষা করে চলেছে। চিত্রফলকের কথা *শাপমোচন* কথিকায় পাই। সেখানে অরুণেশ্বর কমলিকার চিত্রদর্শনে পূর্বরাগে অভিষিক্ত হয়।

চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যেই অনঙ্গ-আশ্রমের কথা পাই যেখানে চিত্রাঙ্গদা বর যাচঞা করে মদনদেবের কাছে। নৃত্যনাট্যে তার উল্লেখ না থাকলেও মদনদেবের আরাধনার কথা জানা যায় একটি গানে –

আমার এই রিক্ত ডালি
দিব তোমারই পায়ে
দিব কাঙালিনীর আঁচল
তোমার পথে পথে বিছায়ে ।
যে পুষ্পে গাঁথ পুষ্পধনু
তারি ফুলে ফুলে হে অতনু,
আমার পূজা-নিবেদনের দৈন্য
দিয়ো ঘুচায়ে ।[১৬৫]

এমনকি উপরূপকগুলির ক্ষেত্রে স্ত্রী চরিত্রের সংখ্যার আধিক্য। মূলতঃ বিশ্বনাথ কবিরাজ নাটিকায় লক্ষণে একটি পদ ব্যবহার করেছিলেন – 'স্ত্রীপ্রাযা'[১৬৬] যার অর্থ নটী বা নারীচরিত্রের বহু শতাব্দী। নাটিকার পরিমণ্ডলে বিশেষতঃ নায়িকার সখীদের ভূমিকা নাট্যগুলিতে নায়িকার মনোভাব এবং তদনুসারে তার কার্যক্রমে সহায়িকা অনুপ্রেরণা। *রত্নাবলী* নাটিকায় দেখি সুসঙ্গতা, কাঞ্চনমালা, মদনিকা ইত্যাদি চরিত্রের নাট্যের নাটকীয়তার বাঁকে উপস্থিতি। আবার, *চন্দ্রকলা* নাটিকায় পাই মালবিকা, রতিকলা ইত্যাদি চরিত্র। *বৃষভানুজা* নাটিকায় বৃন্দা, বনরক্ষিকা, চম্পকলতা, তমালিকার ম'ত চরিত্রেরা ইতস্ততঃ যাতায়াত করেছে। এছাড়াও ত্রোটকের মধ্যে *বিক্রমোর্বশী*-তে রম্ভা, সহজন্যার ম'ত সুরকন্যারা নাট্যপ্রসঙ্গ-অনুসারে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখেছে। নৃত্যপ্রধান রবীন্দ্রনাট্যেও নায়িকার সখীদের নায়িকার সঙ্গেই অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। *চণ্ডালিকা* ব্যতিরিক্ত *চিত্রাঙ্গদা*-তে নায়িকার অরণ্যমধ্যে শিকার থেকে শুরু ক'রে মদনদেবের আহ্বান পর্যন্ত নায়িকার সঙ্গে তার সখীগণ একটি সারির শৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করেনি। *শ্যামা*-র ক্ষেত্রেও সখীদের সঙ্গে শ্যামা নৃত্যচর্চা করে। আবার, শ্যামার ভবিষ্যৎ পরিণামের আশঙ্কাও উচ্চারিত হয় সখীদের গানেই। তবে উপরূপকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রবীক্ষায় দেখা যায় যে তিনি সখীদের কোনওরূপ নামকরণ করেননি। নাটিকা বা অন্যান্য উপরূপকের ক্ষেত্রে চরিত্রের ধরণ অনুসারে যেমন নাট্যকারগণ নামকরণ ক'রে থাকেন, এক্ষেত্রে তার বিলক্ষণ। তিনি কোনও একক সখীর ভাবনায় না ভাবিত হয়ে সখীদের একতাকে আমল দিয়েছেন।

অর্থাৎ উপরূপক এবং রবীন্দ্র-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য এই বিষয়টি যে যে সিদ্ধান্তে আসা যায়, তার দুটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা যেতে পারে। প্রথমটিকে সাদৃশ্যমূলক অভিধাগত সমীক্ষণ বলা যায় এবং দ্বিতীয়টি বৈসাদৃশ্যমূলক তত্ত্ব। প্রথমটিতে যে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা হ'ল –

- রবীন্দ্র-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের মধ্যে রামায়ণাদি প্রখ্যাত ইতিবৃত্ত এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রাচীন লোকগাথা অবলম্বনে বিনির্মাণ যেমন লক্ষণীয়, তেমনই মায়ার খেলা-য় কবিকল্পিত বিষয়ে প্রবর্তনা। অর্থাৎ নশ্বর দেহাতিরিক্ত প্রেমের স্বরূপপ্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ পুরাকালীনতা এবং সমকালীনতা উভয়কেই মান্যতা

দিয়েছেন। উপরূপকের মধ্যে শৃঙ্গারপ্রকাশক নাটিকা, সট্টক নাট্যধারাতে যেমন কবিভাবিত বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তেমনই ত্রোটক উপরূপকে দেখা যায় ঐতিহ্যগত সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ। সেক্ষেত্রে প্রেমতত্ত্বের নান্দনিক প্রগলভতা পুরাকাল এবং সমকাল উভয়ই আধাররূপে স্বীকৃত।

- রবীন্দ্র-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য-নির্মিতিতে অনাম্নী নারীগণ নায়িকার নর্মপরিচারিকা, সহচরী এবং সমভাবীগণ প্রাচীন উপরূপকের নিয়ম রক্ষা করেছে।
- রবীন্দ্র-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের ইতিবৃত্ত-আবহে সরোবর, কানন, নৃত্যশালা, ইন্দ্রজালবিদ্যা, বধ্যভূমি, তমসাচ্ছন্ন রাত্রি যেন পুরাকালের উপরূপকের অঙ্কগত সেই সেই স্থান-কালের চিত্ররচনা করে।
- রবীন্দ্র-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের মধ্যে *কালমৃগয়া, শাপমোচন* (কথিকা), *শ্যামা* -য় ত্রোটক গোত্রের উপরূপকের মূল নাট্যদ্বন্দ্বের হেতু 'অভিশাপ' উঠে এসেছে। যদিও অষ্টাদশ উপরূপকের মধ্যে ত্রোটকের অতিরিক্ত কোনও উপরূপকে কোনও ক্রূর ব্যক্তি কর্তৃক শাপের উল্লেখ ছিল কিনা বলা যায়না প্রামাণ্য নথির অভাবে, তবুও ত্রোটক একটি উল্লেখযোগ্য উপরূপক ব'লেই এবং একদা *স্তম্ভিতরম্ভ, মেনকানহুষ* ইত্যাদির ম'ত বহু ত্রোটকের অস্তিত্ব থাকার দরুণ একথা উল্লেখ করতে হয় যে রবীন্দ্র-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের মধ্যে কয়েকটি রচনায় অভিশাপ একটি অন্যতম উপাদান।
- রবীন্দ্র-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের মধ্যে *শাপমোচন* (কথিকা)-এর অরুণেশ্বর, *চিত্রাঙ্গদা*-র অর্জুন, *শ্যামা*-র বজ্রসেন-উত্তীয়, *মায়ার খেলা (২)*-তে অমর-অশোক-কুমারের ম'ত পুরুষ চরিত্রের ভাবাশ্রয়ী নৃত্যের পরম্পরা বয়ে চলেছে। *বিক্রমোর্বশী*-র পুরুরবা এবং *উন্মত্তরাঘব*-এর রামের ললিত উপচারী নর্তন বা কাব্যাবৃত্তিও প্রমাণ করে তৎকালীন সময়ে নায়ক চরিত্রের নৃত্য বর্তমান ছিল এবং তা দেহসৌষ্ঠবমূলক পৌরুষ নৃত্য নয়।

এবং উপরূপকের সঙ্গে নৃত্যপ্রধান রবীন্দ্রনাট্যের বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দর্শনগুলি হ'ল –

- রবীন্দ্র-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের ম'ত উপরূপকগুলি আদ্যন্ত গানে নিবদ্ধ নয়।
- রবীন্দ্র-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের নায়িকার সখী বা বনদেবী (*বাল্মীকি -প্রতিভা, কালমৃগয়া*), পল্লীরমণী (*শ্যামা*), বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী (*চণ্ডালিকা*) নামহীন। অন্যদিকে উপরূপকের মধ্যে সখী বা গৌণ নারীচরিত্রের পরিচিতিমূলক নাম পাওয়া যায়।
- রবীন্দ্র-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের যা হৃৎপিণ্ড তা হ'ল রবীন্দ্রসংগীত এবং তা মানবজীবনের দার্শনিক ভাষ্য। তাই উপরূপকের ম'ত দুই নায়িকাকে ঘিরে কোনও এক পুরুষের ঘূর্ণন (*মায়ার খেলা*), নায়িকার ছলনা (*শ্যামা*), নায়িকা কর্তৃক কামদেবের অনুগ্রহলাভে রূপজ লাবণ্যে পুরুষের মনোহরণ (*চিত্রাঙ্গদা*) ইত্যাদি গানের মাধ্যমেই ব্যক্ত হলেও গ্রাম্যতাদোষের পরিহার করা হয়েছে সম্পূর্ণরূপে এবং সেই গান একটি অলৌকিক অপার্থিব ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরের সুখ দেয় রবীন্দ্ররসজ্ঞব্যক্তিবর্গের।

উপরূপক ভারতীয় নাট্যসংস্কৃতিরই একটি ইতিহাস। সেই সভ্যতার বেশিরভাগই বর্তমানে মৃত্তিকার তলে শায়িত। সেই খননকার্য আজ ক'তখানি সম্ভব তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও সেই স্থানকে শনাক্ত ক'রে সেই সংস্কৃতির ওপরে কোনও নাট্যধারার কোনও নতুন স্থাপত্য-ভাস্কর্য গড়ে উঠেছে কিনা তারই গবেষণা হওয়া উচিত একজন ঐতিহাসিক তথা সাংস্কৃতিক ভারতীয় নাগরিক হিসেবে। সে কারণেই রবীন্দ্র-কাব্যনাট্য-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের নির্বাচন এবং এই অধ্যায়ের মধ্যে দেখানোর প্রয়াস করা হ'ল যে প্রাচীন উপরূপক এবং রবীন্দ্র-কাব্যনাট্য-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের মধ্যে কতখানি সৌহার্দ্য রয়েছে।

এই তৃতীয় অধ্যায়ে মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যকর্মের পদ্ধতিগত বিভাজনপূর্বক তাঁর কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যসমূহের মধ্যে উপরূপকের প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এই অধ্যায় থেকে যে যে বিষয়ে উপনীত হওয়া যায়, সেগুলি হ'ল নিম্মোক্ত –

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাট্যকৃতিকে প্রাচীন ভারতের রূপক বা উপরূপকের সম্পূর্ণ লক্ষণে বিদ্ধ করতে চাননি। তাই নাট্যশাস্ত্রীয় 'নাটক' বা 'নাটিকা' এই জাতীয় গাণিতিক ঐকিক নিয়ম তাঁর নাট্যকর্মে ফলিত হয়নি। তবে তিনি প্রাচীন নাট্যপদ্ধতিগুলি সম্পর্কে পূর্ণতঃ অবগত ছিলেন তার প্রমাণ প্রদর্শিত হয়েছে।
- তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রাচীন রীতির কাছে পরাজিত হতে না চাইলেও তাঁর কাব্যনাট্যে পূর্বতন পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষতঃ *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যটি রূপে-রসে একটি নির্দিষ্ট উপরূপক না হলেও উপরূপকসদৃশতার গুণ অর্জন করেছে।
- উপরূপকের আরও একটি অব্যক্ত বিশিষ্টতা হ'ল পদার্থাভিনয়ী ভাবপ্রকাশক নৃত্য। উপরূপক এবং নৃত্যের মিতালি ঘটেনি। নৃত্য-ই নাট্যগুণের জন্ম দিয়ে তার শৈশব, কৈশোর, তারুণ্যকে লালিতপালিত ক'রে নাট্যীয় হয়ে উঠেছিল। তাই নৃত্য ছিল উপরূপকের প্রকাশভঙ্গি। রবীন্দ্রগীতিনাট্য এবং রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের মধ্যে সংগীতের মাধুর্য অতুলনীয়। তবে নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে যে সেই নৃত্য কখনও পদার্থাভিনয়াত্মক এবং কখনও বাক্যার্থাভিনয়াত্মক। তারই সঙ্গে আঙ্গিক অভিনয়েরও অনেকখানি ভূমিকা রয়েছে নৃত্যনাট্যগুলিতে। এমনকি কয়েকটি সংগীতপ্রধান নাট্যের মধ্যে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিয়ম কার্যকর হয়েছে। সুতরাং *সাহিত্যদর্পণ*-এর অষ্টাদশ উপরূপকের মধ্যে পৃথকভাবে কোনও কোনও উপরূপকের বৈশিষ্ট্য কোনও রবীন্দ্রগীতিনৃত্যনাট্যে বা নৃত্যনাট্যে ধরা দিলেই তাৎক্ষণিকভাবে তাকেই কোনও নির্দিষ্ট উপরূপকের আসন দেওয়া অনুচিত হবে। উপরূপকের বিবর্তন এবং উপরূপক সম্পর্কিত বিভিন্ন মনীষীদের গবেষণাধর্মী মতাবলির পরিপ্রেক্ষিতেই একটি গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যকে উপরূপক বলা যাবে। তাই রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের ক্ষেত্রে উপরূপকত্বের অনুসন্ধান যতখানি সহজ, নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে ততখানি অনায়াসজন্য নয়। তাই বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের মধ্যে উপরূপকের নির্যাস লক্ষ্য করা গেলেও সম্পূর্ণরূপে তা উপরূপক নয়; কারণ বর্তমান সময়ের নৃত্যের মাধ্যমে নাট্য বা নৃত্যনাট্য এবং প্রাএবং উপরূপক একই জাতির পৃথক সত্তা নয়।

উল্লেখপঞ্জি

১) *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস,* সখের নাট্যশালা – ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালা,পৃষ্ঠা - ৯৪-৯৫

২) *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল,* পৃষ্ঠা - ৪৬

৩) *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য -প্রবেশক : প্রথম খণ্ড,* দেশে প্রত্যাবর্তন, পৃষ্ঠা - ৯৮

৪) *রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র,* 'ষোড়শী' নিয়ে কাছাকাছি, পৃষ্ঠা - ১৬

৫) *নাটমঞ্চ নাট্যরূপ,* নাটকীয় : রবীন্দ্রভাবনা, পৃষ্ঠা - ১২৪-২৫

৬) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড,* পৃষ্ঠা - ৩১

৭) *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৬৩

৮) *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৮৫

৯) *তদেব,* পৃষ্ঠা - ১২১

১০) *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৪৭

১১) *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৩২৭

১২) *তদেব,* পৃষ্ঠা - ১৫৫

১৩) *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৬৮৯

১৪) *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৮৬৯

১৫) *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৯৪৭

১৬) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড,* পৃষ্ঠা - ৫৪১

১৭) *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৭৭৩

১৮) *জীবনস্মৃতি,* বাল্মীকিপ্রতিভা, পৃষ্ঠা - ১১৭

১৯) *তদেব,* বাল্মীকিপ্রতিভা, পৃষ্ঠা - ১১৬

২০) *রবীন্দ্র-রচনাবলী : সপ্তদশ খণ্ড,* গ্রন্থসমালোচনা, পৃষ্ঠা - ৬০৩

২১) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, ফাল্গুনী,* পৃষ্ঠা - ৪৪০

২২) *রবীন্দ্র-রচনাবলী: একবিংশ খণ্ড, ছন্দ,* পরিশিষ্ট - মোটকথা : গদ্যছন্দ, পৃষ্ঠা - ৪৩১

২৩) *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ১/৩, পৃষ্ঠা - ১৯

২৪) *রবীন্দ্রসঙ্গীত,* শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা, পৃষ্ঠা - ১৪৯

২৫) তত্রৈব

২৬) তত্রৈব

২৭) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, রাজা ও রাণী,* উৎসর্গ, পৃষ্ঠা - ২৫৮

২৮) *রবীন্দ্রসঙ্গীত,* শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা, পৃষ্ঠা - ১৪৯

২৯) তত্রৈব

৩০) তত্রৈব

৩১) *তদেব,* পৃষ্ঠা - ১৫০

৩২) *বাংলার লোকনাট্য যাত্রা ও সাতটি রবীন্দ্র-নাটক,* চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ৩৩

৩৩) *তদেব,* তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ২৪

৩৪) *রবীন্দ্র-রচনাবলী : একবিংশ খণ্ড, ছন্দ,* পরিশিষ্ট - মোটকথা, পৃষ্ঠা - ৪৩১

৩৫) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, বসন্ত,* উৎসর্গ, পৃষ্ঠা - ৫১

৩৬) *রবীন্দ্রসঙ্গীত,* শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা, পৃষ্ঠা - ১৫২

৩৭) তত্রৈব

৩৮) তত্রৈব

৩৯) *তদেব,* পৃষ্ঠা - ১৫৩

৪০) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৪

৪১) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৬

৪২) তত্রৈব

৪৩) *তদেব,* পৃষ্ঠা - ১৫৯

৪৪) *তদেব,* পৃষ্ঠা - ১৫৭-৫৮

৪৫) *শ্রীমৎপাণিনিমুনিপ্রণীতঃ ধাতুপাঠঃ : ধাত্বর্থপ্রকাশিকয়া টিপ্পণ্যা সমলঙ্কৃতঃ,* টীপ্পণীকার – কনকলাল শর্মা, ক্রমিক সংখ্যা ১৮৫১, পৃষ্ঠা - ৪৯

৪৬) দ্রষ্টব্য : দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৮৮-৮৯

৪৭) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* পৃষ্ঠা - ৫৪৩-৫৪

৪৮) *রবীন্দ্রসঙ্গীত,* শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা, পৃষ্ঠা - ১৬১

৪৯) *রবীন্দ্র-রচনাবলী : পঞ্চবিংশ খণ্ড,* পৃষ্ঠা - ৪৩৩

৫০) *রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ,* পৃষ্ঠাঙ্কবর্জিত সূচীপত্র

৫১) *রবীন্দ্র-নাট্য-সমীক্ষা,* রবীন্দ্রনাট্যের বিশেষত্ব, পৃষ্ঠা - ৫

৫২) *চিঠিপত্র : চতুর্দশ খণ্ড,* পৃষ্ঠা - ১২৯

৫৩) *রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিক,* রবীন্দ্র-নাটকে নৃত্য ও গীত, পৃষ্ঠা - ২২

৫৪) *তদেব,* রবীন্দ্র-নাটকে নৃত্য ও গীত, পৃষ্ঠা - ২১

৫৫) *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা,* রবীন্দ্রনাট্যের স্বরূপ, পৃষ্ঠা - ১

৫৬) তত্রৈব

৫৭) *কাব্যপ্রকাশঃ : অলঙ্কারসন্দর্ভঃ মম্মটভট্টবিরচিতঃ,*সম্পাদক – ঝলকীকর, ১/১, পৃষ্ঠা - ২

৫৮) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, চিত্রাঙ্গদা,* একাদশ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৩৫৬

৫৯) *তদেব, ডাকঘর,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৮৫৯-৬০

৬০) *লিপিকা,* পায়ে চলার পথ, পৃষ্ঠা - ১১

৬১) *পুনশ্চ,* পৃষ্ঠাঙ্কবর্জিত ভূমিকা

৬২) *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা,* সূচিপত্র, পৃষ্ঠা - ৭-৮

৬৩) *এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব,* পৃষ্ঠা - ৬০-৬২

৬৪) *সুরের গুরু,* রবীন্দ্রনাট্যের গানে আশ্রম পরিবেশ, পৃষ্ঠা - ৯৯-১০১

৬৫) *তদেব,* রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যনাট্য, পৃষ্ঠা - ১৩৩

৬৬) *নাটমঞ্চ নাট্যরূপ,* নাটকীয় : রবীন্দ্রভাবনা, পৃষ্ঠা - ১২৭-২৯

৬৭) *তদেব,* নাটকীয় : রবীন্দ্রভাবনা, পৃষ্ঠা - ১৩১

৬৮) *তদেব,* রবীন্দ্রনাথের নাটক, পৃষ্ঠা - ১৪০

৬৯) *রবীন্দ্রনাটকের নির্মাণশৈলী : উনিশ শতক,* পৃষ্ঠাঙ্কবর্জিত সূচীপত্র

৭০) *তদেব,* বাল্মীকি প্রতিভা (প্রথম সংস্করণ) , পৃষ্ঠা - ৮৩

৭১) *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র,* পৃষ্ঠা - ৩০-৩৩

৭২) *রবীন্দ্রনাটকের নির্মাণশৈলী : উনিশ শতক,* উপসংহার : উন্মেষ পর্ব, পৃষ্ঠা - ১৫৬

৭৩) *The Raghuvamśa of Kālidāsa : with The Commentary (the Sanjīvanī) of Mallinātha,* সম্পাদক – মোরেশ্বর রামচন্দ্র কালে, ৯/৪৯-৮২, পৃষ্ঠা – ২১০-২১

৭৪) *রবীন্দ্রনাটকের নির্মাণশৈলী : উনিশ শতক,* উপসংহার : প্রথানুগত্যের পর্ব, পৃষ্ঠা - ২৭০

৭৫) *তদেব,* উপসংহার : প্রথানুগত্যের পর্ব, পৃষ্ঠা - ২৭১

৭৬) *তদেব,* উপসংহার : প্রথানুগত্যের পর্ব, পৃষ্ঠা - ২৭২

৭৭) *তদেব,* উপসংহার : প্রত্যাবর্তন পর্ব, পৃষ্ঠা - ৩৬০

৭৮) *তদেব,* উপসংহার : প্রত্যাবর্তন পর্ব, পৃষ্ঠা - ৩৭০

৭৯) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড,* বিসর্জন, প্রথম অঙ্ক - প্রথম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ২৬১-৬২

৮০) *তদেব, চিত্রাঙ্গদা,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৩৩৪

৮১) *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য,* পৃষ্ঠাঙ্কবর্জিত সূচীপত্র

৮২) *চিত্রা,* স্বর্গ হতে বিদায়, পৃষ্ঠা - ৯৯-১০০

৮৩) *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য,* গদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটক, পৃষ্ঠা - ৬৭

৮৪) *রবীন্দ্রনাট্যে রূপ অরূপ,* সূচীপত্র, পৃষ্ঠা - ১১-১৪

৮৫) *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা,* রবীন্দ্রনাট্যের দ্বিতীয় পর্ব – নাট্যকাব্য, পৃষ্ঠা - ১৭৯

৮৬) *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক,* নাট্যমুহূর্ত ও ভাষার সন্ধান, পৃষ্ঠা - ৩৫

৮৭) *তদেব,* নাট্যমুহূর্ত ও ভাষার সন্ধান, পৃষ্ঠা - ৩৬

৮৮) *তদেব,* নাট্যমুহূর্ত ও ভাষার সন্ধান, পৃষ্ঠা - ৩৭

৮৯) *তদেব,* নাট্যমুহূর্ত ও ভাষার সন্ধান, পৃষ্ঠা - ৩৮

৯০) *Unmattarāghava by Virūpakṣadeva,* সম্পাদক – V. Krishnamacharya, শ্লোকসংখ্যা ৩৯, পৃষ্ঠা - ১২

৯১) *তদেব,* শ্লোকসংখ্যা ৬১, পৃষ্ঠা - ১৮

৯২) *তদেব,* শ্লোকসংখ্যা ৬৬, পৃষ্ঠা - ১৯

৯৩) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, চিত্রাঙ্গদা,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৩৩৫

৯৪) *তদেব, চিত্রাঙ্গদা,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৩৩৮

৯৫) *তদেব, চিত্রাঙ্গদা,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৩৩৯

৯৬) *মহাকবিবিজয়পাল -বিরচিতম্ দ্রৌপদীস্বয়ংবরম্,* সম্পাদক – শান্তিপ্রসাদ, ১/২৩, পৃষ্ঠা - ১৮

৯৭) *তত্রৈব,* ১/২২

৯৮) *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ১০/৩, পৃষ্ঠা - ৫৬১

৯৯) *কাব্যপ্রকাশঃ : অলঙ্কারসন্দর্ভঃ মম্মটভট্টবিরচিতঃ,* সম্পাদক – ঝলকীকর, ১/৫, পৃষ্ঠা - ২২

১০০) *সঞ্চয়িতা, গান্ধারীর আবেদন,* পৃষ্ঠা - ৩৭৫-৭৬

১০১) *তদেব, বিদায়-অভিশাপ,* পৃষ্ঠা - ২০৪

১০২) *তদেব, বিদায়-অভিশাপ,* পৃষ্ঠা - ২০৫

১০৩) *তদেব, বিদায়-অভিশাপ,* পৃষ্ঠা - ২০৬

১০৪) *তদেব, কর্ণকুন্তীসংবাদ,* পৃষ্ঠা - ৩৯৬

১০৫) *তদেব, গান্ধারীর আবেদন,* পৃষ্ঠা - ৩৭৮

১০৬) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, চিত্রাঙ্গদা,* প্রথম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৩২৯

১০৭) তত্রৈব

১০৮) *Unmattarāghava by Virūpakṣadeva,* সম্পাদক – V. Krishnamacharya, শ্লোকসংখ্যা ৩২,পৃষ্ঠা - ১১

১০৯) *মৃচ্ছকটিকম্ : কবিবর-শ্রীশূদ্রকরাজেন বিরচিতম্,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১১৬

১১০) *তদেব,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১১৮

১১১) *তদেব,* ১/৫৮, পৃষ্ঠা - ১২১

১১২) *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ : মহাকবি -শ্রীকালিদাসপ্রণীতম্,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫/২, পৃষ্ঠা ৩৬১

১১৩) *তদেব,* ষষ্ঠ অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৪৮৩

১১৪) *তদেব,* ৬/২০, পৃষ্ঠা - ৪৯৯

১১৫) তত্রৈব

১১৬) *The Ratnāvalī of Sri Harsha-deva,* সম্পাদক – M. R. Kale, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩২

১১৭) *তদেব,* দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩০

১১৮) *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ : মহাকবি-শ্রীকালিদাসপ্রণীতম্,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ষষ্ঠ অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৪৬০

১১৯) *তদেব,* ষষ্ঠ অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৪৭০

১২০) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, চিত্রাঙ্গদা,* ভূমিকা, পৃষ্ঠা - ৩২৭

১২১) *তদেব, চিত্রাঙ্গদা,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৩৩৭

১২২) *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য,* অষ্টাদশ অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ২২৬-২৭

১২৩) *রবীন্দ্রনাথের গান : অধরা মাধুরী – রূপের সন্ধানে,* পৃষ্ঠা - ২৫

১২৪) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* প্রথম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৩

১২৫) *তদেব, শাপমোচন,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৯

১২৬) *রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া,* শ্যামা, পৃষ্ঠা - ৩০১

১২৭) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা,* প্রথম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৭১৬

১২৮) *তদেব, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা,* ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৭৩২

১২৯) তত্রৈব

১৩০) তত্রৈব

১৩১) দ্রষ্টব্য : প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা –৩৬

১৩২ *Subhadrāharana of Mādhavabhaṭṭa,* সম্পাদক – পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব, পৃষ্ঠা - ১

১৩৩) তত্রৈব

১৩৪) *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol II,* সম্পাদক – M. Ramkrishna Kavi, পুনঃসম্পাদক – V. M. Kulkarni ও Tapasvi Nandi, ৮/১১, পৃষ্ঠা - ৩

১৩৫) *তদেব,* ৯/৪-৭, পৃষ্ঠা - ২৬

১৩৬) *তদেব,*৯/৮-১০,পৃষ্ঠা - ২৭

১৩৭) *তদেব,* ৯/১০-১৭, পৃষ্ঠা - ২৮

১৩৮) *তদেব,* ৯/১৭১, পৃষ্ঠা - ৬৬

১৩৯) *তদেব,* ৯/৪৫-৪৬, পৃষ্ঠা - ৩৬

১৪০) *তদেব,* ৯/২০, পৃষ্ঠা - ২৯

১৪১) *তদেব,* ৯/৯২, পৃষ্ঠা - ৪৮

১৪২) *তদেব,* ৯/৯৬, পৃষ্ঠা - ৪৯

১৪৩) *তদেব,* ৯/১২৭, পৃষ্ঠা - ৫৬

১৪৪) *শ্রীনন্দিকেশ্বর বিরচিত অভিনয়দর্পণ, সম্পাদক – হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ,* পৃষ্ঠা - ১

১৪৫) *Subhadrāharana of Mādhavabhaṭṭa,* সম্পাদক – পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব, শ্লোকসংখ্যা ৭, পৃষ্ঠা - ৩

১৪৬) *Unmattarāghava by Virūpakṣadeva,* সম্পাদক – V. Krishnamacharya, শ্লোকসংখ্যা ১-২, পৃষ্ঠা - ১

১৪৭) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, তাসের দেশ,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৬৪৩-৪৪

১৪৮) *হ্বাগনের ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য,* দেশী পাঁচালি ও গীতিনাট্য, পৃষ্ঠা - ১১

১৪৯) *লোকসাহিত্য,* ছেলে-ভুলানো ছড়া, পৃষ্ঠা - ৩৬

১৫০) *The Ratnāvalī of Sri Harsadeva,* সম্পাদক – M R Kale, ১/১৩, পৃষ্ঠা - ১৪

১৫১) *চতুর্ভাণী, পদ্মপ্রাভৃতক,* সম্পাদক - শ্রীমোতিচন্দ্র, পৃষ্ঠা - ৬

১৫২) *গীতবিতান (অখণ্ড),* ২৭২ নং গান (বসন্ত), পৃষ্ঠা - ৫৩৫

১৫৩) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, বসন্ত,* পৃষ্ঠা - ৫৪

১৫৪) *তদেব, শেষ বর্ষণ,* পৃষ্ঠা - ২৭৮

১৫৫) *প্রাচীন সাহিত্য,* কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, পৃষ্ঠা - ২০

১৫৬) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড,* চিত্রাঙ্গদা, পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৭৩০

১৫৭) *মহাকবিকালিদাসবিরচিতম্ বিক্রমোর্বশীয়ম্,* সম্পাদক – সুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, ১/৩, পৃষ্ঠা - ৮

১৫৮) *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol I,* সম্পাদক –M. Ramkrishna Kavi, ৪/২৬৮ – অভিনবভারতী, পৃষ্ঠা - ১৮১

১৫৯) *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী,* ৫নং গান, পৃষ্ঠা - ১২

১৬০) *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৮৪, পৃষ্ঠা - ৪১৪

১৬১) *শৃঙ্গারপ্রকাশঃ [সাহিত্যপ্রকাশঃ] : প্রথম ভাগঃ [১-১৪ প্রকাশঃ],* সম্পাদক – রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী ও সদাশিবকুমার দ্বিবেদী, ১১/২৮৪-৮৫, পৃষ্ঠা - ৬৬৯

১৬২) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, চিত্রাঙ্গদা,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৭২০

১৬৩) তত্রৈব

১৬৪) *সারদামঙ্গল : শ্রী বিহারীলাল চক্রবর্তী বিরচিত,* প্রথম সর্গ, পৃষ্ঠা - ৬

১৬৫) *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, চিত্রাঙ্গদা,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৭২১

চতুর্থ অধ্যায়

নাটিকা ও *মায়ার খেলা* : তুলনামূলক আলোচনা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উপরূপকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাট্যের নাট্যগুণের একটি সাধারণ রূপরেখা অঙ্কনের প্রয়াস করা হয়েছে। এই অধ্যায় এবং পরবর্তী দুটি অধ্যায়প্রস্তুতির মাধ্যমে প্রস্তাবিত তিনটি নাট্যের সমীক্ষা করা হবে উপরূপকের প্রেক্ষিতে। প্রথমটি হ'ল *মায়ার খেলা* (১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ), দ্বিতীয়টি হ'ল *নটীর পূজা* (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ) এবং তৃতীয়টি হ'ল *শাপমোচন* (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ)। কালানুক্রমিকতার নিরীখেই এই অধ্যায়ে আলোচিতব্য *মায়ার খেলা* । নাটিকা নামক উপরূপকটির একটি বিশেষ মান্যতা রয়েছে উপরূপকগুলির মধ্যে। তাই এই নাটিকা জাতীয় উপরূপকটি রবীন্দ্রনাট্যে কোনওভাবে অবস্থান করছে কিনা; সে বিষয়ে কৌতূহল জন্মায়। তাই এই প্রবৃত্তি থেকেই এই অধ্যায়ের অবতারণা। এখানে প্রথমেই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় নাটিকা-র রূপে *মায়ার খেলা*-র স্বীকৃতির প্রামাণ্য বৌদ্ধিক যুক্তি।

৪.১ রবীন্দ্রভাবনায় 'নাটিকা' :

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের নাটিকাসম্পর্কিত ভাবনা। তিনি নাটিকা-র কোনও সংজ্ঞা বা লক্ষণ না দিলেও *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থের 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অধ্যায়ে *বাল্মীকি-প্রতিভা* গীতিনাট্যের নাট্যগত অভিধার নামকরণ করেছেন 'সুরে নাটিকা' –

য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে, ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র,..[১]

একথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থখানি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। যদিও তার পূর্বে *প্রবাসী* পত্রিকায় এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রজীবনালেখ্যরচনাকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য -প্রবেশক : দ্বিতীয় খণ্ড*-তে জানিয়েছেন "এই ভাদ্রমাসের প্রবাসীতে কবির জীবনস্মৃতি প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হইল। অতঃপর শ্রাবনমাস ১৩১৯ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে"[২]। অর্থাৎ *বাল্মীকি-প্রতিভা*-র দ্বিতীয় তথা বর্তমানে প্রাপ্ত সংস্করণ (১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ) থেকে *জীবনস্মৃতি* রচনার মধ্যে যেমন নাট্যকৃৎ রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যব্যতীত পঞ্চাঙ্ক রীতির নাটক-কাব্যনাট্য-নাট্যকাব্য এমনকি *শারদোৎসব* সহ বেশ কয়েকটি রূপক সাংকেতিক নাট্যরচনা সম্পূর্ণ করেছেন এবং কয়েকটি অভিনীতও হয়েছে, তাই বলা যেতে পারে যে তিনি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর রচিত নাট্যাবলির প্রেক্ষিতে তাঁর প্রথম গীতিনাট্যটিকে 'সুরে নাটিকা' বলেছেন। তাই এই বিশেষ্য-বিশেষণ প্রয়োগ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের নয়; এমনকি সেই সময় এই শব্দবন্ধের সঙ্গে জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ি এবং রসজ্ঞ সহৃদয়বর্গ পরিচিত ছিলেন এমন সিদ্ধান্তগ্রহণ সঠিক নয়। উপরূপকবিশেষ নাটিকা-র অন্তরঙ্গ নাট্যতত্ত্ব *বাল্মীকি-প্রতিভা* নাট্যে অনুসৃত না হওয়া সত্ত্বেও তিনি নাটিকা-কে বিশেষ্যরূপে মেনেছেন এবং তার বিশেষণ দিয়েছেন 'সুরে' যার দ্বারা নাটিকার গেয়ত্ব বা গীতিপ্রবণতা দর্শিত হয়। আবার পূর্ব অধ্যায়েই প্রদর্শিত হয়েছে যে *চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা* এবং *শ্যামা* এই নৃত্যনাট্যত্রয়ীকেও একত্রে

রবীন্দ্রনাথ 'নাটিকা'-ই বলেছেন[৩]। সেখানেও সুরের প্রসঙ্গ বর্জিত নয়। "সুরে বোঝাই করা" এবং 'সুরে'-র মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। অর্থাৎ অর্থাৎ 'নাটিকা' শব্দটি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যবহার করেছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু 'নাটিকা'-কে তিনি যে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের বিধিনিষেধ অনুসারেই বাচ্যার্থে গ্রহণ করেছেন, তা নয়। তার কারণ *বাল্মীকি-প্রতিভা*-র নাট্যবস্তু এবং নাট্যগঠনপ্রণিধির সঙ্গে সাহিত্যদর্পণোক্ত নাটিকা-র লক্ষণের (যা পরবর্তীতে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত) কোনও সাদৃশ্য নেই। তবে এইদুটি ব্যতীত *রুদ্রচণ্ড*-কেও রবীন্দ্রনাথ 'নাটিকা' বলেছেন[৪]। আবার অন্যদিকে নাটিকারূপী *নলিনী* কোনও গীতল নাট্যসন্দর্ভ নয়। তাই নাটিকার সঙ্গে একদিকে যেমন সুরের সাহচর্যকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছেন, তেমনই সুর বিহীন কোনও নাট্যরচনা যেখানে দুই নারী এবং এক পুরুষের মধ্যে একটি কৌণিক প্রণয়াখ্যান রয়েছে। তাই নলিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা প্রাচীনপন্থী। যদিও এহেন কোনও প্রমাণ বা লিখিত নথি অদ্যাবধি পাওয়া যায়না যে তিনি *সাহিত্যদর্পণ* বা তজ্জাতীয় কোনও নাট্যশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই *নলিনী*-কে 'নাটিকা' রূপেই উল্লেখ করেছিলেন; তথাপি পরোক্ষভাবে এটিও স্বীকার্য যে প্রাচীন নাটিকার একটি অস্পষ্ট রেখা রবীন্দ্রকথিত নাটিকা *নলিনী*-তে বর্তমান। তাই *মায়ার খেলা*-র মধ্যে নাটিকাধর্মের অনুসন্ধান করার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় নলিনী সম্পর্কিত রবীন্দ্র-অভিধা। সুতরাং সুর তথা গান এবং নাটিকার আদিরূপের সাংকর্য এই দু'দিক থেকেই *মায়ার খেলা* গুরত্বপূর্ণ। *মায়ার খেলা* গীতিনাট্য হ'লে এবং তা নাটিকা-র সংস্পর্শী হ'লে তাকেও কি 'সুরে নাটিকা' বলা যেতে পারে ? সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরই আরও একটি ভাবনার উল্লেখ করতে হয় যা *জীবনস্মৃতি*-র উপরিউক্ত অধ্যায়েই উল্লিখিত –

ইহার অনেককাল পরে 'মায়ার খেলা' বলিয়া আর-একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য।[৫]

সুতরাং নাট্য এখানে গৌণ। তথাপি বর্তমানে প্রাপ্ত *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড*-এ *মায়ার খেলা* মুদ্রিত[৬]। তাই *মায়ার খেলা* রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় মুখ্যতঃ নাট্য না হলেও গৌণতঃ নাট্য বটে একথা বলা যায়। এমনকি যদি কোনও সহৃদয় পাঠক বা প্রেক্ষক *মায়ার খেলা*-র পাঠ করেন বা অভিনয়দর্শন করেন, তিনি *বাল্মীকি-প্রতিভা* গীতিনাট্যের অঙ্গে এর পার্থক্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবেন না। তাই *মায়ার খেলা*-কে গীতিনাট্যরূপে অঙ্গীকার করলে ভ্রান্তির উদ্রেক ঘটেনা। তাই 'নাটিকা' অর্থে যদি পঞ্চাঙ্কপদ্ধতি অননুসৃত আকারে ক্ষুদ্র নাট্য হয়, তবে *মায়ার খেলা* সাধারণ দৃষ্টিতে নাটিকা-ই। যেহেতু সংস্কৃত উপরূপকের পরিপ্রেক্ষিতে *মায়ার খেলা*-কে বিশ্লেষণ করতে উদ্যত হয়েছে এই গবেষণাকার্য, তাই প্রাচীন সংস্কৃত নাটিকা-র তাত্ত্বিকতাও আলোচ্য এবং ব্যাখ্যাতব্য। তাই প্রথমাংশে নাটিকা-র সঙ্গে *মায়ার খেলা*-র বহিরঙ্গ সাযুজ্যের অনুসন্ধান করা হোক।

৪.২ *মায়ার খেলা* - রচনা, প্রকাশ ও প্রথম-অভিনয় :

মায়ার খেলা গীতিনাট্যের গানগুলির রচনা শুরু হয় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের শরৎকালে দার্জিলিংয়ে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক : প্রথম খণ্ড* গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তৃত যে তথ্য দিয়েছেন, তা হ'ল –

দার্জিলিঙবাস-পর্বটা সাহিত্যসৃষ্টির দিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। সখিসমিতির তরফ থেকে সরলা রায় রবীন্দ্রনাথকে কেবল মেয়েদের অভিনয়োপযোগী একটি গীতি-নাট্য রচনা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন... সেই উপলক্ষ্যেই দার্জিলিঙবাসকালে 'মায়ার খেলা'র গান রচনা শুরু করেন।[৭]

এবং ১২৯৫ বঙ্গাব্দের (১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ) ১৫ই পৌষ তদানীন্তন কলিকাতা বেথুন স্কুল-এর শিল্পমেলায় *মায়ার খেলা* গীতিরূপে নাট্যায়িত হয়। অর্থাৎ প্রায় একটি বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ *মায়ার খেলা*-র রচনাসহ গ্রন্থপ্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ে যুক্ত ছিলেন। *রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া* গ্রন্থে রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী কয়েকজন নটীর উল্লেখ করেছেন যারা সেই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে শান্তা এবং প্রমদার রূপাভিনয়ে ছিলেন যথাক্রমে সরলা দেবী এবং অভিজ্ঞা দেবী। এছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, প্রতিভা দেবী, ইন্দিরা দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রমুখ[৮]।

৪.৩ *মায়ার খেলা* : উৎস এবং বস্তুনির্দেশ :

ইতঃপূর্বে গবেষণা-অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে নাটিকা গোত্রের উপরূপকের সঙ্গে *মায়ার খেলা* নাট্যের একটি ভাবসঙ্গতির প্রসঙ্গ স্বল্প পরিসরে উক্ত হয়েছে। এই অধ্যায়ে লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় নাটিকা-র রূপে *মায়ার খেলা*-র স্বীকৃতির প্রামাণ্য বৌদ্ধিক যুক্তি।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড*তে *মায়ার খেলা*-র মুদ্রণের পূর্বে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয়েছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় –

আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারই সংশোধন-স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।[৯]

এই 'গদ্যনাটিকা'টি রবীন্দ্রনাথের ছয় দৃশ্যে সম্পূর্ণ। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী ও *রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক : প্রথম খণ্ড*-এ জানিয়েছেন "গল্পাংশের মধ্যেও নূতনত্ব কিছু নাই, পূর্ব-প্রকাশিত গদ্য-নাটক 'নলিনী'র ছায়াবলম্বনে ইহা রচিত"[১০]। সুতরাং *মায়ার খেলা*-র পূর্বপ্রজন্ম যদি *নলিনী* হয়, সেই *নলিনী* -র গর্ভধারিণীর সন্ধান করণীয়। *নলিনী* নাট্যটি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। এই নাট্যটির ইতিবৃত্তটি নীরদ ও নলিনীর প্রেমোপাখ্যান। নলিনীর মন অধরা-ই থেকে গেছিল নীরদের কাছে। ক্ষণিকের মায়বিজলিতে নীরদ নীরজার বাহুবন্ধন করলেও সেই মুহূর্ত খণ্ড হয়ে যায় বসন্ত-উৎসবে। নীরজা নলিনীকে মনেপ্রাণে সমর্পণ ক'রে যায় নীরদকে। এই তিনটি চরিত্রের অতিরিক্ত নবীন, ফুলি এবং এক প্রতিবেশিনীর চরিত্র পাওয়া যায় এই নাট্যনিবন্ধে। মানব-মানবীর মানবীয় প্রেমের জন্য কিছু কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছিল এই নাট্যে। জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে নাট্যচর্চার সময়ে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা লেশমাত্র নয়। তাঁরা নাট্যরচনা থেকে অভিনয় পর্যন্ত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করতেন। পৌরাণিক দেবদেবী অথবা রাজা-রাণী-বিদূষকের চরিত্রকে

আশ্রয় না ক'রেই কল্পিত নামধারী নরনারীর প্রণয়োপাখ্যানধর্মী নাট্যরচনাতেই তাঁরা কৌতুক প্রকাশ করতেন। এই প্রসঙ্গে আমরা স্বর্ণকুমারী দেবীর *বসন্ত-উৎসব*, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মানময়ী* নাট্যদ্বয়ের উল্লেখ করতে পারি। এদুটি সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা প্রয়োজন। দুই নারী এবং এক পুরুষের মধ্যে প্রেমের আবর্তনা *নলিনী* এবং *মায়ার খেলা*-র কথাবস্তু হ'লে তার উৎস জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এই দুই নাট্যগ্রন্থনায় পাওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকথাসংকলিত এবং সম্পাদিত আকারে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় *জোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি* নামে একখানি গ্রন্থাপ্রকাশ করেছেন। সেখানে জোতিরিন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ উক্তি রয়েছে "এসোনা, আমরাও একদিন সেকেলে ধরণে বসন্ত-উৎসব করি"[১১]। এই 'সেকেলে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তার উল্লেখ না থাকলেও এক্ষেত্রে অনুমান করতে হয় যে হয়ত এই 'সেকেলে'-র মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উল্লিখিত বসন্তোৎসবের রীতিনীতিকেই হয়ত অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংস্কৃত নাটিকা শ্রেণীর উপরূপকে বসন্ত ঋতু এবং তার উদযাপন একটি চরিত্র হয়েই ধরা দিয়েছে। তাই প্রকৃতির সৌরভে অভিভাবিত হয়ে নরনারীর ত্রিকোণপ্রেমের যাবতীয় অভিব্যক্তি,তাকেই আদর্শ মেনেই তিনি বসন্তোৎসবের পক্ষপাতী ছিলেন ব'লেই মনে হয়। সময়কাল ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংল্যাণ্ডে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য কলিকাতায় অনুপস্থিত। ঠিক সেই সময় স্বর্ণকুমারী দেবী রচনা করলেন *বসন্ত-উৎসব* গীতিনাট্য। অনুষ্ঠিত হয় ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া আসরে দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায়। শ্রীমতী সরলা দেবী আত্মস্মৃতিকথনমূলক *জীবনের ঝরাপাতা* গ্রন্থে বলেছেন "রবীন্দ্রনাথের বিলেতনিবাস কালেই আমার মায়ের রচিত 'বসন্তোৎসব' গীতিনাট্যের অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল"[১২]। এটি প্রকাশিত হওয়ার সময়ে লেখা হয়েছিল 'গীতিনাট্য' এবং সরলা দেবী-ও তা স্বীকার করেছেন। ইতিবৃত্তটি হল শোভাময়ী ও কুমারের বিবাহ আসন্ন। বসন্ত-উৎসবের পুণ্যলগ্নেই তাদের মিলন ঘটবে। কিন্তু অন্যদিকে লীলাবতীর মন অশান্ত। সে কিরণের সাথে মিলিত হতে চাইলেও কিরণের কোনও অনুভূতি নেই। তাই শোভাময়ী লীলাবতীকে নিয়ে যোগিনী উদাসিনীর কাছে উপস্থিত হয়। উদাসিনীর মন্ত্রপুত মালা লীতাবতী ধারণ করলেও বসন্ত-উৎসবের ক্ষেত্রে কুমার শোভাময়ীর বদলে লীলাবতীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। এর জন্য কিরণের সঙ্গে তার যুদ্ধ বাধে। তাই পুনরায় শোভাময়ী উদাসিনীর দ্বারস্থ হলে মায়াঞ্জনের প্রভাবে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে এবং মধুরমিলন সম্পন্ন হয়। নাটিকা-র মৌল নির্যাস অর্থাৎ দুই নারীকে ঘিরে একজন পুরুষের প্রেমের দ্বন্দ্ব – সেটি এখানে বিকশিত। তবে প্রাচীন রীতিতে রাজার বহুবিবাহ বৈধ ছিল। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিস্থিতিও পরিবর্তিত হয়। স্বর্ণকুমারী দেবী যে সময়ে এই গীতিনাট্যের প্রণয়ন করেছেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলনের উত্তরকাল। ফলতঃ পুরুষের দ্বি-বিবাহ বৈধ নয়, কিন্তু বিবাহের পূর্বে একাধিক প্রেমসম্পর্কের উত্থান-পতন কোনও অযৌক্তিক বিষয় নয়। তাই সেরকম আখ্যান নিয়ে নাটিকা রচিত এবং অভিনীত হতে বাধা নেই। *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল* থেকে জানা যায় যে *বসন্ত-উৎসব*-এর অভিনয়কালে লীলাবতীর চরিত্রে ছিলেন কাদম্বরী দেবী এবং উদাসিনীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী[১৩]। এই গীতিনাট্যের সাফল্যের পরেই আসরে নামেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রায় একই ছকে রচনা করলেন *মানময়ী* । ইতোমধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বগৃহে ফিরে এসেছেন। *মানময়ী*-ও ছিল গীতিনাট্য

এবং এই নাট্যের শেষ গান "আয় তবে সহচরী" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের-ই রচনা। সরলা দেবী জানিয়েছেন ইন্দ্র, শচী এবং বসন্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন যথাক্রমে জ্যোতিরন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাদম্বরী দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৪]। একাঙ্কিকা *মানময়ী* গীতিনাট্যটি যখন সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হয়ে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে *পুনর্ব্বসন্ত* নামে 'ভারত-সঙ্গীত-সমাজ'-এ অভিনীত হবে বলে প্রকাশিত হয়, তখন শচীর চরিত্র অন্তর্ভুক্ত হয় এবং উর্বশীর চরিত্র নেপথ্যে চলে যায়[১৫]।

তাই রবীন্দ্রনাথের মনোভাবে এই ত্রিকোণ প্রেমের আখ্যানমূলক নাট্যাভিজ্ঞতার একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তিনি যে তাঁর গীতিনাট্যে কেবলই এই ধরণের ইতিবৃত্তে প্রস্ফুটনের অবকাশ দিয়েছেন এমনটি বলা যায়না। *বাল্মীকি-প্রতিভা* এবং *কালমৃগয়া*-র পরবর্তীতে *মায়ার খেলা*-র রচনা এবং অভিনয়। এমনকি এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্বের আরও একটি দিক বিধৃত হয়েছে *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থের শেষ অধ্যায় 'কড়ি ও কোমল'-এ –

জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে,..[১৬]

কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। এই কাব্যগ্রন্থের যে দুটি পর্যায় রয়েছে, তার অনুরূপ দৃশ্যকল্প *মায়ার খেলা* গীতিনাট্যে লক্ষণীয়। দেহসর্বস্ববাদ বা বস্তুনিষ্ঠ সুখ এবং দেহরিক্ত আত্মনিষ্ঠ ব্রহ্মচৈতন্যবাদ এই গীতিনাট্যে গানের মালিকায় সুরসূত্রজালে ধরা দিয়েছে। *কড়ি ও কোমল* কাব্যগ্রন্থের 'যৌবন স্বপ্ন', 'চুম্বন' ইত্যাদি কবিতায় ধরা দেয় মনুষ্যজীবনের ভোগসর্বস্বতাময় আকাঙ্ক্ষা। 'চুম্বন' কবিতায় দেখা যায় –

অধরের কাণে যেন অধরের ভাষা ।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে ।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটী ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর-সঙ্গমে ![১৭]

অথচ এই মালিন্য কাব্যপারাবারের সীমানায় যখন উত্তীর্ণ হয়, তখন 'পবিত্র প্রেম' কবিতায় শোনা যায় –

ছুঁয়োনো, ছুঁয়োনো ও'রে, দাঁড়াও সরিয়া ।
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে !
ওই দেখ তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনা-নিশ্বাস তব গরল বরষে ![১৮]

এই ক্ষুদ্রতা এবং মহত্ব দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়নি; বরং মনের দুই প্রান্তের কৌণিক দূরত্ব কোনও একটি সরলরেখায় এসে মিশেছে এবং তা মানস প্রেমের রেখা। তাই *কড়ি ও কোমল* কাব্যগ্রন্থের কবিতাভাবনাগুলি একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের মনস্তলের অন্তঃদেশে গাঢ় প্রেমরসকে জমিয়ে তুলেছে, তেমনই তার উপরিতলে ভেসে উঠেছে

একাধিক নাট্য। *মায়ার খেলা* এমনই একটি গীতিনাট্য। এই প্রেমের রূপ আমরা পাই *মানসী* কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায়। তার মধ্যে তিনিটি উল্লেখ্য কবিতা হ'ল 'বধূ' (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ)[১৯] 'অপেক্ষা' (১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ)[২০] এবং 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' (২৩শে আষাঢ়, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ)[২১]। এই তিনটি কবিতাই গাজীপুরে সস্ত্রীক বাস করার সময়ে রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং প্রতিটিতেই এক একাকিনী সরলা গ্রাম্যবধূর চুপিসারে আনাগোনা। এই বধূর ভাবকল্পই পরবর্তীতে *মায়ার খেলা* -র শান্তা চরিত্রে গানে ব্যক্ত হয়ে ওঠে। কয়কটি উদাহরণ দেওয়া যাক। 'বধূ' কবিতার বধূ আসে এভাবে –

পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে—
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল !
কোথা সে ধাঁধা ঘাট, অশথতল ![২২]

আবার, 'অপেক্ষা' কবিতায় সেই বধূর দিনলিপিকা বড়ই ধূসর –

অলস দুখে দীর্ঘ দিন
ছিল সে বসে মিলনহীন,
এখনো তার বিরহগাথা
বিরাম নাহি মানে।
বধূরা দেখো আইল ঘাটে,
এল না ছায়া তবু।[২৩]

এবং 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ'-এ কোনও এক গ্রাম্যবালিকা বাল্যবিবাহের পরেও যেন তার স্বামীর কাব্যপারাবারের স্রোতে না ভেসে বরং ছায়াঘেরা পুকুরঘাটকেই আপন করেছে। সেই সহজ অকৃত্রিম আকুতি কবিতায় দেখা যায় বধূর উক্তিতে –

বর ।। ...কানন নিরালা, আঁখি হাসি-ঢালা,
মন সুখস্মৃতি-সমাকুল—
কী করিছ বনে কুঞ্জভবনে ?
কনে ॥ খেতেছি বসিয়া টোপাকুল ।[২৪]

মায়ার খেলা গীতিনাট্যের শান্তা চরিত্রের অনুপ্রেরণা বলা যায় এই মানসী কাব্যগ্রন্থোল্লিখিত বিরহিণী বঙ্গবধূর বিভোলতা। তাই একদিকে যেমন *বসন্ত-উৎসব, মানময়ী* গীতিপ্রধান নাট্যগুলির ম'ত রূপসী নারীর রূপঝংকারে অভিভূত নায়কের উছলতায় অপর কোনও মানবতী নায়িকার মানভঞ্জনে নায়কের আত্যন্তিক প্রয়াস *মায়ার খেলা*-র কথাবস্তুতে উপনীত হয়েছে, তেমনই অমর-শান্তার হৃদয়গত বৃত্তির অনুকারক হয়েছে *মানসী* কাব্যগ্রন্থের

কবিতাগুলি এবং *কড়ি ও কোমল*-এর দ্বন্দ্ব *মায়ার খেলা*-র নাট্যিকতার আত্মারূপে বিরাজ করেছে। তাই *মায়ার খেলা* গীতিনাট্যের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা যায় উক্ত রবীন্দ্ররচনাগুলিকে যে নাট্যসন্দর্ভ নয়।

এই গীতিনাট্যের বস্তুনির্দেশে তার কাহিনিটি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা যাক। এই নাট্যের নায়ক অমর, প্রথম নায়িকা শান্তা এবং দ্বিতীয় নায়িকা প্রমদা। আধিকারিক ইতিবৃত্তের সমান্তরালে কুমার, অশোক নামের দুই যুবক, নায়ক-নায়িকার সমাগম ও সখীগণ কোনও প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের সূচনা না করলেও নায়িকার অনুক্ত মনোভাবকে ব্যক্ত করতে তারা সহায়ক। এছাড়াও মায়াকুমারীগণের ভূমিকা এই গীতিনাট্যে বিশেষতঃ উল্লেখনীয়। এই মায়াকুমারীগণ মূল ইতিবৃত্তের নিয়ন্ত্রক তথা নিয়ামক। নাট্যটি সপ্ত দৃশ্যে বিন্যস্ত। এই সপ্তদৃশ্যের স্থান-কাল-পাত্রের একটি নির্ঘণ্ট নিম্নে প্রদত্ত হ'ল –

প্রথম দৃশ্য : স্থান – কানন, কাল – রাত্রি, পাত্র – মায়াকুমারীগণ
দ্বিতীয় দৃশ্য : স্থান – গৃহ, কাল – অনুল্লেখিত, পাত্র – অমর, শান্তা, মায়াকুমারীগণ
তৃতীয় দৃশ্য : স্থান – কানন, কাল – সন্ধ্যা, পাত্র – প্রমদা, সখীগণ, কুমার, অশোক, মায়াকুমারীগণ
চতুর্থ দৃশ্য : স্থান – কানন, কাল – অনুল্লেখিত, পাত্র – অমর, অশোক, কুমার, প্রমদা, সখীগণ, মায়াকুমারীগণ
পঞ্চম দৃশ্য : স্থান – কানন, কাল – সন্ধ্যা, পাত্র – অমর, কুমার, প্রমদা, অশোক, সখীগণ, মায়াকুমারীগণ
ষষ্ঠ দৃশ্য : স্থান – গৃহ, কাল – রাত্রি, পাত্র – অমর, শান্তা, প্রমদা, সখীগণ, মায়াকুমারীগণ
সপ্তম দৃশ্য : স্থান – কানন, কাল – রাত্রি, পাত্র – অমর, শান্তা, প্রমদা, সখীগণ, মায়াকুমারীগণ, পুরনারী এবং পৌরজন

সপ্তদৃশ্যে সুমন্থিত এই গীতিনাট্যের ইতিবৃত্তটি এরূপ যে কুহকবিদ্যার প্রয়োগে কোনও এক বসন্ত রজনীতে মায়াকুমারীগণ নরনারীর হৃদয়ে মোহসঞ্চার করে। অমর যৌবনতৃষায় শান্তার প্রেমকে উপেক্ষা ক'রে অদৃষ্টের বলে প্রমদার প্রমোদকাননে উপস্থিত হয়। প্রগল্ভা প্রমদার দ্বারে অশোক এবং কুমার ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যাওয়ার কথা জেনেও অমর মায়াপাশে প্রমদার মায়ামরীচিকার দিকে এগিয়ে যায়। আবার, স্বভাবকোমল অমর প্রমদাকেও তার অন্তরনিবেদনে অপূর্ণ থেকে যায়। মনে উচাটনতা রেখেই শান্তার সঙ্গে তার মিলনোৎসব স্থির হয় কিন্তু তৎক্ষনাৎ প্রমদার পুনরায় উদ্যানে আগমন ঘটে এবং দ্বিধাবিভক্ত অমরের হাতে ধরা পুষ্পমালাটি ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায় কিন্তু প্রমদা অমরকে মুক্তি দেয় মোহাবরণ থেকে। প্রমদা ফিরে যেতেই শান্তা সেই মালাটি তুলে নেয় এবং মায়াকুমারীগণ তাদের লীলা সাঙ্গ করে অমর-শান্তার অন্তঃকরণে যাবতীয় মায়ার মোচনে। এভাবেই অমর-শান্তার প্রেম বাসন্তিক পরিবেশে চন্দ্রিমায় শুভ্র বেশ ধারণ করে ।

এই নাট্যটি সংস্কৃত উপরূপকের কতখানি সহমর্মিতা লাভ করেছে, তা দুটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হবে। প্রথমটি হ'ল লক্ষণগ্রন্থের প্রেক্ষিতে বহিরঙ্গ সাযুজ্য এবং দ্বিতীয়টি হ'ল লক্ষ্যগ্রন্থের প্রেক্ষিতে অন্তরঙ্গ সাযুজ্য। বহিরঙ্গ সাযুজ্য অর্থে নাট্যটির নাট্যশাস্ত্রানুমোদিত নাট্যতত্ত্ব (বস্তু, নেতৃচরিত্র, অঙ্গিরস, সন্ধি, অর্থপ্রকৃতি, অর্থোপক্ষেপক, বৃত্তি) এবং অন্তরঙ্গ সাযুজ্য অর্থে প্রয়োগানুশীলন (চরিত্রচিত্রণ, নামকরণ,ঘটনাবিন্যাস) বিষয়কেই

ভাবা হয়েছে। যেহেতু এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য তিনটি রবীন্দ্রনাট্যের নান্দনিক সমীক্ষা, তাই ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের প্রকরণগ্রন্থ তথা নাট্যতত্ত্বের আলোচনায় ঋদ্ধ এবং বলীয়ন গ্রন্থগুলিতে প্রদত্ত নাট্যতত্ত্বের বিভিন্ন প্রায়োগিক এবং পারিভাষিক দিকগুলির সাপেক্ষে নির্বাচিত রবীন্দ্রনাট্যগুলির বিচার প্রদর্শিত হবে। সুতরাং পূর্বে বহিরঙ্গ দিক এবং পরে অন্তরঙ্গ দিকগুলি উঠে আসবে। এই ক্রম এই অধ্যায়সহ পরবর্তী অধ্যায়দুটিতেও ফলিত হবে।

৪.৪ নাটিকা ও *মায়ার খেলা* : বহিরঙ্গ সাযুজ্য :

এই বহিরঙ্গের দিকগুলি মূলতঃ নাট্যতত্ত্বের বিষয়। তবে তার জন্য ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*, ধনঞ্জয়ের *দশরূপ* এবং বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণ* এই তিনটি গ্রন্থ-ই প্রমাণস্বরূপ হ'লেও *সাহিত্যদর্পণ*-এর লক্ষণগুলির উল্লিখিত হয়েছে। মূলতঃ গবেষণা-অভিসন্দর্ভটির দৈর্ঘ্যের অতিবৃদ্ধি নিবারণার্থেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এমনকি অন্তরঙ্গ সাযুজ্য এবং পরবর্তী দুটি অধ্যায়েও এই পদ্ধতি-ই অনুসৃত হয়েছে।

❖ **নাট্যবস্তু :**

স্বর্ণকুমারী দেবীর *বসন্ত-উৎসব* থেকে শুরু করে *নলিনী* এবং শেষে *মায়ার খেলা* এই প্রতিটি নাট্যেরই বস্তুগত সখ্যতা রয়েছে। চরিত্রের নামকরণ নাট্যান্তরে পরিবর্তিত হলেও তার চেতন এবং অবচেতন মনের গতি চলমান অবিকল একই গতিবেগে ধাবিত হয়েছে। তাই প্রখ্যাত বৃত্তের কাছে যাচঞ্চা না ক'রেই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোনীত নামেই কাল্পনিক চরিত্রের সংঘটনায় *মায়ার খেলা*-র সৃজন করেছেন যাকে প্রাচীন ভারতের নাট্যতাত্ত্বিক পরিভাষায় বলা হয় 'ক্লৃপ্তবৃত্ত' বা 'উৎপাদ্য'। *সাহিত্যদর্পণ*-এ নাটিকার লক্ষণে দেখা যায় এরকম শব্দের প্রয়োগ – "নাটিকা ক্লৃপ্তবৃত্তা স্যাত্ স্ত্রীপ্রাযা চতুরঙ্কিকা"[২৫]। অর্থাৎ নাটিকা-র প্রথম পালনীয় ধর্ম তার কবিকল্পিত কথাবস্তুর রসায়ন। তাই মায়ার খেলা-র নাটিকাত্ব বিচারে প্রথম সোপানটি সঠিকভাবেই অতিক্রম করা যায়। এছাড়াও 'স্ত্রীপ্রাযা' পদের অর্থ দাঁড়ায় নাটিকায় স্ত্রী চরিত্রের একাধিপত্য থাকে। এই উপরূপকে স্ত্রী চরিত্রের সংখ্যাধিক্য থাকবে। *মায়ার খেলা*-য় অমর, অশোক, কুমার এবং পৌরজন ব্যতীত সব চরিত্রই নারী চরিত্র। প্রমদার সখীগণ, পুরনারীগণ এবং এই লীলানাট্যের সূত্রধার মায়াকুমারীগণ এই নাট্যের অস্থিসজ্জা গঠন করেছে। এমনকি সাতটি দৃশ্যের মধ্যে এমন কোনও দৃশ্য নেই যা নারীচরিত্রবর্জিত। তাই আনুপাতিকতার বিচারে মায়ার খেলা নাট্যের মধ্যেও 'স্ত্রীপ্রাযা' এই ধর্মটি বর্তমান। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ অঙ্কপদ্ধতি গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যে ব্যবহার করেননি, তাই চতুরঙ্কবিশিষ্টত্ব লক্ষণটি এক্ষেত্রে কার্যকর হয়না।

❖ **নায়ক-নায়িকা :**

নাটিকার লক্ষক শ্লোকের মধ্যে দেখা নায়ক-নায়িকা বিষয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজের অনেকখানি বক্তব্য। যথা –

প্রখ্যাতো ধীরললিতস্তত্র স্যান্নাযকো নৃপঃ।।
স্যাদন্তঃপুরসম্বন্ধা সংগীতব্যাপৃতাথবা।
নবানুরাগা কন্যাত্র নাযিকা নৃপবংশজা।।[২৬]

অর্থাৎ নায়ক হবে ধীরললিত গুণান্বিত বিখ্যাত রাজা এবং নায়িকা হবে অন্তঃপুরনিবাসিনী সংগীতাদি কলায় প্রসাধিতা নবানুরাগা কোনও রাজকন্যা। *মায়ার খেলা*-র ক্ষেত্রে অমর, শান্তা এবং প্রমদার কোনওরূপ জন্মপরিচয় পাওয়া যায়না। তবে রাজানুষঙ্গ কোনও প্রতীক তাদের মধ্যে বিদ্যমান না থাকায় তাদের সাধারণ মানুষ ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে সংশয় থাকেনা। তাই *সাহিত্যদর্পণ* যে লক্ষণ প্রস্তুত করেছেন, তার প্রাথমিক শর্ত রক্ষা করতে অপারগ *মায়ার খেলা* । তবে রাজানুষঙ্গতা ব্যতীত আরও একটি নায়কগুণ নাটিকায় থাকবে। তা হ'ল ধীরললিত স্বভাব। ধীরললিত স্বভাবপ্রসঙ্গে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন "নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাত্"[২৭]। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিরুদ্বেগচিত্ত, যার স্বভাবে মৃদুতা বা সৌকুমার্য রয়েছে, নৃত্য-গীত ইত্যাদি কলায় পারদর্শী; সে-ই হয় ধীরললিত নায়ক। সাহিত্যদর্পণকার উদাহরণে *রত্নাবলী*-র বৎসরাজ উদয়নের কথা বলেছেন। তবে ধীরললিত নায়ক যে সর্বদাই কোনও রাজা হবে একথার কোনও ইঙ্গিত নেই গ্রন্থমধ্যে। *মায়ার খেলা*-র নায়ক অমরের মধ্যে ধীরললিত গুণ কতখানি রয়েছে তা বিচার্য। প্রথমতঃ চরিত্রটি একমুখী। অমরের প্রেমসুধাপানের তৃষা ব্যতীত তার প্রাত্যহিক দিনচর্যার বা সাংসারিক কর্তব্যের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায়না নাট্যমধ্যে। তাই জগৎসংসারে চলমান বিচিত্র কাণ্ড তাকে প্রভাবিত করেনা। সে কেবলই প্রেমের আশায় ছুটে যায় কখনও প্রমদারূপী মায়ার হরিণের দিকে আবার কখনও হৃদয়মাধুরী দান করে শান্তাকে। তাই অমরের চারিত্রিক বিশিষ্টতায় নিশ্চিন্ত মনের পাওয়া যায়। এমনকি মৃদুতার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি গানকে উপস্থিত তুলে ধরতে পারি। যথা –

দিবসরজনী, আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি।
তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ,
তৃষিত আকুল আঁখি।
...
এত ভালোবাসি, এত যারে চাই,
মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই –[২৮]

আবার, প্রমদার প্রলোভনে দগ্ধ হয়ে যখন নিঃস্বার্থ প্রেমের স্পর্শ পায় শান্তার কাছে, তখন সে বলে –

ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে,
জেনেছি স্বপন সব মিছে,
বিঁধেছে বাসনা-কাঁটা প্রাণে-
এ তো ফুল নয়, ফুল নয় ![২৯]

প্রমদার প্রতি কোনও ক্ষোভ বা উষ্মা প্রকাশ পায়না অমরের গানে। এমনকি শেষ পর্যন্তও মনের দ্বন্দ্ব কাটিয়ে যখন শান্তাকেই আপন ক'রে নিতে চায়, তখন নিজেকেই ধিক্কার দেয় ভাগ্যবিড়ম্বিত বিধির লেখনে –

সুখনিশি অবসান – গেছে হাসি, গেছে গান,
এখন এ ভাঙা প্রাণ লইয়া গলে
নীরব নিরাশা কে সহিবে ![৩০]

অর্থাৎ ঈষৎ বক্রতা বা কুটিলতা মুক্ত একটি রবীন্দ্রনাট্যচরিত্র অমর। তাই এই ধরণের চরিত্রের মধ্যে ‘মৃদুতা’ মৃদু না হয়ে প্রবল হয়ে ওঠে। ধীরললিত স্বভাবের জন্য যে গুণটির আবশ্যকতা সর্বাধিক প্রয়োজন ব’লে মনে হয়, তা হ'ল কলাপারঙ্গমতা। ললিত কলায় নায়ককে অভিজ্ঞ হতে হবে। অমরের মধ্যে তার কলানিপুণতার উল্লেখ নেই। গীতিনাট্য ব’লেই প্রতি চরিত্রের উক্তিই গীতোক্তি। তাই অমরের গানগুলিই তার কলানিপুণতার পরিচায়ক নয়। তাই সম্পূর্ণভাবে অপরকে ধীরললিত নায়ক বলা যায়না।

এবারে আসা যাক নায়িকাপ্রসঙ্গে। শান্তার নায়িকালক্ষণ মেলানোর পূর্বেই বলে নিতে হয় যে নাটিকা উপরূপকের নায়িকার সঙ্গে নায়কের প্রথমা স্ত্রী-ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নায়িকা ম’ত রাজবংশজাত হবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন –

সম্প্রবর্ত্তেত নেতাস্যাং দেব্যাস্ত্রাসেন শঙ্কিতঃ।
দেবী ভবেত্ পুনর্জ্যেষ্ঠা প্রগলভা নৃপবংশজা ।।
পদে পদে মানবতী তদ্বশঃ সঙ্গমো দ্বযোঃ ।[৩১]

অর্থাৎ রাজার প্রথমা স্ত্রীও রাজবংশ থেকে আগত, সে হবে ‘প্রগলভা’, বয়সে জ্যেষ্ঠ এবং রাজার দ্বিতীয় নারীর সঙ্গে মিলন তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং ক্ষণে ক্ষণে সে মানিনী হবে। তাই নাটিকা দুজন মুখ্য নারী চরিত্রের মধ্যে একজন রাজান্তঃপুরের বিবাহিতা রাজমহিষী এবং অপরজন আন্তঃরাজ্য থেকে নবাগতা কোনও রাজনন্দিনী। তাই এই নাট্যের ক্ষেত্রে কে ‘মানিনী’ এবং কে ‘নবানুরাগা’ তা বিশ্লেষণ করতেই হয়। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে স্বর্ণকুমারী দেবীর *বসন্ত-উৎসব* গীতিনাট্যের যুগ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পরবর্তী যুগ। তাই বহুবিবাহের ম’ত প্রাচীন অসাড় রীতি তখন বিদ্বৎবর্গে ঘৃণ্য। তাই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যে সে বিষয়কে প্রশ্রয় দেওয়া যায়নি। তবে একজন পুরুষের দুটি বিবাহ নিয়ে কোনও সাহিত্যরচনা করেননি তা নয়। জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ বঙ্গাব্দে (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে) সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর *মধ্যবর্তিনী* গল্প[৩২]। এই গল্পেই নিবারণের দুই স্ত্রীর উপস্থিতি থাকলেও এটি মনে করা উচিত হবেনা যে রবীন্দ্রনাথ বহুবিবাহকে সমর্থন জানাচ্ছেন। বরং একই পরিবারের দু’জন স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা, অসূয়া কতখানি কঠিন রূপ ধারণ করতে পারে, তা-ই গল্পে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই প্রথমা স্ত্রীর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গলাভ কখনওই রবীন্দ্রসাহিত্যে সমাদর লাভ করেনা। *মায়ার খেলা*-র পটভূমিকায় রাজতন্ত্রের আবহ না থাকলেও চরিত্রগুলির অবস্থানের কাল অধরা থেকে গেছে। এমন কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নেই যার দ্বারা তার সময়কাল নির্ণয় করা সম্ভব। এমনকি চরিত্রের নামকরণগুলিও দেশ-কালের সীমার উর্ধ্বে অবিনশ্বর । তাই যে সময়ে অমর-শান্তার প্রেমের কথা সূত্রিত হচ্ছে, সেই সময় নগরজীবনে বহুবিবাহ প্রথা স্বীকৃত ছিল কিনা তা সঠিকভাবে নিরূপিত হয়না। তাই

নাটিকা উপরূপকের লক্ষণ থেকে রাজতন্ত্র এবং বহুবিবাহকে প্রথমেই স্থানান্তরিত করতে হয়। অর্থাৎ অবশিষ্ট থাকে কোনও একজন নারীর সঙ্গে একজন পুরুষের সম্পর্কে অকস্মাৎ নতুন কোনও নারীর আগমন এবং পুরুষটির তার প্রতি মিলনৌৎসুক্য। এমনকি প্রথম নারীর সঙ্গেই নাট্যপরিণামে মিলন সাধিত হবে। সুতরাং নাটিকা-র স্বরূপসম্বন্ধে পাঠক এবং সহৃদয় প্রেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিকে যুগোপযোগী করতে তুলতে হবে এই ধরণের তুলনামূলক সাহিত্যবিচারপদ্ধতিতে। তাই আলোচ্য গীতিনাট্যে শান্তা-কে 'প্রগল্ভা মানিনী' রূপে কল্পনা করতে হয় এবং প্রমদা-কে 'নবানুরাগা কন্যা' ভাবে কল্পনা করতে হয়। নায়িকাভেদের আলোচনাবসরে বিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণ*-এ বলেছেন "অথ নায়িকা ত্রিবিধা স্বা'ন্যা সাধারণী স্ত্রীতি"[৩৩]। অর্থাৎ নায়কের সমগুণভাবাপন্ন নায়িকা তিন প্রকার। যথা নায়কের স্ত্রী, অপর কোনও ব্যক্তির স্ত্রী এবং সকলের উপভোগ্য সাধরণ স্ত্রী। নায়কের নিজ স্ত্রী বা স্বীয়া নায়িকাও ত্রিধা। যথা মুগ্ধা, মধ্যা এবং প্রগল্ভা – "সাপি কথিতা ত্রিভেদা মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভেতি"[৩৪]। আবার অন্য স্ত্রীয়ের দুই ভেদ যথা পরোঢ়া এবং কন্যা-র প্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণ*-এর উক্তি – "পরকীয়া দ্বিধা প্রোক্তা পরোঢা কন্যকা তথা"[৩৫]। অর্থাৎ শান্তার ক্ষেত্রে প্রগল্ভতার লক্ষণ এবং প্রমদার ক্ষেত্রে কন্যার লক্ষণ অনুসন্ধান করণীয়। তবে নাট্যগ্রন্থনায় দেখা যায় শান্তা এবং প্রমদা উভয়েই অবিবাহিতা কন্যা। তাই স্বীয়া নায়িকার প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে খাটবে না। তবে প্রগল্ভতার কিছু নির্যাস শান্তার মধ্যে পাওয়া যায় কিনা তা দেখে নেওয়া যাক। *সাহিত্যদর্পণ*-এর মতে প্রগল্ভা নায়িকার লক্ষণ হ'ল –

স্মরান্ধা গাঢতারুণ্যা সমস্তরতিকোবিদা ।
ভাবোন্নতা দরব্রীডা প্রগল্ভাক্রান্তনাযকা ।।[৩৬]

এর বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় যে নায়িকা কামান্ধ, যে পরিপূর্ণ যৌবনবতী, যে রতিক্রীড়ায় সুদক্ষ, ভাবগত দিক থেকে উন্নত, যার মধ্যে লজ্জাশীলতা অপেক্ষাকৃত কম এবং নায়কের প্রতি আসক্ত; এমন নায়িকা-ই 'প্রগল্ভা'। এমনকি *সাহিত্যদর্পণ*-এ 'স্মরান্ধা' ইত্যাদি বিশেষণের উদাহরণস্বরূপ যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হয়েছে সেখানে দেখা যায় কামিনী নায়িকাদের সম্ভোগাত্মক বর্ণচিত্র[৩৭]। তাই শান্তার ক্ষেত্রে সরাসরি এই বিশেষণগুলির অবস্থিতির অনুসন্ধান অনর্থক। ১৯শে মার্চ, ২০২০ তারিখে "রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের পার্থক্য" বিষয়ে আনন্দমোহন কলেজের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তথা 'দক্ষিণী' সংগীতপ্রতিষ্ঠানের সংগীতশিল্পী দেবাশিস রায়চৌধুরী-র সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উক্ত বিষয়ক আলোচনায় তিনি তাঁর *মায়ার খেলা*-র গানের গঠন বিষয়ে সচেতন ক'রে দেন। তাঁর মতে শান্তা শান্ত স্বভাবের একজন নারী। তার গানগুলি এক-একটি পূর্ণ গীতি। অন্যদিকে প্রমদা এবং সখীদের কথোপকথনে একটি গানই খণ্ডিত হয়ে বিভিন্ন জনের কণ্ঠে উক্ত হচ্ছে। ওনার দেওয়া এই সমীক্ষাটি এই প্রসঙ্গে প্রসঙ্গোচিত। মায়ার খেলা গীতিনাট্যে শান্তার চরিত্রে মোট সাতটি গান রয়েছে। যথা "পথহারা তুমি পথিক যেন"[৩৮], "আমার পরাণ যাহা চায়" (দ্বিতীয় দৃশ্য)[৩৯], "দেখো, সখা, ভুল করে ভালোবেসো না"[৪০], "না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে" (ষষ্ঠ দৃশ্য)[৪১], "আহা, কে গো তুমি মলিননয়নে"[৪২], "আমি তো বুঝেছি সব"[৪৩], "চাঁদ, হাসো হাসো"[৪৪] এবং "যদি কেহ নাহি চায়" (সপ্তম

দৃশ্য)[৪৫]। এর মধ্যে "চাঁদ, হাসো হাসো" গানটি পুরজনের সঙ্গে শান্তার সম্মিলিতভাবে গীত হয়েছে। বাকি প্রতিটি গানই শুধু তার কণ্ঠে শ্রুত হয়। অন্যদিকে চতুর্থ দৃশ্যে কাননে দেখা যায় প্রমদা এবং তার সখীগণের ভাবনা একটিই গানে ব্যক্ত –

প্রমদা ।। সুখে আছি, সুখে আছি, সখা আপন মনে ।
প্রমদা ও সখীগণ ।। কিছু চেয়ে না, দূরে যেয়ো না –
শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি ।[৪৬]

সমগ্র নাট্যজুড়েই দেখা যায় প্রমদা ও তার সখীদের মনোভাবনায় অসামান্য পার্থক্য নেই। প্রমদা কখন কোন্ পুরুষের সঙ্গে হৃদয়বন্ধন করবে, কোন্ পুরুষকে ভর্ৎসনা করবে তা সবই সখীদের গোচরেই ঘটে। তাই তৃতীয় দৃশ্যে অশোক প্রমোদোপবনে আভরিত তরুণী প্রমদার পদভিক্ষা করলে তাকে প্রত্যাখ্যান করে প্রমদা। তাই অশোককে সরাসরি ফিরে যেতে না ব'লে ছলনার মধ্যস্থতার ভার দেয় সখীদের - "ওকে বলো সখী, বলো কেন মিছে করে ছল –"[৪৭]। অন্যদিকে ষষ্ঠ দৃশ্যে শান্তা-ই অমরকে সকাতর মিনতি জানায় –

শান্তা ।। দেখো, সখা ভুল করে ভালোবেসো না !
আমি ভালোবাসি ব'লে কাছে এসো না ।[৪৮]

চতুর্থ দৃশ্যেই অশোক, প্রমদা, কুমার এবং সখীগণের কথোপকথনের মাধ্যমে একটিই গান খণ্ডিত –

অশোক ।। ভালোবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে ।
প্রমদা ও সখীগণ ।। না না না, সখা, ভুলি নে ছলনাতে ।
কুমার ।। মন দাও দাও দাও, সখী, দাও পরের হাতে ।[৪৯]

প্রমদার প্রণয়সঙ্গীর সঠিক চয়ন, প্রমদাকে অবাঞ্ছিত কামী পুরুষদের থেকে নিবৃত করা, প্রমদার দূতী হয়ে পুরুষদের ভর্ৎসনা, কোনও পুরুষকে আহ্বান এই নানাবিধ নর্মক্রীড়ায় প্রমদার পরিমিত জনবল রয়েছে। অপরদিকে শান্তা কখনওই অন্যের দ্বারা পরিনির্দেশিত নয়। সে শুধুই অমরের সঙ্গে নিরালায় একাকী কথা বলে। দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ দুটি দৃশ্যেই অমর-শান্তাকে গৃহাভ্যন্তরে থাকতে দেখা যায়। সপ্তম দৃশ্য যেহেতু বিবাহ-উৎসবের ক্ষেত্র তাই সেখানে পুরবাসীগণ উপস্থিত থাকলেও শান্তা সখীপরিত্যক্ত অবস্থায় অমরকে তার অন্তঃকরণবৃত্তি, অনাগতকালের সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে। প্রমদা শান্তারই বিপ্রতীপ সত্তা। সে একাকী আত্মনিমগ্ন নারী নয়। সে অলংকার রচনা করে, সখীদের সঙ্গে তার প্রেমদর্শন আলোচনা করে, পুরুষকে স্বাগত জানায় বা প্রত্যাখ্যান করে। তাই প্রগলভা নায়িকারূপে শান্তাকে চিহ্নিত করা যায়। কাম এবং প্রেমের পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ এই গীতিনাট্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গীতিসুধায় অপরূপ ক'রে তুলেছেন। তা শুধুই অনুভূতিবেদ্য। তাই 'স্মরান্ধা'-র পরিবর্তে শান্তাকে 'প্রেমচৈতন্যস্বরূপা' প্রকাশমূর্তি বলা যায়। সে প্রেমে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়নি। অমরকে ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তা পূর্ণভাবে গ্রহণ করেনি যতক্ষণ না তার মোহের কালিমা দূরীভূত হয়। নতুবা ষষ্ঠ দৃশ্যেই অমরের

প্রত্যাবর্তনের পরেই শান্তার সঙ্গে বাহুবন্ধনে নাট্যের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পুনরায় তাদের মিলনক্ষেত্রে প্রমদার উপস্থিতিতে অমরের হৃদয়ের শোধন প্রয়োজন ছিল। যতক্ষণ না বিরহানলে তপ্ত হয়ে 'চির বিষাদ'কে আপন ক'রে নিতে পারছে অমর, ততক্ষণ শান্তা ধরা দেয়নি। তাই শান্তার উন্নত মানসিকতা এবং শুদ্ধ চৈতন্যে সে অন্ধ নয়-ই; বরং নতুন দৃষ্টিদান করেছে অমরকে। তারুণ্যের গাঢ়ত্বের কথা যদি ধরি, তবে তাহলে তার বয়সের কোনও আভাস নাট্যবস্তুতে উহ্য থাকলেও তাকে প্রাপ্তবয়স্ক ব'লেই অনুমান করা যায়। তার মানসিক স্থিতি তাকে তার বয়সের মাপকে নস্যাৎ ক'রে দেয়। অর্থাৎ বয়স যদি মানসিক স্থিতিশীলতার অপেক্ষক হয়, তবে সেই ক্ষুদ্রতাকে সে অধিমানস চেতনার দ্বারা অতিক্রম ক'রে গেছে। 'সমস্তরতিকোবিদা' বলতে বোঝায় কামকলা (রতি)-য় নিপুণ অভিজ্ঞতা। প্রগল্ভা এমন শ্রেণীর নায়িকা যে রতিক্রিয়া সম্পর্কে পূর্বেই অবগত এবং বরিষ্ঠ। *মায়ার খেলা* নাট্যে অমর-শান্তার মধ্যে সম্ভোগশৃঙ্গারজনিত কোনও অনুভাবের ধ্বনি হয়নি। তাই রতিক্রীড়াজ্ঞতা তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল কিনা তা জানা যায়না। তবে মায়ারহিত তার প্রেমের আবেদন রতিনিষ্ঠ আত্মতুষ্টির সম্ভোগ নয়। ষষ্ঠ দৃশ্যের "না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে" গানের মধ্যে সে বলে –

পড় নি নয়নের ভাষা,
বোঝনি কাহার মরমের আশা,[৫০]

রতিকলাব্যতীত নয়নের দৃষ্টির গভীরতায় প্রেমের অভিব্যক্তিকে শান্তা অধিক গুরুত্ব দিতে চায়। তাই শরীরী মিলনের উর্ধ্বে তার প্রেমোপলব্ধির আকুতি। এরপর আসে 'ভাবোন্নতা'-র প্রসঙ্গ। কামকলায় অভিজ্ঞতা-ই ভাব তথা কামক্রীড়ায় উন্নত থাকা। তাই এই বিষয়টির অনুপস্থিতি-ও উপরিউক্ত গানটির বাণীর মধ্যে দিয়েই প্রমাণিত হয়। এরপরের বিশেষণ 'দরব্রীড়া'। লজ্জাশীলতা 'প্রগল্ভা' নায়িকার অপেক্ষাকৃত কম থাকা উচিত ব'লেই বিশ্বনাথ কবিরাজের দাবি। এই গুণটি শান্তার মধ্যে বর্তমান। তবে এই লজ্জা যে নায়কের সঙ্গে নিভৃতে মিলনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমনটি বলা যায়না। যদিও সাহিত্যদর্পণকার উদাহরণ দিয়েছেন –

ধন্যাসি যা কথযসি প্রিযসঙ্গমে'পি ।
বিশ্রব্ধচাটুকশতানি রতান্তরেষু ।।
নীবীং প্রতি প্রাণিহিতে তু করে প্রিযেণ ।
সখ্যাঃ ! শপামি যদি কিঞ্চিদপি স্মরামি ।।[৫১]

এখানে নায়কের দ্বারা নায়িকার বস্ত্রমোচনের প্রসঙ্গে তার লজ্জাহীনতার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থতঃ মিলনে এই নায়িকার কোনও জড়তা থাকেনা। এই প্রসঙ্গটিই *মায়ার খেলা*-র শান্তা চরিত্রে র ক্ষেত্রে অহেতুক।

আমার হৃদয় মন দিব বিসর্জন –
তোমার হৃদয়ভার আমি বহিব[৫২]

সপ্তম দৃশ্যের শান্তার গানের এই চরণগুলিই যথাযথ প্রমাণ তার কামগন্ধশূন্যতার। তবে যদি শুধুই 'দরব্রীড়া' শব্দদ্বারা লজ্জাহীনতা বা জড়ত্বহীনতাকে চিহ্নিত করি, তবে তা শান্তার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমীচীন। শান্তা অমরকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে তার হওয়ার গহীনতা। সে ষষ্ঠ দৃশ্যের একটি গানের মধ্যেই এটিও বলে "আমার অদৃষ্টস্রোতে তুমি ভেসো না"[৫৩]। সে যদি লজ্জাবনত হ'ত, সত্যকে স্বীকার করতে সক্ষম হলেও প্রকাশ করতে অক্ষম হ'ত, তবে এই ধরণের কথা বলত না। তাই আলোচ্য বিশেষণটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। শেষকালে 'আক্রান্তনায়কা' লক্ষণটি খাটতে বাধ্য। এটি ব্যতীত নায়কের সংসর্গতা লাভ করা যায়। তাই অপরের প্রতি তার আকৃষ্ট হওয়া এই লক্ষণটিকে অঙ্গীকার করেছে। আবার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্তৃক নিবন্ধীকৃত *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* গ্রন্থে 'প্রগল্ভ' শব্দের অর্থে পাই যথাক্রমে অহংকারী, দাম্ভিক, উদ্ধত, লজ্জাহীন, নির্লজ্জ, ধৃষ্ট, নির্ভীক, সাহসী, অবিনীত, গর্ব, অকুণ্ঠিত[৫৪]। এর মধ্যে 'সাহসী'-কে বাদ দিলে বাকি সবক'টি বিশেষণই যে কোনও ব্যক্তির সৎ গুণের প্রসঙ্গে যায়না; বরং কোনও কলঙ্কিত চরিত্রের জন্যই সচরাচর এই ধরণের শব্দের ব্যবহার করা হয়। তাই অভিধানকারের মতের সঙ্গে *সাহিত্যদর্পণ*-এর লক্ষণের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে, তা নয়। তবে এই অর্থগুলি সেকালের সংস্কৃত নাটিকার নায়িকার ক্ষেত্রে কামুকতার বৃত্তে প্রযুক্ত। তাই *মায়ার খেলা*-র শান্তার ক্ষেত্রে এই গুণাবলির প্রসঙ্গ আসেনা। যেহেতু সে কামকেই একমাত্র সাধন ব'লে গণ্য করেনা, তাই স্বাচ্ছন্দ্যে তাকে 'প্রগল্ভা' নায়িকার খেতাব থেকে দূরে রাখা যায়

প্রমদার ক্ষেত্রে কন্যা শ্রেণীর নায়িকার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধেয়। কন্যা নায়িকার লক্ষণ হ'ল – "কন্যা ত্বজাতোপমা সজ্জিত নবযৌবনা"[৫৫]। এছাড়াও বৃত্তিতেও বলা হয়েছে "অস্যাশ্চ পিত্রাদ্যাযত্তত্বাত্ পরকীযাত্বম্"[৫৬]। তাহলে সব মিলিয়ে অর্থ দাঁড়ায় যে নায়িকা অবিবাহিতা হওয়ার পিতার অধীনস্থ, যার মধ্যে লজ্জার ভাব রয়েছে এবং যে নবযৌবনসম্পন্না; এমন নায়িকা-ই কন্যা। প্রমদা অবিবাহিত, তাই নিয়মানুযায়ী সে পিতার নিয়ন্ত্রণে থাকবে এমনটিই হওয়া উচিত। তবুও নাট্যমধ্যে তার পিতার কোনও চরিত্র নেই বা নাট্যোক্তির মাধ্যমেও তার পিতার পরিচয় পাওয়া যায়না। এরপরে আসতে পারে সে 'নবযৌবনা' রমণী কিনা। সে প্রসঙ্গে বহুবিধ সাক্ষ্য রয়েছে নাট্যে। তৃতীয় দৃশ্যে প্রমদার সখী প্রমদার উদ্দেশ্যে বলে –

> সখী, তোরা দেখে যা, দেখে যা –
> তরুণ তনু এত রূপরাশি
> বহিতে পারে না বুঝি আর ![৫৭]

এখানের 'তরুণ তনু' শব্দবন্ধ তার পূর্ণ যৌবনবতী রূপের দ্যোতক। 'সলজ্জতা' প্রমদার চরিত্রে রয়েছে কিনা তা বিচার্য। তৃতীয় দৃশ্যে কুমার এবং অশোক প্রমদাকে প্রেমনিবেদন করলে প্রমদা মুহূর্তেই তাদের নিরস্ত করে। অথচ চতুর্থ দৃশ্যে যখন অমর প্রমদার প্রতি মদনতাপিত হয়, তখন প্রমদা লজ্জার বশে অমরের সম্মুখে আসতে পারেনা। তাই সখীদের সঙ্গে প্রমদার কথোপকথনটি এইরকম হয় –

প্রমদা ।। ওলো, যা তোরা, যা সখী, যা শুধা গে
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে ।
সখীগণ ।। ছি, ওলো ছি, হল কী, ওলো সখী !
লাজবাঁধ কে ভাঙিল, এত দিনে শরম টুটিল ![৫৮]

এছাড়াও পঞ্চম দৃশ্যে অমরের প্রতি প্রমদার মনোবাসনা তীব্রতর হয়ে উঠলে মায়াকুমারীগণ গায় –

নিমেষের তরে শরমে বাঁধিল,
মরমের কথা হল না ।[৫৯]

অর্থাৎ প্রমদার লজ্জার অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে চলেছে। তাই প্রমদাকে নায়কব্যাপারে 'সলজ্জা' বলা চলে। ফলতঃ প্রমদা কন্যা শ্রেণীর নায়িকা ।

❖ **অঙ্গী রস :**

এই গীতিনাট্যের মূল অঙ্গিরস শৃঙ্গার। শৃঙ্গার রসের লক্ষণপ্রসঙ্গে বিশ্বনাথ কবিরাজের বচন –

শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ ।
উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে ।।[৬০]

'শৃঙ্গ' থেকেই 'শৃঙ্গার' শব্দের উৎপত্তি। এই শব্দের অর্থ হ'ল মন্মথ বা কামের আবির্ভাব। নায়ক-নায়িকার সম্ভোগের অভিলাষ যখন হেতু হয়ে দাঁড়ায়, তখন শৃঙ্গারের রসধ্বনি ঘটে থাকে। যেহেতু রস 'সশব্দবেদিত' নয়, তাই 'শৃঙ্গার' শব্দোল্লেখেই রসের অভিব্যক্তি যথার্থরূপে ঘটেনা। নাট্যবস্তুর মধ্যে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাবের সন্ধানবশতঃ রস সহৃদয়হৃদয়লোকে ব্যঞ্জিত হয়। শৃঙ্গার রস পুনরায় দু'প্রকার। যথা বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগ শৃঙ্গার – "বিপ্রলম্ভো'থ সংযোগ ইত্যেষ দ্বিবিধো মতঃ"[৬১]। তন্মধ্যে সম্ভোগ শৃঙ্গারের লক্ষণটি বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে–

দর্শনস্পর্শনাদীনি নিষেবেতে বিলাসিনৌ ।
যত্রানুরক্তাবন্যোন্যং সম্ভোগো'যমুদাহৃতঃ ।।[৬২]

সুতরাং বিলাসী-বিলাসিনী নায়ক-নায়িকা যখন পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়া, উভয়কে শারীরিক ও মানসিকভাবে স্পর্শ করা যায়, তখনই সাহিত্যকর্মটির পরিণামে নির্যাসরূপে সম্ভোগ শৃঙ্গারের ব্যঞ্জনা ঘটে। এই নাট্যটিকে সম্ভোগ-শৃঙ্গার-রসাশ্রিত নাট্যরূপে চিহ্নিত করা যায়। শান্তা এবং অমরের মিলনেই সম্ভোগাত্মক শৃঙ্গার রস রসকোবিদ প্রেক্ষকের অন্তঃস্থলে ব্যঞ্জিত হতে পারে। এছাড়াও সূক্ষ্মভাবে বিচারের জন্য বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিভারিভাবকেও পরখ ক'রে নিতে হয়। বিভাব দু'প্রকার। যথা আলম্বন বিভাব (রসের আশ্রয়) এবং উদ্দীপন বিভাব (রসমুখী ধনাত্মক অনুঘটক)। শৃঙ্গারের বিভাব সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজের উক্তি –

আলম্বনং নাযিকাঃ স্যুর্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নাযকাঃ ।।
চন্দ্রচন্দনরোলম্বরুতাদ্যুদ্দীপনং মতম্ ।[৬৩]

অর্থাৎ আলম্বন বিভাব হ'ল নাট্যস্থ নায়ক-নায়িকা এবং উদ্দীপন বিভাব হ'ল চন্দ্রমরীচি, সুগন্ধি চন্দন, ভ্রমরের গুঞ্জন ইত্যাদি। আলম্বন বিভাব বা পাত্র-পাত্রীকে কেন্দ্র ক'রেই যেমন রসের উদগত, তেমনই উদ্দীপন বিভাব রসকে তরান্বিত করে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনেকখানিই দায়ী। *মায়ার খেলা*-য় আলম্বন বিভাব নায়ক অমর এবং নায়িকা শান্তা। বসন্তের রাত্রি, জ্যোৎস্নালু পরিবেশ, কুসুমকুঞ্জ ইত্যাদি প্রেমের বৃত্তের বহির্ভাগের আনুকূল্য। অনুভাব সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেনবলেছেন "ভ্রূবিক্ষেপকটাক্ষাদিরনুভাবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"[৬৪]। কোনও নায়কের প্রতি নায়িকার ভ্রূবিক্ষেপ, কটাক্ষ ইত্যাদি আঙ্গিক অভিনয় অনুভাবের ধর্ম। যেহেতু এটি গীতিনাট্য, তাই গানের মাধ্যমে একটি নাট্যবস্তুকে উপস্থাপন করায় আঙ্গিক অভিনয়ের এলাকা অনেকখানিই সংকীর্ণ। তবুও গানগুলির মধ্যে এমন উল্লেখ রয়েছে কিনা দেখা যাক। পঞ্চম দৃশ্যে অমর-প্রমদার হৃদয় পরস্পরকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করায় মায়াকুমারীদের গানে জানা যায় তাদের দৃষ্টিমৈত্রীর কথা –

পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ –
মেলিতে নয়ন মিলাল স্বপন[৬৫]

আবার, সপ্তম দৃশ্যে হঠাৎ প্রমদার আগমনে শান্তার গান –

আহা, কে গো তুমি মলিননয়নে
আধ-নিমীলিত ননলিননয়নে[৬৬]

এই উক্তিটিই প্রমদার অভিনয়ের নির্দেশ দেয়। তাই ভ্রবিভঙ্গ, কটাক্ষাদির প্রসঙ্গ রয়েছে নাট্যমধ্যে। এছাড়াও তৃতীয় দৃশ্যে কুসুমকাননে প্রমদার পুষ্পরচনার পরে সখীদের কথায় প্রমদার হাসির আঙ্গিকাভিনয় ধরা পড়ে –

বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে,
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে ![৬৭]

তবে অঙ্গিরস যদি নায়ক-নায়িকা-নিষ্ঠ হয়, তবে শান্তা-অমরের মধ্যে হাব, ভাব, হেলার যথাযথ রসানুযায়ী বিচরণ দেখা দেওয়ার কথা। অমর-প্রমদার পরিণাম বিচ্ছেদ। সেখানে শৃঙ্গারের বদলে করুণ রসের অভিব্যক্তি। অথচ প্রমদার মধ্যেই শৃঙ্গার রসের নায়িকোচিত অনুভাব শান্তার তুলনায় অধিকতর স্ফুট। যেহেতু নাটিকারূপে *মায়ার খেলা*-র যাচাই করা হচ্ছে, তাই *রত্নাবলী* -র ন্যায় প্রাচীন নাটিকার গঠনানুসারেই *মায়ার খেলা*-কে পরীক্ষা করা কর্তব্য। নাটিকায় দুই নায়িকার সঙ্গেই নায়কের মিলন ঘটত। *রত্নাবলী*-তে রাজা উদয়নের সঙ্গে সাগরিকার মিলনের সঙ্গে বাসবদত্তার সঙ্গেও উদয়নের চিরবিচ্ছেদ ঘটেনি। উভয়ের ক্ষেত্রেই শৃঙ্গার রসের অনুমিতি। অথচ *মায়ার খেলা* নাট্যে যেমন শান্তা-অমরের ইতিবৃত্ততে সম্ভোগরূপ শৃঙ্গার রসের অভিব্যঞ্জনা, তেমনই প্রমদা-অমরের ইতিবৃত্তের ফল করুণ। তাই শান্তা এবং প্রমদা উভয়কেই নায়িকার মর্যাদা দেওয়া হ'লে শৃঙ্গার এবং করুণ দুই

রসকেই স্বীকৃতি দিতে হয়। আবার, নাট্যের মধ্যে যে কোনও একটি রস-ই প্রধানভাবে উপজীব্য। তাই যেহেতু অমর-শান্তার অংশটি মিলনান্তক, তাই শৃঙ্গার রস তাদের ঘিরেই বর্ণিল এবং উপভোগ্য। অর্থাৎ তখন প্রমদার বৃত্তটি সহকারী বা প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের অধীনস্থ। তাই করুণ সেখানে অঙ্গরস। করুণ রসের লক্ষণপ্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণ*-এ পাওয়া যায় "ইষ্টনাশাদনিষ্টাপ্তেঃ করুণাখ্যো রসো ভবেত্"[৬৮]। ইষ্টের নাশ এবং অনিষ্টের প্রাপ্তিতে করুণ রস ধ্বনিত হয়। এছাড়াও করুণ-বিপ্রলম্ভের থেকে এর পৃথকত্ব বোঝাতে বলা হয়েছে –

শোকস্থাযিতযা ভিন্নো বিপ্রলম্ভাদযং রসঃ ।
বিপ্রলম্ভে রতিঃ স্থাযী পুনঃ সম্ভোগহেতুকঃ ।।[৬৯]

করুণাখ্য বিপ্রলম্ভে মিলনের আভাস থাকে। তাই সেখানে স্থায়িভাব রতি কিন্তু করুণ রসের স্থায়িভাব শোক –

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভযং তথা।
জুগুপ্সা বিস্মযশ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোপি চ।।[৭০]

মায়ার খেলা-র শেষে প্রমদার অনিষ্ট সাধিত হয়েছে ভাগ্য বা কর্ম যার জেরেই হোক না কেন। তাই অমরের সঙ্গে তার মিলনের কোনওরূপ সূত্র থাকেনি। অমর শান্তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় প্রমদাকে কেন্দ্র ক'রে অঙ্গরস 'করুণ' জারিত হয়েছে। সবশেষে আসে ব্যভিচারিভাবের প্রসঙ্গে। বিশ্বনাথ কবিরাজের ভাবনায় শৃঙ্গাররসোপযোগী এই ভাবগুলি সম্পর্কে কথিত রয়েছে "ত্যক্ত্বৌগ্র্যমরণালস্যজুগুপ্সাব্যভিচারিণঃ"[৭১]। অর্থাৎ উগ্রতা, মৃত্যু, আলস্য, ঘৃণা ব্যতীত বাকি তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিভাবের-ই শৃঙ্গার রসে ঝটিতি আগমন বা স্থানবিশেষে অবস্থান লক্ষ্য করা যেতে পারে। এই ব্যভিচারিভাবের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন বিশ্বনাথ কবিরাজ, সেখানে বাকি ব্যভিচারিভাবগুলি হ'ল – নির্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, মোহ, বিবোধ, স্বপ্ন, অপস্মার, গর্ব, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থা, ঔৎসুক্য, উন্মাদ, শঙ্কা, স্মৃতি, মতি, ব্যাধি, সন্ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা এবং বিতর্ক[৭২]। এগুলির মধ্যে মায়ার খেলা-য় আবেগ, জড়তা, মোহ, ঔৎসুক্য, স্মৃতি, হর্ষ, বিষাদ, গ্লানি, চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের সম্ভাব্য পরিস্থিতি দেখা যায়। বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক। আবেগ অর্থে আকস্মিক ব্যাকুলতা *মায়ার খেলা* -র দ্বিতীয় দৃশ্যে অমরের গানে অনুভূত হয় –

যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে,
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে ।
তেমনি আমিও, সখী, যাব-
না জানি কোথায় দেখা পাব ।[৭৩]

যৌবনের দীপশিখা অমরকে তার মানসী প্রতিমার নির্মাণে ত্রুটি রাখতে দিতে চায়না। তাই অমর যেন 'সব পেয়েছির দেশ'-এই সেই রূপকথার রাজ্যের সর্বাঙ্গসুন্দর কোনও মানসীর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। সহসা তার

নিস্তরঙ্গ জীবনে এহেন চিত্তবিকার আবেগের পটভূমিকা রচনা করেছে। জড়তা সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজের অভিমত –

অপ্রতিপত্তির্জড়তা স্যাদনিষ্টানিষ্টদর্শনশ্রুতিভিঃ ।
অনিমিষনয়ননিরীক্ষণস্তূষ্ণীম্ভাবাদয়স্তত্র ।।[৭৪]

ইষ্ট বা অনিষ্টের দর্শন-শ্রবণজনিত যে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, তা-ই জড়তা। *মায়ার খেলা* -র সপ্তম দৃশ্যে অমর-শান্তার মিলনোৎসবে হঠাৎ প্রমদার আগমনে অমরের স্থানুবৎ আচরণে জড়তা-র অনুমিতি রয়ে যায়। অতঃপর বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে 'মোহ'-এর সংজ্ঞা হ'ল "মোহো বিচিত্ততা ভীতিদুঃখাবেগানুচিন্তনৈঃ"[৭৫]। ভয়, দুঃখ, আবেগ বা অতিরিক্ত চিন্তার বশে 'মোহ' জন্মায়। এ এক প্রকার চিত্তবৈকল্য। এর ফলে ভূমিতে পতন, মূর্ছা দেখা দিতে পারে। *মায়ার খেলা*-র সপ্তম দৃশ্যে অমরের হাত থেকে মালাখানি পড়ে যাওয়ার ঘটনাটিকে মোহ-এর নামান্তর বলা যায়। ঔৎসুক্য হ'ল অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিতেপ্রাপ্তিতে কালবিলম্বজনিত অসহিষ্ণুতা। একেই বিশ্বনাথ কবিরাজ এভাবে বলেছেন – "ইষ্টানবাপ্তেরৌৎসুক্যং কালক্ষেপাসহিষ্ণুতা"[৭৬]। এই নাট্যের ষষ্ঠ দৃশ্যে শান্তার প্রতি অমরের গানরূপ উক্তিগুলিতে অমরের অধীরতা ধরা দিয়েছে –

এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি,
আজিও বুঝিতে নারি – ভয়ে ভয়ে থাকি ।[৭৭]

শান্তা তাকে "দেখো, সখা, ভুল করে ভালোবেসো না"[৭৮], "না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে"[৭৯] গানে অমরকে বারংবার সজাগ করতে চাইলেও অমর সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রেই কেবল তার ইষ্টজন শান্তার পাণিপ্রার্থনা করে। শৃঙ্গার রসে স্মৃতি নামক ব্যভিচারিভাবও সক্রিয় হয়ে থাকে। *সাহিত্যদর্পণ*-এ এই সম্পর্কে বলা হয়েছে –

সদৃশজ্ঞানচিন্তাদ্যৈর্ভ্রূসমুন্নয়নাদিকৃত্ ।
স্মৃতিঃ পূর্বানুভূতার্থবিষয়জ্ঞানমুচ্যতে ।।[৮০]

সাদৃশ্যবোধ, পূর্বকথা স্মরণের ফলে এরকম মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। পঞ্চম দৃশ্যে প্রমদার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হলে অমর স্মৃতিচারণা করে শান্তার –

ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে,
এসেছি এ কোথায়!
হেথাকার পথ জানি নে, ফিরে যাই ।
যদি সেই বিরামভবন ফিরে পাই ।[৮১]

হর্ষ এসেছে অমর-শান্তার পুণ্যমিলনে এবং তা *সাহিত্যদর্পণ*-এর নিয়ম মেনেই। সেখানে কারিকায় বলা হয়েছে "হর্ষস্ত্বিষ্টাবাপ্তের্মনঃপ্রসাদো'শ্রুগদ্গদাদিকরঃ"[৮২]। অর্থাৎ মনোবাসনা পূর্ণ হ'লে তার আনন্দানুভব-ই হর্ষ। আবার, কখনও কখনও শৃঙ্গার রসের পরিপোষণে বিষাদ নামক ব্যভিচারিভাবেরও উপস্থিতি ঘটতে পারে। এটি উপেয়ের অলাভজনিত একপ্রকার বলহানি যা কারিকায় "উপায়াভাবজন্মা তু বিষাদঃ সত্তসংক্ষয়ঃ"[৮৩] রূপে রয়েছে।*মায়ার খেলা*-র ষষ্ঠ দৃশ্যে শান্তা অমরকে মনেপ্রাণে গ্রহণ না করায় অমর বিষণ্ণ চিত্তে গেয়ে ওঠে –

ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাই নি তো কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে ।[৮৪]

গ্লানি হ'ল সাহিত্যদর্পণকারের মতে "রত্যায়াসমনস্তাপক্ষুৎপিপাসাদিসম্ভবা"[৮৫]। অর্থাৎ গ্লানি একাধিক কারণে আসতে পারে। তার মধ্যে মনস্তাপ অন্যতম। নিজ কৃতকর্মের ফলে যে আত্মসমালোচনামূলক অনুশোচনার জন্ম হয়, তা-ই গ্লানি। *মায়ার খেলা*-র ষষ্ঠ দৃশ্যে অমর চরিত্রে এরূপ আত্মগ্লানি দেখা দিয়েছে কারণ সে শান্তার নিমগ্নতা তার সুধাতৃষ্ণার তুলনায় ছিল গুরুত্বহীন। সরোবরের যে স্থির জলরাশি, তার সৌন্দর্য অমরের মনে স্থান পায়নি; পেয়েছিল নির্ঝরিণীর কলকল মুখরিত কোনও জলস্রোত। পরিশেষে বলতে হয় চিন্তা-র কথা। এটিও এমন একটি ব্যভিচারিভাব যা *মায়ার খেলা* নাট্যে শ্রুত। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতানুসারে এটির লক্ষণ "ধ্যানং চিন্তা হিতানাপ্তেঃ শূন্যতাশ্বাসতাপকৃত্"[৮৬]। এখানেও হিতবস্তুর অপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ রয়েছে। এখানে অমর-শান্তার মিলনের পূর্বসময় পর্যন্ত অমরের মনে এই অপ্রাপ্তির আক্ষেপ রয়ে গেছে।

সুতরাং *মায়ার খেলা* যে সম্ভোগ শৃঙ্গার রসাশ্রিত গীতিনিবদ্ধ রবীন্দ্রনাট্য এ বিষয়ে সংশয় থাকেনা। আবার, 'নাটিকা' পদবাচ্য হতে গেলে যে নাট্যটিকে শৃঙ্গাররসোদ্ভূত হতে হবে এই শর্তটিও রসগত বিচারে রক্ষা পেয়েছে সাবলীলভাবেই।

❖ **নাট্যসন্ধি :**

সংস্কৃতে 'সম্' নিপাতপূর্বক √ধা ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'সন্ধি' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়। সন্ধি বলতে সংযোগস্থানকে আপাতভাবে বোঝানো হলেও একটি বিষয় মাথায় রাখতে হয় যে এটি দুটি বস্তু বা ঘটনা বা মানুষের মিলনসূত্র। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যতত্ত্ব অনুসারে নাট্যসন্ধির প্রসঙ্গ আসলে দেখা যায় এটিও নাট্যশরীরের বিভিন্ন অংশের সংযোগ সাধন করেছে। *সাহিত্যদর্পণ* সন্ধির সংজ্ঞা দিয়েছে "অন্তরৈকার্থসম্বন্ধঃ সন্ধিরেকান্বয়ে সতি"[৮৭] ব'লে এবং বৃত্তিতে বলা হয়েছে "একেন প্রয়োজনেনান্বিতানাং কথাংশানামাবান্তরৈকপ্রয়োজনসম্বন্ধঃ সন্ধিঃ"[৮৮]। ফলে নাট্যসন্ধি হ'ল নাট্যের অন্তিমভাগে প্রধান ফলের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন কথাংশ বা অপরিপক্ক ঘটনার প্রয়োজনের সম্বন্ধ। অর্থাৎ একটি নাট্য আধিকারিক, প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত নিয়ে যখন তার উদ্দিষ্ট পথে যাত্রা করে, সেই যাত্রাপথের বিভিন্ন আকর্ষণীয় বা উল্লেখ্য ঘটনাটি নাট্যপরিণামের সঙ্গে কীরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করছে, তা নির্ণয়ের জন্যই এই নাট্যসন্ধির প্রয়োজন। যেমন মায়ার খেলা নাট্যের পরিণামে দেখা যায় যে অমর-শান্তার মিলন

ঘটেছে। অথচ এই মিলনের ইঙ্গিত প্রথম থেকেই স্পষ্ট ছিলনা। প্রমদার সঙ্গে অমরের সাক্ষাৎ এবং প্রমদার অনুরাগের কথাংশটি মূল কার্যসিদ্ধির পক্ষে প্রতিকূলতা নিয়ে আসে। আবার, অমরের পুনরায় শান্তার কাছে আত্মসমর্পণের মিনতির অংশটি মখ্য ফলের হিতকারী। তাই এই তাৎক্ষণিক মুহূর্তগুলির সঙ্গে চূড়ান্ত পর্যায়ের নাট্যফলের কীরূপ যোগ রয়েছে, তার বিচারের জন্যই নাট্যতাত্ত্বিকগণ সন্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তবে নাট্যসন্ধির সঙ্গেই আরও দুটি বিষয় সংশ্লিষ্ট। যথা পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি এবং পঞ্চ অবস্থা। বিশ্বনাথ কবিরাজর পর্যবেক্ষণে পঞ্চাবস্থারই পরিণত পূর্ণরূপ পঞ্চ সন্ধি –

যথাসংখ্যমবস্থাভিরাভির্যোগাত্তু পঞ্চভিঃ ।
পঞ্চধৈবেতিবৃত্তস্য ভাগাঃ স্যুঃ পঞ্চসন্ধয়ঃ ।।[৮৯]

যথাক্রমে পাঁচটি অবস্থা অনুসারে নাট্যেতিবৃত্তের পাঁচটি বিশেষ ভাগ হয় ব'লেই এদের পঞ্চ সন্ধি বলা হয়। অবস্থাপঞ্চক হ'ল আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি এবং ফলাগম। এই প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ কবিরাজের উক্তি –

অবস্থা পঞ্চ কার্য্যস্য প্রারব্ধস্য ফলার্থিভিঃ ।
আরম্ভ-যত্ন-প্রাপ্ত্যাশা-নিযতাপ্তি-ফলাগমাঃ ।।[৯০]

এবং পঞ্চসন্ধি হ'ল যথাক্রমে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ (বা অবমর্শ) এবং উপসংহৃতি (বা নির্বহণ) –

মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্ষ উপসংহৃতিঃ ।
ইতি পঞ্চাস্য ভেদাঃ স্যুঃ ক্রমাল্লক্ষণমুচ্যতে ।।[৯১]

তবে সন্ধির বিষয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজের পূর্বাচার্য ধনঞ্জয় *দশরূপ* গ্রন্থে ভিন্ন মতপোষণ না করলেও তাঁর সমীক্ষণে পঞ্চাবস্থার সঙ্গে অতিরিক্ত পঞ্চ অর্থপ্রকৃতির প্রসঙ্গ বিধৃত রয়েছে –

অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ পঞ্চাবস্থাসমন্বিতাঃ ।।
যথাসংখ্যেন জাযন্তে মুখাদ্যাঃ পঞ্চ সন্ধয়ঃ ।[৯২]

এই পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি হ'ল যথাক্রমে বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী এবং কার্য। এই বিষয়ে যেহেতু আচার্য ধনঞ্জয় এবং আচার্য বিশ্বনাথের মধ্যে মতানৈক্য নেই, তাই *সাহিত্যদর্পণ*-এর কারিকাটিই উদ্ধৃত করা হ'ল –

বীজং বিন্দুঃ পতাকা চ প্রকরী কার্য্যমেব চ ।
অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্বা যোজ্যা যথাবিধি ।।[৯৩]

তাহলে এক্ষেত্রে ধনঞ্জয়ের মতটিকে যদি গ্রহণ করি, তবে বলতে হয় মুখ সন্ধি – বীজ ও আরম্ভের সহাবস্থান, প্রতিমুখ সন্ধি – বিন্দু ও যত্নের যুগপৎ স্থিতি, গর্ভ সন্ধি – পতাকা ও প্রাপ্ত্যাশার মেলবন্ধন, বিমর্ষ বা অবমর্শ সন্ধি – প্রকরী ও নিয়তাপ্তির মৈত্রী এবং উপসংহৃতি বা নির্বহণ সন্ধি – কার্য ও ফলাগমের একত্র সমাবেশ। সুতরাং

অর্থপ্রকৃতির সঙ্গে নাট্যসন্ধির সংযোগের বাধ্যবাধকতা না থাকলেও অবস্থার সঙ্গে তার সম্বন্ধকে কোনওমতেই অস্বীকার করার উপায় নেই। এখন *মায়ার খেলা* নাট্যের পঞ্চ সন্ধির ভূমিকা বিশ্লেষণ করা যাক ।

- **মুখ সন্ধি :**

সাহিত্যদর্পণ এই সন্ধিকে লক্ষায়িত করেছে এভাবে –

যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা ।
প্রারম্ভেন সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্ত্তিতম্ ।।[৯৪]

অর্থাৎ নাট্যবীজ আরম্ভ অবস্থার সঙ্গে বিবিধ সরস বৃত্তান্তের অবতারণায় মুখসন্ধির জন্ম দেয়। অর্থাৎ এখানে কিন্তু বিশ্বনাথ কবিরাজ পরোক্ষভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে বীজ এবং আরম্ভের সহাবস্থানেই মুখসন্ধির প্রস্তুতি ঘটে। আবার, তাঁর মতে বীজ হ'ল –

অল্পমাত্রং সমুদ্দিষ্টং বহুধা যদ্ বিসর্পতি ।
ফলস্য প্রথমো হেতুর্বীজং তদভিধীযতে ।।[৯৫]

উদ্ভিদবিজ্ঞানে যেরূপ একটি ক্ষুদ্র বীজ ধীরে ধীরে মহীরুহের আকার ধারণ করে, তেমনই নাট্যবিজ্ঞানে কোনও নাট্যের প্রারম্ভিক দশাতেই একটি বীজরোপন হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে দেখা যায় যে সেই বীজ-ই নাট্যফলে রূপান্তরিত হয়েছে। নাট্যফলের হেতু হ'ল এই উপ্ত বীজ। আবার, তিনি আরম্ভ বিষয়ে বলেছেন "ভবেদারম্ভ ঔৎসুক্যং যন্মুখ্যফলসিদ্ধয়ে"[৯৬]। নাট্যের মূল ফললাভের জন্য ত্বরিত যে ঔৎসুক্য, তা-ই হ'ল আরম্ভ। তাই বলা যেতে পারে যে বীজ এবং আরম্ভ একে অপরের পরিপূরক। বীজের ব্যাপ্তি ঘটে আরম্ভের মাধ্যমেই। *মায়ার খেলা* নাট্যের মুখসন্ধির জন্য বীজ, আরম্ভ দুটিকেই অনুসন্ধান করতে হয়।

এই নাট্যের প্রথম দৃশ্যে এক বসন্তের রজনীতে মায়াকুমারীরা নাট্যবস্তুর সূচনা করলে দেখা যায় দ্বিতীয় দৃশ্যে শান্তা অমরের প্রতি উন্মুখ হলেও অমর যেন প্রেমতৃষায় মরীচিকার দিকে ছুটে যেতে যায়। তাই মায়াকুমারীরা বলে –

ওগো, মনের মতো সেই তো হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও ।[৯৭]

গানের এই চরণদুটিই পরবর্তী সময়ে ফলে পরিণত হয়েছে। অমর এবং শান্তা শুভক্ষণে শুভমিলনে এই বক্তব্যটিই অধিকতর প্রভাবী। তাই ফলের প্রথম হেতুস্বরূপ এটিই হ'ল নাট্যবীজ। আবার অমরও তার প্রেমের প্রতিমার রূপদানে সদা তৎপর। সেও চেয়েছে আবরণবন্ধনমুক্তিত অনঙ্গ প্রেমের সুরভি। তাই তার গানে সে বলেছে –

কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত !
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত ।[৯৮]

তাই অমরের মনস্তত্ত্ব, প্রেমদর্শনচিন্তার গতি, তা-ই অনন্ত প্রেমের বৃত্তের রেখা। তাই ফললাভের প্রতি ঔৎসুক্যবশতঃ এই অংশকে আরম্ভাবস্থা ব'লে মানা যেতে পারে। তাই *মায়ার খেলা*-র প্রথম দুটি দৃশ্যে মুখসন্ধির রচনা হয়েছে।

- **প্রতিমুখ সন্ধি :**

সাহিত্যদর্পণ-এ এই সন্ধির নিয়মটি হ'ল –

ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ ।
লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্ভেদো যত্র প্রতিমুখং চ তত্ ।।[৯৯]

এখানে মুখসন্ধিতে উপ্ত বীজ লক্ষ্য এবং অলক্ষ্য দু'ভাবেই রয়ে যায়। অবান্তর বৃত্ত যখন উপনদীবৎ মূল ইতিবৃত্তে প্রবেশ করে, তখন নাট্যধারায় সংযুক্ত নতুন কাহিনির ব্যাপকতা কখনও বীজকে দুর্লক্ষ্য ক'রে ফেলে। তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে এখানে বীজ কখনও কখনও অদৃশ্য হলেও লুপ্ত বা অতীত হয়ে যায়না। তাই এই টানাপোড়নের দ্বন্দ্বেই তৈরি হয় প্রতিমুখ সন্ধি। এই অংশে বিন্দু-র ভূমিকাকে নস্যাৎ করাও যায়না। তার কারণ বিন্দুর সংজ্ঞা *সাহিত্যদর্পণ*-এর মতে "অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্"[১০০]। এখানে অবান্তর শব্দের অর্থ প্রাসঙ্গিক। আধিকারিক বৃত্তের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বৃত্তের যোগে যখন বীজ অলক্ষ্য, তখন যে পরিস্থিতিতে বীজের পুনঃপ্রকাশ ঘটে তাই-ই বিন্দু। তাই বীজেরই রূপান্তরণ-ই হ'ল বিন্দু। তাই মুখের বিপরীত প্রতিমুখ সন্ধিতে ঘটনাস্রোত প্রতিকূল পথে এগিয়ে গেলে তাকে তার লক্ষ্যে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে বিন্দু। এ যেন নাবিকের কর্তব্য পালন করে। আবার, প্রযত্ন অবস্থা সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজের ভাবনা "প্রযত্নস্তু ফলাবাপ্তৌ ব্যাপারো'তিতরান্বিতঃ"[১০১]। অর্থাৎ প্রযত্ন হ'ল নাট্যফলের জন্য উন্মুখীকরণতা। তাই যদি শুধুই নাট্যবীজ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলত, তবে এর ভূমিকার প্রয়োজন ছিলনা। যেহেতু ফলের জন্য চেষ্টা করার কথা বলা হয়েছে, তাই পরোক্ষভাবে স্বীকার করতে হয়েছে প্রাসঙ্গিক বৃত্তকে এবং তার ভার লাঘবের জন্যই প্রয়োজন বিন্দুর। তাই বিন্দু এবং প্রযত্নের ঐক্য প্রতিমুখ সন্ধিতে অনস্বীকার্য।

মায়ার খেলা-য় তৃতীয় থেকে চতুর্থ দৃশ্য পর্যন্ত এই সন্ধির অবস্থান বলা যায়। প্রাসঙ্গিক বৃত্তে এসে পড়েছে প্রমদা, অশোক, কুমার। বিশেষতঃ অশোক এবং কুমারের প্রমদার দ্বারে নবরাগের কারুকৃতি, অমরের প্রমদার প্রতি অভিলাষ ইত্যাদি ঘটনায় অমর এবং শান্তার প্রেমোপাখ্যান অদৃশ্য হয়ে পড়েছে। তবুও তৃতীয় দৃশ্যের শেষে মায়াকুমারীদের গানখানি যেন সহৃদয়কে মনে করায় শান্তার নিস্তরঙ্গ প্রেম –

এ সুখধরণীতে, কেবলি চাহ নিতে –
জান না হবে দিতে আপনা,

সুখের ছায়া ফেলি কবে যাবে চলি,
বরিবে সাধ করি বেদনা ।[১০২]

এই গানের পূর্বে মঞ্চে প্রমদার নন্দনোপবনে আগমন ঘটেছে। এমনকি তার চাঞ্চল্য সম্পর্কেও সহৃদয় অবগত হয়েছে। এমনকি তার সহজাত হাবভাবও ধরা পড়েছে গানের সূত্রে। তাই এই নাট্যে যে তার ভূমিকাটিও নগণ্য নয়, তার আভাস রয়েছে। তাই তার পুলকরসের গাঢ়তা যে অবিলম্বেই ছিন্ন হতে চলেছে তার ইঙ্গিত মায়াকুমারীদের গানের সুরে স্পষ্ট। তাই এখানে হারানো সুর পুনরায় গীত হয়েছে। অর্থাৎ বিন্দুরূপী বীজ এখানে সবার দায়িত্ব পালন করেছে।

আবার চতুর্থ দৃশ্যে বীজ পুনরায় সুপ্ত হয়ে যায় অমরের উপস্থিতিতে। তৃতীয় দৃশ্যে অমরের উল্লেখ নেই। কুমার এবং অশোকের সঙ্গে প্রমদার প্রাসঙ্গিক বৃত্তে এবারে নায়কেরও স্বয়ং উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এমনকি এই দৃশ্যের শেষে প্রমদার সঙ্গে অমরের সম্ভাব্য প্রেমরচনার একটি আবহ সংগীত ধ্বনিত। অথচ অমর বা প্রমদার কেউই একে অপরকে স্বীকার করেনি। অমরের মানসকল্পনা এখানেও দ্বিতীয় দৃশ্যের ন্যায়ই প্রতিফলিত। সে প্রমদার রূপে-রসে-গন্ধে আকৃষ্ট হলেও অপার্থিব সুখের সন্ধান পায়নি –

আমি কি যেন করেছি পান,
কোন্ মদিরা রস-ভোর ।[১০৩]

তাই ফলপ্রদ এই অংশটিতে প্রযত্ন-এর ভূমিকা রয়েছে।

- **গর্ভ সন্ধি :**

তৃতীয় নাট্যসন্ধি হ’ল গর্ভ সন্ধি। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে এর সংজ্ঞাটি হ’ল –

ফলপ্রধানোপাযস্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন ।
গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্মুহুঃ ।।[১০৪]

সমগ্র নাট্যফলটি এখানে গর্ভে থাকে ব’লেই এর নাম গর্ভসন্ধি। প্রতিমুখ সন্ধির সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্যটি হ’ল যে এই সন্ধিতে ফলের আগমন-গমনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে অনেকখানিই বেশি। এখানে বীজ পুনঃ পুনঃ নষ্ট এবং দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের ভার এখানে পূর্বের থেকে অধিক। তাই নাট্যবীজ লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ে। তাই তার অন্বেষণ করতে হয়। তাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তটি এখানে প্রয়োজনীয় যা পতাকা এবং প্রকরী নামে পরিচিত। *সাহিত্যদর্পণ*-এর প্রেক্ষিতে পতাকা বৃত্তের লক্ষণটি হ’ল “ব্যাপি প্রাসঙ্গিকং বৃত্তং পতাকেত্যভিধীযতে”[১০৫]। এর সঙ্গে পার্থক্য এখানেই যে প্রকরী পতাকার ন্যায় বিস্তৃত নয়। সেটি হ’ল “প্রাসঙ্গিকং প্রদেশস্থং চরিতং প্রকরী মতা”[১০৬]। নাট্যের একটি নির্দিষ্ট অংশেই এর অবস্থান। পতাকাবৃত্তেরও একজন নায়ক থাকে এবং তারও একটি

ফললাভ ঘটলেও তা নাট্যফলের প্রতিপক্ষে নয় বা স্বতন্ত্র কোনও অধিকারপ্রতিষ্ঠা নয়। তার বৃত্তান্ত গর্ভ বা অবমর্শ সন্ধিতে শেষ হয়ে যায় –

প্রকরীনাযকস্য স্যান্ন স্বকীযং ফলান্তরম্ ।
গর্ভে সন্ধৌ বিমর্ষে বা নির্বাহস্তস্য জাযতে ।।[১০৭]

অর্থাৎ পতাকা-র সঙ্গে গর্ভসন্ধির যোগ স্পষ্ট। আবার, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রাপ্ত্যাশা সম্পর্কে জানিয়েছেন "উপাযাপাযশঙ্কাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তিসম্ভবঃ"[১০৮]। উপায় বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে বীজের লক্ষ্য হওয়া এবং অপায় হ'ল বীজের লক্ষ্যগোচর হওয়ায় কিছু স্তব্ধতা। তাই এই দুইয়ের মধ্যে যেখানে নাট্যফলের ক্ষীণ আলোক দূর থেকে দেখা যায়, সেখানেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এভাবেই এটি ধীরে ধীরে এটি গর্ভসন্ধির আকার নেয়।

মায়ার খেলা-য় পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ দৃশ্য পর্যন্ত অর্থাৎ অমর-শান্তার মিলনক্ষেত্রে প্রমদার আগমনের পূর্বসময় পর্যন্তই প্রমদার কথাংশটিকে ধরা যেতে পারে। যদিও *সাহিত্যদর্পণ*-এ পতাকানায়কের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তবে এখানে নায়িকাকেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। তার ফললাভ কী প্রকার ? অমরের সঙ্গে তার মধুর প্রণয়ের আবহ তৈরি হলেও তা পূর্ণতা পায়নি। তার নিজস্ব পরিণতি বিয়োগান্তক। সুতরাং নায়কের সঙ্গে বিচ্ছেদ-ই তার ফললাভ ব'লে ধরলে তা কিন্তু স্বাধীন কোনও ফললাভ নয়। অমরের সঙ্গে শান্তার মিলনের জন্যই তার করুণ পরিণতি এবং তা গর্ভসন্ধিতেই সমাপ্ত নয়; বরং পরবর্তীতেও তার ভূমিকা রয়েছে। পঞ্চম দৃশ্যের শুরুতেই অমরের "দিবসরজনী আমি যেন কার" গানে প্রমদার সঙ্গলাভ থেকে দূরে সরে আসা বোঝা যায় এবং তার সঙ্গে তার মনোবেদনা প্রকাশ পায় –

যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি ।[১০৯]

এই বাণীর মধ্যে 'তাহারে'-র মধ্যে শান্তার মূর্তি প্রচ্ছন্নভাবে ধরা দিয়েছে। তাই এখানে নাট্যবীজ দৃশ্য। অথচ এরই পরে প্রমদার সম্মুখে সে বলে –

তোমার সকলি ভালোবাসি –
ওই রূপরাশি,
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধুহাসি ।
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি,
কোথায় তোমার সীমা ভুবনমাঝারে ![১১০]

শান্তার সঙ্গে তার ভাবী মিলনের পরিস্থিতি অনেকখানি লঘু হয়ে যায় এই অংশে আবার এই দৃশ্যের শেষে প্রমদার সখীগণের গঞ্জনা শুনে অমর নিরস্ত হয়ে ব্যথিত চিত্তে ফিরে আসে এবং ষষ্ঠ দৃশ্যে শান্তাকে বলে –

পাই যদি ভালোবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না লয়ে মন ।[১১১]

তাই এখানে বারংবার উপায়-অপায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রাপ্ত্যাশা-র লক্ষণে বলা হয়েছে ‘প্রাপ্তিসম্ভব’। তাই এহেন জটিলতার মধ্যেও একটি আশার আলো লক্ষ্য করা যাবে। তাই প্রমদার থেকে অমরের দূরে চলে যাওয়ার অঙ্গীকার-ই নাট্যফলপ্রাপ্তির সোপান। মায়াকুমারীরা গেয়ে ওঠে–

মধুনিশি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চলে ![১১২]

এরূপ উত্তেজনা-ই রচনাটিকে নাট্যিক ক’রে তুলেছে।

- **বিমর্ষ বা অবমর্শ সন্ধি :**

চতুর্থ নাট্যসন্ধির নাম অবমর্শ। এর সম্পর্কে *সাহিত্যদর্পণ*-এর বিধান –

যত্র মুখ্যফলোপায উদ্ভিন্নো গর্ভতো’ধিকঃ ।
শাপাদ্যৈঃ সান্তারাযশ্চ স বিমর্ষ ইতি স্মৃতঃ ।।[১১৩]

যেখানে গর্ভসন্ধি অপেক্ষা মুখ্যফলের উপায় কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হলেও অভিশাপাদি দৈবযোগে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, সেখানেই বিমর্ষ বা অবমর্শ সন্ধির অবস্থান। পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে নাটিকায় অবমর্শ সন্ধি স্বল্পমাত্রায় লক্ষিত হয়। সপ্তম দৃশ্যে শান্তার সঙ্গেই অমরের বিবাহ প্রস্তুতিকালে প্রমদার আগমনে অমরের চিত্তবিকৃতি ঘটে এবং পুনরায় এক দোলাচলতায় সহৃদয় দর্শক তথা শ্রোতাবৃন্দের মনে এক অস্থিরতা প্রকাশ পায়। তাই সপ্তম দৃশ্যের শুরুতেই অমরের আনন্দগানে বীজ দৃষ্ট –

মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে,
মধুর মলয়সমীরে মধুর মিলন রটাতে ।[১১৪]

আবার প্রমদার দর্শনে অমরের স্তম্ভিত হওয়ায় শান্তার গানে নাট্যবীজ পুনরায় লুক্কায়িত –

আমি কেন মাঝে থেকে দুজনার রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে ।[১১৫]

পুনরায় প্রমদার চিরতরে অমরের সঙ্গে দূরত্ব তৈরির মনোভাবনায় নাট্যফল অনেকখসনিই প্রকাশিত হয়েছে। তবুও অমর নিজেকে কৃতঘ্ন ব’লেই মনে করে শেষ মুহূর্তের দ্বন্দ্বে –

এ ভাঙা সুখের মাঝে নয়নজলে,
এ মলিন মালা কে লইবে ![১১৬]

প্রথম তিনটি নাট্যসন্ধির তুলনায় নাটিকা-র নিয়মানুযায়ী এই সন্ধিটির পরিসর অনেকখানিই স্বল্পদৈর্ঘ্যের। এখানে পতাকা বৃত্তের নায়িকা প্রমদার বৃত্তান্ত শেষ হচ্ছে এমনটিই বলা যায়। যদিও মায়াকুমারীদের শেষ গান "এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম" [১১৭] গানের পূর্বেও সখীগণের সঙ্গে প্রমদার আত্মগ্লানিমূলক বিলাপবাক্য গীত হয়েছে, তবুও তা মূল নাট্যবৃত্তকে প্রভাবিত করেনা। সেই অংশটির কোনও গভীর তাৎপর্য নেই। যদি সেখানে তার বোধোদয় ঘটত, তবে বলা যেতে পারত যে তার অন্তিম পরিণতি ঘটেছে আত্মজাগৃতির মধ্যে। সেরূপে চরিত্রটিকে গ্রন্থনা করা হয়নি। শুধু সে এটুকুই বুঝতে পারে "তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে,"[১১৮]। এভাবেই চরিত্রটির উপস্থাপনা ঘটেছে। তবে প্রকরী যা একদেশভাক্ নাট্যেতিবৃত্ত, সেটির অবস্থান যথেষ্ট দুর্বল।

- **উপসংহৃতি বা নির্বহণ সন্ধি :**

এটিই অন্তিম নাট্যসন্ধি। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে এই সন্ধির লক্ষণটি নিম্নরূপ –

বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্ ।
একার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তত্ ।।[১১৯]

উপসংহৃতি সন্ধির-ই অপর অভিধা নির্বহণ সন্ধি। এটিও একটি সবীজ সন্ধি। এখানে মূলতঃ নাট্যের বহুধা বিস্তৃতির সংহার করা হয়। সুষম পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত নাট্যবীজের ফলে পরিণতি। উপকাহিনিগুলিও বিমর্ষ বা অবমর্শ সন্ধিতে শেষ হয়ে থাকলে এখানে কেবলমাত্র প্রধান ফললাভ ঘটে। তাই এখানে 'একার্থে' বা ফলের দিকেই অভিশ্রয় একমাত্র কর্তব্য। এখানে কার্য অর্থপ্রকৃতির প্রসঙ্গ আসতে পারে। কার্য সম্বন্ধে বিশ্বনাথ কবিরাজের প্রস্তাব –

অপেক্ষিতং তু যত্ সাধ্যমারম্ভো যন্নিবন্ধনঃ ।
সমাপনং তু যত্ সিদ্ধৈ তত্ কার্য্যমিতি সংমতম্ ।।[১২০]

অর্থাৎ বলা হয়েছে যে সাধ্যবস্তু অপেক্ষিত, যার জন্যই সমস্ত প্রচেষ্টা বা প্রবৃত্তি এবং যা সিদ্ধ করার জন্যই বিবিধ আয়োজন, তা-ই হ'ল কার্য। এই সাধ্য হ'ল ফলযোগ। তাই শব্দান্তরে নাট্যফলকেই কার্য বলা যায়। আবার, পঞ্চম অবস্থা হ'ল ফলাফল। বিশ্বনাথ কবিরাজের ভাষায় তার সংজ্ঞা "সাবস্থা ফলযোগঃ স্যাদ্ যঃ সমগ্রফলোদয়ঃ"[১২১]। এখানে নাট্যফলের উদয় ঘটে। তাই এই উপসংহৃতি সন্ধির মূলতঃ নাট্যফলের ঘোষণা-ই বিধেয়।

মায়ার খেলা-য় দেখা যায় শান্তার সঙ্গেই অমরের মিলন সম্পাদিত হয়েছে। তাই পূর্বোক্ত "ওগো, মনের মতো .." কথাখানিই ফলেছে অন্তিম লগ্নে। এমনকি মায়াকুমারীরা গেয়ে ওঠে –

দুখের মিলন টুটিবার নয় –
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয় ।[১২২]

❖ কৈশিকী বৃত্তি :

নাটিকা উপরূপকের অন্যতম লক্ষণ হ'ল কৈশিকী বৃত্তির নান্দনিক ঔচিত্য। চতুর্বিধ সাহিত্যবৃত্তির মধ্যে কৈশিকী বৃত্তির লক্ষণটি *সাহিত্যদর্পণ*-এ যে প্রদত্ত,তা হ'ল –

যা শ্লক্ষ্নেপথ্যবিশেষচিত্রা স্ত্রীসঙ্কুলা পুষ্কলনৃত্যগীতা ।
কামোপভোগপ্রভবোপচারা সা কৌশিকী চারুবিলাসযুক্তা ।।[১২৩]

যে বৃত্তিতে নায়কাদির মনোহর বেশপারিপাট্য রয়েছে, বহু স্ত্রীর নৃত্যগীতাদি রঙ্গকলার রসদ রয়েছে এবং যেখানে কামোপভোগের প্রভূত সাধন রয়েছে; সে-ই বৃত্তি-ই হ'ল কৈশিকী। অর্থাৎ এককথায় বলতে হয় এই বৃত্তি ললিতোপচারান্বিত। চতুঃষষ্টি রঙ্গকলার উপাদান এখানে প্রভূত পরিমাণে থাকে। তবে এই বৃত্তির চারটি অঙ্গ রয়েছে। যথা নর্ম, নর্মস্ফূর্জ, নর্মস্ফোট এবং নর্মগর্ভ। এর মধ্যে নর্ম-এর লক্ষণটি হ'ল "বৈদগ্ধ্যক্রীড়িতং নর্ম"[১২]। সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন যে প্রিয়জনের আনন্দের উদ্রেককারী নিপুণ ক্রীড়াকে নর্ম বলা হয়। এটি পুনরায় তিন প্রকার। যথা শুদ্ধহাস্যের দ্বারা, শৃঙ্গারহাস্যের দ্বারা এবং সভয় হাস্যের দ্বারা "বিহিতং শুদ্ধহাস্যেন সশৃঙ্গারভয়েন চ"[১২৫]। দ্বিতীয় অঙ্গ নর্মস্ফূর্জ হ'ল যেখানে নায়ক-নায়িকার মিলনে প্রথমে সুখ কিন্তু পরিণামে ভয়ের সংকেত থাকে – "নর্মস্ফূর্জঃ সুখারম্ভো ভযান্তো নবসংগমঃ[১২৬]। যখন শৃঙ্গার রসের ধ্বনি ঈষৎ প্রকাশিত হয়, তখন তা নর্মস্ফোট কৈশিকী বৃত্ত্যঙ্গ – "নর্মস্ফোটো ভাবলেশৈঃ সূচিতো'ল্পরসো মতঃ"[১২৭] এবং চতুর্থতঃ নায়কের ব্যবহার যখন প্রচ্ছন্নভাবে হয়ে থাকে, তখন তা নর্মগর্ভ অঙ্গের পর্যায়ে পড়ে – "নর্মগর্ভো ব্যবহৃতির্নেতুঃ প্রচ্ছন্নবর্ত্তিনঃ"[১২৮]।

যদি এই বৃত্তির সাধারণ লক্ষণটির দিকে স্থিত হই, তবে বলতে হয় যে নায়ক-নায়িকার মনোহর বেশবৈচিত্র্যের উল্লেখ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দু'ভাবেই রয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যের শুরুর দিকেই প্রমদার নাট্যে তথা মঞ্চে প্রবেশের সময় জানা যায় তার অলংকার পরিধানের কথা –

দে লো, সখী, দে পরাইয়ে গলে
সাধের বকুলফুলহার ।
আধুনিক জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুলভার ।
তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারেবার ।[১২৯]

আবার, সপ্তম দৃশ্যে বাসন্তী রজনীতে অমর এবং শান্তার পরিধেয়ে ঔজ্জ্বল্য থাকবে তা-ই অনুমেয়। এছাড়াও পুরনারীগণ পুষ্পমালায় সজ্জিত করতে চায় নবদম্পতিকে –

তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি ।
আনো আনো ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে ।[১৩০]

মায়ার খেলা স্বয়ং একটি গীতিনাট্য ব'লেই আদ্যোপান্ত স্বরে নিবদ্ধ এই রচনা। তাই পুষ্কলনৃত্যগীতাত্মকতার অর্থ এই নয় যে এখানে প্রমদার সখীগণ বা পুরনারীগণের সংগীতায়োজন রয়েছে। প্রাচীন নাটিকা যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ গেয়নাট্য ছিলনা, তাই সেক্ষেত্রে দশ রূপকের তুলনায় বা অন্যান্য উপরূপকের তুলনায় এই উপরূপকে নৃত্যগীতের বাহুল্যকে উল্লেখ করতে হ'ত। তবে আবার এটিও উপেক্ষণীয় নয় যে *মায়ার খেলা*-য় কিছু দৃশ্যে নারীদের সম্মিলিত গানগুলি যেন পারস্পরিক বাক্যবিন্যাসের ছন্দ অপেক্ষা অনেকখানিই ভিন্ন। যেমন ষষ্ঠ দৃশ্যে "অলি বার বার ফিরে যায়" [১৩১] বা সপ্তম দৃশ্যে "আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে"[১৩২] ইত্যাদি গানগুলির বাণী অন্যদিকে "আমার পরাণ যাহা চায়"[১৩৩] বা "আমি, জেনেশুনে বিষ করেছি পান"[১৩৪] গানগুলির গঠন অপেক্ষা পৃথক। ভগ্নমনোরথ অশোক খেদের বশেই বলে –

> যতই হাসি দিয়ে দহন করে
> ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
> প্রেম-অমৃতধারা ততই যাচি
> যতই করে প্রাণে অশনি দান ।[১৩৫]

এ যেন ববাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও এক প্রেমী যুবকের বেদনা। এখানে 'প্রেম-অমৃতধধারা' বা 'অশনি' শব্দে যথাক্রমে রূপক এবং অতিশয়োক্তি অলংকার থাকলেও এমন ব্যবহার বস্তুজগতে দুর্লভ নয়। তাই এই ধরণের উক্তিগুলি গান হলেও প্রকৃতিগতভাবে গদ্য বা আড়ম্বরহীন বাহুল্যবর্জিত ভাবপ্রকাশ। একই রীতি শান্তার প্রতিটি গানেই লক্ষ্য যায়। যেমন "আমার পরাণ যাহা চায়" গানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

> আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে,
> আর কিছু নাহি চাই গো ।
> আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
> তোমাতে করিব বাস ।[১৩৬]

তুলনায় প্রমদার বেশিরভাগ গানই যেন কাব্যিক। তৃতীয় দৃশ্যে অশোকের সঙ্গে আলাপের পূর্বেই তার স্বভাব নিজেই ব্যক্ত করেছে –

> কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,
> আমি শুধু বহে চলে যাই ।
> পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা ।[১৩৭]

এখানে 'ফুল' রূপকার্থে তার প্রণয়প্রার্থী। সে তার কৌতুলবশতঃ সকলের সঙ্গে মৌখিক সম্পর্ক রাখলেও চিরতরে তাদের বেঁধে রাখেনা। তাই 'টুটে'-র ম'ত শব্দের ব্যবহার রয়েছে। এমনকি তার পরম আকাঙ্ক্ষিত মণিরত্ন হ'ল

'পুলকরস'। সে চিরস্থায়ীতে নয়; বরং ক্ষণস্থায়ী সুখের পরশ আস্বাদন করতেই ব্যগ্র। তাই এই গানটি সাহিত্যগুণে পটু সুরের শাখায় শোভনসুন্দর। আবার, সপ্তম দৃশ্যের "এসো এসো বসন্ত ধরাতলে" গানের পুরবাসীদের কথা–

> এসো থরথর-কম্পিত মর্মরমুখরিত
> নব-পল্লব-পুলকিত
> ফুল-আকুল-মালতী-বল্লি-বিতানে,
> সুখছায়ে মধুবায়ে এসো এসো ।[১৩৮]

ঋতুরাজের এই আহ্বানমন্ত্রটিও একটি সুষম কাব্য তথা গান। তাই মিলমোৎসুক অমর-ও গেয়ে ওঠে –

> কুহকলেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
> লিখিছে প্রণয় কাহিনী বিবিধবরনছটাতে ।[১৩৯]

অথচ এই চরিত্রটিই পূর্বেকার গানগুলিতে কখনও বলেছে –

> এত ভালোবাসি, এত যারে চাই,
> মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই ।[১৪০]

অমর যখন অবচেতন মনের প্রান্তে পৌঁছে যায়, যখন কল্পমানস তাকে শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে চলে, তখনই সে গান গায়। যখন মনস্তাপে দগ্ধ বা বিরহদুঃখ অন্যান্যদের সম্মুখে প্রকাশ করে, তখন সে গান গায়না। গীতিনাট্য কেবল নাট্যের একটি কৌশলমাত্র। সব চরিত্রই গানে-গানে কথা বলে, বাক্যবিনিময় করে কিন্তু তারই মধ্যে কখনও গেয়ে ওঠে। *মায়ার খেলা* নাট্যেও উপরিউক্ত উদাহরণে সে ধারণারই আভাস মিলেছে। তাই সাংগীতিকতার জন্যও কৈশিক বৃত্তি নিশ্চিত হতে পারে।

কামের উপভোগের প্রসঙ্গ সম্পর্কে বলতে হয় যে এখানে সম্ভোগের কৌশলগুলি সজ্জিত থাকলেও তার অনুষ্ঠান সরাসরি লক্ষ্য করা যায়না। অমর-শান্তা, অমর-প্রমদা, অশোক-প্রমদা, কুমার-প্রমদা এদের কোনও যুগলের মধ্যেই শারীরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে প্রমদার ভোগেচ্ছা "কে ডাকে ! আমি কভু ফিরে নাহি চাই"[১৪১] গানে ফুলের উপমায় প্রমাণিত। তাই কৈশিকী বৃত্তির সাধারণ ধারণা অনুযায়ী এই গীতিনাট্যে তাকে স্বীকার করতে প্রতিমুখতা থাকেনা।

কৈশিকী বৃত্তির চারটি অঙ্গের মধ্যে সভয় হাস্যনর্ম সপ্তম দৃশ্যে কিয়দংশে কার্যকর হয়েছে। অমর-শান্তার বিবাহমণ্ডপে প্রমদার আগমনহেতু ভয়বিশ্রিত বিস্ময় উদ্রিক্ত হয়েছে অমরের মনে। তবে এখানে ভয়াপেক্ষা বিস্ময়-ই প্রতীয়মান। আবার, নর্মস্ফূর্জ হিসেবে বলা যায় যে 'ভয়ান্ত'-র পরিবর্তে যদি দ্বিধা-সংশয়-দ্বন্দ্বের মিশ্র অনুভূতিকে ধরি; তবে সপ্তম দৃশ্যেই তা লক্ষণীয়। শান্তার সঙ্গে তার মিলনের সুখদ সম্ভাবনা থাকলেও তৃতীয় ব্যক্তি প্রমদার উপস্থিতি সেই মিশ্র অনুভূতিকেই ইন্ধন জুগিয়েছে। নর্মস্ফোট রসধ্বনির অন্য পরিচয়। তবে এখানে ষষ্ঠ দৃশ্য থেকেই অমরের শান্তার অভীপ্সা বাচ্য হয়েছে। সে ক্রমাগত তাকেই প্রেয়সীরূপে বরণ করতে চেয়েছে। নর্মগর্ভের

বিষয়টিও তাই। এটিও *মায়ার খেলা*-য় পরিস্ফুট নয়। তবে এই প্রতিটি বৃত্ত্যঙ্গের ব্যবহার যে অপরিহার্য এমন নির্দেশ নেই সাহিত্যদর্পণকৃত নাটিকা-র লক্ষণে। এমনকি কৈশিকী বৃত্তির এই চতুর্বিধ অঙ্গের উদাহরণের প্রতিটিই যে *রত্নাবলী* বা কোনও নাটিকা থেকে গৃহীত এমনটিও নয়। একমাত্র নর্মের উদাহরণটিই *রত্নাবলী* থেকে প্রদত্ত। তাই এক্ষেত্রে কৈশিকী বৃত্তির সাধারণ ভাবনাটির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হ'লে সেক্ষেত্রে *মায়ার খেলা* পরীক্ষিত হয়ে যায়।

❖ **অর্থোপক্ষেপক :**

অর্থোপক্ষেপক হ'ল একটি নাট্যকৌশল। এটির সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন –

অঙ্কেষ্বদর্শনীয়া যা বক্তব্যৈব চ সম্মতা ।
যা চ স্যাদ্বর্ষপর্যন্তং কথা দিনদ্বয়াদ্বিজা ।।[১৪২]

অর্থাৎ একাধিক দিনব্যাপী বা বহুবছরব্যাপী সংঘটিত কোনও ঘটনা যা নাট্যে প্রদর্শিত হওয়ার অযোগ্য কিন্তু উল্লেখ্য, সেই সমস্ত ঘটনাবলি যে পদ্ধতিতে উক্ত হয় তাকেই বলা হয় অর্থোপক্ষেপক। এটি পাঁচ প্রকার। যথা বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাবতার এবং অঙ্কমুখ। এর মধ্যে অঙ্কাবতার এবং অঙ্কমুখ *মায়ার খেলা*-য় লক্ষিত হয়।

▪ **অঙ্কাবতার :**

এটির সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজের মত –

অঙ্কান্তে সূচিতঃ পাত্রৈস্তদঙ্কস্যাবিভাগতঃ ।
যত্রাঙ্কো'বতরত্যেষো'ঙ্কাবতারঃ ইতি স্মৃতঃ ।।[১৪৩]

কোনও একটি অঙ্কের সঙ্গে যখন পরবর্তী অঙ্কের পাত্রপাত্রীর কোনও প্রভেদ থাকেনা এবং মনে হয় যেন উত্তরাঙ্ক পূর্বাঙ্কেরই সম্প্রসারণ। *মায়ার খেলা*-র তৃতীয় এবং চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যে এরূপ সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় দৃশ্যে কাননে প্রমদার সঙ্গে অশোক এবং কুমারের সাক্ষাৎ হয় কিন্তু প্রমদা সেই প্রেমপ্রার্থীদের উপেক্ষা করে। চতুর্থ দৃশ্যে দেখা যায় অশোক এবং কুমার হৃদয়ব্যথায় মথিত এবং তারা অমরকে সখ্যতায় তাদের কথা ব্যক্ত করেছে। প্রকৃতিগত দিক থেকে দুই দৃশ্যের মধ্যে অন্তর নেই। তৃতীয় দৃশ্যে ঘটিত কার্যেরই প্রতিক্রিয়া চতুর্থ দৃশ্যে ধরা দিয়েছে।

▪ **অঙ্কমুখ :**

এটির সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজের উক্তি –

যত্র স্যাদঙ্ক একস্মিন্নঙ্কানাং সূচনা'খিলা ।
তদঙ্কমুখমিত্যাহুর্বীজার্থখ্যাপকং চ তত্ ।।[১৪৪]

যখন একটি অঙ্কেই সমস্ত অঙ্কের সামগ্রিক সূচনা হয় বা একটি অঙ্কের মাধ্যমেই সামগ্রিক নাট্যোদ্দেশ্য বিহিত হয়, তখন তাকে বলা হয় অঙ্কমুখ। এখানে যদিও বীজ দ্বিতীয় দৃশ্যে উক্ত তবুও প্রথম দৃশ্যে মায়াকুমারীদের অবতরণ এবং গানটি বীজার্থখ্যাপক। সেখানেই বলা হয়েছে –

নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে ।
কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে ।[১৪৫]

এখানেই বোঝা যায় শান্তা অমরের জন্য আসন প্রস্তুত করলেও অমর প্রমদার প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়বে এবং শেষে ভ্রান্তিমোচন ঘটবে। যদিও এই বাক্যদুটি বীজ নয়। তার কারণ এখানে নাট্যফলে অধিকারী পাত্রপাত্রীর অনুপস্থিতি। দ্বিতীয় দৃশ্যে অমর এবং শান্তার চরিত্র উন্মোচিত হওয়ার পরে যখন মায়াকুমারীগণ যখন দুটি অপেক্ষিত হৃদয়ের মিলনের কথা বলে, তখন সেই অংশে সহৃদয় বুঝতে পারে যে নাট্যস্ত্র চরিত্রদের দ্বারাই নাট্যটি পরিণতি লাভ করবে। তবুও প্রথম দৃশ্যে মায়াকুমারীদের "মোরা জলে স্থলে"[১৪৬] গানটি নাট্যের সারাংশ তুলে ধরায় এটিকে অঙ্কমুখ বলতে দ্বিধা থাকেনা। অন্যান্য অর্থোপক্ষেপকগুলি যথা বিষ্কম্ভক, প্রবেশক এবং চূলিকার উল্লেখ এই নাট্যে অপ্রাপ্ত।

৪.৫ নাটিকা ও *মায়ার খেলা* : অন্তরঙ্গ সাযুজ্য :

নাটিকা উপরূপকরূপে *মায়ার খেলা*-কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শুধুমাত্র প্রকরণগ্রন্থের দাক্ষিণ্য-ই যথেষ্ট নয়। ইতিবৃত্তের মাত্রাজ্ঞান, নায়ক-নায়িকার প্রকৃতিবিচার, রসের ঔচিত্য, বৃত্তির আনুকূল্য ইত্যাদি যদি বর্তমান ভারতের প্রাদেশিক বিভিন্ন ভাষার নাট্যে লক্ষ্য যায়, তবেই তাকে নাটিকা শ্রেণীর উপরূপকের পরিচ্ছদ পরিধান করানো মননশীলতার লক্ষণ নয়। নাটিকা কীভাবে শৃঙ্গাররসপ্রধান রূপকবিশেষ নাটকের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র এবং কীভাবে রূপক ও উপরূপকের মেরুকরণ হয়েছিল, তা অনুধাবনের জন্যই নাটিকার আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরতে হবে। প্রাচীন ভারতের বা মধ্যযুগের ভারতের যে সমস্ত সংস্কৃত উপরূপক বর্তমানে উপলব্ধ, সেগুলির আনুপাতিক বিশ্লেষণ করণীয় *মায়ার খেলা* তথা যে কোনও আধুনিক নাট্যের ক্ষেত্রে। তাই শ্রীহর্ষের *রত্নাবলী-প্রিয়দর্শিকা,* রাজশেখরের *বিদ্ধশালভঞ্জিকা,* মদনকবির *পারিজাতমঞ্জরী,* বিহ্লণের *কর্ণসুন্দরী,* বিশ্বনাথদেবের *মৃগাঙ্কলেখা,* বিশ্বনাথ কবিরাজের *চন্দ্রকলা,* মথুরাদাসের *বৃষভানুজা* এরকম কয়েকটি নাটিকার গ্রন্থনার সাপেক্ষে *মায়ার খেলা*-র বিচার করাই কাঙ্ক্ষিত।

- **নামকরণ :**

প্রাচীন সংস্কৃত নাটিকাগুলির নামকরণে লক্ষ্য করা গেছে নায়িকার নাম বা পরিচয়ের প্রভাব। এ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ কবিরাজের উক্তিটি হ'ল "নাটিকাসট্টকাদীনাং নায়িকাভির্বিশেষণম্"[১৪৭]। অর্থাৎ নাটিকা, সট্টকের ম'ত উপরূপকগুলির নাম হবে নায়িকার নামানুসারে। তবে *রত্নাবলী*-তে দেখা যায় নায়িকার নাম সাগরিকা। আবার *বৃষভানুজা* নাটিকার নায়িকা হ'ল রাধা। তবে বৃষভানু তার পিতা হওয়ায় তার পিতৃপরিচয়ের স্মারকস্বরূপ একটি

পরিচয় রয়ে গেছে ‘বৃষভানুজা’ নামকরণে। তবে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের *বিরাজ-সরোজিনী* নাটিকা যা আধুনিককালের খ্রিস্টিয় বিংশ শতাব্দীর রচনা, তা কিন্তু নায়িকা সরোজিনীর নামের সঙ্গে ‘বিরাজ’ শব্দটি যুক্ত করেছেন নাট্যকার। তাই *মায়ার খেলা*-কে নাটিকারূপে স্বীকৃতি দিতে গেলে যদি নামকার্যের শর্তটির প্রতি অনুধ্যান করা হয়, তবে সেই শর্তটি সম্পূর্ণতঃ ব্যর্থ হয়। শান্তা বা প্রদান নামের কোনও অনুষঙ্গ নাট্যনামকরণে নিহিত হয়নি। তার পরিবর্তে *সাহিত্যদর্পণ*-এর গর্ভিতার্থপ্রকাশের মতটি এখানে অপেক্ষাকৃত সবল – “নাম কার্য্যং নাটকস্য গর্ভিতার্থপ্রকাশকম্”[১৪৮]। যদিও এই কারিকাটিতে ‘নাটকস্য’ পদের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ নাটকরূপকের জন্যই এই কারিকার অবতারণা করা হলেও এটি সামান্যীকরণে যে কোনও নাট্যসন্দর্ভের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কোনও নাট্যের নামকরণে তার গর্ভিতার্থ বা গূঢ়ার্থ বা সারার্থ-ই তো প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাই এক্ষেত্রে ‘মায়া’ শব্দটি শ্লিষ্ট। নাট্যস্থ ইতিবৃত্তের পরিধিতে এই ‘মায়া’ অদৃশ্য তথা অগম্য মায়াকুমারীগণ হতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ অদ্বৈত বেদান্তদর্শনের ‘মায়া’ বা ভ্রম দ্যোতিত হতে পারে। যেহেতু মোহের পাশ এবং তার বিমোচনকেই রবীন্দ্রনাথ শান্তা-অমর-প্রমদার চরিত্রের অন্তর্জালে ধরেছেন, তাই নামকরণটি প্রাসঙ্গিক। তবে যদি গোঁড়ামি রেখে কেবলই শাস্ত্রবাক্যকে আদর্শ করে চলা হয়, তবে *মায়ার খেলা*-র শর্তরক্ষার একটি ধাপ ক্ষীণ হয়ে যায়। যেহেতু *বিরাজ-সরোজিনী* বা এরকম আধুনিকমনস্কতার ফসল সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ নয়, তাই এটি নায়িকার নামানুসারে না হওয়ায় বিশেষভাবে আহত হয়না। নাট্যের নামকরণের সঙ্গে নাট্যগত চরিত্রগুলির নামকরণগুলির ভাবব্যঞ্জকত্বের পর্যবেক্ষণ আবশ্যক। নাটিকার নায়িকাদের নাম পাওয়া যায় সাগরিকা (*রত্নাবলী*), প্রিয়দর্শনা (*প্রিয়দর্শিকা*), মৃগাঙ্কাবলী (*বিদ্ধশালভঞ্জিকা*), কর্ণসুন্দরী (*কর্ণসুন্দরী*), পারিজাতমঞ্জরী (*পারিজাতমঞ্জরী*), চন্দ্রকলা (*চন্দ্রকলা*), মৃগাঙ্কলেখা (মৃগাঙ্কলেখা), রাধা (বৃষভানুজা), সরোজিনী (*বিরাজ-সরোজিনী*) ইত্যাদি। আবার, নায়কদের নাম দেখি উদয়ন (*রত্নাবলী* ও *প্রিয়দর্শিকা*), বিদ্যাধরমল্ল (*বিদ্ধশালভঞ্জিকা*), কর্ণদেব (*কর্ণসুন্দরী*), অর্জুনবর্মা (*পারিজাতমঞ্জরী*), চিত্ররথদেব (*চন্দ্রকলা*), কর্পূরতিলক (*মৃগাঙ্কলেখা*), কৃষ্ণ (*বৃষভানুজা*), হরিদশ্ব (*বিরাজ-সরোজিনী*)। এছাড়াও অন্যান্য সহকারী পাত্রপাত্রীগণ হ’ল বসন্তক-বাসবদত্তা (*রত্নাবলী* ও *প্রিয়দর্শিকা*), সুসঙ্গতা (*রত্নাবলী*), কুবলয়মালা (*বিদ্ধশালভঞ্জিকা*) কুসুমাকর-বসন্তলীলা-সর্বকলা-কনকলেখা (*পারিজাতমঞ্জরী*), বসন্তলেখা-রতিকলা-মাধবিকা-সুনন্দনা (*চন্দ্রকলা*), বৃন্দা-বনরক্ষিকা-চম্পকলতা-তমালিকা (*বৃষভানুজা*)। এই নামকরণগুলির মধ্যে মাধুর্য গুণ ব্যঙ্গ্য হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থটির আলোচনা বিধেয়। সেখানে বলা হয়েছে –

টঠডঢবর্জিতাঃ কাদযো মান্তাঃ শিরসি নিজবর্গান্ত্যযুক্তাঃ তথা রেফণকারৌ হ্রস্বান্তরিতাবিতি বর্ণাঃ সমাসাভাবো মধ্যমঃ সমাসো বেতি সমাসঃ তথা মাধুর্যবতী পদান্তরযোগেন রচনা মাধুর্যস্য ব্যঞ্জিকা।[১৪৯]

অর্থাৎ ট বর্গের প্রথম টি অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণ (ট, ঠ, ড, ঢ)বর্জিত, বর্গের শেষ বা অনুনাসিক বর্ণগুলির সঙ্গে সেই সেই বর্গের সংযুক্তি, লঘুস্বরযুক্ত ‘র’ বা ‘ণ’, সমাসবিহীন বা অল্পসমাসযুক্ত পদ মাধুর্যগুণঘটক। আবার, মাধুর্যগুণসম্বন্ধে তাঁর উক্তি “আহ্লাদকত্বং মাধুর্যং শৃঙ্গারে দ্রুতিকারণম্”[১৫০]। সুতরাং শৃঙ্গার রসের ক্ষেত্রে পরম

আহ্লাদনীয় এই মাধুর্য গুণ। যেহেতু নাটিকা আদিরসাত্মক, তাই সেক্ষেত্রে 'রত্নাবলী' নামে দেখা যায় দন্ত্য বর্ণ 'ত্' এবং 'ন্'-এর সংযোগ। অনুরূপভাবে 'পারিজাতমঞ্জরী', 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা', 'মৃগাঙ্কলেখা', 'বসন্তলেখা', 'চন্দ্রকলা', 'বসন্তলীলা', 'সুসঙ্গতা', 'বসন্তক' এই নামকরণগুলিতেও রয়েছে যথাক্রমে 'ঞ্'-'জ', 'ঞ্'-'জ্', 'ঙ্'-'ক্', 'ন্'-'ত্', 'ন্'-'দ্', 'ন্'-'ত্', 'ঙ্'-'গ্', 'ন্'-'ত্' এর অনন্তর সংযুক্তি। এমনকি এখানে 'ট' বর্গ অনুপস্থিত। এমনকি শব্দগুলি দীর্ঘসমাসযুক্ত নয়। তাই মাধুর্যগুণব্যঞ্জকধর্মিতা নাটিকাগুলির এবং বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর নামকরণে শৃঙ্গার রসের প্রতিচ্ছবি রয়েছে।

'মায়ার খেলা' নামকরণে ম বর্গ (ম্), ক বর্গ (খ্), অন্তঃস্থ বর্ণ (র্, ল্) রয়েছে। এমনকি এখানে সমাসের লেশমাত্র নেই। আবার, 'শান্তা' নামকরণে 'ন্'-'ত্'-এর মিলন। 'প্রমদা' শব্দটিতে ট বর্গ, ণ্ কার, দীর্ঘ সমাসের স্থান নেই। র-ফলার প্রয়োগ রয়েছে। 'অমর', 'কুমার' এবং 'অশোক' এই তিনটি পুরুষ চরিত্রের নামকরণেও যুক্তাক্ষর বা সমাসবদ্ধ আড়ম্বরতা প্রযুক্ত নয় এবং নাট্যস্থ পাঁচটি চরিত্রের নামকরণেই সেই গর্ভিতার্থ বা প্রতীয়মানার্থ প্রকাশ্য। শান্ত অর্থে ধীরস্থির নয়। শান্ত শব্দটি বেদান্তের পরিভাষা। অন্যদিকে 'প্রমদা' শব্দের অর্থে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস দেখিয়েছেন "রূপসৌভাগ্যজন্য গর্ব্ব" এবং "মনোহারিণী নারী"[১৫১]। সাংসারিক জীবের মায়ার প্রলোভন থেকে মুক্তির নামান্তর প্রমদার থেকে অমরের বিচ্ছেদ। 'অমর' হ'ল শাশ্বতবাদের প্রতীক। প্রেম যে আনন্দ স্বরূপ এবং তা অবেধ্য, অচ্ছেদ্য এবং শুধুই হৃদয়বেদ্য তা অমর-শান্তার প্রেমের রূপকে ব্যঞ্জিত। এ যেন জীবাত্মা-পরমাত্মার পরম আনন্দঘন মিলন। যে শোককে অতিক্রম করেছে, সে 'অশোক' এবং স্বভাবগত সারল্যের প্রতিচ্ছবি 'কুমার'। তাই প্রাচীন সংস্কৃত নাটিকোপরূপকগুলির মধ্যে এই দর্শনগত চেতনা যতখানি পাওয়া যায়, তার অধিক ভাবগাম্ভীর্য পাওয়া যায় রবীন্দ্ররচনায়। 'মৃগাঙ্ক' অর্থে চন্দ্র, 'মঞ্জরী' অর্থে মুকুলিত শাখা, সরোজিনী অর্থে পদ্ম এগুলি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা ঘটায়। নিসর্গসৌন্দর্য যেন মনুষ্যজীবনের উপমান। তাই মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে একটি তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল এই ধরণের চরিত্রের নামকরণবশতঃ। তবে যেহেতু উপরূপকের ক্ষেত্রে বাচ্যার্থ-ই প্রধান এবং তার উদ্দেশ্য সহৃদয়ের হৃদয়রঞ্জন, তাই প্রকৃতির মাদকতার সঙ্গে নাট্যরসোপলব্ধির একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন তৎকালীন নাট্যকারগণ। মাধুর্য গুণের যথোচিত ব্যবহারকে অক্ষুণ্ন রেখে কীভাবে একটি নাট্যসন্দর্ভকে দর্শনগ্রন্থেরও নির্যাসে সুবাসিত ক'রে তোলা যায়, তার প্রকৃত উদাহরণ রবীন্দ্রনাট্যকৃতি *মায়ার খেলা* । সেখানে বাচ্য এবং প্রতীয়মান দুটি অর্থ-ই বর্তমান হলেও প্রতীয়মান অর্থটিই ব্যঙ্গ্য হয়ে সাহিত্যকর্মটিকে উত্তমসাহিত্যরূপে স্মরণীয় ক'রে তুলেছে।

❖ চরিত্রচিত্রণ :

নামকরণের পরের বিষয়টি হ'ল চরিত্রচিত্রণ। এখানে বিচার্য বিষয় যে প্রাচীন সংস্কৃত নাটিকাগুলির চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব ও আবেদন কীরূপ ছিল এবং *মায়ার খেলা*-তে তার কিয়দংশ প্রতিফলিত হয়েছে কিনা। নাটিকা-র নিয়মানুসারে ধীরললিত নায়কের চাতুর্যে রাজা উদয়ন, রাজা অর্জুনবর্মা, রাজা চিত্ররথদেবের চরিত্রগুলি পাই। নাট্যারম্ভে প্রস্তাবনা এবং কখনও কখনও বিষ্কম্ভকের পরে যেভাবে রাজাদের চরিতরচনা ধরা দিয়েছে, তাতে

একজন প্রাপ্তবয়স্ক সকামী নারীলোভা যুবকের রেখা ফুটে ওঠে। যেমন *রত্নাবলী* নাটিকার প্রথমাঙ্কে বসন্তোৎসবের নগরবাসীদের বিহ্বল চিত্র দেখে বলে ওঠে –

অস্মিন্ প্রকীর্ণপটবাসকৃতান্ধকারে
দৃষ্টো মনাঙ্মণিবিভূষণরশ্মিজালৈঃ ।
পাতালমুদ্যতফণাকৃতিশৃঙ্গকো'যং
মামদ্য সংস্মরযতীব ভুজঙ্গলোকঃ ।।[১৫২]

উড্ডীয়মান আবিরের ঘনময় পরিবেশে মণিময় অলংকারের শোভায় রসিক পুরুষগণ যেন পাতালপুরীতে ইতস্ততঃ বিচরণ করছে। এরা সকলে যেন হয়ে উঠেছে পিচকারিরূপ ফণাধারী ভুজঙ্গ এবং তাদের আভূষণ সর্পমণিতুল্য।

আবার, রাজমহিষী বাসবদত্তাকে মকরন্দ উদ্যানে দর্শনমাত্রই তার অঙ্গলাবণ্যই উদয়নের হৃদয়ে ধরা দিয়েছে যা অবচেতন মনে কামনায় অন্তর্লীন হওয়ার নামান্তর –

দেবি ত্বন্মুখপতঙ্গেন শশিনঃ শোভাতিরক্তারিণা ।
পশ্যাব্জানি বিনির্জিতানি সহসা গচ্ছন্তি যিচ্ছাযতাম্ ।।[১৫৩]

এখানে অপহ্নুতি অলংকারের অবকাশ রয়েছে। রাজার দৃষ্টিতে প্রেয়সীর মুখকান্তি পদ্মের সৌন্দর্য অপেক্ষাও উজ্জ্বল। অনুরূপভাবে *চন্দ্রকলা* নাটিকায় রাজার উক্তি –

বিনা দোষাসঙ্গং সততপরিপূর্ণাখিলকলঃ ।
কুতঃ প্রাপ্তশ্চন্দ্রো বিগতিকলঙ্কঃ সুমুখি ! তে ।।[১৫৪]

নায়িকা চন্দ্রকলার মধ্যে লোকোত্তর নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমা কীভাবে এসে পড়েছে যেখানে নীলকমল শোভা পাচ্ছে। সেই চন্দ্রমার মধ্যে শঙ্খদ্যুতি এবং ভ্রমরশ্রেণীর গুঞ্জন মুখরিত হয়েছে। এই চন্দ্র নিশাকালের অতিরিক্ত দিবাভাগেও উদিত। এখানেও তার জন্মগত রূপজ সৌন্দর্যের প্রতিই রাজা মগ্ন।

এমনই নিদর্শন উপলভ্য *কর্পূরমঞ্জরী* নাট্যেও। সেখানে রাজা কল্পলোকে রচনা করেছে কোনও এক শীতল সরোবরে সদ্যস্নাতা অপূর্ব সুন্দরী নারীমূর্তি। তার হৃদয়স্থলকে কামনা না ক'রেই তার রূপকল্পে এনেছে মৃণালদ্বারা তার কর্ণের সজ্জা –

যস্যাঃ রক্তং কিল কলযসি ক্লান্তিমত্যর্থমেকং
নূনং বৃন্দাদিব সরসিজং মজুদন্তার্হিমাস্তঃ ।
কৃত্বা সদ্যঃ শ্রবণযুগলে লোলতাটঙ্করিক্তে
সাপি স্বৈরং বিশিখখুরলী কল্পিতা মন্মথেন ।।[১৫৫]

তাহলে শুধু একটিমাত্র নাটিকারূপী উপরূপকে নয়; এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন উপরূপকে নায়কের চরিত্র এভাবেই বর্ণিত। একজন বিবাহিত পুরুষ এবং যার স্ত্রী রাজন্তঃপুরে অবস্থান করছে, এমন কোনও ব্যক্তির মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা প্রগ্রহের দ্বারা। যদিও *রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা* নাট্যে রাজনীতিশাস্ত্রের একটি সূক্ষ্ম বীজ উপ্ত হয়েছে। শক্তিশালী রাজার সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনে বিবাহ-ই একমাত্র পথ এবং ভাবীকালে অরিসংহারে সেই রাজবংশের সাহায্য প্রার্থনায় কোনও কুণ্ঠা থাকবে না। তাই ভাসরচিত *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকেও পদ্মাবতীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে এবং উদয়নের সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। তাই সাগরিকার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তথাপি প্রয়োজনসিদ্ধির অতিরিক্ত কোনও কন্যার প্রতি রাজার কামলোলুপতার চূড়ান্ত নির্দশন প্রাচীন সংস্কৃত নাটিকা উপরূপকগুলি।

অন্যদিকে *মায়ার খেলা*-র অমরের শান্তা বা প্রমদার প্রতি দেহসর্বস্বতার কোনও প্রত্যক্ষ উদাহরণ নেই। প্রথম দৃশ্যের "জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত" গানটিতে 'বসন্ত' শব্দের দ্বারা যদি কামদেব এবং অকালবসন্তের সম্বন্ধের নিরীখে কামের প্রতিই অনুমান চালিত হয়, তবে সেই গানেরই শেষ দুটি চরণও লক্ষণীয় –

কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে !
তাহারে খুঁজিব দিগ্-দিগন্ত ।[১৫৬]

এখানে 'হৃদয়' শব্দের ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অমর চায় তার হৃদয়মানসী এবং প্রেমমানসী কোনও একজন নারী-ই হোক। কাম যদি প্রেমেরই অঙ্গ হয়, তবে তাদের দ্বন্দ্ব যেন না থাকে। প্রেম কামের মোহনায় পতিত হবে এমনটি নয়; কাম যেন শেষ পর্যন্ত বিসর্জিত হয় প্রেমের সাগরে। আবার, অমর চতুর্থ দৃশ্যে প্রমদার দর্শনে অমর গেয়ে ওঠে –

এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি বিকশিত,
তৃষা-ভরা তৃষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল !
কোন্ চাঁদ হেসে চাহে, কোন্ পাখি গান গাহে,
কোন্ সমীরণ বহে লতাবিতানে ।[১৫৭]

এই উক্তিগুলির মধ্যে 'তৃষা-ভরা' শব্দবন্ধটির মধ্যে অতৃপ্ত বাসনা ধ্বনিত হয়েছে। 'ঘুমঘোর' শব্দে মায়ার আভাস রয়েছে। অর্থাৎ সে দীর্ঘদিন যে মানসপ্রতিমার সন্ধানে দিক থেকে দিগন্তে অনুসন্ধান করেছে, সে-ই যেন দেহসম্পদে লাবণ্যের ডালি নিয়ে কাননে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাই তাকে দর্শনমাত্রেই তার পুলকিত, রোমাঞ্চিত অনুভব রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গানে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকৌশলে উদয়ন এবং অমরের মনস্তাত্ত্বিক বিভেদ না থাকলেও উপস্থাপনাগত ভাষার নিবন্ধনে ব্যবধান অপরিমেয়। প্রমদার বিভিন্ন অঙ্গের বর্ণনা অমর ব্যক্ত করেনি বা নাট্যবস্তুর কারণে সে অবিবাহিত যুবক পুরুষ হওয়ায় পরস্ত্রীর প্রতি আকাঙ্ক্ষায় কোনও

আত্মগ্লানিও ধরা দেয়নি। এমনকি সপ্তম দৃশ্যে বসন্তোৎসবের আবহে অমর-শান্তার মিলনোৎসবে নরনারীদের বসন্তবন্দনায় তাদের কামাকুলতার নিখুঁত চিত্রও উপস্থাপিত করেনি গানের বন্ধনে। তার গানে রয়েছে –

হেরো পুরোনো প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্যামলবরনী,
যেন যৌবনপ্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টুটাতে।
পুরানো বিরহ পানিতে, নবীন মিলন আনিছে –
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে ।[১৫৮]

এখানে 'যৌবনপ্রবাহ' শব্দটি চিরনবীনতার বোধক। শীতকালে প্রকৃতি যেমন রিক্তবসন হয়ে পড়ে, তেমনই নব বসন্তের মন্ত্রণায় সেই প্রকৃতিই বর্ণে বর্ণে অপরূপ মাধুরীদানে ভরিয়ে তোলে বনানীকে। তাই এমন বসন্তে আনন্দ মিলন ঘটেছে প্রকৃতিতে এবং মনুষ্যজীবনেও। তাই বসন্তোৎসবের সামগ্রিক নবীন আনন্দ রবীন্দ্রভাবনায় হয়েছে দেহাতীত। নারীগণ বলেছে –

এসো যৌবনকাতর হৃদয়ে,
এসো মিলনসুখালস নয়নে,[১৫৯]

যদি এই ভাষার মাধ্যমে জাড্য কামনার কোনওরূপ অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলেও অমর সেই ক্ষুদ্রতাকে নিয়ে পৌঁছেছে পরমের দ্বারে। সে শান্তার সঙ্গে মিলনে প্রস্তুত কিন্তু বহির্জগতে নরনারীর লীলাভূমি তার কাছে একটি পটভূমিকামাত্র। তাই নায়কের চরিত্রচিত্রণে নাটিকা-র প্রাচীন পদ্ধতি অগম্য বা সম্পূর্ণ বিপরীত তা বলা যায়না। একটি সংস্কৃত নাটিকার উত্তরণ তথা পরিমার্জনের জন্যই যে রবীন্দ্রনাথের *মায়ার খেলা* নাট্যরচনা এমন প্রমাণও অনুপলব্ধ। তবে প্রাচীন রীতি অনুযায়ী *রত্নাবলী*-র ম'ত নাটিকাশ্রেণীর উপরূপকে যা ছিল ব্যক্ত এবং বাচ্য, *মায়ার খেলা* গীতিনাট্যে তা-ই হয়েছে অব্যক্ত এবং প্রতীয়মান। এই ঘটনার উপকারক নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের শব্দচয়ন এবং শব্দপ্রয়োগ।

এরপরে যদি মানিনী প্রগল্ভা নায়িকার প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করা হয়, তবে দেখা যায় যে বাসবদত্তা এবং শান্তার মধ্যে অবস্থানগত এবং ভাবগত পার্থক্য বর্তমান। *রত্নাবলী* নাটিকার তৃতীয় দৃশ্যে রাণী বাসবদত্তা স্বামীর সঙ্গে অন্য রমণীর চিত্রাঙ্কন দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন রাজা তার উদ্দেশ্যে 'কোপানুবন্ধঃ' শব্দের প্রয়োগ করে। আবার *চন্দ্রকলা* নাটিকার তৃতীয় অঙ্কে রাজমহিষী বসন্তলেখা স্বামী এবং চন্দ্রকলাকে তাদের গোপন মিলনের জন্য ধিক্কার জানায় এবং চন্দ্রকলার উদ্দেশ্যে 'দুষ্টকন্যা' বিশেষণ প্রয়োগ করে। এমনকি ক্রূরতাবশে বিদূষক এবং চন্দ্রকলার সখী সুনন্দনাকে লতাপাশের দ্বারা বন্দী করতে ইচ্ছুক। "এষ খলু দুষ্টব্রাহ্মণঃ ইয়ং গর্ভদাসী সুনন্দনা দ্বে অপি একেনৈব লতাপাশেন একীকৃত বদ্ধা গৃহ্যেতাম্"[১৬০] এই ধরণের আচরণ শান্তার মধ্যে দেখা যায়না। বিবাহমণ্ডপে প্রমদাকে দেখে অমরের বিচলিত হওয়ার পরেও সে বলে –

চাঁদ, হাসো, হাসো -
হারা হৃদয়দুটি ফিরে এসেছে।[১৬১]

এখানে সে খণ্ডিতা নায়িকা নয়। দ্বিতীয় কোনও রমণীর প্রতি নিজ প্রিয়তমের সুপ্ত বাসনা সম্পর্কে অবগত হয়েও সে গাইতে পারে –

আমি কেন মাঝে থেকে দুজনারে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে।[১৬২]

অমরের প্রতি শান্তা ছিল আশ্বস্ত। তাই সে অমরের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েই গান্ধর্ব বিবাহে উৎসাহী ছিল। অথচ সেই শুভ লগ্নেই এ ধরণের দুর্ঘটনায় সে বাসবদত্তা বা বসন্তলেখার ম'ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেনি। এমনকি প্রমদার প্রতি সরোষে কটূক্তিবর্ষণ-ও করেনি। বাসবদত্তা বা বসন্তলেখা নিজের হৃত অধিকারকে পুনরায় অর্জন করতে চায় কিন্তু শান্তা তার নামের গুণে বা স্বভাবগুণে তদনুরূপ ক্রূরতার আস্ফালন ঘটায়নি। অথচ সে-ও মানিনী। বাসবদত্তা বা বসন্তলেখার সঙ্গে এহেন পরিস্থিতিতে তার মনস্তত্ত্ব একই কথা বলতে চায় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রটিকে অত্যন্ত সংযত করতে চেয়েছেন। তাই অন্তরের অগ্নির বহিঃপ্রকাশ ঘটেনা শান্তার মধ্যে। সে তার দয়িতের সুখই প্রার্থনা করেছে; কোনও অভিশাপে বিদ্ধ করেনি। যদিও সে বাসবদত্তা বা বসন্তলেখার ম'ত বিবাহিতা নয়; তাই ঘটনাসাপেক্ষে নিজমর্যাদার পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট নয়। তবুও প্রেমের সম্পর্কে যে বিশ্বাস এবং আশ্বাস থাকে, অমর তা ভঙ্গ করেছে। তাই তার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হতে পারার সম্ভাবনা থাকলেও সে প্রশান্ত চিত্তে নিজেই সেই স্থান ত্যাগ করতে চেয়েছে এবং চরিত্রটির মহত্ব আরও বৃদ্ধি পায় অমরকে ক্ষমার মাধ্যমে। তাই শান্তার জীবনদর্শন প্রাচীন নাটিকা-র অভিমানিনী নায়িকা অপেক্ষা অনেকখানিই উন্নত।

ইতোমধ্যেই দেখানো হয়েছে যে সাগরিকা গোত্রের চরিত্র প্রাচীন নাটিকায় নায়িকা হলেও *মায়ার খেলা* গীতিনাট্যে প্রমদা অপ্রধান নায়িকা। সে প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের একটি চরিত্র। সাধারণতঃ নায়িকাকে দেখা গেছে সখীদের সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে। যেমন সাগরিকার সঙ্গে সুসঙ্গতা রয়েছে, তেমনই চন্দ্রকলার সঙ্গে সুনন্দনা রয়েছে, আবার রাধার সঙ্গে বৃন্দা, বনরক্ষিকা, তমালিকা রয়েছে; তেমনই প্রমদা-ও সর্বদা সখীজন-পরিবৃত্তা। আবার *বৃষভানুজা*-তে দ্বিতীয় অঙ্কে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলনে চম্পকলতার ভূমিকা অনন্য। সে অলংকৃত ভাষায় বলে –

সখি, ফলেন জ্ঞাস্যসি। পুনরুক্তেন কিম্। অথ বা কথয়িষ্যে। শৃণু। অস্মিন্নেবাতিমুক্তলতামণ্ডপপরিসরে ত্বং কিল কস্যাপ্যনুরূপবল্লভস্য সমীপে নবজলধরস্য বিদ্যুল্লতেব তথা তমালবিটপসংগতা সুবর্ণযূথিকা লতা শোভমানা সুখং ক্রীডন্তী তিষ্ঠসীতি।[১৬৩]

অর্থাৎ এখানে চম্পকলতা বৃষভানুসুতা রাধাকে নির্দেশ দিচ্ছে যে অতিমুক্তমণ্ডপস্থানে নবীন মেঘবর্ণ কান্তের জন্য দামিনীর ন্যায় শোভিত হতে চলেছে এমনভাবে যেন তমাল বৃক্ষে সুবর্ণসূত্র আলিঙ্গিত হয়েছে। মনই তৃতীয় দৃশ্যে প্রমদার জনৈক সখী তার মাধুকরী বৃত্তির জন্য বলেছে –

উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে,
আশা-নিরাশায় পরান টুটিবে,
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে,
শরম-অরুণ-রাগে।[১৬৪]

আবার, পঞ্চম দৃশ্যে প্রমদার সঙ্গে অমরের মিলনে কৌতুকপূর্ণ চটুলতার আশ্রয় নেয়। তারা অমরকে পরীক্ষা করে যে তার প্রেম ক'তখানি গভীর। তাই অমর প্রমদার সঙ্গলাভ করতে চাইলে তাকে বলে –

এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা –
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা ?[১৬৫]

এবং যখন অমর ফিরে যায়, তখন প্রমদা মরিয়া হয়ে অমরকে পুনরাহ্বান জানাতে চাইলে সখীরাই বলে –

অধীর, হোয়ো না সখী,
আশ মিটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে।[১৬৬]

সাগরিকা বা অন্যান্যা নায়িকাদের মধ্যে আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তা হ'ল তার কামোন্মাদনা। *রত্নাবলী* -র দ্বিতীয় অঙ্কে সাগরিকার কামজনিত অবশতা লক্ষ্য করা যায় একটি শ্লোকে –

দুর্লভজনানুরাগেন লজ্জা গুর্বী পরবশ আত্মা ।
প্রিয়সখি বিষমং প্রেম মরণং শরণং নঃ বরমেকম্ ।।[১৬৭]

দুর্লভ জনের প্রতি তার প্রেম। এ যেন পতঙ্গের অগ্নিশিখার দিকে ধাবিত হওয়া। সে নিজেও বুঝেছে তার আকাঙ্ক্ষা হয়ত পরিপূর্ণ হওয়ার নয় তবুও নিজের শরীরী তৃপ্তিসাধনের ডাককে উপেক্ষাও করতে পারছে না। তেমনই *মায়ার খেলা* -র তৃতীয় দৃশ্যে পূর্বোল্লিখিত 'পুলকরস'-এর প্রসঙ্গটিও তার পুরুষদের প্রতি শরীরী আকর্ষণের ইঙ্গিত। তবে অমিল শুধুমাত্র তার পরিণতিতেই। সেকথা পূর্বেই বিশদে আলোচিত হয়েছে। নাটিকায় নবানুরাগা নায়িকার সঙ্গে ধীরললিত নায়কের মিল ঘটে যায় কিন্তু প্রমদার সঙ্গে অমরের সম্পর্ক নিঃশেষ হয়ে যায়।

এছাড়াও প্রাচীন নাটিকাগুলিতে বিদূষকের চরিত্র উপস্থিত থাকত কিন্তু *মায়ার খেলা*-য় বিদূষকের কোনও ভূমিকা নেই। *রত্নাবলী, পারিজাতমঞ্জরী, কর্ণসুন্দরী, চন্দ্রকলা* ইত্যাদিতে রাজা তার মনের যাবতীয় গোপন অনুভব

বিদূষকের কাছেই ব্যক্ত করত। *রত্নাবলী* এবং *পারিজাতমঞ্জরী*-র প্রথমাঙ্কে বসন্তোৎসবের চিত্র রাজা এবং বিদূষকের পারস্পরিক কথোপকথনেই ব্যক্ত হয়েছে[১৬৮]। অর্থাৎ রাজার যে সুপ্ত কামেচ্ছা, তা কেবল বিদূষকই জানতে পারত। *কর্ণসুন্দরী* নাটিকার প্রথমাঙ্কে বিষ্কম্ভকের পরে ২৬নং শ্লোক থেকে শুরু ক'রে ৪৩ নং শ্লোক পর্যন্ত রাজার উক্তি, ৪৪নং শ্লোকটি বিদূষকের উক্তি, আবার ৪৫ থেকে ৪৮তম শ্লোকগুলি রাজার উক্তি, পুনরায় বিদূষকের উক্তি দেখা যায় ৪৯ এবং ৫০নং শ্লোকে এবং শেষে ৫১ থেকে ৫৫নং শ্লোকে রাজার বচন[১৬৯]। তবে *বৃষভানুজা*-তে বিদূষকের চরিত্র অনুপস্থিত থাকলেও বিদূষকের অনুপ্রেরণা প্রিয়ালাপ চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়। কৃষ্ণ তার পরিকল্পনাগুলি প্রিয়ালাপের কাছে ব্যক্ত করেছে[১৭০]।

মায়ার খেলা-র ক্ষেত্রে অশোক বা কুমারকে তদনুরূপ 'বিদূষক' আখ্যা দেওয়া যায়না। যদিও চতুর্থ দৃশ্যের প্রথমাংশে অমর, অশোক এবং কুমারের মধ্যে উক্তি-বিনিময় চলেছে তথাপি অশোক বা কুমার কেউই বিদূষকের আসন গ্রহণ করতে পারেনি কারণ নাটিকায় বিদূষক কখনও নায়িকার প্রতি আসক্ত হয়নি। অথচ এখানে অমর-অশোক-কুমারের কথোপকথনটি হ'ল –

অমর ।। অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হা হা তবে –
অশোক ।। আমি, জেনেশুনে বিষ করেছি পান,
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ ।
কুমার ।। সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি
পরের মন নিয়ে কি হবে ![১৭১]

অশোক এবং কুমারের লক্ষ্য প্রমদা। অমর যদিও তখনও পর্যন্ত প্রমদার সঙ্গে পরিচিত হয়নি, তবুও সে তার স্বপনপ্রেয়সীলাভের অনিশ্চয়তাই ব্যক্ত করেছে অপর দুই পুরুষের কাছে। তাই অপরের এহেন বিজনতায় যদি কেউ নিরপেক্ষভাবে তার মনে আশার সঞ্চার করত, তবে হয়ত সে বিদূষকের আখ্যায় ভূষিত হতে পারত। যেমন *রত্নাবলী* নাটিকার দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা উদয়ন এবং সাগরিকার স্পর্শমাত্রেই বিদূষক বসন্তক উল্লাসিত হয়ে বলেছে "ভো এষা খলু ত্বয়া অপূর্বা শ্রীঃ সমাসাদিতা"[১৭২]। অর্থাৎ সাগরিকার সঙ্গে রাজার ভাববিনিময়ে বিদূষকের সম্মতি রয়েছে এবং বলা যায় রাজার সঙ্গে নায়িকার মিলনে নাটিকায় বিদূষকের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকত। *প্রিয়দর্শিকা* নাটিকার দ্বিতীয় অঙ্কে রাজার আরণ্যিকার বেশধারিণী নায়িকা প্রিয়দর্শিকাজনিত প্রেমোদ্গারের জন্য তার সৌকুমার্য বর্ণনা ক'রে বলে "আশ্চর্যমাশ্চর্যম। এষা সলিলচলৎকরপল্লবিতপ্রভাবিস্তৃতেনাপহসিতশোভং করোতি কমলবনমবচিন্বংতী"[১৭৩]। এটির বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় যে প্রিয়দর্শিকা পুষ্পচয়ন করতে করতে জলের মধ্যে দিয়ে চলেছে এবং সেই সময় তার হস্তের শোভা পল্লবতুল্য হয়ে পদ্মবনকেও পরাস্ত করছে। এই ধরণের বাক্যগুলি উদ্দীপন বিভাবের ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজার মনে পূর্বেই প্রিয়দর্শিকার প্রতি কাম জাগ্রত হলেও বিদূষকের বাক্যে তা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাই এই নাট্যটিতে এই ধরণের চরিত্রচিত্রণ ঘটেনি। যেহেতু *মায়ার খেলা*-

র ইতিবৃত্তটির মূলে কোনও ক্ষত্রিয় রাজা নেই, তাই তার সঙ্গে বয়স্য বিদূষকেরও প্রয়োজন নেই। এমনকি নাটিকায় বিদূষকসহ কঞ্চুকী, প্রতিহারী ইত্যাদি চরিত্রেরাও প্রয়োজনানুসারে যাতায়াত করে কিন্তু রাজতন্ত্রের আবহ *মায়ার খেলা*-য় স্পর্শ করেনি ব'লেই এই ধরণের রাজ-অনুষঙ্গ-সম্বন্ধিত চরিত্ররাও অধিকার পায়নি নাট্যপরিসরে।

❖ **ঘটনাবিন্যাস :**

পুরাতনী নাটিকাশ্রেণীর উপরূপকে নাট্যকারগণ যেভাবে নাট্যবস্তুর গ্রন্থনা করেছেন, তাতে দেখা যায় যে একজন বিবাহিত ক্ষত্রিয় নৃপতি ঘটনাচক্রে দ্বিতীয় কোনও ললনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিদূষকের ভূমিকা থাকে সেই অপরিচিত নারীর সঙ্গে রাজার মিলন। অন্যদিকে রাজমহিষী সেই ঘটনার অনুমান করতে পারে এবং দ্বিতীয় নারীর সঙ্গে রাজার মিলনে যথাসম্ভব প্রতিকূলতার পরিবেশ রচনা করে তার পরিচারিকাবৃন্দের সহায়তায়। প্রয়োজনে কখনও সেই নারীকে বন্দী করে, স্বামীকে ভর্ৎসনা করে। একেবারে শেষ পর্যায়ে ঘাত-প্রতিঘাতে দ্বিতীয় অনূঢ়া নায়িকার সঙ্গেই রাজার মিলন ঘটে এবং প্রথমা স্ত্রী তাকে স্বাগত জানায়। অর্থাৎ যাই হোক; নাট্যদ্বন্দ্বের বিন্যাসের জন্যই নায়কের সঙ্গে নায়িকার মিলনে প্রভূত অন্তরায় থেকে যায়। একাধিক উপরূপকে পাঠপূর্বক নাটিকা জাতীয় উপরূপকের ক্ষেত্রে কাহিনিবিস্তারে যে কয়েকটি স্বজাতীয় অন্তরঙ্গতা ধরা দেয়, তা হ'ল প্রকৃতির বর্ণনা এবং বিশেষতঃ তা বসন্তকালীন মদনোৎসব। *রত্নাবলী* নাটিকার প্রথমাঙ্কের নাম-ই 'মদনমহোৎসব'। অবিকল এই পরিবেশ আমরা *পারিজাতমঞ্জরী*-র প্রথমাঙ্কেও লক্ষ্য করা যায়। সেই অঙ্কটি 'বসন্তোৎসব' নামে পরিচিত। আবার, প্রিয়দর্শিকা নাটিকার প্রথমাঙ্কেই সূত্রধারের "অদ্যাহং বসন্তোৎসবে.."[১৭৪] ইত্যাদি বাক্যের মাধ্যমেই প্রতীতি হয় সেকালের বসন্তোৎসবেই এই নাটিকাটি অভিনীত হত। *কর্ণসুন্দরী* নাটিকায় প্রথমাঙ্কে বাসন্তী পরিবেশে এক উদ্যানে অবস্থানকরতঃ রাজার উক্তিতে বারংবার মদনদেবের উল্লেখ রয়েছে।[১৭৫] *বিদ্ধশালভঞ্জিকা*-য় প্রথমাঙ্কে প্রমোদোদ্যানে বিদূষকের উক্তিতে বসন্তপ্রকৃতির নিসর্গপ্রকৃতির মধ্যেও মাদকতা লক্ষ্য করা গেছে।[১৭৬] আবার *বৃষভানুজা* -তে সরাসরি বসন্তের কথা বলা না হলেও কৃষ্ণের উক্তিতে তারই প্রসঙ্গ রয়েছে প্রথমাঙ্কেই - "মুহূর্তকমেতেষু মধুমাসকুসুমসমৃদ্ধিমধুপানমত্তমধুকরনিকরমধুরঝঙ্কারমুখরেষু . .."[১৭৭] । অর্থাৎ নাট্যক্রিয়ার অধিকরণ বসন্ত ঋতু। কারণ কৃষ্ণের বাক্যের মাধ্যমেই মধু মাসে সুরের গুঞ্জনকারী ভ্রমরপঙক্তির মধুপানোৎসবের মত্ততা বর্ণিত। তাহলে এতগুলি নাটিকায় যখন বসন্তের বর্ণনা বা উৎসবমুখরতা লক্ষ্য করা যায় সচেতনভাবেই, তখন স্বীকার করতেই হয় যে নাটিকা উপরূপকের সঙ্গে বসন্তোৎসবের সম্পর্ক ছিল। তা বসন্তোৎসব-উপলক্ষ্যে নাটিকার মঞ্চায়ন হোক বা নাট্যকথাবস্তুর গ্রন্থনায় বসন্তোৎসবের উল্লেখ থাক। আবার, *মায়ার খেলা*-র কথাবস্তুটি যে ঋতুতে সম্প্রবর্তিত হচ্ছে, তা বসন্তকাল-ই। প্রথম দৃশ্যের মায়াকুমারীদের গানেই "নব বসন্তের রাতি"-র উল্লেখ রয়েছে[১৭৮] এবং শেষ বা সপ্তম দৃশ্যেও বসন্তোৎসবের নৃত্যগীতের বর্ণনা পাই[১৭৯]। এই বিষয়টি কাকতালীয় হলেও এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের যে লক্ষ্য, তার জন্য অনেকখানিই ধনাত্মক। রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি নাট্যে বসন্ত-উৎসবের প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে এসেছে। যেমন *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্য-এ এর

প্রথম দৃশ্যটিই অনঙ্গ-আশ্রমে সংঘটিত। সেখানে অনঙ্গ তথা মদনদেব এবং তার সখা বসন্ত উপস্থিত[১৮০]। *রাজা* নাটকের প্রথম দৃশ্যে রাজার উক্তিতে পাওয়া যায় "আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসব"[১৮১]।

ফাল্গুনী নাট্যকাব্যের মধ্যে চন্দ্রহাস এবং সর্দারের কথোপকথনটি হ'ল –

> চন্দ্রহাস ।। হাঁ, রইল কথা। দোলপূর্ণিমার দিনে
> তাকে ঝোলার উপর দোলাতে দোলাতে তোমার কাছে হাজির করে দেব।
> কিন্তু তাকে নিয়ে কী করবে।
> সর্দার ।। বসন্ত-উৎসব করব।[১৮২]

বসন্ত নাটিকার প্রথমাংশের রাজা এবং কবির মধ্যে বাক্যবিনিময়েও লক্ষ্য করা যায় বসন্তোৎসবের আয়োজন –

> রাজা ।। আজ বসন্ত-উৎসবে কী পালা তৈরি করেছ সেইটে বলো।
> কবি ।। আজ সেই পলাতকার পালা।[১৮৩]

শাপমোচন কথিকায় চতুর্থ দৃশ্যে বসন্তোৎসবে অরুণেশ্বরের নৃত্যগীতের পরে কমলিকার বিবৃতিতে ধরা দেয় –

দেখলেম নাচ। যেন মঞ্জরিত শালতরুশ্রেণীতে বসন্তবাতাসের অধৈর্য। যেন চন্দ্রালোকের শুক্লপক্ষে লেগেছে তুফান।[১৮৪]

তবে এটি মনে করা উচিত নয় যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটিকা রচনার জন্যই *মায়ার খেলা* গীতিনাট্যে বসন্তের পরিবেশকে জোরপূর্বক নিবদ্ধ করেছেন। তবে *মায়ার খেলা*-র যে বার্তা, তার জন্য বসন্তের প্রয়োজন ছিল। বসন্তকালে অনঙ্গদেবের পঞ্চশরে নরনারী মদনাক্রান্ত হয়ে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। এই ঋতু-ই মায়ার আবরণ এবং বিক্ষেপ শক্তির উপযুক্ত কাল। গ্রীষ্মের রুক্ষতা, বর্ষায় নবীন প্রানের জাগৃতি, শরতে উৎসাহ, শীতে জড়ত্ব এবং বসন্তের মাদকতাই প্রকৃতিতে বৈধ। তাই মনুষ্যজীবনের মায়ার খেলার জন্য নাট্যকারকে বসন্তের দ্বারে উপনীত হতেই হ'ত। তাই *মায়ার খেলা*-য় বসন্তোৎসব প্রাসঙ্গিকতাবিহিত। তবে এখানে যেহেতু লক্ষ্য গ্রন্থানুসারে *মায়ার খেলা*-র সমীকরণের একটি কার্য চলছে, তাই প্রাচীন নাটিকাকারের ভাবনায় বসন্ত এবং বসন্তোৎসবের উল্লেখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের *মায়ার খেলা*-য় উল্লিখিত বসন্ত এবং বসন্তোৎসবের কতখানি মিল বা অমিল রয়েছে।

প্রাচীনকালে প্রচলিত মদনোৎসবের নিপুণ বর্ণনা *রত্নাবলী* নাটিকার প্রথমাঙ্কে পাওয়া যায়। রাজা এবং বিদূষক বারনারীদের নিবিড় কামোপভোগের রসোপলব্ধি করার পরেই রাণী বাসবদত্তার সঙ্গে মকরন্দ উদ্যানে যায়। সেখানে রাণী রক্তাশোক বৃক্ষতলে মদন দেবের পূজা করে। এই পূজায় যতখানি ভক্তিরস লক্ষ্য করা যায়, তার অধিক প্রার্থনা কামরসের জারণ। নাট্যকার পৌরবাসীদের রতিকেলি-আস্বাদনের চিত্রটি বিদূষকের জবানীতে এভাবে ধরেছেন –

..মধুমত্তকামিনীজনস্বযংগ্রহগৃহীতশৃঙ্গকজলপ্রহারনৃত্যন্নাগরজনজনিতকৌতূহলস্য সমন্ততঃ স্বচ্ছন্দমর্দলোদ্দামচর্চরীশব্দমুখররথ্যামুখশোভিতঃ প্রকীর্ণপটবাসযুঞ্জযিঞ্জরিতদশদিশামুখস্য সস্বীকতাং মদনমহোৎসবস্য।[১৮৫]

নগরের পথে বারবিলাসিনীগণ কামীপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিচকারি সহযোগে জলীয় রঞ্জক নিক্ষেপ করছে, রাস্তায় মাদলবাদ্যের ধ্বনি শ্রুত হচ্ছে, কখনও বা চর্চার গীতচর্চা চলেছে এবং আবিরের বর্ণে দিক-দিগন্ত বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। এমনকি কামান্ধ রাজাও রাজপথের জনৈক বেশ্যা নারীর অঙ্গসৌষ্ঠব প্রকাশ্যে বিবৃত করেছে বয়স্য বসন্তককে। সেখানে নায়ক উদয়ন বলে ওঠে যে সেই আলুয়ালিত কেশের স্ত্রীলোকের স্তনভারে কটিদেশ নুব্জ হয়ে পড়েছে, অঙ্গের শৃঙ্গাররচনা রঙ্গক্রীড়ায় শিথিল তথাপি পদযুগলে নূপুরনিক্কন অবিরত –

স্রস্তঃ স্রগ্দামশোভাং ত্যজতি বিরচিতামাকুলঃ কেশপাশঃ
ক্ষীবাযা নূপুরৌ চ দ্বিগুণতরমিমৌ ক্রন্দতঃ পাদলগ্নৌ ।
ব্যস্তঃ কম্পানুবন্ধাদনবরতমুরৌ হন্তি হারো'যমস্যাঃ
ক্রীডন্ত্যা পীডযেব স্তনভরবিনমন্মধ্যভঙ্গানপেক্ষম্ ।।[১৮৬]

আবার ধীরললিত স্বভাবজন্যেই তার মনে কবিত্বের একটি সমাদর রয়েছে। তাই মকরন্দোদ্যানের বর্ণনা দিয়েছে এভাবে –

উদ্যদ্বিদ্রুমকান্তিভিঃ কিসলযৈস্তাম্রাং ত্বিষং বিভ্রতো
ভৃঙ্গালীবিরুতৈঃ কলৈরবিশদব্যাহারলীলাভূতঃ ।
ঘূর্ণন্তো মলযনিলাহতিচলৈঃ শাখাসমূহৈর্মুহু-
-র্ভান্তি প্রাপ্য মধুপপ্রসঙ্গমধুনা মত্তা ইবামী দ্রুমাঃ ।।[১৮৭]

অর্থাৎ উদ্যানবৃক্ষে প্রবালরূপ তাম্রবর্ণে নবপল্লবের সমাগম ঘটেছে। সেখানে মধুকরগুঞ্জন অবিরত এবং দক্ষিণ মলয়বায়ুর সংস্পর্শে দোদুল্যমান নবপল্লবদলে যেন বৃক্ষরাজির মদোন্মত্তদশার সৃষ্টি হয়েছে। আবার সংগীতাবহে কোকিলরবে আম্রমঞ্জরীরেণু বাতাসে উড়ে সেই মকরন্দ উদ্যান যেন এক রেশমী চন্দ্রাতপ রচনা করেছে এমন বর্ণনাও তারই উক্তিতে প্রত্যক্ষ করা যায় –

এতত্ খলু তন্মলযমারুতান্দোলনপ্রফুল্লসহকারমঞ্জরীরেণুপটলপ্রতিবদ্ধপটবিতানং মত্তমধুকরনিকরমুক্তঝঙ্কারমিলিতমধুরকোকিলারাবসঙ্গীতশ্রুতিসুখং ত্বদাগমনদর্শিতাদরমিব মকরন্দোদ্যানং লক্ষ্যতে।[১৮৮]

আবার *কর্ণসুন্দরী* নাটিকায় কোনও এক বসন্তসময়ে রমণীয় উপবনে বিদূষকের সঙ্গে রাজা এসে রক্তিম বা পীত বর্ণের অশোক, চম্পক এবং মদনবৃক্ষের অপরূপতার কথা তুলে ধরে। রক্তিম অশোকবৃক্ষের নবপল্লবের রূপ যেন প্রেমের বর্ণিল মায়া, পীত বর্ণ যেন দ্রাবিড় দেশীয় নারী বিম্বাফলসদৃশ অধরশোভা বর্ধন করছে, চম্পা

যেন মরাঠী নারীর কপোলদস্থলে অমিত সৌন্দর্য ধারণ করেছে এবং মদন বৃক্ষের বৈভব কর্ণাট দেশীয় রমণীর হাস্যোজ্জ্বল রূপ -

রক্তাশোকদ্রুমাণাং লসতি কিসলযশ্রেণিরার্দ্রাপরাধ
প্রেযঃ শৌণ্ডীর্যপীত দ্রবিড বরবধূ চারু বিম্বাধরশ্রী ।
উন্মেষশ্চম্প কা নাম জরঠমরঠী গণ্ডপালী বিলাসঃ
কর্ণাটী হাস্যলেশান্বিচ কিল মুকুল স্ফূর্তযো বার্তযন্তি ।।[১৮৯]

আবার নব চূতমঞ্জরী যা কামদেবের পঞ্চশরের একটি বাণ, সেই বাণের অতিরিক্ত কোকিলের পঞ্চম স্বরের গান যেন ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ হয়ে উঠেছে বসন্তে কামীজনের চিত্তরতির জাগরণের জন্য। তার কথা নাট্যকার এভাবে তুলে ধরেছেন –

কান্তে নূতন চূতমঞ্জরি ধনুর্দণ্ডে'ধুনাসদংদধ-
-ৎকন্দর্পঃ কলকণ্ঠপঞ্চম রব ব্রহ্মাস্ত্রমব্যাহতম্ ।।[১৯০]

পারিজাতমঞ্জরী-র দ্বিতীয়াঙ্কে কুসুমাকরের বচনে নগরবাসীর বসন্তোৎসবের চিত্রগীতি উঠে এসেছে। যথা –

দেব্যা সমস্তকলযা মলযানিলেন
চূতাতিমুক্তকলতামিথুনোৎসবেন ।
বারাঙ্গনামসৃণমঙ্গলগীতরঙ্গৈ-
-র্ধারাগিরিঃ কমপি সংমদমাতনোতি ।।[১৯১]

অর্থাৎ মলয় পবনে উদ্বেলিত সহকার ও অতিমুক্তলতার মিলনে এই উৎসব ছিল মিথুনের উৎসব এবং বিশেষতঃ বারাঙ্গনার মঙ্গলগীতিসুধা ছিল অন্যতম উপভোগ্য নর্মবিলাস। *বিদ্ধশালভঞ্জিকা* নাটিকার প্রথমাঙ্কে শোনা যায় –

গর্ভগ্রন্থিষু বীরুধাং সুমনসো মধ্যে'ঙ্কুরঙ্কুরং পল্লবা
যাঞ্ছামাত্রপরিগ্রহঃ পিকবধূকণ্ঠোদরে পঞ্চমঃ ।[১৯২]

অর্থাৎ বসন্তে ইচ্ছামাত্রই কামদেব তার কর্ম সম্পাদন শুরু করে দেয়। লতাবল্লরীর গর্ভগ্রন্থির মধ্যে প্রফুল্ল কুসুমের মধ্যে অঙ্কুর, নব কিশলয়ের উদগম এবং স্ত্রী কোকিলের পঞ্চম স্বরে গান-ই কামদেবের নিদ্রাভঙ্গ ঘটাতে সমর্থ।

মৃগাঙ্কলেখা নাটিকাতেও প্রথমাঙ্কে মকরন্দ উদ্যানে বসন্তোৎসব উদযাপনের খণ্ডচিত্র ধরা দিয়েছে। পূর্ববৎ নাটিকাগুলির ম'ত এখানেও রাজা মকরধ্বজ কামদেবের বিচিত্র লীলার স্বাদগ্রহণ করতে করতে বলে ওঠে –

কেনাপি চঞ্চলদৃগঞ্চলবিভ্রমেণ
চন্দ্রাননা মযি চকার সরোজমালাম্ ।
হা ! হন্ত ! সা স্মৃতিগতাপি তনোতি দাহং
কেযং প্রকাররচনা মকরধ্বজস্য ।।[১৯৩]

রাজা মদনপীড়ায় আক্রান্ত। চঞ্চলদৃষ্টি এবং অঞ্চলবিভ্রমের হাব-ভাবের দ্বারা কোনও চন্দ্রবদনা নারীর স্মৃতি বারংবার উদ্রিক্ত হয়েছে তার মনে।

সপদিমুকুলিতেযং কিংশুকানাং বনালী
ললিতমধুপমালা বিভ্রমং সন্তনোতি ।
ইহ ঘনমকরন্দামোদমাদ্যন্মিলিন্দা
বিলসতিসহকারশ্রেণিরাকম্পকুঞ্জাঃ ।।[১৯৪]

অর্থাৎ সেই স্বর্গীয় নন্দনকানোপম উদ্যানে নব পলাশ বিকশিত, সুগন্ধি আম্রমুকুল ব্যাপ্ত এবং মধুকরপঙক্তি ইতস্ততঃ গুচ্ছাকারে পুঞ্জীভূত।

এমনকি হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশের বিংশ শতাব্দীর রচনা *বিরাজ-সরোজিনী* নাটিকাতেও এই ধারা অক্ষুণ্ন থেকেছে। দ্বিতীয় অঙ্কে দেবীর গানেও বসন্তের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে দেবী আনন্দপ্রসবী ঋতুরাজ বসন্তকে শোকদায়ী ঋতুরূপে চিহ্নিত করেছে; কারণ বসন্তে তার স্বামীর আচরণে তার মর্মপীড়া উৎপন্ন হয়েছে–

ঋতুরাজো বসন্ত আসীদশোকহেতুঃ ।
সাম্প্রতমপরাগতো দদাতি যন্ত্রণাম্ ।।[১৯৫]

তবে উপরিউক্ত উল্লেখগুলির মাধ্যমে যা প্রতিপন্ন হ'ল তা কিন্তু শুধুই কথ্যাকারে নাট্যে পরিবেশিত হ'ত; দৃশ্যাকারে নয়। তাই নাটিকার পাঠসুখ এবং দর্শনসুখ ভিন্ন। *রত্নাবলী*-তে রাজা ও বিদূষকের কথোপকথনটি এতই জীবন্ত যে পাঠক সহজেই তার মানসপটে সেই দৃশ্যের কল্পনা করতে পারে কিন্তু *রত্নাবলী* নাট্যপ্রযোজনাদর্শনের সময় শ্লোক বা গদ্যগুলি শ্রবণ করলেও মঞ্চোপরি সেই কামোল্লাস দৃশ্য হয়না। বিষয়টি বিষ্কম্বকতুল্য। এক্ষেত্রে যদিও অঙ্কের লক্ষণাবলি অনুসরণ করলে বোঝা যায় যে শারীরিক মিলন কখনওই প্রাচীন ভারতে দর্শিতব্য ছিলনা। বিশ্বনাথ কবিরাজের অভিমত এরূপ –

দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যু রতং তথা ।।[১৯৬]

অর্থাৎ নাট্যমধ্যে বা মঞ্চোপরি রতিক্রিয়া ('রতং') অদর্শনীয় বিষয়। অথচ উপরূপক-এর সহৃদয়বর্গের কথা ভেবেই বা তার নিজস্ব সত্তাকে পরিপুষ্ট রাখতেই তার অঙ্গহানি ঘটাতে চাননি নাট্যকারগণ । তাই উদয়নকথাশ্রিত *স্বপ্নবাসবদত্ত* এবং *রত্নাবলী* যেমন দুই বিশিষ্ট নাট্যকারের রচনা, তেমনই নাট্যেরও দুটি পৃথক গোত্র – 'রূপক' এবং 'উপরূপক'। অতএব প্রাচীন সংস্কৃত নাটিকাগুলির মধ্যে যে বসন্ত ঋতুর একটি বিশেষ মান্যতা উপরূপককারগণ দিয়েছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাই এই সমস্ত নাটিকাগুলির মোট যোগফলে যেভাবে ঋতুরাজ বসন্ত এবং বসন্তোৎসবকে অন্তর্লোকে দৃশ্যায়িত করা যায়, তা হ'ল এই ঋতু মাদনের ঋতু। এই সময়ে কামদেব পঞ্চশরযোজনায় নরনারীকে কামাতুর ক'রে তোলে যার ফলে সমাজের শাসক থেকে শুরু

ক'রে নগরবাসী তথা বারবণিতাসমাজও মোহপাশে আবদ্ধ হয়। প্রকৃতিতে যেমন বন-বনানী, পল্লব-মঞ্জরীর মিলন হয়; তদ্রুপ নরনারীর মিথুনও অবিসংবাদিত। রঞ্জকচূর্ণে এক অপরকে রঞ্জিত করা, মদ্যপান, সংগীতপরিবেশনা ইত্যাদিরও যথেচ্ছতা লক্ষ্য করা যায় এবং তখন রক্তাশোকপাদমূলে কামদেবের পূজার্চনারও লোকাচার প্রচলিত ছিল তাও জানা যায়।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের লেখনীপ্রসূত বসন্তবর্ণনা *মায়ার খেলা* নাট্যে এরূপ নয়। সেখানে প্রথম দৃশ্যেই মায়াকুমারীদের গানটি হ'ল –

মোরা জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি ।
মোরা স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি ।
গোপনে হৃদয়ে আশি কুহক-আসন পাতি ।
মোরা মদির তরঙ্গ তুলি বসন্তসমীরে !
দুরাশা জাগায় প্রাণে-প্রাণে আধো-তানে ভাঙা গানে
ভ্রমরগুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি !
মোরা মায়াজাল গাঁথি ।
নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে ।
কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে ।
মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান-অভিমান ।
বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথি ।
মোরা মায়াজাল গাঁথি ।[১৯৭]

এই গানটির স্থায়ী এবং অন্তরার অংশদুটিতে একটি ভাবার্থ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যা প্রাচীন নাটিকাগুলির স্পষ্টোক্তিরই সারমর্ম নয় ? *রত্নাবলী*-র প্রথম অঙ্কে রাজা এবং বিদূষকের পারস্পরিক কথোপকথনে যে রসিক পুরুষ এবং বারবারীদের আভিচারিক বিবৃতি ধরা হয়েছে, সেই বিশেষেরই সাধারণীকরণ এই গানটি। স্বপ্ন যদি বিশেষ্য পদ হয়, তবে সেই স্বপ্নদৃশ্যের ঘটনাটি কী ? সেখানে নর্মসম্ভোগেরই ভাস্বর গাথা অনুভূত। "মদির তরঙ্গ তুলি" বাক্যাংশে 'মদির' অর্থে অভিধেয়ার্থে মদ্যপান বোঝা গেলেও তা ব্যঙ্গ্যার্থে ভোগবাসনার চূড়ান্ত ঈপ্সা। তা তরঙ্গায়িত হয়ে পড়ে যারই প্রভাবে নারীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে রাজা। এমনকি বসন্তোৎসবে আবিরের বর্ণিল আবেদন, প্রকৃতির সন্তান অশোক, কিংশুকের বর্ণমাধুরীর সঙ্গে আবির বা পটবাসচূর্ণের একাত্মতার ঔপম্যবাচী কোনও শ্লোক রচিত হয়না। বরং রাজার মনে উদিত হয় যে এ যেন পাতালপুরীর ভুজঙ্গরাজ্য। সিঁদুরলেপনের রক্তিমাভায় উপমান এবং উপমেয়ের বদান্যতায় প্রকৃতিদর্শনমূলক শ্লোকের অবকাশ নেই বরং পুরুষদের স্বর্ণালংকারের সঙ্গে আবিরের লালিমায় উষাকালের সাদৃশ্যের উল্লেখের পরেই তাদের অঙ্গচ্ছটার শোভা

বর্ণনা। "কত হাসে কাঁদে" অংশটিও মিলে যায় নাটিকাগোত্রের সঙ্গে। তাই রাজমহিষী ক্ষুণ্ণ হয়, অভিমানিনী হয়। স্বপ্ন বা অবচেতন মনের ইচ্ছায় বিরহী হৃদয়ের প্রেমলাভ ঘটনাটিও নাটিকায় দেখা যায়। যেমন *রত্নাবলী*-র দ্বিতীয় অঙ্কে রাজার প্রতিকৃতি অঙ্কন। গানটির একেবারে শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেমছল,
প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি ।[১৯৮]

এখানে 'প্রেমছল' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রেমের ছলনা অর্থাৎ বহিরঙ্গসম্পন্নতা যে নির্মল প্রেম নয় তা-ই রবীন্দ্রনাথের বার্তা। বসন্তকালের কামদেবের পূজাবিধির কোনও উল্লেখ নেই এই নাট্যে। এমনকি চলিত ভাষায় 'রং খেলা'-র ম'ত ঘটনাকেও তিনি অনুমতি দেননি নাট্যে। আবার, নায়কের মনোদর্শনে বসন্তের বনরাজি বা অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য কোনও সুসজ্জিত, পরিকল্পিত উদ্যানেরও উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র প্রদমার প্রমোদক্রীড়ার ঘটনাস্থল কোনও এক পুষ্পিত কানন। শেষ দৃশ্যের "এসো এসো বসন্ত ধরাতলে"[১৯৯], "মধুর বসন্ত এসেছে"[২০০] এবং "আহা, আজি এ বসন্তে"[২০১] এই তিনটি রবীন্দ্রসংগীত-ই স্বমহিমায় বাঙালির কাছে জনপ্রিয়। প্রথম গানটির মধ্যে কামগন্ধ জড়িয়ে রয়েছে। "গন্ধমদভরে অলস সমীরণ", "আনো নবযৌবনহিল্লোল", "প্রফুল্ল নবীন বাসনা" ইত্যাদি অংশগুলির প্রাচীন বসন্তগীতির আবহ থাকলেও এক্ষেত্রে মনে রাখতে হয় যে এই গানের পরেই অমর এবং প্রমদার পুনঃসাক্ষাৎ ঘটবে। তখনও অমরের মন থেকে প্রমোন্মত্ততা ধৌত হয়ে যায়নি। তাই গানটির প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান। "আহা, আজি এ বসন্তে" গানটি প্রকৃততঃ শান্তারই অন্তর্বেদনা।

সুখে আছে যারা সুখে থাক্ তারা,
সুখের বসন্ত সুখে হোক সারা,
দুখিনী নারীর নয়নের নীর
সুখীজনে যেন দেখিতে না পায় ।[২০২]

বসন্ত সকলের জন্য সুখকর বার্তাবহ হয়ে আসেনি। শান্তার জীবনে যখন চরমতম অপমান এবং লাঞ্ছনা নেমে এসেছে, সেই সময় সখীরা গেয়েছে এই গান। যদি উদয়নের সঙ্গে বাসবদত্তার সম্পর্কের কথা বলা হয়, তবে *রত্নাবলী* বা *প্রিয়দর্শিকা* নাট্যে বাসবদত্তার কাছে তার সপত্নীতুল্য কোনও রমণীর উপস্থিতিতে এরূপ কোমল কোনও গানের বা নাট্যোক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়না। তাই এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি অভিনবত্ব রয়েছে। শান্তা এই অংশে পদে পদে মানময়ী কিন্তু তার সমান্তরালে তার দুঃখ, বেদনা, অশ্রুরও প্রকাশ ঘটেছে। তাই গানটি বসন্তের গানের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম ক'রে একটি মানবিক গানে পর্যবসিত হয়েছে।

অর্থাৎ একটি আদর্শ নাটিকা-র সাপেক্ষে যদি *মায়ার খেলা*-র বিচার করা হয়, তবে ঘটনাবিন্যাসগত একটি সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। দুই নারীর মধ্যস্থলে এক পুরুষের দ্বিধাবিভক্তিমূলক কথাবস্তুর বুনন যখন হয়েছে, তখন সেই বসন্তের চিত্রপটও উপস্থিত হয়েছে। গ্রীষ্ম বা বর্ষাকে যদি এই নাট্যের পশ্চাৎপটে রাখা হ'ত,তবে

ঘটনাটির ঔচিত্যহানি ঘটত। এতগুলি প্রাচীন নাটিকা উপরূপকে যখন বসন্তের আবহাওয়াতেই এরূপ ঘটনাবিন্যাস ঘটেছে এবং বাস্তব জগতেও বসন্ত কাল প্রেমের কাল ব'লেই পালিত বা উদযাপিত হয়, তখন সেই চিরন্তনী সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করার বা প্রথাভঙ্গের কোনও যৌক্তিকতা হয়ত রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেননি। ইতঃপূর্বেই যখন স্বর্ণকুমারী দেবীর *বসন্ত-উৎসব* গীতিনাট্য অভিনীত হয়েছে, তখন সেই ধারাকেও তিনি অনুসরণ করেছেন। রাজা নাটকের "আজি দখিনদুয়ার খোলা" গানটির মধ্যে উদাত্ত স্বরের আহ্বান রয়েছে বিশ্বচরাচরের উদ্দেশ্যে। জীর্ণতার মোচনের জন্যই এই গান। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা দেখা দিয়েছিল শান্তিনিকেতনের পরিবেশে কিন্তু যখন তিনি জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির সান্নিধ্যে রয়েছেন, তখনও তিনি বসন্তের মধ্যে সেই মায়ামুক্তি এবং প্রেমপ্রাপ্তির বিষয়টিই লক্ষ্য করেছেন যা শতাব্দীপ্রাচীন নাটিকা উপরূপকেরই একটি অঙ্গ ।

বসন্তোৎসব ব্যতিরেকে অন্যান্য ঘটনাবিন্যাস বলতে নাট্যাভিনয় (তৃতীয় অঙ্ক, *প্রিয়দর্শিকা*), ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (চতুর্থ অঙ্ক, *রত্নাবলী*) ইত্যাদির কোনও স্থান নেই *মায়ার খেলা*-য় । রাজার প্রথমা স্ত্রীর অন্য কোনও নারীর সঙ্গে স্বামীর গোপন পরকীয়া সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া কীরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে নাটিকাকারদের নিজস্ব স্বাক্ষর রয়ে গেছে। তাই সেই আগন্তুক নারীকে কারারুদ্ধ করা হবে নাকি স্বামীকে তিরস্কার করবে এবং কীভাবে সে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ সমর্থন করবে, তা একেক নাটিকাকার একেক মুন্সিয়ানার সাহায্যে নাট্যায়িত করেছেন। এ বিষয়ে বাঁধাধরা বা প্রথাসিদ্ধ কোনও নিয়মকে আদর্শ ধরা হয়নি। তাই এই খণ্ডচিত্রগুলির উল্লেখে বা অনুল্লেখে কোনও নাট্যের নাটিকাধর্ম ব্যাহত হয়না। *মায়ার খেলা* এমনই একটি নাট্য যেখানে প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের বহুধা বিস্তার নেই। অন্য দুটি গীতিনাট্য *বাল্মীকি-প্রতিভা* এবং *কালমৃগয়া*-য় বিন্যাসে বহু পাত্রপাত্রীর সমাবেশ ঘটেছে। যেমন *বাল্মীকি-প্রতিভা* -র প্রথম দৃশ্যে দস্যুগণের মধ্যে কথোপকথনে হাস্যরসের অভিব্যক্তি রয়েছে যা মূল নাট্যস্রোতকে প্রভাবিত করেনা। আবার, পঞ্চম দৃশ্যে ব্যাধগণের ক্রৌঞ্চপক্ষীর উদ্দেশ্যে শরনিক্ষেপের কথাংশটি নাট্যবস্তুকে গতি দান করলেও চরিত্রদুটির উপস্থিতি যৎসামান্য। *কালমৃগয়া*-য় ক্ষেত্রেও প্রথম দৃশ্যে লীলা এবং ঋষিকুমারের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কের মাধুর্য শ্রুতিনন্দন বা দৃষ্টিনন্দন হলেও তা মূল নাট্যেতিবৃত্তের কোনও স্তম্ভস্বরূপ নয়। আবার, পঞ্চম দৃশ্যে শিকারীগণের শিকারদৃশ্যও নাট্যের গন্তব্যপথকে কিছুক্ষণের জন্য অবরুদ্ধ করে। অথচ *মায়ার খেলা*-য় এমন কোনও অপ্রত্যাশিত বা অপ্রয়োজনীয় কথাংশ নেই যা মূল নাট্যবস্তুর বিপরীত। তাই এখানে যেমন প্রমদার প্রতি শান্তার অমর্ষের চিত্তভাব নেই, তাই প্রমদার প্রতি নিপীড়ন বা দণ্ডেরও কোনও অবকাশ নেই। প্রমদার সঙ্গে অমরের সাক্ষাৎ কাননেই হয়েছে, প্রমদার সঙ্গে তার প্রেমসম্বন্ধের ভঙ্গুর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, এক বাসন্তী যামিনীর শুভ লগ্নে শান্তার সঙ্গে অমরের বিবাহ স্থির হয়েছে, অকস্মাৎ প্রমদার আগমন ঘটেছে, শান্তা ব্যথিত চিত্তে হতাশ হয়েছে এবং প্রমদার বিদায়ে তাদের শুভমিলন সম্পন্ন হয়েছে। নাটিকাগুলিতেও এই সারাংশটিই দর্শিত হত। প্রকৃতির বিহ্বলতায় মুগ্ধ রাজার সঙ্গে ঘটনাচক্রে কোনও এক লাবণ্যময়ী নারীর সাক্ষাৎ, সেই নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ, সেই সংবাদে রাণী বিচলিত, নায়িকার প্রতি আক্রোশ, উভয়ের মিলন বাধাগ্রস্ত এবং শেষে জটিলতা র অবসানে মিলন। তাই নায়কের সঙ্গে নায়িকার

মিলনে বাধাপ্রাপ্তির কারণগুলি কী কী এবং কীভাবে সেই প্রতিকূলতার নিষ্পত্তি হয়েছে, সেই নাট্যিক পরিস্থিতিগুলিকে উপেক্ষা করাই যায় যদি আধুনিকতাকে বরণ ক'রে নেওয়া যায়।

৪.৬ প্রকরণিকা ও সট্টক-এর সাপেক্ষে *মায়ার খেলা* :

এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ এ কারণেই করা আবশ্যক যে 'প্রকারণিকা' এবং 'সট্টক' এই দুই উপরূপকের সঙ্গে 'নাটিকা'র সম্পর্ক রয়েছে। নাটিকার লক্ষণে 'নৃপ' এই শব্দটি প্রমাণিত করে যে এই উপরূপকের নায়ক হবে কোনও রাজা এবং *বৃষভানুজা* ব্যতীত প্রায় প্রতিটি নাটিকাতেই দেখা গেছে নায়ক একজন ক্ষত্রিয় রাজা। অথচ এই *মায়ার খেলা* নাট্যে অমর কোনও সিংহাসনারূঢ় নৃপতি নয় । *নাট্যদর্পণ*-এর মতে নায়ক যদি কোনও ধীরললিত ব্রাহ্মণ, অমাত্য বা বণিক্ চরিত্র হয়; তবে তা নাটিকা-র পরিবর্তে প্রকরণিকা উপরূপক হবে। যদিও সাহিত্যদর্পণকার এই ধারণার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করেছেন। তিনি বলেছেন –

নাটিকৈব প্রকরণী সার্থবাহাদিনাযকা ।
সমানবংশজা নেতুর্ভবেদত্র চ নাযিকা ।।[২০৩]

এখানে 'সার্থবাহ' শবের অর্থ বণিক। 'আদি' পদের দ্বারা ব্রাহ্মণ, অমাত্যদেরও বোঝানো হয়। তবে নায়িকার যে বৈশিষ্ট্য এই উপরূপকে প্রয়োজন তা হ'ল নায়কের সমান বংশমর্যাদাসম্পন্নতা। তাই বৈশ্য বর্ণের নায়কের সঙ্গে বৈশ্য বর্ণের নায়িকারই মিলন ঘটবে। প্রকরণিকা-র কোনও আদর্শ উদাহরণ খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতকেও বিশ্বনাথ কবিরাজের সময়ে বর্তমান ছিলনা। তাই রাজোচিত অনুষঙ্গ ওই উপরূপকে স্থান পাওয়ার কথা নয়। *মৃচ্ছকটিক* একটি আদর্শ প্রকরণ, তাই বণিক চারুদত্তের সঙ্গে নটী বসন্তসেনার মিলনের পাশাপাশি চারুদত্তের প্রথমা স্ত্রী ধূতা দেবীর অবস্থানটিও লক্ষণীয় । তাই *মৃচ্ছকটিক*-এর গ্রন্থায়নের অনুরূপ সাদৃশ্য হয়ত প্রকরণিকা উপরূপকে বর্তমান থাকত *নাট্যদর্পণ*-এর যুগে। আবার সট্টক উপরূপকটি নাটিকারধর্মী কিন্তু ভাষাগত তারতম্যের কারণেই এই পৃথক উপরূপকরূপে স্বীকার। তবে এখানে প্রকরণিকা-র ম'ত নায়ক-নায়িকা জাতি, বর্ণ পরিবর্তিত হয়না নাটিকা-র প্রেক্ষিতে। শুধু কয়েকটি বিষয় নাটিকা অপেক্ষা স্বতন্ত্র –

সট্টকং প্রাকৃতাশেষপাঠ্যং স্যাদপ্রবেশকম্ ।
ন চ বিষ্কম্ভকো'প্যত্র প্রচুরশ্চাদ্ভুতো রসঃ ।।[২০৪]

সুতরাং নাটিকাসম এই উপরূপকে প্রবেশক, বিষ্কম্ভকের কোনও স্থান নেই এবং অদ্ভুত রসের ব্যঞ্জনা থাকবে প্রভূত পরিমাণে । সট্টক শ্রেণীর বেশ কয়েকটি উপরূপক বর্তমানে হস্তগত হয় । যথা রাজশেখরের *কর্পূরমঞ্জরী* , বিশ্বেশ্বরের *শৃঙ্গারমঞ্জরী* ইত্যাদি। *কর্পূরমঞ্জরী* প্রাকৃত ভাষায় রচিত হলেও নাটিকাতুল্য প্রথমাঙ্কে বসন্তোৎসবের বিবরণ, রাজা চন্দ্রপালের সঙ্গে নায়িকা কর্পূরমঞ্জরীর মিলন, মহারাণী বিচক্ষণার আক্রোশ ইত্যাদি ঘটনা এখানে স্থান পেয়েছে । তাই সংস্কৃতভিন্ন নাটিকাতুল্য কোনও উপরূপক-ই কি সট্টক ব'লে পরিগণিত হবে ? যেহেতু *মায়ার খেলা* আধুনিক বাংলা ভাষার একটি গীতিনাট্য, তাই ভাষাগত প্রভেদের জন্য এটির সট্টক শ্রেণীতে স্থান

পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সট্টক উপরূপকের কথা *শৃঙ্গারপ্রকাশ* গ্রন্থে পেয়েছি । তার সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দী যদি ধরা হয়, তবে সেই সময় বর্তমান ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির গর্ভাবস্থা। বাংলা ভাষার আদিযুগের নিদর্শন মিললেও সেই ভাষায় নাট্যগঠনের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়না। প্রাকৃত ভাষার বহুল প্রচলনের ফলেই হয়ত সংস্কৃতেতর এমন একটি ভাষার নাট্যকে বিশেষরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনই অমর ক্ষত্রিয় নৃপতি না হলেও সে বৈশ্য বণিক কিনা এরূপ কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই । তাই প্রকরণিকা পর্যায়ের উপরূপকরূপে স্বীকৃতি দিতে কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয় । আবার সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় রচিত সট্টক উপরূপক মৌলিকতাবিহীন। চতুরঙ্কা নাটিকা যদি নাটক ও প্রকরণের মিশ্ররূপ হয়, তবে সেই নাটিকা-র বৈশিষ্ট্য প্রাকৃত ভাষায় ধরা দেওয়ায় তা হ'ল সট্টক। আবার এভাবেও ভাবা যেতে পারে যে নাটক এবং প্রকরণের মিলিত রূপ যদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়, তবে তা হবে নাটিকা এবং যদি প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয় তবে তা সট্টক। তবে এটিও স্মর্তব্য যে ভাষাগত পার্থক্যের জন্যই এবং 'অঙ্ক'-এর পরিবর্তে 'জবনিকা' শব্দের ব্যবহারের জন্যই যে একটি পৃথক উপরূপকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল সট্টক উপরূপককে। তবে এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভ প্রথম থেকেই প্রস্তাব রেখেছে যে রবীন্দ্রনাট্যে উপরূপকধর্মের অনুসন্ধান। তাই যেহেতু রবীন্দ্রনাট্য আধুনিক বাংলা ভাষাতেই রচিত, তাই ভাষাগত বাধ্যবাধকতাকে ব্রাত্য ক'রেই অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে আপন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে । অতএব বাংলা নাট্যসাহিত্য এই ধ্রুবককে স্থির রেখে বিচার করতে হলে *মায়ার খেলা*-র মধ্যে নাটিকাধর্মেরই অনুসন্ধান করণীয় । তবে এটিও সত্য নাটিকা এবং সট্টক এই পারিভাষিক শব্দদ্বয়ের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় নাটিকা সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী ।

প্রাচীন নাটিকা এবং *মায়ার খেলা* গীতিনাট্যের পারস্পরিক তুলনামূলক আলোচনায় যে সিদ্ধান্তে আমরা পৌছাঁতে পেরেছি, তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যাক। প্রথমটি উভয়ের সাদৃশ্য এবং দ্বিতীয়টি উভয়ের বৈসাদৃশ্য। এগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

ক) সাদৃশ্য : নাটিকা এবং *মায়ার খেলা* -র মধ্যে সাদৃশ্যগুলি হ'ল –

- প্রাচীন নাটিকা নাট্যধারা যেমন ত্রিকোণপ্রেমের নাট্যালেখ্য ছিল, তেমনই *মায়ার খেলা*- ও অমর-শান্তা-প্রমদার ত্রিবিন্দুর সংযোগের আখ্যায়িত শৃঙ্গার রসপ্রধান নাট্য।
- নাটিকা-র ইতিবৃত্তের উৎস থাকত উৎপাদ্য। কয়েকটি ব্যতিক্রমী নাটিকা যথা শর্মিষ্ঠা-বিজয়, বৃষভানুজা প্রখ্যাত বৃত্তাশ্রয়ী হলেও নাট্যশাস্ত্রগত বিধান অনুযায়ী এটি কল্পিত বৃত্তমূলক হবে এবং *মায়ার খেলা*-ও সেরূপ ধর্মপালন করেছে।
- নাটিকা-র নায়ক হওয়া উচিত ধীরললিত। অমরের মধ্যে সেই লক্ষণ পরিস্ফুট। এমনকি পরিস্থিতিসাপেক্ষে শান্তা 'মানিনী' এবং প্রমদা 'নবানুরাগা কন্যা' নায়িকা। তাই নায়ক-নায়িকার মৌল স্বভাব উভয় ক্ষেত্রেই সমান।

- আদ্যোপান্ত শৃঙ্গার রস এবং কৈশিকী বৃত্তির সূত্রে গ্রথিত প্রাচীন নাটিকা উপরূপকগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের *মায়ার খেলা* গীতিনাট্য।

- নাটিকাসদৃশ বসন্তোৎসববর্ণন, কাননে নর্মক্রীড়া, পুষ্পালংকারে সজ্জিত নারী, সখীসহ কন্যা নায়িকার বিলাসবিভ্রম ইত্যাদি বিষয় *মায়ার খেলা*-য় লক্ষ্য করা যায়।

খ) বৈসাদৃশ্য : নাটিকা এবং *মায়ার খেলা*-র মধ্যে প্রাপ্ত বৈসাদৃশ্যগুলি হ'ল –

- নাটিকা রূপকবিশেষ নাটক এবং প্রকরণ-এর থেকে পৃথক হয়েছিল অঙ্ক-এর কল্যাণে। চারটি অঙ্ক নাটক বা প্রকরণ-এ থাকেনা। তাই এই বিশিষ্টতা নাটিকা-র হৃৎস্পন্দন। অথচ *মায়ার খেলা*-য় অঙ্ক-এর উল্লেখ নেই এবং দৃশ্যচতুষ্টয়ের মধ্যে কাহিনিবদ্ধ করার কোনও প্রয়াস লক্ষ্য যায়না নাট্যকারের।

- সট্টক উপরূপককে স্বীকার করার মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে নাটিকা-র ভাষা হতে হবে সংস্কৃত। অথচ *মায়ার খেলা* একটি বাংলা ভাষায় রচিত গীতিনাট্য। তাই এখানে একটি বাধা রয়েছে *মায়ার খেলা*-কে নাটিকা উপরূপকরূপে স্বাগত অভিবাদন জানাতে।

- নাটিকায় পদ্যাংশের পরিমাণ বেশি থাকলেও এবং কিছু গানের উল্লেখ থাকলেও তা সম্পূর্ণ গীতিনাট্য নয়। অন্যদিকে *মায়ার খেলা* নাট্যসূত্রে সুশোভিত গীতিনাট্য।

- নাটিকা-য় বিবাহিত নৃপতির সঙ্গে দ্বিতীয় নায়িকার মিলন সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ এই উপরূপক বহুবিবাহকে সমর্থন জানায়। অন্যদিকে প্রমদার সঙ্গে অমরের মিলন সাধিত হয়নি এমনকি প্রকৃত নায়িকার মর্যাদা পেয়েছে শান্তা।

অর্থাৎ বস্তু-নেতা-রসের বিচারে এবং বিভিন্ন নাটিকাগ্রন্থের ধরণ অনুসারে *মায়ার খেলা* অনেকখানিই প্রাচীন নাটিকোপরূপকের বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে কিন্তু আধুনিক যুগকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই একটি প্রাদেশিক ভাষায় রচিত হয়েছে নাটিকাধর্মাশ্রিত বা নাটিকাবলম্বিত একটি গীতিনাট্য যা রসে এবং দর্শনে সম্পৃক্ত।

উল্লেখপঞ্জি

১. *জীবনস্মৃতি*, বাল্মীকিপ্রতিভা, পৃষ্ঠা - ১১৬

২. *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক : দ্বিতীয় খণ্ড*, 'জীবনস্মৃতি', পৃষ্ঠা - ৩২৩

৩. দ্রষ্টব্য : তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ১৪০

৪. দ্রষ্টব্য : তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ১৩৯

৫. *জীবনস্মৃতি*, বাল্মীকিপ্রতিভা, পৃষ্ঠা - ১১৭

৬. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা*, পৃষ্ঠা - ১৪৩-৬২

৭. *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক : প্রথম খণ্ড*, 'পারিবারিক স্মৃতি' : 'মায়ার খেলা', পৃষ্ঠা - ২৬৮

৮. *রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া,* মায়ার খেলা : ১৮৮৮ (১২৯৫), পৃষ্ঠা - ৪২

৯. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* পৃষ্ঠা - ১৩৯

১০. *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য -প্রবেশক : প্রথম খণ্ড,* 'পারিবারিক স্মৃতি' : 'মায়ার খেলা', পৃষ্ঠা - ২৬৯

১১. *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি,* ছেলেবেলা, নাটক-রচনা ও অভিনয়, পৃষ্ঠা - ৭২

১২. *জীবনের ঝরাপাতা,* পৃষ্ঠা - ২৯

১৩. *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল,* পৃষ্ঠা - ৪৬

১৪. *জীবনের ঝরাপাতা,* পৃষ্ঠা - ৩০

১৫. *জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী : চতুর্থ ভাগ, পুনর্ব্বসন্ত,* আখ্যাপত্র, পৃষ্ঠা - ১৪৩

১৬. *জীবনস্মৃতি,* কড়ি ও কোমল, পৃষ্ঠা - ১৬০

১৭. *কড়ি ও কোমল,* চুম্বন, পৃষ্ঠা - ১৯৮

১৮. *তদেব,* পবিত্র প্রেম, পৃষ্ঠা - ২১৭

১৯. *মানসী,* বধূ, পৃষ্ঠা - ১০৮-১১

২০. *তদেব,* অপেক্ষা, পৃষ্ঠা - ১১৯-২৫

২১. *তদেব,* নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ, পৃষ্ঠা - ১৯৬-৯৯

২২. *তদেব,* বধূ, পৃষ্ঠা - ১০৮

২৩. *তদেব,* অপেক্ষা, পৃষ্ঠা - ১১৯-২০

২৪. *তদেব,* নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ, পৃষ্ঠা - ১৯৮

২৫. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক - হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৬৯, পৃষ্ঠা - ৪১২

২৬. *তদেব,* ৬/২৬৯-৭০, পৃষ্ঠা - ৪১২

২৭. *তদেব,* ৩/৪০, পৃষ্ঠা - ৯২

২৮. *রবীন্দ্র -নাট্য -সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫২

২৯. *তদেব, মায়ার খেলা,* ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৭

৩০. *তদেব, মায়ার খেলা,* সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৬১

৩১. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৬৯, পৃষ্ঠা - ৪১২

৩২. *গল্পগুচ্ছ : অখণ্ড সংস্করণ,* সূচিপত্র, পৃষ্ঠা - ১৬

৩৩. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/৬৯, পৃষ্ঠা - ১০৬

৩৪. *তদেব,* ৩/৭১, পৃষ্ঠা - ১০৭

৩৫. *তদেব,* ৩/৮১, পৃষ্ঠা - ১১৮

৩৬. *তদেব,* ৩/৭৪, পৃষ্ঠা - ১১১

৩৭. তত্রৈব

৩৮. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা -:১৪৪

৩৯. *তদেব, মায়ার খেলা,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৫

৪০. *তদেব, মায়ার খেলা,* ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৭

৪১. *তদেব, মায়ার খেলা,* ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৮

৪২. *তদেব, মায়ার খেলা,* সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৬০

৪৩. *তদেব, মায়ার খেলা,* সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৬১

৪৪. তত্রৈব

৪৫. *তদেব, মায়ার খেলা,* সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৬২

৪৬. *তদেব, মায়ার খেলা,* চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫০

৪৭. *তদেব, মায়ার খেলা,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৮

৪৮. *তদেব, মায়ার খেলা,* ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৭

৪৯. *তদেব, মায়ার খেলা,* চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫০

৫০. *তদেব, মায়ার খেলা,* ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৮

৫১. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা - ১১১

৫২. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৬২

৫৩. *তদেব, মায়ার খেলা,* ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৭

৫৪. *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,* পৃষ্ঠা - ৯৮৭

৫৫. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/, পৃষ্ঠা - ১১৯

৫৬. তত্রৈব

৫৭. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৬

৫৮. *তদেব, মায়ার খেলা,* চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫১

৫৯. *তদেব, মায়ার খেলা,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৬

৬০. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/১৮৩, পৃষ্ঠা - ১৭৫

৬১. *তদেব,* ৩/১৮৪, পৃষ্ঠা - ১৭৭

৬২. *তদেব,* ৩/১৯৭, পৃষ্ঠা - ১৯২

৬৩. *তদেব,* ৩/১৮৩, পৃষ্ঠা - ১৭৬

৬৪. *তত্রৈব,* ৩/১৮৩

৬৫. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৬

৬৬. *তদেব, মায়ার খেলা,* সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৬০

৬৭. *তদেব, মায়ার খেলা,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৬

৬৮. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/২০২, পৃষ্ঠা - ১৯৭

৬৯. *তদেব,* ৩/২০২, পৃষ্ঠা - ১৯৭

৭০. *তদেব,* ৩/১৭৯, পৃষ্ঠা - ১৭৩

৭১. *তদেব,* ৩/১৮৩, পৃষ্ঠা - ১৭৬

৭২. *তদেব,* ৩/১৪২, পৃষ্ঠা - ১৫৫

৭৩. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৪

৭৪. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/১৪৮, পৃষ্ঠা - ১৫৮

৭৫. *তদেব,* ৩/১৫০, পৃষ্ঠা - ১৫৯

৭৬. *তদেব,* ৩/১৭৬, পৃষ্ঠা - ১৬৪

৭৭. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৮

৭৮. *তদেব, মায়ার খেলা,* ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৭

৭৯. *তদেব, মায়ার খেলা,* ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৮

৮০. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/১৬৩, পৃষ্ঠা - ১৬৬

৮১. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৫-৫৬

৮২. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/১৬৮, পৃষ্ঠা - ১৬৮

৮৩. *তদেব,* ৩/১৭০, পৃষ্ঠা - ১৬৮

৮৪. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৮

৮৫. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/১৭৩, পৃষ্ঠা - ১৭০

৮৬. *তদেব,* ৩/১৭৪, পৃষ্ঠা - ১৭১

৮৭. *তদেব,* ৬/৭৫, পৃষ্ঠা - ৩১৯

৮৮. তত্রৈব

৮৯. *তদেব,* ৬/৭৪, পৃষ্ঠা - ৩১৯

৯০. *তদেব,* ৬/৭০, পৃষ্ঠা - ৩১৭

৯১. *তদেব,* ৬/৭৫, পৃষ্ঠা - ৩১৯

৯২. *Daśarūpam with Dhanika's Commentary,* সম্পাদক – F E Hall, ১/২২, পৃষ্ঠা - ১১

৯৩. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৬৪, পৃষ্ঠা - ৩১৫

৯৪. *তদেব,* ৬/৭৬, পৃষ্ঠা - ৩২০

৯৫. *তদেব,* ৬/৬৫, পৃষ্ঠা - ৩১৫

৯৬. *তদেব,* ৬/৭১, পৃষ্ঠা - ৩১৭

৯৭. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৫

৯৮. *তদেব, মায়ার খেলা,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৪

৯৯. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৭৭, পৃষ্ঠা - ৩২০

১০০. *তদেব,* ৬/৬৬, পৃষ্ঠা - ৩১৫

১০১. *তদেব,* ৬/৭২, পৃষ্ঠা - ৩১৮

১০২. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৮

১০৩. *তদেব, মায়ার খেলা,* চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১০৩

১০৪. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৭৮, পৃষ্ঠা - ৩২০

১০৫. *তদেব,* ৬/৬৭, পৃষ্ঠা - ৩১৬

১০৬. *তদেব,* ৬/৬৮, পৃষ্ঠা - ৩১৭

১০৭. *তদেব,* ৬/৬৭, পৃষ্ঠা - ৩১৭

১০৮. *তদেব,* ৬/৭২, পৃষ্ঠা - ৩১৮

১০৯. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৩

১১০. *তদেব, মায়ার খেলা,* দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৫

১১১. *তদেব, মায়ার খেলা,* ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৭

১১২. *তদেব, মায়ার খেলা,* ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৯

১১৩. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৭৯, পৃষ্ঠা - ৩২১

১১৪. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৯

১১৫. *তদেব, মায়ার খেলা,* সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৬১

১১৬. তত্রৈব

১১৭. *তদেব, মায়ার খেলা,* সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৬২

১১৮. তত্রৈব

১১৯. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৮০, পৃষ্ঠা - ৩২১

১২০. *তদেব,* ৬/৬৯, পৃষ্ঠা - ৩১৭

১২১. *তদেব,* ৬/৭৩, পৃষ্ঠা - ৩১৮

১২২. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৬২

১২৩. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/১২৪, পৃষ্ঠা - ৩৫৪

১২৪. *তদেব,* ৬/১২৫, পৃষ্ঠা - ৩৫৪

১২৫. *তদেব,* ৬/১২৬, পৃষ্ঠা - ৩৫৪

১২৬. *তদেব,* ৬/১২৭, পৃষ্ঠা - ৩৫৫

১২৭. *তদেব,* ৬/১২৭, পৃষ্ঠা - ৩৫৬

১২৮. *তদেব,* ৬/১২৮, পৃষ্ঠা - ৩৫৭

১২৯. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৬

১৩০. *তদেব, মায়ার খেলা,* সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৬০

১৩১. *তদেব, মায়ার খেলা,* ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৭

১৩২. *তদেব, মায়ার খেলা,* সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৬০

১৩৩. *তদেব, মায়ার খেলা,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৫

১৩৪. *তদেব, মায়ার খেলা,* চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৯

১৩৫. তত্রৈব

১৩৬. *তদেব, মায়ার খেলা,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৫

১৩৭. *তদেব, মায়ার খেলা,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৭

১৩৮. *তদেব,* , সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৯

১৩৯. তত্রৈব

১৪০. *তদেব, মায়ার খেলা,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৩

১৪১. *তদেব, মায়ার খেলা,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৭

১৪২.*সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৫১, পৃষ্ঠা - ৩১১

১৪৩. *তদেব,* ৬/৫৮, পৃষ্ঠা - ৩১২

১৪৪. *তদেব,* ৬/৫৯, পৃষ্ঠা - ৩১৩

১৪৫. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৩

১৪৬. *তদেব, মায়ার খেলা,* প্রথম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৩

১৪৭. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/১৪৩, পৃষ্ঠা - ৩৬২

১৪৮. *তদেব,* ৬/১৪২, পৃষ্ঠা - ৩৬২

১৪৯. *কাব্যপ্রকাশঃ : অলঙ্কারসন্দর্ভঃ মম্মটভট্টবিরচিতঃ,* সম্পাদক – ঝলকীকর, অষ্টম উল্লাস, পৃষ্ঠা - ৪৮৪

১৫০. *তদেব,* ৮/৩, পৃষ্ঠা – ৪৭৪

১৫১. *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,* সম্পাদক – জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, পৃষ্ঠা - ১০০৭

১৫২. *The Ratnāvalī of Śrī Harṣa-deva,* সম্পাদক - M. R. Kale, ১/১২, পৃষ্ঠা - ১৩

১৫৩. *তদেব,* ১/২৫, পৃষ্ঠা - ২৮

১৫৪. *সাহিত্যদর্পণকার আচার্যবিশ্বনাথপ্রণীতা চন্দ্রকলানাটিকা,* সম্পাদক – প্রভাতশাস্ত্রী সাহিত্যাচার্য, ১/১৭, পৃষ্ঠা - ৬৯

১৫৫. *মহাকবিশ্রীবিহ্লণবিরচিতা কর্ণসুন্দরীনাটিকা,* সম্পাদক – অবিনাশচন্দ্র, ২/৬, পৃষ্ঠা - ৮৪

১৫৬. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৪

১৫৭. *তদেব, মায়ার খেলা,* চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫১

১৫৮. *তদেব, মায়ার খেলা,* সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৯

১৫৯. তত্রৈব

১৬০. *সাহিত্যদর্পণকার আচার্যবিশ্বনাথপ্রণীতা চন্দ্রকলানাটিকা,* সম্পাদক – প্রভাতশাস্ত্রী সাহিত্যাচার্য, তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১৪৫

১৬১. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৬১

১৬২. তত্রৈব

১৬৩. *শ্রীমথুরাদাসবিরচিতা বৃষভানুজা,* সম্পাদক – পাণ্ডুরঙ্গ জাবজী, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১৫-১৬

১৬৪. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৬

১৬৫. *তদেব, মায়ার খেলা,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৫

১৬৬. তত্রৈব

১৬৭. *The Ratnāvalī of Śrī Harṣa-deva,* সম্পাদক - M. R. Kale, ২/৭, পৃষ্ঠা - ৪২

১৬৮. *তদেব,* ১/১০-২৫, পৃষ্ঠা - ১২-২৮

১৬৯. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৫২-৭৩

১৭০. *শ্রীমথুরাদাসবিরচিতা বৃষভানুজা,* সম্পাদক – পাণ্ডুরঙ্গ জাবজী, প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১০-১৩

১৭১. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৯

১৭২. *The Ratnāvalī of Śrī Harṣa-deva,* সম্পাদক - M. R. Kale, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৫৪

১৭৩. *The Priyadarśikā of Śrī Harshadeva,* সম্পাদক – বিষ্ণু দাজী গদ্রে, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১৪

১৭৪. তদেব, প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১

১৭৫. *মহাকবিশ্রীবিহ্লণবিরচিতা কর্ণসুন্দরীনাটিকা,* সম্পাদক – অবিনাশচন্দ্র, পৃষ্ঠা - ৫২-৭৩

১৭৬. *মহজবিশ্রীরাজশেখরবিরচিতা বিদ্ধশালভঞ্জিকা : 'প্রকাশ' হিন্দি ব্যাখ্যোপেতা,* সম্পাদক – রমাকান্ত ত্রিপাঠী, পৃষ্ঠা - ১৫-১৮

১৭৭. *শ্রীমথুরাদাসবিরচিতা বৃষভানুজা,* সম্পাদক – পাণ্ডুরঙ্গ জাবজী, প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১৫

১৭৮. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা,* প্রথম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৩

১৭৯. *তদেব, মায়ার খেলা,* সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৯

১৮০. *তদেব, চিত্রাঙ্গদা,* প্রথম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৩২৯-৩৪

১৮১. *তদেব, রাজা,* প্রথম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৭৫০

১৮২. *তদেব, ফাল্গুনী,* প্রথম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৮৮৯

১৮৩. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, বসন্ত,* পৃষ্ঠা - ৫৩

১৮৪. *তদেব, শাপমোচন,* চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫১

১৮৫. *The Ratnāvalī of Śrī Harṣa-deva,* সম্পাদক - M. R. Kale, প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১১

১৮৬. *তদেব,* ১/১৬, পৃষ্ঠা - ১৫

১৮৭. *তদেব,* ১/১৭, পৃষ্ঠা - ১৯

১৮৮. *তদেব*, প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১৮

১৮৯. *মহাকবিশ্রীবিহ্লণবিরচিতা কর্ণসুন্দরীনাটিকা*, সম্পাদক – অবিনাশচন্দ্র, ১/৪২, পৃষ্ঠা - ৬২

১৯০. *তদেব*, ১/৪৩, পৃষ্ঠা - ৬২

১৯১. *Pārijātamañjarī or Vijayaśrī : A Nāṭikā composed about A.D. 1213 by Madana*, সম্পাদক – E haltzsch, ২/১, পৃষ্ঠা - ১০-১১

১৯২. *মহজবিশ্রীরাজশেখরবিরচিতা বিদ্ধশালভঞ্জিকা : 'প্রকাশ' হিন্দি ব্যাখ্যোপেতা*, সম্পাদক – রমাকান্ত ত্রিপাঠী, ১/২৩, পৃষ্ঠা - ১৫

১৯৩. *আচার্য তথা নাটিককার বিশ্বনাথদেববিরচিত সাহিত্যসুধা এবং মৃগাঙ্কলেখা : ভাগ ২*, সম্পাদক – রামপ্রতাপ, মৃগাঙ্কলেখা, ১/১৯, পৃষ্ঠা - ৮১২

১৯৪. *তদেব*, মৃগাঙ্কলেখা, ১/২৫, পৃষ্ঠা - ৮১৪

১৯৫. *বিরাজ-সরোজিনী*, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৪৭

১৯৬. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/১৬, পৃষ্ঠা - ২৯১

১৯৭. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, মায়ার খেলা*, প্রথম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৪৩

১৯৮. তত্রৈব

১৯৯. *তদেব, মায়ার খেলা*, সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৫৯

২০০. তত্রৈব

২০১. *তদেব, মায়ার খেলা*, সপ্তম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ১৬০

২০২. তত্রৈব

২০৩. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৩০৬, পৃষ্ঠা - ৪১৯

২০৪. *তদেব*, ৬/২৭৬, পৃষ্ঠা - ৪১৩

পঞ্চম অধ্যায়

প্রেক্ষণ ও *নটীর পূজা* : নব মূল্যায়ন

মায়ার খেলা গীতিনাট্যের বিচারের পর এবার যে নাট্যটির সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত উপরূপকের তুলনামূলক আলোচনা হতে চলেছে, তা হ'ল *নটীর পূজা* । এই নাট্যটিকেও পূর্ববৎ অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ সাযুজ্যে বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে। এই নাট্যটির সঙ্গে যে উপরূপকের সাদৃশ্যের অনুমান করা যেতে পারে, তা হ'ল প্রেঙ্খণ। সংস্কৃত উপরূপক : সেকাল ও একাল অধ্যায়ে এই উপরূপকের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি নিদর্শনসাহচর্যে প্রেক্ষণক এবং প্রেঙ্খণ-এর পারস্পরিক সম্বন্ধও তুলে ধরা হয়েছে। অতএব এই রবীন্দ্রনাট্যটি প্রেক্ষণক-এর সঙ্গে তুলনা না ক'রে কেন প্রেঙ্খণ-এর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, তা প্রকাশ করা আবশ্যক। এর জন্য *নটীর পূজা*-র উৎস, ইতিবৃত্ত এবং গ্রন্থীকৃত হওয়ার তথ্যসকল উল্লেখনীয়।

৫.১ *নটীর পূজা* : উৎস, বিবর্তন ও গ্রন্থপ্রকাশ :

বৌদ্ধ গ্রন্থ *অবদানশতক*-এর ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত 'শ্রীমতী'-র আখ্যান অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা রচনা করেন। তার নাম 'পূজারিণী'। এই কবিতাটি কথা কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়। এরপর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর উৎসাহে এবং পৌরোহিত্যে এটির নৃত্যায়িত নাট্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শান্তিদেব ঘোষের *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য* গ্রন্থ থেকে যতটুকু জানা যায়, তা হ'ল –

প্রতিমা দেবী স্থির করেছিলেন, ২৫শে বৈশাখের (১৩৩৩) দিন গুরুদেবের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে সন্ধ্যায় ছাত্রীদের দিয়ে কথা ও কাহিনী কাব্যগ্রন্থের 'পূজারিণী' কবিতাটির গল্প অবলম্বনে, নবকুমারের সহযোগিতায় নৃত্য সহযোগে একটি মূকাভিনয় করাবেন। এতে থাকবে, আবৃত্তি ও গানের সঙ্গে মূকাভিনয় ও মণিপুরী নৃত্য। গুরুদেব সে কথা শুনে , কবিতাটিকে পূর্ণাঙ্গ নাটকে রূপান্তরিত করার কাজে হাত দিলেন চৈত্র মাসের শেষ দিকে, নাম দিলেন 'নটীর পূজা'।[১]

অর্থাৎ বিশ্বভারতীর ছাত্রীরা যখন নবকুমার সিংয়ের প্রশিক্ষণে মণিপুরী নৃত্যকলায় পারঙ্গম হয়ে উঠেছে, সেই সময়েই এই নাট্যের রচনা। কুশীলবদের পক্ষে যাতে অনভিনেয়ত্বের সম্ভাবনা উপস্থিত না হয়, তার জন্যই কিছু গানের রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ এবং স্ত্রীচরিত্রের দ্বারাই এই দৃশ্যকাব্যের সৃজন করেন। নাট্যসংগীত-গবেষক দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় *নটীর পূজা*-র যাবতীয় তথ্যবিষয়ক একটি গ্রন্থরচনা করেছেন – *নটীর পূজা : রবিপরিক্রমা*। এই গ্রন্থপাঠহেতু অবগত হওয়া যায় যে এই সময়েই অর্থাৎ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ) *নটীর পূজা* নাট্যের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৩৩৩ বঙ্গাব্দেরই (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে) ১৪ই, ১৫ই ও ১৭ই মাঘ জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে অভিনয়ের সময় এই দৃশ্যকাব্যটির কিছু অংশ অভিনীত হয় এবং সেই পরিবর্ধিত সংস্করণেই মঞ্চায়িত হয়। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে *নটীর পূজা*-র পুনরভিনয় সম্পন্ন হয় জোড়াসাঁকোতেই। সেই সময়েই *নটীর পূজা*-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যা ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকোয় অভিনীত নাট্য অপেক্ষা পরিবর্ধিত এবং

বিশেষতঃ গানের দিক থেকে পরিবর্তিত-ও বলা যায়[২]। বর্তমানে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড*-এ *নটীর পূজা*-র যে পাঠটি প্রাপ্য, সেটি *নটীর পূজা*-র দ্বিতীয় সংস্করণ এবং প্রকৃতপক্ষে তা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে) উপস্থাপিত নাট্যেরই গ্রন্থায়ন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে অভিনয়কালে যে গানগুলি ছিল[৩], তা হ'ল –

১) পূর্বগগনভাগে (সূচনা)

২) ওরে কি শুনছিস্ ঘুমের ঘোরে, (প্রথম অঙ্ক)

৩) নাই নাই ভয় (দ্বিতীয় অঙ্ক)

৪) বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে, (ঐ)

৫) এক হাতে ওর কৃপাণ আছে, (তৃতীয় অঙ্ক)

৬) ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু (ঐ)

৭) হে মহা জীবন, মে মহা মরণ (ঐ)

৮) ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময় (চতুর্থ অঙ্ক)

৯) আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, (ঐ)

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এই গানগুলির বেশ কয়েকটি গানই বর্জিত হয় এবং বর্তমানে প্রাপ্ত সংস্করণে মোট ১২টি গান পাওয়া যায়। *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয়* নৃত্য গ্রন্থে শান্তিদেব ঘোষ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে অভিনীত *নটীর পূজা*-য় ব্যবহৃত মোট ১১টি গানের উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে "সকলকলুষতামসহর" গানটি প্রচার-পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়নি একথাও তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন[৪]। শুধুমাত্র মঞ্চায়নের সময়েই এই গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল। এই গানগুলি বর্তমান সংস্করণে প্রাপ্ত হলেও দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী" গানটির উল্লেখ করেননি। তবে দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লিখিত গ্রন্থে সেই গানের উল্লেখ করেছেন[৫]। এই দুটি গান-ই অঙ্কের শেষে প্রযুক্ত হওয়ায় মূল নাট্যগ্রন্থ কোনওরূপ ব্যাহত বা আহত হয়না।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী-তে *নটীর পূজা*-র নাট্যাভিনয়ে কোনও পুরুষ চরিত্র না থাকলেও ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকোয় অভিনয়ের সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'উপালি' চরিত্রটিকে সংযুক্ত করেন নাট্যসূচনা অংশে। দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থেই ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২১শে মাঘ দিনাঙ্কে প্রকাশিত নাচঘর পত্রিকার নলিনীমোহন রায়চৌধুরীর 'নাট্য-জগৎ' প্রবন্ধটির নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদটিও পঙক্তিবদ্ধ করেছেন। সেখানে দেখা যায় –

সমকালীন সমাজ-স্বজনের দাবিতে জোড়াসাঁকোর প্রথম অভিনয়ে যুক্ত হল একমাত্র 'পুরুষ' চরিত্র উপালি। রূপদানে একমেবাদ্বিতীয়ম্ রবীন্দ্রনাথ।[৬]

তদানীন্তন সময়ে শিক্ষিত ভদ্রপরিবারের কোনও নারীর মঞ্চে নৃত্যপ্রদর্শন একটি নিন্দার্হ বিষয় ছিল। তাই বিশ্বভারতীর ছাত্রীদের নৃত্যাভিনয় সম্পর্কে তথাকথিত বিদ্বৎপরিমণ্ডলে তথা বাঙালি জনসমাজের পক্ষে অনুভবগ্রাহ্য

নাট্যে যদি স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনয় করেন, তবে সেই কুৎসা এবং বিরূপাত্মক অভিমতের সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে যায়। বরং তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন করার উৎকণ্ঠায় জনসমাগম ঘটবে। তাই নটীর পূজা-য় 'উপালি' অবতারণা করা হয় বিচক্ষণতা-সহকারে। অর্থাৎ এই দৃশ্যকাব্যে উল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণ হ'ল –

১) শ্রীমতী (নটী)

২) লোকেশ্বরী (রাজা বিম্বিসারের পত্নী তথা চিত্রের মাতা)

৩) মল্লিকা (লোকেশ্বরীর সহচরী)

৪) উৎপলপর্ণা (বৌদ্ধ ভিক্ষুণী)

৫) মালতী (শ্রীমতীর সহচরী)

৬) অজিতা, ভদ্রা, বাসবী, নন্দা, রত্নাবলী (রাজকুমারীগণ)

৭) রাজকিংকরীগণ

৮) রক্ষিণীগণ

এবং

৯) উপালি (বৌদ্ধ ভিক্ষু)

উক্ত চরিত্রমালায় সংবলিত *নটীর পূজা*-র দ্বিতীয় সংস্করণটিকেই আদর্শ এবং চূড়ান্তরূপে স্বীকার ক'রেই এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভে ব্রতী হওয়া।

৫.২ *নটীর পূজা* : বস্তু নির্দেশ :

এ তো গেল উৎসের কথা। এরপর আসা যাক এই দৃশ্যকাব্যের ইতিবৃত্তের প্রসঙ্গে। **১৯২৭** খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে অভিনয়কালে একটি *নটীর পূজা*-র একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গবেষণাধর্মী গ্রন্থটিতেই সেটি মুদ্রিত হয়েছে। সেই পুস্তিকায় রবীন্দ্রনাথ একটি নাট্যভূমিকা রচনা করেছিলেন। সেটির উল্লেখ করা হল –

অজাতশত্রু পিতৃসিংহাসনে লোভ প্রকাশ করিতেছেন জানিয়া মহারাজ বিম্বিসার স্বেচ্ছায় রাজ্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া নগরী হইতে দূরে বাস করিতেছেন।

একদা রাজ্যোদ্যানে ভগবান বুদ্ধ অশোকতরুচ্ছায়ায় আসন গ্রহণ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন সেইখানে বুদ্ধভক্ত বিম্বিসার চৈত্য স্থাপন করিয়া রাজকন্যাদিগকে বেদীমূলে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অর্ঘ্য আহরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন।

রাজমহিষী লোকেশ্বরী তাঁহার স্বামীর রাজ্যত্যাগে ও তাঁহার পুত্র চিত্রের সন্ন্যাসগ্রহণে ক্ষুব্ধ হইয়া বুদ্ধ অনুশাসিত ধর্ম্মের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন।[৭]

নটীর পূজা-র নটীকেন্দ্রিক ইতিবৃত্তটিকে যেমন প্রখ্যাতবৃত্তাশ্রয়ী বলা যায়, তেমনই কাল্পনিক-ও বলা যায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে যেমন হর্যঙ্ক বংশীয় রাজা বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর কথা পাওয়া যায়, তেমনভাবেই 'লোকেশ্বরী'-র কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইতিহাস দিতে অপারগ। সিংহলী বৌদ্ধ গ্রন্থ *দীপবংস*-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে রাজা বিম্বিসারের উল্লেখ পাওয়া যায় –

দেসেসি অমতং ধম্মং অবহঞএ্রাসি মহীপতি ।
জাতিবস্সং মহাবীরং পঞ্চতিংস অনূনকং ।।
বিম্বিসারো সমতিংসা জাতবস্সো মহীপতি ।
বিসেসো পঞ্চহি বস্সেহি বিম্বিসারস্য গোতমো ।।[৮]

রাজা বিম্বিসারের পঞ্চ মনোবাসনার মধ্যে শেষ দুটি ছিল যেন গৌতম বুদ্ধ তাকেই বৌদ্ধ ধর্মোপদেশ দেন এবং তিনি স্বয়ং রাজগৃহে বাস করেন। যদিও অজাতশত্রুর বৌদ্ধবিদ্বেষী মনোভাবের কোনও তথ্য এই গ্রন্থে নেই। এমনকি ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার-ও এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ নীরব। তিনি বলেছেন –

Ajatashatru, the son of Bimbisara, impatient to rule Magadha, murdered his father in about 493 B.C snd become king. He was determined to continue his father's policy of expansion thorough military conquest.[৯]

তিনি অজাতশত্রুর আমলে মগধ রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের কথা বললেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তার অনুরাগ বা বিতৃষ্ণার কোনও সম্যক ধারণার কার্য-কারণ সম্বন্ধের কোনও সুনির্দিষ্ট মতামত নেই। *অবদানশতক*-এর 'শ্রীমতী' কথায় যতটুকু পাওয়া যায়, তা হ'ল –

যথা পুনা রাজ্ঞা অজাতশত্রুণা দেবদত্তবিগ্রাহিতেন পিতা ধার্মিকো ধর্মরাজো জীবিতাদ্ ব্যবরোপিতঃ, স্বযংস্বযং চ রাজ্যং প্রতিপন্নঃ, তদা ভগবচ্ছাসনে সর্বদেযধর্মাঃ সমুচ্ছিন্নাঃ। ক্রিযাকারশ্চ কারিতো ন কেনচিত্তথাগতস্তূপে কারাঃ কর্তব্যা ইতি।[১০]

আবার, উপালি চরিত্রটিও অনৈতিহাসিক নয়। বৌদ্ধধর্মসংগীতি প্রসঙ্গে ত্রিপিটকের গঠনে উপালির ভূমিকা ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'হীনযান ও মহাযান' প্রবন্ধের অন্ত্যটীকায় প্রাসঙ্গিক তথ্যে বলা হয়েছে যে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পাঁচ মাস পরে রাজগৃহে মহাকাশ্যপের নির্দেশে প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপালি পাঠ করেছিলেন 'বিনয় পিটক'। বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পক্ষে পালনীয় বিষয়ের নির্দেশনামা এই 'বিনয় পিটক'[১১]। অর্থাৎ এই চরিত্রটিও ইতিহাসসম্মত।

রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস-অপেক্ষা বৌদ্ধ কথাসাহিত্যের *অবদানশতক*-কেই আশ্রয় করেছিলেন 'পূজারিণী' কবিতায় এবং এই কবিতাটিরই নাট্যরূপ *নটীর পূজা* । বুদ্ধের মৃত্যুর উত্তরকালে অজাতশত্রুর আবহকেই তিনি নাট্যে ব্যবহার করেছেন মাত্র; তাই লোকেশ্বরী,বাসবী,রত্নাবলীর ম'ত অনৈতিহাসিক বা কল্পিত চরিত্রাবলির সাহায্যে

একটি ভাবভূত নাট্যনির্মাতা করেছেন। তাই এই এই *নটীর পূজা* প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ যুগ তথা দেশ-কাল-সময়কে অতিক্রম ক'রে এক অকৃত্রিম চিরন্তন সত্য এবং সুন্দরের বার্তা বয়ে আনে। তিনি ইতিহাসাশ্রিত চতুরঙ্কের দৃশ্যকাব্য প্রণয়ন করেননি। শুধুমাত্র উক্ত কবিতাটির নাট্যায়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন। 'শ্রীমতী'-র আশ্রয়ে *নটীর পূজা* রচনা করেছেন তিনি কিন্তু রাজান্তঃপুরে বিম্বিসারপত্নী লোকেশ্বরী, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের চরিত্রের স্বতন্ত্র নামকরণ এবং এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে শ্রীমতীর করুণ পরিণতির যে গ্রন্থনা, সেটি অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা, একাধিক বিষয়ে ব্যুৎপন্নতা এবং নিরন্তর অনুশীলনজনিত কবিকল্পিত সাহিত্যসৃষ্টি। অজাতশত্রুর চরিত্রটি নেপথ্যে থাকলেও তার হুংকার, আত্মম্ভরিতা এবং রাজনৈতিক কার্যাবলি পরিচালন-পদ্ধতির সমগ্র নির্যাস *নটীর পূজা*-য় ধরা দিয়েছে।

ইতিবৃত্তটি এরূপ যে রাজা বিম্বিসার রাজধর্মত্যাগ দিয়ে ত্যাগধর্মের রাজার অনুগামী হয়েছে। তার জন্য রাজ্ঞী লোকেশ্বরীর হৃদয় ব্যথিত। ভগবান বুদ্ধের শরণকে অতীত ক'রে সে ক্ষত্রিয়বাহুবলের পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট। এমনই সময়ে রাজবাড়ির নটী শ্রীমতীর সঙ্গে ভিক্ষু উপালির ঘনিষ্ঠতা এবং রাজ-অন্তঃপুরে কারুণিক বুদ্ধের বার্তাপ্রচারের আবহাওয়ায় রুষ্ট হয় লোকেশ্বরী। রাজকন্যাদের মধ্যে রত্নাবলী ছিল তার প্রধান সহায়। শ্রীমতীকে বারংবার সতর্ক করা সত্ত্বেও যখন সে বসন্তপূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের পাদপদ্মে অর্ঘ্যদান করতে চায়, তখনই অজাতশত্রুর বার্তা এসে পড়ে যে বুদ্ধানুরাগী ব্যক্তির বুদ্ধভক্তির ফল হতে পারে মৃত্যু। এতদসত্ত্বেও শ্রীমতী বিপথচালিত না হলে তার ওপর সজোরে আদেশ আসে যে তাকে সেই পুণ্যতিথিতে নৃত্য প্রদর্শন করতে হবে। নটীর বেশে শ্রীমতী নৃত্য করে এবং একে একে তার সকল আভরণ ত্যাগ করে। তার স্থৈর্য, ধৈর্য এবং নিবেদনকে ঔদ্ধত্য জ্ঞান ক'রে তাকে হত্যা করা হয়। শ্রীমতীর কাছে সেই মৃত্যু পূজারই উপাচারমাত্র। তাই তার চিত্তের নৈর্মল্য এবং প্রশান্তিতে হার স্বীকার করে রাজমহিষী লোকেশ্বরী এবং রত্নাবলী।

বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণ* তথা প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী যে কোনও নাট্য বস্তু দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। যথা আধিকারিক বা মুখ্য এবং প্রাসঙ্গিক বা গৌণ ইতিবৃত্ত[১২]। *নটীর পূজা*-র সামগ্রিক ইতিবৃত্তটির নায়িকা শ্রীমতী। নাট্যকথাবস্তুকে যদি আধিকারিক এবং প্রাসঙ্গিক এই দুভাগে বিভক্ত করতেই হয়, তবে মুখ্যেতিবৃত্তে রয়েছে শ্রীমতী, লোকেশ্বরী এবং রত্নাবলী। অন্যদিকে আধিকারিক ইতিবৃত্তের পরিপোষক প্রাসঙ্গিক বা গৌণেতিবৃত্তে রয়েছে ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার প্রসঙ্গ। এই প্রেক্ষ্যকাব্যে রাজা বিম্বিসার, কুমার অজাতশত্রু এবং দেবদত্তের চরিত্র উহ্য রয়ে গেলেও কুমার অজাতশত্রুর নিয়ন্ত্রণকর্তৃত্বকে অস্বীকার করা যায়না। 'লোকেশ্বরী' শব্দটি বিশেষ্য পদরূপে প্রযুক্ত হলেও মূলতঃ শব্দটি রাজ্ঞীর সমপর্যায়বাচী একটি শব্দ। সমাসবদ্ধ এই শব্দটির ব্যাসবাক্যে পাই "লোকানাং ঈশ্বরী" বা "লোকসমাজের ঈশ্বরী"। অর্থাৎ এটি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। এখানে লোক বা জনগণের প্রভুত্বের একটি প্রতীকী ব্যবহার। লোকেশ্বরী-র যে চরিত্র, তাতে তার ক্ষাত্রধর্মাকাঙ্ক্ষা-ই পদে পদে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় অঙ্কে তার তেজস্বী ভাষণ –

নির্বোধকে কেমন করে বোঝাব অহিংসা ইতরের ধর্ম ! হিংসা ক্ষত্রিয়ের বিশাল বাহুতে মাণিক্যের অঙ্গদ, নিষ্ঠুর তেজে দীপ্যমান।[১৩]

এই লোকেশ্বরীর সঙ্গেই নটী শ্রীমতীর চরিত্রে নাট্যিক দ্বন্দ্ব। রত্নাবলী শ্রীমতীর প্রতি অসূয়ার্থক কার্যাবলি ঘটালেও মৌলিক দ্বন্দ্বটি বা বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রভাষ্যবাণীটি যে দুটি স্তম্ভের মধ্যে আদর্শগত এবং মনস্তত্ত্বগত ব্যবধান এনেছে, তা হ'ল লোকেশ্বরী এবং শ্রীমতী। সেই দ্বন্দ্বটি নাট্যে বিভিন্ন ভাবে ধরা দিয়েছে ব্যক্ত এবং নির্ব্যক্ত দু'ভাবেই। এই দ্বন্দ্বগুলি হ'ল –

- **ক্ষত্রিয়ধর্মের সঙ্গে সন্ন্যাসধর্মের দ্বন্দ্ব :**

লোকেশ্বরী মনে করে ক্ষত্রিয় রাজার ধর্মই রাজ্যরক্ষা, প্রজাপালন এবং শস্ত্রধারণ। তাই তার স্বামী নৃপতি বিম্বিসার যখন ভগবৎদর্শনে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, তখন তার প্রতি মায়া বা স্ত্রীত্বের বন্ধন অপেক্ষা ক্ষাত্রধর্মে অকর্তব্যতা-ই তাকে ব্যথিত ক'রে তোলে। দ্বিতীয় অঙ্কে বাসবীর সংবিৎ ফেরাতে সে বলে –

তা হলে জিজ্ঞাসা করি দয়া-মন্ত্রের হাওয়ায় যে রাজা সিংহাসনের উপর কেবল টলমল করে, রাজদণ্ড যার হাতে শিথিল, জয়তিলক যার ললাটে ম্লান, তাকে শ্রদ্ধা করে বরণ করতে পারবে ?[১৪]

অপরদিকে প্রথম অঙ্কে শ্রীমতী গানের সুর বলে ওঠে –

বাঁধন কেন ভূষণবেশে তোরে ভোলায়
হায় অভাগী !
মরণ কেন মোহন হেসে তোরে দোলায়
হায় অভাগী ![১৫]

- **ভোগের সঙ্গে ত্যাগের দ্বন্দ্ব :**

লোকেশ্বরী রাজৈশ্বর্যের প্রভূত অধিকারিণী হতে চায়। একজন সুদৃপ্ত পরাক্রমশালী রাজার রাজমহিষীর ভোগলিপ্সার বিপ্রতীপ কোণে রয়েছে আত্মদানী শ্রীমতী। সে চতুর্থ অঙ্কে নৃত্য করে কিন্তু সেই নৃত্যেই তার বাহ্যিক কঞ্চুককে ত্যাগ দেয়।

- **প্রকৃতির সঙ্গে বিকৃতির দ্বন্দ্ব :**

এই নাট্যের প্রথম অঙ্কে মগধপ্রাসাদের কুঞ্জবনে ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার সঙ্গে লোকেশ্বরীর কথোপকথনকালে উৎপলপর্ণা তাকে মনে করিয়ে দেয় "সোনার দাম আর আলোর দাম কি এক ?"[১৬]। এখানে হিরণ্যরেতা 'আলো' প্রকৃতিতে প্রাণের উৎস। অন্যদিকে খনি থেকে খনন ক'রে সুবর্ণের পরিশুদ্ধি ঘটিয়ে তাকে অলংকাররূপে সৌন্দর্যায়নের প্রয়োজন, আলোকের ঔদার্য অপেক্ষা যে অনেকখানিই কম একথা লোকেশ্বরীর মনে অনুরণিত হয়না। অন্যদিকে গ্রাম্যবালিকা মালতীর সঙ্গে শ্রীমতীর কথোপকথনে শ্রীমতী বলে "বনের পাখি সোনার খাঁচা

দেখে লোভ করে, যখন তার ডানায় চাপে দুষ্টবুদ্ধি”[১৭]। এখানে বন্ধন এবং মুক্তির বিকর্ষণ-ই শ্রীমতীর প্রকৃতিপারম্যের সঙ্গে কৃত্রিমতায় স্পৃষ্ট রাজ-অট্টালিকার প্রতি রাণী লোকেশ্বরীর প্রেমের সংঘাত।

- **মমত্বের সঙ্গে সহত্বের দ্বন্দ্ব :**

'মম' অর্থে 'যা আমার' বা কারোর। এখানে একটি সম্বন্ধভাব রয়েছে। লোকেশ্বরীর পরিবার-পরিজনের সঙ্গে তার এই 'মমত্ব'-এর বন্ধন-ই জীবনরসের পাত্র। শ্রীমতীর মধ্যে রয়েছে এক অনির্বচনীয় 'সহত্ব'। 'সহ' অর্থে যা তার সঙ্গেই রয়েছে, সেই বোধই সে উপালির থেকে লাভ করেছে। মানুষের ধর্ম মানবতা। তা অতুল্য, তা অমূল্য। তাই উপালি যখন বলে যে তার শ্রেষ্ঠ দান স্বয়ং প্রভু-ই গ্রহণ করবেন, তখন শ্রীমতীর উত্তর "প্রভু, তা হলে তিনি স্বয়ং তুলে নিন যা আছে আমার”[১৮]। এই 'সহত্ব' তত্ত্ব লোকেশ্বরীর অন্তর্জগতে পৌঁছায়নি। লোকেশ্বরীর নিজসন্তান চিত্র বৈরাগ্যের মার্গে গমন করেছে। ফলে তার মমত্বরূপ মাতৃত্বের বন্ধন যেন শিথিল হয়ে পড়েছে। এই দ্বন্দ্বটি পূর্ণতম হয়ে উঠেছে উৎপলপর্ণার কথায় "কোলে যাকে পেয়েছিলে আজ বিশ্বে তাকেই পেয়েছ”[১৯]। দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতেই যুবরাজ চিত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই লোকেশ্বরী বলে –

পুত্র যখন অপুত্র হয়ে মার কাছে আসে তার মতো দুঃখ আর নেই। কিরকম করে চাইলে আমার দিকে ! তার মা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে – কোথাও কোনো তার চিহ্নও নেই ![২০]

- **ভক্তের সঙ্গে ভক্তির দ্বন্দ্ব :**

নটী শ্রীমতী একজন ভক্ত এবং ভক্তি তার উপকরণ। অন্যদিকে লোকেশ্বরী মনে করে ভক্তিই ভক্তকে গড়তে পারে। প্রথমাঙ্কে লোকেশ্বরীর কথায় জানা যায় –

ভিক্ষু ধর্মরুচিকে ডাকিয়ে প্রতিদিন কল্যাণপঞ্চবিংশতিকা পাঠ করিয়ে তবে জলগ্রহণ করেছিকরেছি, একশো ভিক্ষুকে অন্ন দিয়ে তবে ভাঙত আমার উপবাস, প্রতিবৎসর বর্ষার শেষে সমস্ত সংঘকে ত্রিচীবর বস্ত্র দেওয়া ছিল আমার ব্রত।[২১]

অথচ দ্বিতীয় অঙ্কে যখন শোনা যায় যে অজাতশত্রু অশোকদ্রুমতলের ভগবান বুদ্ধের আসন ভেঙে দিয়েছেন, তখন তা শুনে শ্রীমতী বলে –

প্রভুর আসনকে কি পাথর দিয়ে পাকা করতে হবে ! ভগবানের নিজের মহিমাই তাকে রক্ষা করে।[২২]

শ্রীমতী অন্তঃকরণে ভগবানকে বিশ্বাস করে। ঐশ্বরিক উপলব্ধির জন্য ঈশ্বরকে প্রমাণস্বরূপ করতে চায়নি সে। অন্যদিকে লোকেশ্বরী ঈশ্বরের সত্তাকেই পরম জ্ঞান করেছে। আচরিত ধর্মানুষ্ঠানকে ভক্তি-র পরিচয়ে বাঁধতে চেয়েছে। অথচ শ্রীমতী নিঃস্ব ব'লেই করুণাঘন বুদ্ধের ভক্ত। নিঃস্বতাই তার চরম দাক্ষিণ্য।

এই চরম দ্বন্দ্বটিকেই ভাষার সৌধে চরিত্রের অভিলেখে একটি দৃশ্যশ্রব্যকাব্যের রূপ দিতেই প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের তির্যক রেখায় প্রবেশ ঘটে। তেমনই ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার চরিত্রটি প্রাসঙ্গিক বৃত্ত। উৎপলপর্ণার

চরিত্রটিকে প্রথম অঙ্কে লোকেশ্বরীর সঙ্গে বাগ্বিনিময়কালে দেখা যায়। সেখানেই রাণীর মধ্যে ফুটে ওঠে সিংহাসনস্পৃহা এবং পদমর্যাদার লালসা। আবার, দ্বিতীয় অঙ্কে উৎপলপর্ণার আবির্ভাব ঘটে। সেখানে তার কথায় জানা যায় শ্রীমতী-ই বুদ্ধচরণবন্দিনী হতে চলেছে – "আজ বসন্তপূর্ণিমায় ভগবান বোধিসত্ত্বের জন্মোৎসব। অশোকবনে তাঁর আসনে পূজা-নিবেদনের ভার শ্রীমতীর ওপর"[২৩]। এরপরে তৃতীয় অঙ্কে তার নাট্যমধ্যে প্রবেশের কারণটিও যুক্তিসঙ্গত। তার উক্তি থেকেই জানা যায় যে দেবদত্তের প্রতাপে নগরে প্রলয়কাল প্রায় সমাগত – "উপদ্রব এসেছে নগরে, ধর্ম পীড়িত, শ্রমণেরা শঙ্কিত, আমি পৌরপথে রক্ষামন্ত্র পড়তে চলেছি"[২৪] এবং এই অঙ্কেরই শেষভাগে পাটলীর কথায় সহৃদয় অবগত হয় যে অপ্রতিরোধ্য উৎপলপর্ণা নিহত। অর্থাৎ সমগ্র *নটীর পূজা*-র আস্বাদ্য নাট্যরসে উৎপলপর্ণা পতাকা (বা মূল নাট্যফলের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক) ইতিবৃত্তে[২৫] অবস্থান করেছে। এখানে তার নিজস্ব কোনও কার্যসিদ্ধি হয়নি। বৌদ্ধ ধর্মাশ্রয়ীদের বিপ্লবে সে যথাসাধ্য নেতৃত্ব দান করলেও সে মৃত্যুর মারকত্বে জয়ী নয়। নাট্যবৃত্তে এই চরিত্রটির প্রয়োজনীয়তা বৌদ্ধ শ্রমণদের প্রতি অবিচার এবং নিপীড়নের প্রতিচ্ছায়ায়। পরবর্তীতে দেখা যায় শ্রীমতীর প্রাণ রক্ষা না পেলেও তার প্রাণাধিক নৈবেদ্য দেবপ্রসাদে হয়েছে অমৃত। উৎপলপর্ণার মৃত্যুসংবাদ শ্রীমতীকে যেন আরও তাড়িত ক'রে তোলে। অর্থাৎ তৎকালীন ভারতভূমির বৌদ্ধভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের সামাজিক অবস্থান এবং তাদের বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গের তেজঃপ্রকাশক উৎপলপর্ণা। তাই পতাকা ইতিবৃত্তে নায়কের পরিবর্তে একজন নায়িকাকে এই নাট্যে আবিষ্কার করা যায়।

যে প্রশ্নটি প্রথমেই উত্থাপিত হয়েছিল যে কেন এই নাট্যটিকে প্রেঙ্খণের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে,তার উত্তর এতক্ষণে অনেকখানিই পরিষ্কৃত হয়েছে। অর্থাৎ *নটীর পূজা*-র মূলে রয়েছে একটি দ্বান্দ্বিক নাট্যাবহ। এই সংঘভেদের বিষয়কে উপজীব্য ক'রেই যখন নাট্যটি বিকশিত হয়েছে, তখন এটিকে প্রেঙ্খণ জাতীয় উপরূপকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

৫.৩ প্রেঙ্খণ ও *নটীর পূজা* : বহিরঙ্গ সাযুজ্য :

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ম'তই এখানে অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ দুটি শ্রেণিবিভাগ করণীয়। এমনকি প্রথমে বহিরঙ্গ বিষয়ের পরে অন্তরঙ্গ বিষয়গুলি এই অধ্যায়েও আলোচিত হবে। বহিরঙ্গ বিষয়টি পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ম'তই নাট্যতত্ত্বগত বিচারে উপস্থাপিত হবে। এই সাযুজ্যবিচার হবে যথাক্রমে ইতিবৃত্তগত, রসগত, সন্ধিগত, বৃত্তিগত, অর্থোপক্ষেপকগত এবং অঙ্কগত। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায় যে এটি হ'ল প্রেঙ্খণ-এর লক্ষণটির সঙ্গে *নটীর পূজা*-র মেলবন্ধন ঘটানোর একটি প্রয়াস।

❖ **ইতিবৃত্তের সাপেক্ষে :**

তাহলে নায়িকাপ্রধান নাট্য *নটীর পূজা*-র ইতিবৃত্তের পাঠগ্রহণের পরে যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়, তা হ'ল এটির সঙ্গে প্রেঙ্খণ উপরূপকের ইতিবৃত্তগত একটি সাযুজ্য রয়েছে। প্রেঙ্খণ-এর সংবদ্ধ লক্ষণটিতে *সাহিত্যদর্পণ* -এ বলা হয়েছে –

গর্ভাবমর্ষরহিতং প্রেঙ্খণং হীননাযকম্ ।
অসূত্রধারমেকাঙ্কমবিষ্কম্ভপ্রবেশকম্।।
নিযুদ্ধ-সংফেটযুতং সর্ববৃত্তিসমাশ্রিতম্ ।[২৬]

সুতরাং (গর্ভ এবং অবমর্শ সন্ধির দূরত্বেও) নাট্যেতিবৃত্তের জটিলতামুক্ত এই উপরূপক যুদ্ধ এবং সংফেট-এর আশ্রয়স্থল। যুদ্ধ শব্দ সম্পর্কে যথাবিধি জ্ঞান থাকলেও এই সংফেট শব্দটির অর্থ জানতে হয়। প্রথমতঃ চতুর্বিধ নাট্যবৃত্তির মধ্যে অন্যতম হ'ল আরভটী বৃত্তি। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে এই আরভটী বৃত্তির লক্ষণ হ'ল –

মাযেন্দ্রজালসংগ্রামক্রোধোদ্ভ্রান্তাদিচেষ্টিতৈঃ ।
সংযুক্তা বধবন্ধাদ্যৈরুদ্ধতারভটী মতা ।।[২৭]

কুহক, জাদুবিদ্যা, সংগ্রাম এবং ক্রোধজনিত উদ্ভ্রান্তি প্রভৃতি ব্যাপার সমন্বিত নিগ্রহ এবং বন্ধনাদি দুষ্কর্মমূলক ঘটনায় যে নাট্যবৃত্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তা হ'ল আরভটী। এই বৃত্তির চারটি অঙ্গ যথাক্রমে বস্তূত্থাপন, সংফেট, সংক্ষিপ্তি এবং অবপাতন –

বস্তূত্থাপন-সংফেটৌ সংক্ষিপ্তিরবপাতনম্ ।
ইতি ভেদাস্ত চত্বার আরভট্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।।[২৮]

তন্মধ্যে সংফেট হ'ল –"সমাঘাতঃ ক্রুদ্ধসত্ত্বরযোর্দ্বযোঃ"[২৯]। অর্থাৎ যেখানে ক্রুদ্ধ এবং তরান্বিত দুই ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত ঘটে, তা-ই হ'ল 'সংফেট'। অর্থাৎ দু'জন ব্যক্তির দ্বন্দ্ব এবং বিদ্বেষের ফলে যুদ্ধ-ই এর বিষয়।

আবার বিমর্ষ বা অবমর্শ সন্ধির দ্বিতীয় অঙ্গের নাম-ও সংফেট। এর লক্ষণ বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে "রোষভাষণম্"[৩০]। রোষ বা ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ভাষণ-ই সংফেট। তাহলে আরভটী বৃত্ত্যঙ্গ এবং বিমর্ষ সন্ধ্যঙ্গে উল্লিখিত সংফেট প্রভিন্ন নয়। অমর্ষহেতু কোনও ব্যক্তিবিশেষে নিক্ষিপ্ত রুষ্ট উক্তি-ই সংফেট। প্রেঙ্খণ উপরূপকে সংফেট-এর অবস্থান প্রমাণ করে এর ইতিবৃত্তে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির আক্রোশভাষণ বর্ষিত হবে এবং তজ্জন্য যুদ্ধাদির ম'ত ঘটনাও বিরল বা ব্যতিক্রমী হবেনা। এমনকি *সাহিত্যদর্পণ*-এ এই উপরূপকের নায়ককে চিহ্নিত করা হয়েছে হীননায়করূপে। অর্থাৎ স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যে অপ্রশস্ত এবং অপ্রশংসিত দোষবাহুল্য তার মধ্যে লক্ষ্য করা উচিত। যেহেতু সাহিত্যদর্পণকার এর উদাহরণ দিয়েছেন বালিবধ নামাঙ্কিত একখানি নাট্যকে[৩১], তাই বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বানররাজ বালির চরিত্র পাওয়া যায়[৩২]। সেই পরম্পরায় বানররাজ বালি-কে হীননায়করূপে নাট্যকার প্রতিপন্ন করেছিলেন, তার সন্দেহ নেই। তবে যেহেতু তার বধ সাধিত হয়েছিল এমনটিই অনুমান করা যায় নামকরণের সৌজন্যে, তাই পরোক্ষভাবে এটিও প্রমাণিত যে এটি এমন একটি উপরূপক যেখানে নায়কের মৃত্যুসংবাদ সহৃদয়গণ হৃদয়গত করতে পারত।

নটীর পূজা নাট্যগ্রন্থে শ্রীমতীর ম'ত সাধ্বী ধার্মিক নারীর বিপরীতে রয়েছে রাজ্যলোভী দুরাচারী কুমার অজাতশত্রু। যদিও নাট্যে তার উপস্থিতি নেই কিন্তু পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করার দুরভিসন্ধি, বুদ্ধবিদ্বেষী মনোভাব,

নিষ্ঠুর রাজাজ্ঞা ইত্যাদির ম'ত ঘৃণ্য কার্যাবলি অনুল্লিখিত নয়। সমগ্র নাট্যকথাবস্তুটির সূত্রধারস্বরূপ এই চরিত্র। দ্বিতীয় অঙ্কে রক্ষিণীর উক্তিতে শোনা যায় "মহারাজের আদেশ এই যে, তুমি নটী, তোমাকে অশোকবনে নাচতে যেতে হবে"[৩৩]। নটীর মৃত্যুতে রাজকন্যা রত্নাবলীর ইন্ধন থাকলেও অজাতশত্রু নিষ্কলুষ নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তার পাপ। যেহেতু বিশ্বভারতীর শিক্ষার্থিনীরাই *নটীর পূজা*-য় অংশগ্রহণ করবে এমন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, তাই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ প্রথম অভিনয়ে কোনও পুরুষ চরিত্র নাট্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি। যদি রবীন্দ্রনাথ স্বতঃ উৎসাহিত হয়েই নাট্যরচনার তাগিদেই নটীর পূজার বিরচনা করতেন, তাহলে সেখানে অজাতশত্রু চরিত্র প্রত্যক্ষীভূত হ'ত এমনটিই মনে করা যেতে পারে। তবুও একটি নাট্যকে যখন উপরূপকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হচ্ছে,তখন সেই নির্দিষ্ট উপরূপকের শর্তাবলি মান্য করা আবশ্যক। "নটীর পূজা প্রেঙ্খণ উপরূপক-ই" এই তত্ত্ব প্রমাণের জন্যই যেন বিভিন্ন অযৌক্তিক বা নিরর্থক অছিলার আশ্রয় না নেওয়া হয় এটিকে স্মরণে রাখতে হবে। বরং প্রেঙ্খণ উপরূপকের সঙ্গে *নটীর পূজা*-র তারতম্য কীভাবে ধরা দিয়েছে, তা-ই এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য। অতএব প্রেঙ্খণ-এর লাক্ষণিক দিক থেকে *নটীর পূজা*-র সঙ্গে ইতিবৃত্ত এবং উপস্থাপনগত যে বিষয়টির মিল রয়েছে, তা হ'ল উভয়ক্ষেত্রেই দুশ্চরিত্র কোনও পুরুষ ইতিবৃত্তের নিয়ামক এবং যে বিষয়ের অমিল রয়েছে বলে অনুমান করা হয়, তা হ'ল *নটীর পূজা*-য় সেই দুষ্ট পাপাত্মা কলঙ্কিত নায়ক অজাতশত্রুর মঞ্চোপরি কোনও ভূমিকা নেই।

যুদ্ধের বিষয়টি যদি দেখা হয়, তবে বলতে হয় যে *নটীর পূজা*-য় যুদ্ধ বহুমাত্রিক। শ্রীমতীর সঙ্গে লোকেশ্বরীর যে পাঁচটি মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছে, সেগুলি নাট্যে অমিত পরিমাপে চালিত হয়েছে। এছাড়াও গৌতম বুদ্ধ এবং দেবদত্তের মধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম এবং নাস্তিক্যবাদী ধর্মের যে সংঘাত, তাও নাট্যকাহিনিতে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমতীর হত্যা বস্তুতঃ দুটি ভিন্ন ধারার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে গড়ে ওঠা বিরোধের ফল। একজন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণহনন হয়ে যায় দুটি প্রতিষ্ঠানের অন্তর্দ্বন্দ্বে। তাই 'বালিবধ' নামকরণটি হীননায়কের পরাজয় ঘোষণার প্রতীক কিন্তু *নটীর পূজা*-য় অজাতশত্রুর আক্ষরিক অর্থে পরাজয় ঘটেনা। বরং নটীর নৃত্যনিবেদনের স্পর্ধা নটীকে আনন্দলোকের দর্শন করায়।

আপাতদৃষ্টিতে নটী অজাতশত্রুর দ্বারা বিজিত মনে হলেও নাট্যের অন্তিম পর্বে মল্লিকার উক্তি প্রমাণ করে যে শ্রীমতীর প্রতিবাদে তিনিও সন্ত্রস্ত –

মল্লিকা ।। সংবাদ শুনে তিনি ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠলেন। / লোকেশ্বরী ।। কাকে তাঁর ভয় ? // মল্লিকা ।। ঐ হতপ্রাণ নটীকে। /[৩৪]

অপ্রতিরোধ্য শ্রীমতীর প্রত্যয় এবং নির্বাক পরাক্রমকে আশা করেনি অজাতশত্রু। তার আদেশ ছিল সত্য কিন্তু সেই আদেশের পালন যে নটী-ই করবে এমন মনোবল ছিলনা। তাই তার অমিত বাহুবল সেদিন নত হয়েছিল রাজনটীর চরণে। ভারতবর্ষের ইতিহাস যা-ই বলুক না কেন; নাট্যবৃত্তের পরিধিতে অজাতশত্রু পরাভূত। এমনকি

শ্রীমতীর প্রতিপক্ষ লোকেশ্বরী বলে "নটী, তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি"[৩৫]। এমনকি রত্নাবলী-ও শেষে মন্ত্রোচ্চারণ করে –

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি।[৩৬]

তাই সর্বতোভাবে শ্রীমতীর পারমার্থিক জ্ঞান, বুদ্ধভক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং নীতিপরায়ণতা তাকে অমর এবং অজেয় করে তুলেছে। মৃত্যু কেবলই ক্ষণিক। অজাতশত্রুর বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি যে বিরাগ, তার প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে লোকেশ্বরী এবং রত্নাবলী। বিশেষতঃ রত্নাবলীর ম'ত চরিত্র যখন ধর্মমন্ত্রের গান গায়, তখন একথা সহজবোধ্য যে অজাতশত্রুর শাসনব্যবস্থার বিরোধিতা করার ম'ত সবল এবং সবিনয়ী মানুষও বর্তমান। সেখানেও রাজদ্রোহিতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হতে চলেছে। তাই এমন আশাবাদের আভাসেই *নটীর পূজা* -র সমাপ্তিহেতুই এটিকে প্রাচীনকালের প্রেজ্খণ-এর সঙ্গে তুল্যরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

❖ **রসগত সাম্যবিচারে :**

সাহিত্যদর্পণকার এই উপরূপকের অঙ্গিরস বিষয়ে পদের অবতারণা করেননি। তথাপি আরভটী বৃত্ত্যঙ্গ 'সংফেট' প্রমাণ করে এই নাট্যে রৌদ্র এবং বীভৎস রসের সমুচিত ব্যঞ্জনা –

...সাত্ত্বত্যারভটী পুনঃ ।
রসে রৌদ্রে চ বীভৎসে... .. .।।[৩৭]

অর্থাৎ প্রেজ্খণ-এ রৌদ্র এবং বীভৎস রসের চর্বণা আস্বাদ্য হবে। আবার, ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র*-এ অষ্টবিধ (শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত) রসের মধ্যে চারটি রসকে নিরপেক্ষ এবং চারটি রসকে সাপেক্ষ বলা হয়েছে –

শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেদ্ধাস্যো রৌদ্রাত্তু করুণো রসঃ ।
বীরাচ্চৈবাদ্ভুতোৎপত্তির্বীভৎসাচ্চ ভয়ানকঃ ।।[৩৮]

অর্থাৎ রৌদ্র রস থেকেই করুণ রসের উদ্ভব ঘটে। করুণ রস শোক স্থায়িভাবের পরিপাকে জাত হলেও মৌলিক নয়। তার কারণ "রৌদ্রস্যাপি চ যত্ কর্ম স জ্ঞেয়ো করুণো রসঃ"[৩৯]। এই বিষয়টি পরিস্ফুট করলে বলতে হয় যে রৌদ্ররসের স্থায়িভাব ক্রোধ হওয়ার ফলে প্রহার, আক্রমণ, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এমনকি নিগ্রহ পর্যন্ত ঘটতে পারে। তার ফলে যে ব্যক্তির নিগ্রহ হচ্ছে, তাকে কেন্দ্র ক'রেই 'শোক' স্থায়িভাব করুণ রসে পরিণত হচ্ছে। প্রমাণস্বরূপ বিশ্বনাথ কবিরাজের উক্তিকে ব্যবহার করা যায় –

রৌদ্রঃ ক্রোধস্থাযিভাবো রক্ত রুদ্রাধিদৈবতঃ ।

আলম্বনমরিস্তত্র তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্ ।।

মুষ্টিপ্রহার-পাতন-বিকৃত-চ্ছেদ-বিদারণৈশ্চৈব ।

সংগ্রাম-সংভ্রমাদ্যৈরস্যোদ্দীপ্তির্ভবেত্ প্রৌঢা ।।[৪০]

এই বিষয়ে আলংকারিক জগন্নাথ *রসগঙ্গাধর* গ্রন্থেও বলেছেন যে বীর এবং রৌদ্র রস পরস্পর অবিরোধী –

এতেষাং পরস্পরং কৈরপি সহাবিরোধঃ কৈরপি বিরোধঃ। তত্র বীরশৃঙ্গারযোঃ, শৃঙ্গারহাস্যযোঃ, বীরাদ্ভুতযোঃ, বীররৌদ্রযোঃ, শৃঙ্গারাদ্ভুতযোশ্চাবিরোধঃ।[৪১]

তাহলে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সমর্থনে দাঁড়ায় যে বীর, রৌদ্র এবং করুণ এই তিনটি যেন উত্তরণের সোপান। উৎসাহভাবে যুদ্ধবীরত্ব ক্রমে পৌঁছায় রৌদ্রে এবং রৌদ্ররসানুযায়ী কার্য করুণ রসে উপচিত হয়।

বালিবধ নাট্যে যদি রামচন্দ্র কর্তৃক বালিবধ হয়েই থাকে, তবে এক্ষেত্রে করুণ রসের আলম্বন বিভাব হবে বানররাজ বালি। অন্যদিকে বীর এবং রৌদ্র রসের আধার হবে রামচন্দ্র। যেহেতু নাট্যে যে কোনও একটিই অঙ্গিরস বা মূল রসের ব্যঞ্জনা-ই নাট্যকারের তথা সহৃদয় রসিকজনের উদ্দেশ্য, তাই এক্ষেত্রে রৌদ্র রসকেই একমাত্র মূল রসরূপে স্বীকার করতে হয়। তার কারণ বালিরাজের যে অন্যায়-আচরণ, তার সংহারের প্রয়োজন। তাই একজন বীর বিক্রমী ক্ষত্রিয় রাজার ধর্মনীতিপালনের জন্যই সেই গুরু দায়িত্বের ভার গ্রহণ করতে হয়। যদিও বিষয়টি বিতর্কিত তথাপি বালিরাজের বধ একটি অন্যায়ের দমন। তাই *বালিবধ*-এর ম'ত প্রেক্ষণ রৌদ্ররসের আকরভূমি।

অপরদিকে *নটীর পূজা*-য় শ্রীমতীর মৃত্যু কাঙ্ক্ষিত ছিলনা। এক্ষেত্রে সাধু-সজ্জন ব্যক্তির নিপীড়ন ঘটেছে। যে সবল, যার বাহুবল যথোচিত, সে-ই নিরপরাধ ব্যক্তির হননের জন্য দায়ী। যদি নাট্যকথায় অজাতশত্রুর মৃত্যু বা দণ্ডবিধান বলীয়ান হ'ত, সেক্ষেত্রে বলা যেত যে নটীর পূজা রৌদ্ররসাশ্রিত দর্শনীয় এবং শ্রাব্য কোনও নাট্যসন্দর্ভ। গূঢ়ার্থ বা নাট্যভাববিশ্লেষণে শ্রীমতী-র চরিত্রটিকে যতই আলোকিত করা হোক না কেন; চরমতম বিপর্যয় বা পরাজয় অজাতশত্রু বা রত্নাবলীর জীবনে আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক কোনও দুঃখ নেমে আসত, তখন তাকে বালিবধ নাট্যের সঙ্গে তুল্যায়িত করা সম্ভবপর হ'ত। অজাতশত্রুর সংগঠন ক্ষীণ হওয়া এবং স্তব্ধ হওয়ার বিষয়কে অতিক্রম করে গেছে একজন নটীর আত্মত্যাগ তথা আত্মনিবেদন। তাই করুণ রস অঙ্গরস হলেও নাট্যটিকে শান্তরসপ্রধান বলাই ন্যায্য হবে কিনা সে বিষয়ে একটি সংশয় উপস্থিত হয়। যখন শান্ত রসের প্রসঙ্গ এসেই পড়ল, তখন শান্তরসের প্রাচীনতম ব্যাখ্যাতা অভিনবগুপ্তের মতটি দেখে নেওয়া যাক যা *অভিনবভারতী* টীকায় বিধৃত "ততস্ত্রিবর্গাত্মকপ্রবৃত্ত(ত্তি)ধর্মবিপরীতনিবৃত্ত(ত্তি)ধর্মাত্মকো মোক্ষফলঃ শান্তঃ"[৪২]। এখানে রসবিজ্ঞাতা অভিনবগুপ্তের মত হ'ল যে ত্রিবর্গের (ধর্ম, অর্থ, কাম) অতিরিক্ত চতুর্থতম উপেয় বর্গ মোক্ষের ফল-ই শান্ত রসের বিষয়। 'শম' স্থায়িভাবাত্মক এই রসের ত্রিবিধ ভাব হ'ল –

তস্য চ বৈরাগ্যসংসারভীরুতাদযো বিভাবাঃ। স হি তৈরুপনিবদ্ধৈর্বিজ্ঞাযতে। মোক্ষশাস্ত্রচিন্তাদযো'নুভাবাঃ। নির্বেদমতিস্মৃতিধৃত্যাদযো ব্যভিচারিণঃ।[৪৩]

মায়ারূপ জগৎসংসারের বন্ধনের প্রতি বিতৃষ্ণাজনিত বৈরাগ্য হ'ল বিভাব, উপনিষদাদি মোক্ষশাস্ত্রবিষয়ক গভীর অনুচিন্তন হ'ল অনুভাব এবং নির্দেশ, স্মৃতি, ধৃতি ইত্যাদি হ'ল ব্যভিচারিভাব। নটীর পূজা-র নাট্যবস্তুতে শ্রীমতীর মধ্যে সংসারধর্মের প্রতি অরুচি দেখা যায়না। প্রথমাঙ্কে যখন মালতী শ্রীমতীর কাছে গান শিখতে আসে, তখনই তাকে শ্রীমতী প্রশ্ন করে তার এই জীবিকা নির্বাচনের কারণ কী ছিল –

কেন এলে বাছা ? সেখানে কি দিন কাটছিল না ? ছিলে পূজার ফুল, দেবতা ছিলেন খুশি; হবে ভোগের মালা, উপদেবতা হাসবে।[৪৪]

এমনকি নটী শ্রীমতী উৎপলপর্ণার ম'ত বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হতে চায়নি। সে তার নর্তন জীবিকাকে সঙ্গে নিয়েই তথাগতের চরণে তার দেহ-মন সমর্থন করতে চায়। সে জীবিকাবশে উপভোগ্যা কিন্ত ঈশ্বরের চরণে তার দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়না। সে যেমন গান গায়, নৃত্য প্রদর্শন করে; তেমনই পূজা করে। কর্মজীবন এবং ব্যক্তিজীবন শ্রীমতীর মনোদর্শনে ভিন্ন। তাই চতুর্থ অঙ্কের শেষে তার অগ্নিপরীক্ষার সময় বলে ওঠে –

> তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
> সংগীত বিরাজে।[৪৫]

সংগীতের মাধ্যমেও যে দেবার্চনা করা যায়, যে দেবচরণে প্রণতি জানানো যায়; সেই সত্যসুন্দর মঙ্গলময় রূপ-ই 'জীবনদেবতা'। রবীন্দ্রনাথ *নৈবেদ্য* কাব্যগ্রন্থের ৩০নং কবিতায় বলেছেন –

> বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
> অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
> মুক্তির স্বাদ।

এই কবিতারই শেষ দুটি চরণে তিনি বলেছেন –

> মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
> প্রেম মোর ভক্তিরূপে জ্বলিবে রহিয়া।[৪৬]

শান্তরসের যে বিভাব বা কারণসমূহ, শ্রীমতীর মধ্যে যেমন সেই প্রকার ভাবনার অবকাশ নেই, তেমনই শাস্ত্রচর্চার জ্ঞান থেকে মোক্ষের প্রতি বাসনা-ও তার পরম ধন নয়। তাই শান্তারসানুকূল অনুভাবও এখানে কার্যকর নয়। *নটীর পূজা*-র কথাবস্তুটিকে দুটি ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ নটী এবং পূজা দুটি পৃথক শ্রেণির নামাঙ্কন। একদিকে কাম এবং অন্যদিকে ভক্তি। একজন রাজনটীর মধ্যেও যে শুচিতা এবং পবিত্রতা থাকতে পারে, তার নৃত্য-ও যে ভক্তির অঙ্গ হতে পারে এমন একটি তত্ত্বের উপন্যাস *নটীর পূজা*-য় বর্তমান। সেখানে

সহস্র প্রতিকূলতাকে জয় ক'রেও তার মন থাকে শুদ্ধ। সেই স্ফটিকে প্রতিচ্ছবি পড়ে ঈশ্বরভক্তির। দ্বিতীয়তঃ আরও একদিক থেকে এর বিচার করা যায় যেখানে রাষ্ট্রনৈতিক অস্থিরতায় তথাকথিত অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য সমাজের একজন প্রতিনিধির নিজ কর্তব্যে অটল থাকায় মৃত্যুবরণ।

দু'দিক থেকেই নাট্যটির রসগত ভাবনা হয় বীররস। বীর রস চার প্রকার। যথা ধর্মবীর, যুদ্ধবীর, দানবীর এবং দয়াবীর। এ প্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণ*-এ পাওয়া যায় "স চ বীরো দানবীর ধর্মবীর দযাবীরশ্চেতি"[৪৭]। এক্ষেত্রে তার ধর্মবীর প্রকৃতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে 'ধর্ম' শব্দটি কোনও জাতিগত সাম্প্রদায়িক ধর্মের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকেনি। *মনুসংহিতা*-র ওপর রচিত টীকা *মন্বর্থমুক্তাবলী*-তে এর সংজ্ঞা "দৃষ্টাদৃষ্টার্থানুষ্ঠেযপরঃ"[৪৮]। অর্থাৎ দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট ফলের নিমিত্ত বিধেয় কর্ম-ই হ'ল ধর্ম। এই ধর্ম সত্য এবং সদাচারের অনুগামী। নটীর ধর্ম ছিল সংগীতসাধনায় মাধ্যমেই দেবভক্তি। আমৃত্যু সে ধর্নরক্ষা করতে চেয়েছে। বিপরীত গোত্রের মানুষদের ক্ষতিসাধন না করে নিজ মার্গে গানের সুরেই সাধ্যের সাধন করেছে। যুদ্ধ না করেও সে রাজাদেশ পালন করেছে। দানের প্রসঙ্গও এই ক্ষুদ্র পরিসরে উল্লিখিত নয় এমনকি দয়ালুচিত্ত হলেও সেই গুণ অতিরঞ্জিত হয়নি। তাই যুদ্ধবীর, দানবীর এবং দয়াবীর এই তিনপ্রকার ভাব স্থান পায়নি *নটীর পূজা*-য় অঙ্কিত তার চরিত্রচিত্রণে।

রৌদ্র রস এখানে অঙ্গরস। নাট্যে প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলির সাপেক্ষে অঙ্গরসের তাৎক্ষণিক উপলব্ধি ঘটে এবং অঙ্গিরসের সঙ্গে বিরোধও থাকতে পারে। এই নাট্যে রৌদ্র রস এবং আরভটী বৃত্তি প্রথম থেকেই অনুমেয় হলেও নাট্যপরিণামে তা গুণীভূত হয় এবং বীর রসের চর্বণা সাধিত হয়। রস যেহেতু সহৃদয়বেদ্য; তাই তার নিরীখে মৃত্যু ব্যভিচারিভাব উৎপলপর্ণা এবং শ্রীমতীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও তা সর্বাঙ্গীণ নয়। অর্থাৎ রসসমীক্ষায় এই নাট্যের প্রধান রস বীর এবং অপ্রধান রস করুণ এবং রৌদ্র।

তাই প্রেঙ্খণ উপরূপকের অঙ্গিরস বিষয়ে যেহেতু প্রত্যক্ষ কোনও বিধি অনুক্ত এবং পুরাতন কোনও এই জাতীয় উপরূপক বর্তমানে অপ্রাপ্ত ; তাই আরভটী বৃত্তির সাহচর্যে, উগ্রতার আস্ফালনে এবং সর্বোপরি বীর রসের দ্যোতনায় *নটীর পূজা*-কে রসগত প্রেক্ষিতে প্রেঙ্খণ-এর সমতুল্য বলা যায়।

❖ **নাট্যসন্ধির সাপেক্ষে :**

প্রেঙ্খণ উপরূপক হয় ত্রিসন্ধিসংগমে। যথা মুখ, প্রতিমুখ এবং নির্বহণ বা উপসংহৃতি সন্ধি। এখানে গর্ভ এবং বিমর্ষ বা অবমর্শ সন্ধির অবকাশ নেই। যেহেতু নাট্যসন্ধি বিচারে অর্থপ্রকৃতি এবং অবস্থার উল্লেখ করতেই হয়, তাই একে একে এগুলির অবস্থান পরীক্ষা করা যাক। পূর্বাধ্যায়ে *মায়ার খেলা*-র নাট্যতত্ত্ববিচারের সময় পঞ্চ অর্থপ্রকৃতির-ই উল্লেখ করা হয়েছে[৪৯], তাই পুনরুক্তি দোষসংহারের জন্যই তার পুনরুল্লেখ করা হ'লনা।

▪ **মুখসন্ধি :**

প্রথম নাট্যসন্ধি মুখ সন্ধি বীজ নামক অর্থপ্রকৃতি এবং আরম্ভাত্মক কার্যের সমাহার[৫০]। নটীর পূজা নাট্যে বীজের উল্লেখ রয়েছে প্রথম অঙ্কে মালতীর সঙ্গে শ্রীমতীর কথোপকথনে। সে মালতীকে নির্ভয়ে বলে "চোখের

জল বয়ে যাক-না। মুক্তিপথের ধুলো ঐ জলে মরবে"[৫১]। অর্থাৎ দুঃখের পথেই মুক্তির সন্ধান। শ্রীমতীর জীবনের অবসান ঘটেছে এক দুঃখের পরিবেশে। মুক্তির পথকে তবু সে অবহেলা করেনি। সেই কণ্টকাকীর্ণ পথেই তার আনন্দযাত্রা। তাই এই উক্তিটি-ই এখানে অল্পমাত্র উদ্দিষ্ট হয়ে পরে ফলবতী হয়েছে। যদিও নাট্যসূচনাপর্বে নটীর আরও একটি উক্তি বীজার্থজ্ঞাপক – "প্রভু, তা হলে তিনি স্বয়ং তুলে নিন যা আমার আছে"[৫২]। তার উত্তরে উপালি জানায় "তাই নেবেন, তোমার পূজার ফুল"[৫৩]। উপালি নটীর কাছে শ্রেষ্ঠ দান ভিক্ষা চেয়েছিল কিন্তু নটী জানত না যে কী তার সেই পরম দান। তাই বলে ভগবান স্বয়ং তার পছন্দের বস্তুটি গ্রহণ করবেন নটীর থেকে। এই "পূজার ফুল" ভক্তির পরাকাষ্ঠা। নটী তার অবিচল ধর্মে কতদূর পৌঁছাতে পারে, তা-ই অনুমান হয় এই নাট্যোক্তিতে। এটিকে বীজ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কিন্তু এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত। মূল রচনার পরবর্তীতে এই অংশটির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল নাট্যসূচনারূপে। তাই যদি এই উক্তিকে বীজরূপে স্বীকার করতে হয়, তবে পরোক্ষভাবে এটি স্পষ্ট যে মূল রচনাটি ছিল বীজশূন্য। অথচ মালতীর সঙ্গে নটীর কথোপকথনে যেহেতু একটি সুস্পষ্ট নাট্যবীজের ইঙ্গিত রয়েছে এবং তা মূলরচনায় প্রথম থেকেই অন্তর্ভুক্ত; তাই সেটিকেই বীজ-এর মর্যাদা দেওয়া উচিত। যদি *নটীর পূজা*-র গ্রন্থায়নের ইতিহাস সম্বন্ধে কোনও পাঠক বা নাট্যগবেষক অনবগত থাকে, তবে তিনি নটী-উপালির কথোপকথনটিকে বীজ-এর স্বীকৃতি দিতেই পারেন এবং তা বেঠিক নয়। যেহেতু এক্ষেত্রে *নটীর পূজা*-র প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে পূর্বেই পাঠগ্রহণ করা হয়েছে, তাই "মুক্তিপথের ধুলো ঐ জলে মরবে" বাক্যটিকেই নাট্যবীজরূপে অভিহিত করাই বিধেয়।

পঞ্চাবস্থার প্রথম অবস্থা আরম্ভ-এর অবস্থান লক্ষ্য করা যায় প্রথম অঙ্কের শেষ দিকে যখন উৎপলপর্ণা জানায় শ্রীমতী বুদ্ধ-জন্মোৎসবে অশোকবনে পূজা নিবেদন করতে চলেছে - "আজ বসন্তপূর্ণিমায় ভগবান বোধিসত্ত্বের জন্মোৎসব। অশোকবনে তাঁর আসনে পূজা-নিবেদনের ভার শ্রীমতীর উপর"[৫৪], তখন রত্নাবলী মনে করে শ্রীমতীর এহেন শ্রদ্ধানিবেদন এক গর্হিত অপরাধ। অথচ রাজকন্যা বাসবী শ্রীমতীর পুণ্যতার কথা সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করে "তাতে অশোকবন দগ্ধ হবে না, শ্রীমতীর শান্তিও থাকবে অক্ষুণ্ন"[৫৫]। তাই মুখ্যফললাভের গতি এই অংশে তরান্বিত হয়েছে ব'লেই এখানে আরম্ভ কার্যের সমাধা হয়েছে।

বীজ এবং আরম্ভ-এর সম্মিলিত দশা-ই মুখসন্ধি। এমনকি সেখানে বিভিন্ন 'রসসম্ভবা' বৃত্তান্তেরও অবকাশ থাকে। সেই প্রসঙ্গে বলতে হয় শ্রীমতীর প্রতি কুচক্রী রত্নাবলীর ক্ষোভ রৌদ্র রসের জন্ম দিয়েছে। শ্রীমতীর প্রতি অসূয়া-র একটি উদাহরণ –

চুপ করে সহ্য কর কী করে বুঝতে পারি নে। ধৈর্য নিরুপায় ইতর লোকের অস্ত্র, রাজার মেয়েদের না।[৫৬]

এখানে প্রথম অঙ্কে দেখা যায় রাজনটী শ্রীমতী কেবলই ভগবৎচিন্তায় মগ্ন। সে তার কর্তব্য কর্মে অবহেলা করেনা। অন্যদিকে রাণী লোকেশ্বরী স্বামী এবং পুত্রের বৈরাগ্যে চঞ্চলা। এমনই সময়ে শ্রীমতী বুদ্ধবেদীতে পূজা করতে উদ্যত হ'লে রত্নাবলী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অথচ শ্রীমতী সে ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করেনা। তাই নাট্যের মুখ্যফললাভের দিশা এখানে শ্রীমতীর প্রতিই অনুসৃত। তাই নটীর পূজা নাট্যের প্রথম অঙ্কটি মুখসন্ধির আবাস স্থল।

- **প্রতিমুখ সন্ধি :**

দ্বিতীয় তথা প্রতিমুখ সন্ধি হ'ল প্রযত্ন অর্থপ্রকৃতির সহায়তায় বিন্দু-র ঔজ্জ্বল্যে ঘটমান এক নাট্যসন্ধি।[৫৭] যেহেতু এই সন্ধিতে নাট্যফল কিঞ্চিৎ পরিমাণে ব্যাহত এবং বিপরীতে চালিত হয়, তাই এখানে সেই অলক্ষিত নাট্যবীজের পুনরুন্মেষ সন্ধাতব্য। *নটীর পূজা*-র দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অঙ্কটিতে প্রতিমুখতার রেশ রয়েছে এমনটিই বলা যায়; তার কারণ উক্ত অঙ্কদ্বয়ে নটীর পূজায় বাধা হেনেছে অজাতশত্রু এবং তৎসহ বিভিন্ন জন। এখানে রত্নাবলীর লোকেশ্বরীর প্রতি প্ররোচনা ও অন্তঃপুররক্ষিণীর কাছে শ্রীমতীর পূজায় বাধা এবং নৃত্যের আহার্য গ্রহণের মধ্যেই প্রতিমুখ সন্ধি প্রস্ফুটিত। বিন্দুরূপে পাওয়া যায় শ্রীমতীর সেই দৃঢ়ভাষণ "মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা"[৫৮]। যখন উৎপলপর্ণার নিগ্রহের সংবাদ এসে পৌঁছায়, তখনই আবহে শ্রুত হয় নটীর শ্রেষ্ঠ দান আসন্ন। উৎপলপর্ণার মৃত্যু এবং পূজায় বাধাপ্রাপ্তিতে বীজ যখন লুক্কায়িত, তখনই শ্রীমতীর স্পষ্টোক্তি নাট্যফলের অণুতা নিয়ে আসে। এরই সঙ্গে প্রযত্ন-ও উপস্থিত হয়েছে শ্রীমতীর রাজাদেশ অমান্য না করার ব্যাপারে। সে জানে তাকে যতই কঠিন বজ্রসম আঘাত আসুক, সে উত্তরণের দিকে অগ্রসর হবেই। তাই তার নৃত্য এবং ভক্তি দুই-ই সমমাত্রিক।

- **গর্ভ সন্ধি :**

এই নাট্যে তৃতীয় তথা গর্ভ সন্ধির[৫৯] বেষ্টনী উন্মুক্ত। এই সন্ধিতে বারংবার 'বীজ' অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও কখনও কখনও সে গ্রহণদশা থেকেও পুনরুন্মোচিত হয়। *নটীর পূজা*-য় বীজ বহুবার অন্তরালে যায়নি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অঙ্কের প্রতিকুল অবস্থা দেখা যায় অজাতশত্রু এবং রত্নাবলীর দৌরাত্ম্যে। সেখানে শ্রীমতী যদি রাজাদেশ লঙ্ঘন করত এবং পুনরায় বন্ধন বা রাজদণ্ড এবং তদবস্থা থেকে মুক্তির প্রচেষ্টার ম'ত জটিল নাট্যদ্বন্দ্ব উত্থাপিত হ'ত, তবে সেটিকে গর্ভ সন্ধি নামাঙ্কিত করা যেত। যেহেতু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অঙ্কে নাট্যফলের বিপরীত স্রোত লক্ষণীয়, তেমনই শ্রীমতীর চরিত্রেরও আদর্শগত ভাবনারূপ নাট্যবীজ ক্রিয়াশীল। তাই দুটি ধারার মিশ্রণ হয়নি; বরং দুটি ধারা আপন গন্তব্যে অভিমুখী। বাধার সঙ্গে সংগ্রামে নাট্যবীজকে ফলে রূপান্তরিত হতে হয়না। বীজ নির্দিষ্ট সময়েই ফলে পরিণত হয়েছে। তাই এই নাট্যটি গর্ভসন্ধিরহিত। পতাকা বৃত্তের প্রসঙ্গে পূর্বেই উৎপলপর্ণার চরিত্রকে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং এই চরিত্রটির স্বীয় ভূমিকা প্রতিমুখ সন্ধিতেই সমাপ্ত হয়েছে।

- **বিমর্ষ বা অবমর্শ সন্ধি:**

যেহেতু গর্ভ সন্ধির অবস্থান নেই, তাই অপায়মুক্তির হেতুস্বরূপ বিমর্ষ বা অবমর্শ সন্ধিও[৬০] এখানে অসিদ্ধ। তবে এই নাট্যে স্বতন্ত্রভাবে প্রকরী বলতে উপালি-র চরিত্রকে নির্দেশ করা যেতে পারে[৬১]। এই 'প্রকরী' একস্থানে স্বল্পদৈর্ঘ্যে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংকেত। উপালি চরিত্রটি পরবর্তীকালীন প্রক্ষেপ হলেও বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণের নিরীখে এই অংশটি প্রকরী অর্থপ্রকৃতির দাবি জানায়। এই চরিত্রটি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর। সে শ্রীমতীকে আশীর্বাদ করে। শ্রীমতীর পক্ষে মালতী অবস্থান করলেও সে কার্যতঃ নটীর শিষ্যা। তাই শ্রীমতীর

দর্শনচিন্তা তাকে প্রভাবিত করলেও মালতীর ব্যতিরেকে শ্রীমতী অপূর্ণ নয়। অর্থাৎ বলা যেতে পারে ভবিষ্যৎকালে শ্রীমতীর যোগ্য উত্তরসূরি মালতী। আবার, বাসবী-ও শ্রীমতীকে মানসিকভাবেই সমর্থন করে কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে সে ক্রিয়াহীন। অথচ উপালি-ই এমন একজন চরিত্র যে শ্রীমতী-কে উদ্বুদ্ধ করে। শ্রীমতী সম্মানিত হয় তার আচরণে। তাই একপ্রদেশস্থিত শ্রীমতী-উপালি-সংবাদ অংশটিকে প্রকরী বলা যায় পারিভাষিক দিক থেকে। এই কথাংশটি নাট্যসূচনায় বিবৃত। তাই বিমর্ষ সন্ধির সঙ্গে এর যোগ নেই এই রবীন্দ্রনাট্যে।

- **উপসংহৃতি বা নির্বহণ সন্ধি :**

পঞ্চম তথা অন্তিম নাট্যসন্ধি নির্বহণ সন্ধি যা ফলযোগ অর্থপ্রকৃতি এবং কার্য অবস্থার সম্মেলনস্বরূপ একটি চূড়ান্ত নাট্যিক পরিস্থিতি[৬২]। যে কোনও নাট্যেই মুখ এবং নির্বহণ সন্ধির অবস্থান অবধারিত। তাই এটি নাট্যে বিরাজমান একথা বলাই বাহুল্য। শুধুমাত্র বলতে হয় এর অবস্থান। *নটীর পূজা*-র চতুর্থ অঙ্কটিই এই সন্ধির নিবাস। এখানে উদ্দিষ্ট ফলসাধন ঘটেছে শ্রীমতী 'নতিনাট্য'-এ। অজাতশত্রুর ভয়ে ভীত না হয়ে সে ভাবনৃত্য প্রদর্শন করেছে এবং তা-ই ছিল তার শ্রেষ্ঠ দান। অতঃপর তার মৃত্যু। তার বীরত্বের চরমতম নিদর্শন এই সমাপ্তি পর্বটি। যেহেতু "মুক্তিপথের ধুলো ঐ জলে মরবে" বা "মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা" এই উক্তিগুলি ফলিত হয়েছে, তাই নাট্যশাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী এখানে ফলযোগ নামক কার্য এবং কার্য নামক অবস্থার সাংকর্যে উপসংহার ঘটেছে।

- **সর্ববৃত্তির বিচারে :**

প্রেক্ষণ উপরূপকের অন্যতম একটি বিশেষণ 'সর্ববৃত্তিসমাশ্রিতম্'। অর্থাৎ এখানে কৈশিকী, সাত্ত্বতী, আরভটী এবং ভারতী এই চারটি বৃত্তিরই ব্যবহার থাকবে এখানে। আরভটী বৃত্তির প্রসঙ্গ পূর্বেই উক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এখন বাকি তিনটি বৃত্তির অবস্থান অনুসন্ধান করতে হবে।

- **কৈশিকী বৃত্তি :**

প্রথমেই আসে কৈশিকী বৃত্তির প্রসঙ্গ। *সাহিত্যদর্পণ* অনুসারে এই বৃত্তি হয় বহু স্ত্রীর আনুকুল্যে নায়কের মনোহারী বেশধারণে বিবিধ ললিত কলার যথেচ্ছাচারে সমৃদ্ধ যা বিবরণ চতুর্থ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে[৬৩]। *নটীর পূজা*-র নাট্যবস্তুতে এরূপ কোনও ঘটনার সুযোগ ঘটেনি। শ্রীমতীর নৃত্যোপযোগী আহার্যের গ্রহণের প্রসঙ্গ রয়েছে কিন্তু তা নিজ অভিরুচিগত কারণে নয়। অজাতশত্রুর নির্দেশে তাকে অশোকবনে নৃত্যানুষ্ঠান করতে হয়। এমনকি এই ঘটনা অজাতশত্রুর কামতাড়িত ভোগলিপ্সাজন্য নয়। কেবলই একটি ধর্মমতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তাকে সমূলে উৎপাটনের জন্যই। শ্রীমতীর প্রতি কোনও কামের ইঙ্গিত অবর্তমান। যেহেতু এই নাট্যে শৃঙ্গার রসের কোনও ধ্বনি নেই, তাই এই বৃত্তি এখানে অসঙ্গত এবং নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এরূপ কোনও কথাংশের সৃজন হয়নি।

- **সাত্ত্বতী বৃত্তি :**

এই বৃত্তি এখানে সমুপস্থিত। বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যাক। এই বৃত্তি সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজের শাস্ত্রীয় বচনটি হ'ল –

সাত্ত্বতী বহুলা সত্ত্ব-শৌর্য্যত্যাগাদযার্জবৈঃ ।
সহর্ষা ক্ষুদ্রশৃঙ্গারা বিশোকা সাদ্ভূতা তথা ।।[৬৪]

অর্থাৎ যে বৃত্তিতে অধ্যবসায়, শৌর্য, ত্যাগ, দয়া এবং ঋজুতা বহুলাংশেই লক্ষিত, যেখানে আনন্দ এবং শৃঙ্গার রস স্বল্প হলেও স্ফুট, যা শোকরহিত এবং অদ্ভুত রসসমাশ্রিত; সেই বৃত্তি-ই সাত্ত্বতী। আবার, এই বৃত্তির চারটি অঙ্গ হল যথাক্রমে উত্থাপক, সাংঘাত্য, সংলাপ এবং পরিবর্তক –

উত্থাপকো'থ সাংঘাত্যঃ সংলাপঃ পরিবর্ত্তকঃ ।
বিশেষা ইতি চত্বারঃ সাত্ত্বত্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ।।[৬৫]

উত্থাপক হ'ল শত্রুপক্ষ থেকে আগত উত্তেজক কোনও বাক্যবাণ – "উত্তেজনাকারী শত্রোর্বাগুত্থাপক উচ্যতে"[৬৬]।*নটীর পূজা*-য় এই অঙ্গটি অত্যন্ত পরিষ্কৃত। অজাতশত্রু শ্রীমতীকে নৃত্যপ্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দিলেও প্রস্তুত ছিলনা যে তার নৃত্যকলার সৌষ্ঠব বাস্তবায়িত করবে। এমনকি তার অদম্য মানসিকতায় ক্রোধের উদ্রেক ঘটেছে রত্নাবলীর-ও। তাই নটীর স্পর্ধায় সে বলে ওঠে "তা হয় হোক, কিন্তু নাচ তার আগেই হবে এও আমি বলে দিচ্ছি"[৬৭]। দ্বিতীয় বৃত্ত্যঙ্গ সাংঘাত্য হ'ল "মন্ত্রার্থৈর্দৈবশক্ত্যাদেঃ সাংঘাত্যঃ সংঘভেদনম্"[৬৮]। এখানে বলা হয়েছে যে কোনও মন্ত্রশক্তি বা অর্থশক্তি বা দৈবশক্তির প্রভাবে সংঘভেদ তথা পৃথক মতের জন্ম-ই সাংঘাত্য। এই বিষয়টিই *নটীর পূজা*-র সারভূত বক্তব্য। শ্রীমতী এবং অজাতশত্রুর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগত একটি পার্থক্য রয়েছে। শ্রীমতী বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী এবং অজাতশত্রু ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। আবার, বিম্বিসারের সঙ্গেও রাণী লোকেশ্বরীর ধর্মচিন্তাগত স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তাই শ্রীমতী যে মন্ত্রের স্মরণ নেয়, তা হ'ল –

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারস্স সনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বোধি মাগচ্ছি অনন্তঞএগাণো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং ।[৬৯]

যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় যিনি বরবোধিবৃকগষমূলে সন্নিহিত, যিনি মারকে বিজয় করেছেন, যিনি অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী; সেই ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করি। আবার অন্যদিকে লোকেশ্বরী স্মরণ করে "নমো বজ্রক্রোধডাকিন্যৈ, নমঃ শ্রীবজ্রমহাকালায"[৭০] মন্ত্র। অর্থাৎ রাণী উপাস্য বজ্রক্রোডাকিনী দেবী এবং শ্রী বজ্রমহাকাল। সুতরাং শান্তস্বরূপ ভগবান বুদ্ধ এবং ক্রুরতার পরাকাষ্ঠা বজ্রডাকিনী-বজ্রমহাকালের একটি আপাতঃ বৈপরীত্য তৈরি হয়েছে শ্রীমতী এবং লোকেশ্বরীর মনোভাবনায়। অর্থাৎ সংঘভেদের বিষয়টি *নটীর পূজা*-র উপজীব্য।

সাত্ত্বতী বৃত্তির তৃতীয় অঙ্গের নাম সংলাপ। এটির লক্ষণ বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে "গভীরোক্তির্নানাভাবসমাশ্রয়ঃ"[৭১]। বিভিন্ন ভাবের ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্য-ই সংলাপ। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতীর "মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা" উক্তিটিই তার প্রমাণ। এই 'মৃত্যু' মরণশীল মানুষের মৃত্যু নয়। এই মরণ অজ্ঞান-অন্ধকারের হনন। সেই মৃত্যুঞ্জয়ী কোনও ব্যক্তি-ই সন্ধান পায় জ্ঞানমার্গের। শ্রীমতীর মৃত্যু বাচ্যার্থে নশ্বর মানুষের মৃত্যু কিন্তু অজাতশত্রু এবং রত্নাবলীর মনে যে কল্মষতার প্রলেপ ছিল, তার মৃত্যুও ঘটে। তাই অজাতশত্রু সেই স্থানে উপস্থিত হতে পারেনা আত্মগ্লানিতে। এমনকি রত্নাবলী-ও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে।

চতুর্থ তথা শেষ বৃত্ত্যঙ্গ পরিবর্তক সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজের অভিমত – "প্রারব্ধাদন্যকার্য্যণাং করণং"[৭২]। আরব্ধ কর্ম থেকে পৃথক পথে গমন-ই পরিবর্তক। অর্থাৎ এখানেও ঘটনার একটি বিপ্রতীপতা সূচিত। নটীর পূজা নাট্যে নটীর পূজায় বাধার বৃত্তান্তটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

এই অঙ্গগুলির উপন্যাস ব্যতীত যদি সামগ্রিকভাবে সাত্ত্বতী বৃত্তির কথা বলতেই হয়, তাহলেও শ্রীমতীর মধ্যে অধ্যবসায়, শৌর্য, ত্যাগ, ঋজুতা এই প্রতিটি বৈশিষ্ট্য-ই দৃষ্টিগোচর হত। অবিচল বুদ্ধভক্তি তার অধ্যবসায়। তার প্রতি অজাতশত্রুর নির্দেশ প্রকারান্তরে তাকে দমনের প্রচেষ্টা। অথচ সে অবদমিত নয়। শৌর্য-বীর্যেই সে প্রতিপক্ষরূপে সংগ্রাম করে। তার মৃত্যুতে ইহকালের মায়াত্যাগ-ই ত্যাগের অভিজ্ঞান এবং এই চরিত্রের ঋজুতা হ'ল তার অপ্রতিরোধ্য মনস্তত্ত্ব। সে কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করেনি রত্নাবলী এবং অজাতশত্রুর প্রতি। তাই তার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। এমনকি বিশোক বা শোকমুক্ত এক বিদূষী নারী শ্রীমতী। নিজের মৃত্যুতে তার জীবননাশের কোনও ভীতি ছিলনা। এই ঘটনাটি বিস্ময় স্থায়িভাবেরই অদ্ভুত রসত্বের প্রাপ্তিযোগ। একমাত্র শৃঙ্গার-এর ধ্বনি এই নাট্যে অনুচ্চারিত। তাই প্রতিটি অঙ্গের উপযুক্ত বিন্যাস এবং গ্রন্থনায় এখানে যেমন 'সাত্ত্বতী' বৃত্তি অনুভূত, তেমনই বীর রসে উৎসাহী।

- **ভারতী বৃত্তি :**

শেষে যদি ভারতী বৃত্তির কথা বলতেই হয়, তবে এক্ষেত্রে তার লাক্ষণিক সঙ্গতি না পাওয়া গেলেও তদ্ভাবানুসারী অনুষঙ্গ এখানে শ্রব্য[৭৩]। এই বৃত্তি নটে (পুরুষ অভিনেতা) প্রযোজ্য এবং এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত গদ্য বা পদ্যের আবৃত্তি। যেহেতু *নটীর পূজা* নারীনির্ভর নাট্য, তাই 'নট'কে এক্ষেত্রে যে কোনও নাট্যস্থ উত্তম পাত্ররূপে বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত। আবার যেহেতু এটি বাংলা ভাষায় রচিত নাট্যকৃতি, তাই উদাত্ত সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ-ও অপ্রাসঙ্গিক। যদিও এই নাট্যে পালি ভাষায় রচিত কিছু বুদ্ধস্তুতি রয়েছে তথাপি সেগুলির দ্বারা এখানে ভারতী বৃত্তির প্রয়োজনসিদ্ধি ঘটেছে এমনটি নয়। এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাণীপ্রধান নাট্যের সঙ্গে এই বৃত্তির সমবেত হওয়ার একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। তাই ভারতী বৃত্তি সম্বন্ধিত আপ্তবাক্যকে আধুনিক কালে বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাট্যে এভাবে পর্যালোচনা করতে হবে যে সেখানে বাচিক অভিনয়ের স্থানাধিক্য রয়েছে কিনা। নাট্যাভিনয়ে 'অনুভাব' বা action *নটীর পূজা*-য় তুলনামূলকভাবে কম। নটীর প্রতি অস্ত্রাঘাত ব্যতীত বাকি অংশগুলি প্রধানতঃ বাচিক অভিনয়েই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। স্বরপ্রক্ষেপণ, শব্দোচ্চারণ, মাত্রাজ্ঞান, পদ্যাবৃত্তি

এমনকি গানের ক্ষেত্রে সুর-তাল-লয়ের সৌষম্য এই নাট্যটিকে মঞ্চায়নে রসালোকিত করতে সক্ষম। এই নাটকে দীর্ঘ নাট্যোক্তি, শব্দালংকার বা অর্থালংকারের ভার অনুপস্থিত। তার পরিবর্তে ক্ষুদ্র বাক্য এবং সরল গদ্যের প্রয়োগ ঘটেছে। তাই বাগভিনয়ে কুশলতা এবং পরিমিতিবোধ নাট্যানুষ্ঠানের জন্য একান্তই প্রয়োজন। অর্থাৎ বাচিক অভিনয়নিমিত্তের বিস্তৃতির জন্যই এটিকে ভারতী বৃত্তিযুক্ত বলা যায়।

❖ **অর্থোপক্ষেপকের প্রেক্ষিতে :**

এই উপরূপক এমনই একটি উপরূপক যা সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজের মত যে এটি প্রধান দুটি অর্থোপক্ষেপকরহিত[৭৪]। পঞ্চবিধ অর্থোপক্ষেপকের মধ্যে বিষ্কম্ভক[৭৫] এবং প্রবেশক এখানে থাকেনা ব'লেই তিনি মনে করেন। বিভিন্ন লক্ষ্যগ্রন্থের উপস্থিতিতেই যেহেতু লক্ষণগ্রন্থে বিধি-নিষেধ বিধৃত হয়, তাই তৎকালীন সময়ে প্রেঙ্খণ জাতীয় উপরূপকে সেগুলির স্থান ছিলনা এমনটিই জ্ঞাত হওয়া যায়। এ সম্পর্কে আরও একটি অকাট্য কারণ হ'ল এটি ছিল একাঙ্কী উপরূপক। যেহেতু *সাহিত্যদর্পণ*-এর দৃষ্টিতে প্রবেশক দুটি অঙ্কের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাজ করে, তাই প্রবেশক এখানে অবৈধ। প্রবেশক সম্পর্কে বিশ্বনাথের স্পষ্টোক্তি – "অঙ্কদ্বয়স্যান্তরিতি প্রথমাঙ্কে'স্য প্রতিষেধঃ"[৭৬]। বিষ্কম্ভক-ও যেহেতু দীর্ঘদিনব্যাপী কোনও ঘটনার জ্ঞাপক, তাই উপবৃত্তবর্জিত স্বল্প চরিত্রে গ্রথিত প্রেঙ্খণ উপরূপকে এই দুটি অর্থোপক্ষেপক অনেকখানিই অপ্রাসঙ্গিক।

নটীর পূজা চার অঙ্কের বন্ধনে গঠিত নাট্য। তাই এক্ষেত্রে উক্ত অর্থোপক্ষেপকদ্বয়ের প্রভূত সম্ভাবনা থেকেই যায়। প্রথম অঙ্কের শুরুতেই লোকেশ্বরী এবং উৎপলপর্ণার কথোপকথনের সারাংশ এই যে রাজগৃহের নৃপতি বিম্বিসার সিংহাসন ত্যাগ করেছেন। এমনকি তার পুত্র চিত্র-ও বৈরাগ্য গ্রহণ করেছে। এমনকি অজাতশত্রু দেবদত্তের শরণার্থী। তাই লোকেশ্বরীর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ফল হয়েছে তার কাছে শূন্য। তাই মূল নাট্যকথাবস্তুর উপস্থাপনার জন্য অতীতে ঘটে যাওয়া বৃত্তান্তগুলি সহৃদয় সামাজিকের কাছে জ্ঞাপন করা আবশ্যক। আবার, যেহেতু নাট্যফললাভে লোকেশ্বরী এবং উৎপলপর্ণার সরাসরি অধিকার নেই, তাই এই দুটি চরিত্রকেই নাট্যমীমাংসায় মধ্যম প্রকৃতির বলা যায়। সুতরাং এই অংশটি বিষ্কম্ভক-এর কার্যক্রম বহন করেছে। তাই *নটীর পূজা*-কে প্রেঙ্খণ উপরূপকের আদর্শগত ভাবনায় পরীক্ষা করতে গেলে এমন একটি রন্ধ্র উপলব্ধ হয় যা প্রেঙ্খণ-এর শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী বৈলক্ষণ্য।

❖ **অঙ্কসজ্জায় :**

প্রেঙ্খণ হওয়া উচিত একাঙ্ক উপরূপক কিন্তু নটীর পূজায় মোট চারটি অঙ্ক লক্ষ্য করা যায়। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে অঙ্কের লক্ষণে পাওয়া যায় – "একদিবসপ্রবৃত্তপ্রবৃত্তং কার্যস্ত্বঙ্কো'র্থবীজমধিকৃত্য"[৭৭]। অর্থাৎ একটি অঙ্ক একটি দিনেরই ঘটনা প্রদর্শিতব্য। এখানে *নটীর পূজা*-র নাট্যবস্তুটি একটি দিনেরই ঘটনা এবং সেই বিশেষ দিনটি বসন্তপূর্ণিমার তিথি। একটি দিনের ঘটনাকেই চারটি অঙ্কে বিভক্ত করা হয়েছে। এহেন অঙ্কবিন্যাসপদ্ধতি *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণেও দেখা যায়। যেমন ষষ্ঠ এবং সপ্তম অঙ্ক একটি নির্দিষ্ট দিনের দিবাভাগেরই ঘটনা। ষষ্ঠ অঙ্কে

বসন্ত সেনা এবং আর্যকের শকট-বিভ্রাটের হেতু এবং ফল দুটি অঙ্কে সমুপন্যস্ত। অর্থাৎ একটি অঙ্কে একটি নির্দিষ্ট দিনের কথা ব্যক্ত হলেও এমনটি বলা যায়না যে একাধিক অঙ্কে একটি দিনের ঘটনাকে খণ্ডিত করা যাবেনা বা যায়নি। এই নাট্যের চারটি অঙ্ককে যেভাবে স্থাপনা করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় –

প্রথম অঙ্ক : বসন্তপূর্ণিমায় অশোকবনে শ্রীমতীকর্তৃক দেবপূজার সংকল্পগ্রহণ। সঙ্গে রত্নাবলীর অসূয়াপ্রকাশ।

দ্বিতীয় অঙ্ক : অন্যান্য রমণীগণের সঙ্গে শ্রীমতীর পূজাস্থলে যাত্রা, যাত্রাপথে বিঘ্ন, উৎপলপর্ণার মৃত্যু এবং নৃত্যকলাপ্রদর্শনের জন্য শ্রীমতীর প্রতি অজাতশত্রুর নির্দেশ।

তৃতীয় অঙ্ক : নৃত্যের জন্য শ্রীমতীর প্রস্তুতি এবং রত্নাবলীর ঈর্ষান্বিত হওয়া। নেপথ্যে বিম্বিসারের মৃত্যুসংবাদের রটনা।

চতুর্থ অঙ্ক : অশোকবনে শ্রীমতীর নৃত্যপ্রদর্শন এবং তার মৃত্যু।

একদিবসীয় এই ঘটনার চারটি স্তর রয়েছে। প্রথমাঙ্কে শ্রীমতীর চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে এবং তৎসহ লোকেশ্বরী এবং রত্নাবলীর বিপরীত মেরুতে অবস্থানের ইঙ্গিতও রয়েছে। তাই দ্বিতীয় অঙ্কে রত্নাবলীর ছলনা এবং কপটতার চরমতম নিদারুণ নিদর্শন এই অঙ্কে বিন্যস্ত হলে তারল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেত। তৃতীয় অঙ্কটি দ্বিতীয় অঙ্কের সাপেক্ষে অধিকতর উন্নত। সেখানে শ্রীমতীর কণ্টকাকীর্ণ পথে গমনের প্রত্যয় দর্শিত এবং শেষ অঙ্কে তার আশু পরিণাম বিধৃত। তাই এমনটি নয় যে অঙ্কসজ্জা বিকৃত হয়েছে। সন্ধিগুলিকে পৃথকীকরণ-ও এভাবে আদর্শীভূত হয়েছে নাট্যতত্ত্বের দিক থেকে। অর্থাৎ অঙ্কের বিচারে এটি প্রেক্ষ্মণ-এর লক্ষণ থেকে বিচ্যুত।

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনায় বস্তু, নেতৃচরিত্র, রস, সন্ধি, বৃত্তি, অর্থোপক্ষেপক এবং অঙ্কের ম'ত নাট্যশাস্ত্রীয় বিধিবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেক্ষ্মণ-এর সঙ্গে *নটীর পূজা* যে দিকগুলি থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছে, সেগুলি হ'ল –

- নাট্যকথাবস্তুতে ভারতীয় ইতিহাসের অবলম্বন।
- একজন দুশ্চরিত্র নায়কের রাষ্ট্রচিন্তাজনিত জটিল মনস্তত্ত্বের রচনা।
- বীররসের প্রাধান্য।
- মুখ, প্রতিমুখ এবং নির্বহণ সন্ধির সমাহার।

এবং *নটীর পূজা*-র মধ্যে প্রেক্ষ্মণ নাট্যধারার যে বৈশিষ্ট্যগুলি রিক্ত, সেগুলি হ'ল –

- বিষ্কম্ভকহীনতা।
- একাঙ্কধর্মিতা।
- কৈশিকী বৃত্তির মূর্ছনা।

৫.৪ প্রেক্ষণ ও *নটীর পূজা* : অন্তরঙ্গ সাযুজ্য :

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রেক্ষণ-এর বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্যাবলি দ্বারা *নটীর পূজা*-র মাননির্ণয়ের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এরপর আসে অন্তরঙ্গ সাযুজ্যের প্রসঙ্গ। তবে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সঙ্গে এই অন্তরঙ্গ সাযুজ্য নির্ণয়ের একটু পার্থক্য রয়েছে। এই অন্তরঙ্গ সাযুজ্যটি নটীর পূজা-র ক্ষেত্রে তার মঞ্চাভিনয়কৌশলের ওপরেই নির্ভরশীল। অর্থাৎ বহিরঙ্গ সাযুজ্যকে যদি theory ধরা হয়, তবে অন্তরঙ্গ বিষয়টি হ'ল pratice। এখানে এই সামগ্রিক বিষয়টিকে প্রথমে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগটি হয় মুখ্য এবং দ্বিতীয় ভাগটি গৌণ। মুখ্য ভাগটিকে কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হবে। তার মধ্যে রয়েছে নৃত্যপরিকল্পনা, আঙ্গিক অভিনয়ভঙ্গী এবং নাট্যস্থ পাত্রপাত্রীর লিঙ্গসাম্যতালিঙ্গসাম্যতা। অন্যদিকে গৌণ বিভাগের মধ্যে থাকছে মঞ্চায়নরীতি এবং নাট্যে অদর্শনীয় বিষয়ের অবতারণা। অর্থাৎ গৌণ দিকটি প্রধানতঃ প্রয়োগকৌশলের ওপর আধারিত। বিষয়টি এখানে আলোচিত হবে, তা হ'ল নৃত্যের পরিগ্রহণরীতি। এই বিষয়টি বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ দিকের সেতু। নাট্যটির রচনাকালে নাট্যকার নৃত্যপদ্ধতি নথিবদ্ধ করেননি। অথচ এই নাট্যের প্রযোজনায় নৃত্যের আবশ্যকতা রয়েছে। এটি ছাড়া নাট্যাভিনয় সম্ভব নয়। তাই সেদিক থেকে ভাবতে গেলে এটিকে অন্তরঙ্গা বিধি ব'লেই গ্রহণ করতে হয়। তাই *নটীর পূজা*-য় প্রযুক্ত নৃত্যাঙ্গিক ক'তখানি উপরূপকোচিত ছিল বা ভবিষ্যৎকালের সম্ভাবনা ক'তখানি রয়েছে সে বিষয়টি দেখা যাক।

❖ **মুখ্য অন্তরঙ্গ সাযুজ্য :**

নটীর পূজা একটি প্রেক্ষণরূপী নাট্যনির্মাণ কিনা; তার যথাযথ বোধের জন্য আঙ্গিক অভিনয় রীতিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেই হয়। নৃত্য প্রকারান্তরে আঙ্গিকাভিনয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু *নটীর পূজা*-য় শ্রীমতীর নৃত্যের একটি ভূমিকা রয়েছে, তাই তাকে সামান্য বা সাধারণ আঙ্গিক অভিনয় অপেক্ষা একটি পৃথক মর্যাদা দিতেই হয়। তাই এই মুখ্য বিভাগটিকে যথাক্রমে নৃত্যের পারিপাট্য এবং ঔচিত্যবোধ প্রথমে আলোচিত হওয়ার পরে সামান্য আঙ্গিক অভিনয় এবং তদনন্তর পাত্রপাত্রীর লিঙ্গসাম্যতার দিকটি বিচার করা যেতে পারে।

- **নৃত্যপরিকল্পনা :**

এটি এমনই একটি রবীন্দ্রনাট্য যেখানে সর্বপ্রথম পরিকল্পিত এবং পরিশীলিত পদ্ধতিতে নৃত্যোপাস্থাপন করা হয়েছে। শেষ অঙ্কের নমো হে নমো গানটিতেই মণিপুরী নৃত্যপদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। এই নৃত্যপরিবেশনা সম্পর্কে বিভিন্ন সহৃদয় প্রেক্ষক তথা মনীষীদের অভিমতগুলির উল্লেখ করা যাক।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) এবং রানী চন্দের (১৯১২-১৯৯৭) গ্রন্থ *ঘরোয়া*-তে এই নৃত্যের বিবরণীতে রয়েছে –

নটীর পূজার অভিনয় হল - নন্দলালের মেয়ে গৌরী নটী সেজেছে। ও যখন নটী হয়ে নাচল সে এক অদ্ভুত নাচ। অমন আর দেখিনি।[৭৮]

প্রমথনাথ বিশীর *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন* গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথের অভিনয়' অধ্যায়ে গৌরী বসুর নৃত্য ছিল 'পূজানৃত্য' –

'নটীর পূজা' লিখিত হইলে আশ্রমে প্রথম অভিনীত হয়। গৌরীর নটীর পূজানৃত্য তো লোকপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।[৭৯]

আবার, রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সাহানা দেবীর (১৮৯৭-১৯৯০) 'কবির সংস্পর্শে' স্মৃতিকথায় *নটীর পূজা*-র নৃত্যের প্রতি যে মন্তব্যটি ধর পড়ে, তা হ'ল –

তখন নাচের টেক্নিক্ এত আয়ত্ত হয়নি এদের কারও। কিন্তু টেক্নিক্ না জেনেও গৌরী নাচের মধ্যে দিয়ে যে ভক্তিরস ফুটিয়ে তুলেছিল তার তুলনা নেই। তেমন আর আজও চোখে পড়লনা। সমস্ত ভিতরকে সে বাইরে সামনে বের করে এনেছিল, ফুটিয়ে তুলেছিল নাচের অপরূপ ভঙ্গিমার মধ্যে। ... 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো নমো হে নমো' গানটির সঙ্গে গৌরীর সে অপূর্ব নাচের ভাবব্যঞ্জনায় সকলেই সমভাবে অভিভূত হয়েছিল নয়নে জল নিয়ে, সে ভুলবার নয়।[৮০]

আবার এই নৃত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অনেকখানিই ব্যক্ত হয়েছে নির্মলকুমারী মহলানবিশের (১৯০০-১৯৮১) বয়ানে। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের (১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ) *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় 'পত্রাবলী' শিরোনামে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে পরিশিষ্ট অংশে নির্মলকুমারী মহলানবিশের কিছু প্রত্যক্ষ উক্তি মুদ্রিত হয়েছে। সেখানেই রবীন্দ্রনাথের নির্দেশের কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় –

কবি গৌরীকে বললেন 'শ্রীমতীর নাচটাতো আমি নিজে করে তোকে দেখিয়ে দিতে পারবো না, ওটা তোকেই তৈরী করতে হবে। শুধু এই কথাটা মনে রাখিস যে খালি ঐ নাচটার উপরেই সমস্ত নাটকটার সাফল্য নির্ভর করছে। শ্রীমতীর মনের ভক্তি ও উপাসনা তোকে নাচের প্রত্যেকটা ভঙ্গী দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। খুবই শক্ত, কিন্তু আমার বিশ্বাস তুই ঠিকই পারবি।'

... একটা কথা কবি গৌরীকে বারবার বলেছিলেন যে, 'নাচটা দেখে যেন কারও মনে না পড়ে যে ওটা নাচ। লোকে যেন উপাসনা বলেই ওটাকে দেখতে পায়।' হোলোও তাই।... মনে হোলো সত্যি সত্যিই উপাসনা হচ্ছে এবং আমরা সেই উপাসনায় যোগ দিচ্ছি।[৮১]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) কর্তৃক সম্পাদিত *প্রবাসী* পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ) শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকো-তে অভিনীত *নটীর পূজা*-র সমালোচনামূলক 'বঙ্গে নাট্য ও নৃত্য' প্রবন্ধে যে প্রতিবেদনটি বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, তা হ'ল –

The superb dancing introduced in the acting of the play by the poet's pupils has been hailed as the first step forwards the revival of a dead art among Bengalis.[৮২]

পদ্মশ্রী পুরস্কার-প্রাপ্ত নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৭৪)-র স্মৃতিচারণামূলক একটি গ্রন্থ *নিজেরে হারায়ে খুঁজি : প্রথম পর্ব*-এ জোড়াসাঁকোয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রযোজিত *নটীর পূজা*-র যে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা নিম্নলিখিত –

নাটকে শ্রীমতীর নাচ ছিল। 'শ্রীমতী' সেজেছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী দেবী। তিনি –"ক্ষম হে ক্ষম- নমো হে নমো-তোমায় স্মরি হে নিরুপম, নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে" গানটির সঙ্গে যে-নৃত্য প্রদর্শন করলেন, তার একটা বিশেষত্ব ছিল। আমাদের রঙ্গালয়গুলিতে যে-সব নাচের প্রচলন ছিল, এ নাচ সে ধরণের নয়, এ দেখলাম, একেবারে অন্য। রঙ্গালয়ের প্রচলিত নাচের ঢং ছিল যে-শ্রেণীর, সে হচ্ছে উত্তর-ভারতীয়, খানিকটা 'কথক'-ঘেঁষা। কিন্তু নটীর পূজা-র নাচের পরিকল্পনা ছিল ভিন্নতর। . .. মঞ্চে ভদ্রমহিলার নাচ দেখলাম আমরা সেই প্রথম। অন্তত তার আগে মঞ্চে কোনো ভদ্রমহিলার নাচ দেখেছি, একথা মনে পড়ে না।[৮৩]

অর্থাৎ উপরিউক্ত সমালোচনাগুলি থেকে যে বিষয়টি বোদ্ধব্য, তা হ'ল *নটীর পূজা*-র দৃশ্যায়নে "আমায় ক্ষম হে ক্ষম" গানটির সঙ্গে গৌরী বসুর মণিপুরি নৃত্যশৈলিটি ছিল ভাবপ্রধান এবং সেই নৃত্যে সাত্ত্বিক অভিনয় ছিল হৃদয়াবেগপূর্ণ। সেখানে আঙ্গিক এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ের সাংকর্য নাট্যের সারভূত বিষয়কে অনেকখানিই তরান্বিত করেছিল এবং নৃত্যটি নাট্য থেকে অবিছিন্ন আকারেই নান্দনিকতা সহকারে নাট্যায়িত হয়ে উপস্থাপিত হয়েছিল।

সুতরাং উপরূপকের যে নৃত্যকল্পনা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে এই নাট্যগত নৃত্যসৌষ্ঠব অনেকখানিই পৃথক ছিল। 'পদার্থাভিনয়'-এর সংজ্ঞা এবং স্বরূপ সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে যা আলোচিত হয়েছে, তার সঙ্গে এই নৃত্যের পরিকল্পনা এবং উপস্থাপনায় বিস্তর ব্যবধান। "আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো" গানটির শব্দ এবং ভাষার বন্ধন থেকেই প্রমাণিত এখানে প্রতি শব্দের অনুকারী অঙ্গাভিনয় প্রযোজ্য নয়। "কানন হতে তুলিনি ফুল, মেলেনি মোরে ফল" এই বাক্যটির গূঢ়ার্থ লৌকিক জগতে কোনও নারীর পুষ্পচয়ন নয়। এটি তার পূজার অর্ঘ্যের সীমাকে অতিক্রম করা এক অনন্ত অপারের দিকে যাত্রার সুরধ্বনি। তাই এখানে পুষ্পাবচয়নের মুদ্রার সাহায্যে বিষয়টিকে অভিব্যক্ত করার প্রয়োজন পড়েনা। এই সম্পূর্ণ বাক্যের ভাবার্থ-ই অভিব্যক্ত হওয়ার উপযুক্ত। রবীন্দ্রসংগীতের এটিই বিশেষত্ব। তাই যা ক্ষুদ্রবিশেষ, তাকে বৃহত্তর সামান্যের উদার ভূমিতে উপন্যস্ত করার জন্যই রবীন্দ্রনৃত্যের সৃজন। *উন্মত্তরাঘব* নামাঙ্কিত প্রেক্ষণক নাট্যে রামের যে শরীরী ভাবপ্রকাশের অবকাশগুলি রয়েছে, তার সঙ্গে *নটীর পূজা* -র এই গানের আবেদন সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। সেখানে কবিত্বের আস্ফালন রয়েছে। সেই কবিত্বকেই লীলায়িত ভঙ্গিমায় নৃত্যের কায়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অথচ এই রবীন্দ্রসংগীতটিতে কবিত্ব অপেক্ষা বক্তব্যকেই প্রধান ক'রে সহৃদয়ের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে হবে। এছাড়াও *নটীর পূজা*-র চারটি অঙ্কজুড়েই নাট্যোক্তির মধ্যে অতিরঞ্জন অনুপস্থিত। সরল বাক্য-ই প্রতিটি চরিত্রের বক্তব্যের প্রকাশক। প্রতিটি দৃশ্যে গানের সংযোজনা নাট্যের অলংকারস্বরূপ। এমনকি সেই গানগুলির সঙ্গে নৃত্যের সম্পর্ক নেই। তাই এটিকে

'নৃত্যসুলভ নাট্য' বলা যায়না। এখানে গান এবং নৃত্যের প্রসঙ্গ এসেছে নাট্যের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই। সূচনাংশে উপালির "পূর্বগগনভাগে" গানটি নৃত্যপরিহিত একটি গান-ই। নাট্যনির্দেশনায় সেখানে তার সঙ্গে নৃত্যের অন্তর্ভুক্তি বিসদৃশ। যেখানে মালতীকে গীতিশিক্ষার প্রসঙ্গ বিধৃত হয়েছে, সেখানে শ্রীমতী গান গায় এবং যেখানে অজাতশত্রুর আদেশে তার নৃত্যপরিবেশনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, সেখানে সে নৃত্যাভিনয় করেছে। এমনকি শ্রীমতী ব্যতিরিক্ত লোকেশ্বরী, রত্নাবলী প্রভৃতি চরিত্রগুলির মধ্যে কৌমল্য না থাকায় সেখানে অভিনয়কৌশলে 'নাট্যধর্মিতা' অনৌচিত্য দোষে দুষ্ট হয়ে যায়। একমাত্র শ্রীমতীর জন্যই নৃত্য বিধেয়। তাই যদি উপরূপককে বাচ্যার্থপ্রধানীভূত শরীরী প্রবণতায় অভিনেয় দৃশ্যশ্রব্যরূপেই স্বীকার করতে হয়, তবে সামগ্রিকভাবে এই রবীন্দ্রনাট্য তদপেক্ষা দূরবর্তী। আবার অষ্টাদশ উপরূপকের পরস্পরের মধ্যেও যেহেতু স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা রয়েছে, তাই প্রেঙ্খণ নামক উপরূপকটি নাটিকা, ত্রোটক, সট্টক, বিলাসিকা, শ্রীগদিত অপেক্ষা অনেকখানিই পৃথক। এটি অনুভাবী নাট্যকলা। আরভটী, সাত্ত্বতী বৃত্তির দায়িত্ব-ই অভিনেতার কায়িক অনুভাবগুলিকে সূক্ষ্মভাবে ব্যক্ত করা। তাই উপরূপকমাত্রেই যে গীতিসুলভ অঙ্গাভিনয়সর্বস্ব লঘু অথচ মনোরঞ্জক কোনও নাট্যনির্মিতি এই ধারণা অশিক্ষিতপটুত্বের নির্দশন। প্রেক্ষণক যদিও বা নৃত্যানুগ হয়ে থাকে, প্রেঙ্খণ সেটির দ্বারা প্রভাবিত হয়নি।

এরপর অন্তরঙ্গতার যে দ্বিতীয় বিষয়টি আলোচিতব্য, তা হ'ল রসানুকুল আঙ্গিক অভিনয়চাতুরী। যেহেতু বীর এবং রৌদ্র রসে যুদ্ধবিগ্রহ, বলপ্রয়োগ ইত্যাদির ভূমিকা থাকে, তাই আঙ্গিক অভিনয়ের দিকটিও লক্ষণীয়।

- **আঙ্গিক অভিনয়ভঙ্গী :**

বিশ্বনাথ কবিরাজের *সৌগন্ধিকাহরণ* একটি প্রেক্ষণক নাট্যবিশেষ। দ্রৌপদীর মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য পাণ্ডব ভীমসেন সৌগন্ধিকা পুষ্প আনয়ন করেন এক দুর্গম স্থান থেকে। পথিমধ্যে হনূমান এবং কুবেরের সঙ্গে তার কিঞ্চিৎ বাকযুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় এই নাট্যে। সৌগন্ধিকার জন্য অপরাজিত ভীমসেনের দুর্বার গতি এবং সংকল্পে অটলতা এবং অজেয় উৎসাহ-ই নাট্যটিকে বীররসে রঞ্জিত করেছে। নাট্যের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে "তেন কবিনা প্রণীতমভিনবং সৌগন্ধিকাহরণং নাম প্রেক্ষণকমস্মাস্বভিনীতপূর্বমাস্তে"[৮৪]। সুতরাং এটি একটি উপরূপক এ বিষয়ে কোনও সংশয় থাকেনা। সমগ্র নাট্যটিতে ভীমসেন, হনূমান, কুবের, যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, নকুল, সহদেব এবং কঞ্চুকীকে পাওয়া গেলেও বেশিরভাগ অংশেই ভীমসেন এবং হনূমানের কথোপকথন। এখানে নারীচরিত্র কেবলমাত্র দ্রৌপদী কিন্তু তা নাট্যের শেষাংশে স্বল্পপরিসরে প্রবিষ্ট। অর্থাৎ যুদ্ধাত্মক বীররসপ্রধান এই উপরূপকে আলম্বন বিভাব পুরুষ চরিত্রেরই প্রাকট্য বর্তমান। তবে এখানে অঙ্গরসের স্থান অধিকৃত হয়েছে রক্তবর্ণের রৌদ্রের প্রভাবে। এখানেও উপরূপকের ধারা মেনেই গদ্যাংশ কিঞ্চিৎ এবং পদ্যাংশ সিংহভাগ জুড়ে অবস্থান করেছে। প্রস্তাবনার পরেই ভীমসেনের বীরবিক্রমসূচক শ্লোকগুলির রচনা। এটি প্রেক্ষণক জাতীয় নাট্যরচনা হলেও *উন্মত্তরাঘব* অপেক্ষা এর ভার অনেকখানিই অধিক। এখানে পুরুষ চরিত্র থাকলেও রামের ম'ত ললিত নয়। যেমন ভীমসেনের কণ্ঠে উক্ত একটি শ্লোক হ'ল –

পরীক্ষিতুমিযং মম প্রগটমাত্মনি স্নিগ্ধতাং ।
বলং চ ভুজদণ্ডযোর্নিযতমেবমভ্যুদ্যতা ।।
কুবেরমপি বিক্রমাদ্যুধি বিজিত্য নিষ্পাদিতে ।
বিধাবিহ মযা ত্বদা দ্বযমিযং চ বৈৎস্যত্যসৌ ।।[৮৫]

এই ধরণের শ্লোকগুলির ধ্বনি রসের উদ্দীপন বিভাবস্বরূপ। এমনকি এই নাট্যের আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রেঙ্খণ-এর যাবতীয় লক্ষণ সঙ্গতিরক্ষা করে। অথচ বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রেক্ষণক-এর পরিবর্তে প্রেঙ্খণ নামের কেন উপরূপককে স্বীকার করলেন, তা নির্ণয় করা দুষ্কর। এমনকি পাণ্ডুলিপিগত লিপিপ্রমাদ এবং পাঠগ্রহণ হয়েছিল কিনা তার সঠিক হদিশ নেই। এই *সৌগন্ধিকাহরণ*-কে যদি আদর্শ প্রেক্ষণক বা প্রেঙ্খণ হিসেবেই গ্রহণ করা হয়, তাহলে দেখা যায় এটি সম্পূর্ণ নৃত্যবর্জিত দৃশ্যশ্রব্যকাব্য। ভারতী বৃত্তি তথা নাট্যোক্তির মাধ্যমেই সাত্ত্বতী এবং আরভটী বৃত্তির আভাস রয়েছে। ভীমসেনের বাহুবলের প্রশংসা-ই ব্যক্ত কিন্তু বাহুবলপ্রয়োগের বা কোনও পৌরুষ প্রদর্শনের কোনও অবসর নাট্যকার রাখেননি। এমন একটি শ্লোকের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে কুবেরের সঙ্গে ভীমসনের বাক্যবিনিময়ে নায়ক ভীমসেনের উষ্মা প্রকাশিত হয়েছে এবং সে তার শানিত অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে তার বীরত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে।

নিষ্ঠযূতা ধনুষঃ কৃতান্তহৃদযানন্দৈকনান্দীকরাঃ ।
বেগক্ষুণ্ণকঠোরকঙ্কটপুটপ্রচ্ছেদলব্ধান্তরাঃ ।।
নির্ভিন্নাবযবপ্রসারিরুধিরস্রোতঃসহাবর্জিতৈঃ ।
প্রাণৈর্বো যুধি মৃ(ষ্ট ?) ভোজিন ইমে তৃপ্যন্তু মে সাযকাঃ ।।[৮৬]

এটি রৌদ্ররসের ব্যঞ্জনা এবং ভীনসেনের এই উক্তির পরেই নাট্যনির্দেশ রয়েছে "ইতি ধনুরাস্ফালযন্নিষ্ক্রান্তঃ"। এই কার্য (action) নাট্যের মাত্র কয়েকটি স্থানেই ব্যক্ত। বিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণ*-এ রৌদ্র রসের অনুভাব সম্পর্কে বলেছেন –

ভ্রূবিভঙ্গৌষ্ঠনির্দ্দেশবাহুস্ফোটনতর্জ্জনাঃ ।
আত্মবদানকথনমাযুধোৎক্ষেপণানি চ ।।
অনুভাবাস্তথাক্ষেপক্রূরসন্দর্শনাদযঃ ।[৮৭]

অর্থাৎ ভ্রূকুটি, ওষ্ঠদংশন, বাহুস্ফোট, তর্জন, আত্মকীর্তিকথন, অস্ত্রনিক্ষেপ, আক্ষেপ, ক্রূরতা সহকারে দৃষ্টিপাত এগুলিই হ'ল রৌদ্ররসানুসারী অনুভাব। এগুলির মধ্যে অস্ত্রসংযোজনায় আহার্য এবং অ। আঙ্গিকের আশ্রয়েই কর্তব্য। এটি ব্যতীত বাকি অনুভাবগুলি অঙ্গ এবং উপাঙ্গের দ্বারা অভিনেয়। সেখানে আহার্যের ভূমিকা নেই। আবার, আত্মকীর্তিকথনের জন্য বাচিক অভিনয় দায়ী। অর্থাৎ রৌদ্ররসপ্রকাশক অনুভাবগুলির জন্য অস্ত্রনিক্ষেপ ব্যতীত বাকিগুলির ক্ষেত্রে নাট্যনির্দেশ লঙ্ঘিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই নাট্যকারকে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগের

বিষয়টিকে সচেতনভাবে নেপথ্যে প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে ভীমসেন শুধু ধনুকের আস্ফালন করে কিন্তু শরযোজনা করেনা। তাই রৌদ্র রসটি যে অনভিব্যক্ত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমনটি নয়। *সৌগন্ধিকাহরণ*-এর ভীমসেনোক্ত একটি শ্লোকের উল্লেখ করা যাক।

যঃ প্রাচ্যাং দিশি রাজকং ভুজবলোৎসিক্তং বিজিত্যাহৃতৈ-
-রর্থৈঃ সংভৃতরাজসূযমকৃত জ্যেষ্ঠং নিজভ্রাতরম্ ।
ভীমঃ সো'যমুপাগতো ভুবমিমাং সৌগন্ধিকৈরুৎসুকো-
-স্তস্মৈ শংসত বর্ত্ম যেন ধনদক্রীডাসরঃ প্রাপ্যতে ।।[৮৮]

এখানে ভীমসেন তার বংশগৌরবের কীর্তিগাথার উল্লেখ ক'রে নিজোদ্দেশ্য সাধনের কথা ব্যক্ত করেছে। তাই আত্মশ্লাঘার বিষয়টি পরিস্ফুট। আবার, এখানেই তার গর্ব বা 'মদ'-এর সঙ্গে উগ্রস্বভাবের চিহ্ন সমহিমায় বিদ্যমান। এই 'উগ্রতা' রৌদ্ররসেরই ব্যভিচারী ভাব। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকারের বিধান –

উগ্রতাবেগরোমাঞ্চস্বেদবেপথবো মদঃ ।।
মোহমর্ষাদযস্তত্রভাবাঃ স্যুর্ব্যভিচারিণঃ ।[৮৯]

"অযে পাণ্ডব, মর্কট খল্বসৌ কিমেবমতিভূমিমারোপ্যতে"[৯০] বাক্যে যখন হনূমান ভীমসেনকে 'মর্কট' ব'লে সম্বোধন করে, তখনও ভীমসেনের সক্রোধে একটি বচন রয়েছে যেখানে রৌদ্র রসের অভিব্যক্তির সম্ভাব্যতা পরিষ্কৃত – "অরে কিমাত্(থ..) মর্কট ইতি। মমাপ্যগ্রতঃ কিমষমতিবাদঃ। কিং ত্বরে দুর্বিগন্ধ"[৯১]। এখানে পুনরায় তার ক্রোধ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ধরা দিয়েছে। আবার,যেহেতু নাট্যটির মূল রস যুদ্ধবীর, তাই বীর রসের কিছু উপসর্গ অনুসন্ধান করা যাক। বীর রসের আলম্বন বিভাবপ্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণ*-এর বক্তব্য – "আলম্বনবিভাবাস্তু বিজেতব্যাদযঃ মতাঃ"[৯২]। অর্থাৎ বীর রসের আলম্বন বিভাব হ'ল 'বিজেতব্য' এবং তদ্‌গ্রন্থানুসারেই এর অনুভাব হ'ল অন্বেষণ – "অনুভাবাস্তু তত্র স্যুঃ সহাযান্বেষণাদযঃ"[৯৩]। সৌগন্ধিকা পুষ্পের জন্যই ভীমসেনের অন্বেষণ। তার জন্য তাকে হনূমান এবং কুবেরের সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিমুখ সন্ধির সেই অপায়গুলিকে নিরস্ত ক'রে যাওয়ার মধ্যেই উৎসাহের ব্যঞ্জনা। তাই তার বীরত্ব নাট্যে পুর্ণাঙ্গরূপে ধ্বনিত এবং সহৃদয়বেদ্য। উত্থাপক, সাংঘাত্য, সংলাপ এবং পরিবর্তক এই চারটি সাত্ত্বতী বৃত্ত্যঙ্গও অনুভাবপ্রধান নয়। এগুলি নাট্যগঠনেরই যৌগিক ক্রিয়া। উত্থাপক যদি উত্তেজক বাক্যবাণ হয়, তবে তা ভীমসেনের সঙ্গে হনূমান এবং কুবেরের কথোপকথনেই ব্যক্ত। আবার দুটি বিরোধী পক্ষের অবস্থানে যে সাংঘাত্যের জন্ম, তাও উক্ত চরিত্রগণের মধ্যেই নিহিত। সংলাপ বাগভিনয়প্রধান; কারণ তা ব্যঞ্জনাধর্মী নাট্যোক্তির মাধ্যমেই গঠিত হয়। আবার, পরিবর্তকের বিষয়টিতে নাট্যগ্রন্থিরই এককালীন দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি। তাই এই চারটি বিষয়ে অনুভাব বা শরীরী করণের প্রাবল্য নেই। *সৌগন্ধিকাহরণ* বা বলা ভালো প্রেক্ষণক কিংবা প্রেঙ্খণ উপরূপকমাত্রেই যে নাট্যচরিত্রের অস্থিরতা একটি বিধ্বংসী যুদ্ধ বা ক্ষত্রিয়ত্বসূচক সংগ্রামের পটভূমিকা উপস্থাপন এমনটি নয়। এখানে নাট্যোদ্দিষ্ট ফলোপায়ের বাধা থাকবে এবং নাট্যচরিত্রের ভাব, ভাষা এবং ভঙ্গীটিই কেবল যুদ্ধনির্মাণের সম্ভাবনা প্রগাঢ় করবে। তাই নিঃসন্দেহে

এটি বাচিক অভিনয় বা ভারতী বৃত্তিকে উপজীব্য করে। যেহেতু প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত নাট্যে যুদ্ধবিগ্রহের ম'ত দৃশ্য নাট্যশাস্ত্রজ্ঞদের মতে অনুমোদিত ছিলনা, তাই এক্ষেত্রে ভীমসেনের সঙ্গে হনূমানের বাকযুদ্ধব্যতীত হস্তাভিনয়ের মাধ্যমে উভয়ের সংঘর্ষের প্রসঙ্গ অসম্ভব। তাই সংফেট-এর ম'ত আরভটী বৃত্ত্যঙ্গের প্রেঙ্খণ নাট্যে উপস্থিতি অর্থে উপরিউক্ত বিমর্ষ সন্ধির অঙ্গের লক্ষণটিকেই গ্রহণ করতে হবে যেখানে সরোষে কিছু বাকযুদ্ধের গাম্ভীর্য প্রদর্শিত হবে। বালিবধ নাট্যটি যেহেতু বর্তমানে অবলুপ্ত,তাই ওই নাট্যে রাম-সুগ্রীব-বালির মধ্যে কীরূপ বাকযুদ্ধকৌশল প্রদর্শিত ছিল, তা জানা যায়না। যেহেতু *সৌগন্ধিকাহরণ* প্রেক্ষণক বা প্রেঙ্খণটি অদ্যাবধি অক্ষত রয়েছে, তাই এটিকে আদর্শ ক'রেই *নটীর পূজা*-কে বিশ্লেষিত করতে হবে।

নটীর পূজা নাট্যেও ভারতী বৃত্তি তথা বাচিক অভিনয়ের আশ্রয়েই অন্যান্য বৃত্তির ধারণা স্ফুট হয়েছে। মঞ্চোপরি অজাতশত্রুর আস্ফালনের কোনও উল্লেখ নেই বা বৌদ্ধদের সঙ্গে দেবদত্তের বিরোধের দৃশ্যটিও উপলব্ধ নয়। তাই সংফেটাদি ইত্যাদি বিষয়ীভূত যে বীর এবং রৌদ্র রসের ত্রিবিধ ভাবের ব্যঞ্জনা হয়েছে, তা অভিনেতাদের আচরণে যতখানি পরিস্ফুট, তদপেক্ষা পরিস্ফুটন ঘটেছে বাক্যবিন্যাসে। রসোচিত আঙ্গিক, বাচিক এবং সাত্ত্বিক অভিনয় যেমন ভীমসেনের পক্ষে করণীয়, তেমনই করণীয় রত্নাবলীর ক্ষেত্রেও। তবে অঙ্গিরস বীর বদান্যতা পেলেও *সৌগন্ধিকাহরণ*-এ বীর রসে যুযুৎসুতা বলীয়ান। অন্যদিকে এই নাট্যে শ্রীমতীর বীরত্ব ধর্মপথানুসৃত। তবে উভয় ক্ষেত্রেই উৎসাহ বা মুহুর্মুহু অন্বেষণ, লক্ষ্যের প্রতি চিত্তচাঞ্চল্যশূন্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলি জাগ্রত থাকায় প্রেঙ্খণ নাট্যধর্মের নাশ হয়নি। ভীমসেন যেমন হনূমান, কুবেরের থেকে বাধাগ্রস্ত হয়, তেমনই বাধার সম্মুখীন হতে হয় শ্রীমতীকে রত্নাবলী, অজাতশত্রুর থেকে। শ্রীমতীর আত্মনির্ভরশীলতামূলক উক্তির মধ্যে গণ্য করা যায় দ্বিতীয় অঙ্কের একটি উক্তিতে –

আমি ভয় করিনে। জানি প্রথম থেকেই কেউ মন্দিরে দ্বার খোলা পায়না। ক্রমে যায় আগল খুলে। তবু আমার বলতে কোনো সংকোচ নেই যে, প্রভু আহ্বান করেছেন আমাকে। বাধা যাবে কেটে। আজই যাবে।[৯৪]

তাই উৎসাহিত চরিত্রের আধারে এবং বাগভিনয়ের ভারসাম্যে নটীর পূজা বাংলা ভাষার একটি প্রেঙ্খণ নাট্যের জন্ম দিয়েছে।

- **নাট্যচরিত্রের লিঙ্গসাম্যতার প্রসঙ্গ :**

একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে প্রাচীনকালের *বালিবধ, কামদহন, নৃসিংহবিজয়, উন্মত্তরাঘব, সৌগন্ধিকাহরণ* এই প্রতিটি প্রেক্ষণক বা প্রেঙ্খণ নাট্যই পুরুষপ্রধান। *কামদহন* নাট্যগ্রন্থ অনুপলব্ধ হলেও কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গ থেকে জানা যায় মদন দেব শিবের নেত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়ে যায়[৯৫]। এই তথ্যবলে অনুমিত হওয়া যায় যে *কামদহন* নাট্যে শিব, মদন এই দুটি চরিত্র প্রতিপক্ষরূপে অবস্থান করেছে। আবার, *শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ*-এর সপ্তম স্কন্ধ অনুসারে বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতার হিরণ্যকশিপুকে বধ করে[৯৬]।

তাই *নৃসিংহবিজয়* নাট্যেও বিষ্ণু এবং হিরণ্যকশিপু দুটি প্রতিপক্ষ কেন্দ্র। অর্থাৎ পুরাকালের প্রায় প্রতিটি প্রেঙ্খণ জাতীয় উপরূপকেই পুরুষ চরিত্র অপরিহার্য ছিল ব'লেই পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু আধুনিক যুগের পণ্ডিতপ্রবর ব্যক্তিত্ব ভি রাঘবনের *প্রেক্ষণকত্রয়ী* গ্রন্থে যে তিনটি উপরূপক পাওয়া যায়, সেখানে নারীচরিত্র উপস্থিত। এমনকি নামকরণগুলিও নায়িকার নামানুসারেই। *বিজয়াঙ্কা, বিকটনিতম্বা* এবং *অবন্তীসুন্দরী* যেগুলির তথ্য বিশদে বিবৃত হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়েই[৯৭], সেখানেও *বিজয়াঙ্কা* নাট্যে দুটি প্রতিপক্ষ তৈরি হয়েছে এবং আদর্শগত বা ভাবনাগত মতানৈক্যের ফলেই দুটি ভিন্ন পক্ষ তৈরি হয়েছে। তাই নাট্যকার ভি রাঘবন মহোদয় মনে করেননি যে একাঙ্কিকা প্রেঙ্খণ কেবল পুরুষচরিত্রের নিয়ন্ত্রণেই থাকা উচিত। এই পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত *নটীর পূজা*-র জন্য অনেকখানি আশাবাদী। উপাধি ব্যতীত সম্পূর্ণ নারীচরিত্রের মাধ্যমে একটি অভিনেয় নাট্যকে যে প্রেঙ্খণ-এর ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, এর জন্য *বিজয়াঙ্কা*-র ম'ত নাট্যসন্দর্ভের প্রয়োজন আবশ্যক। *বালিবধ*-এ বালি, *কামদহন*-এ হিরণ্যকশিপু, *মদনদহন*-এ মদনের ম'ত *নটীর পূজা*-য় এই ভূমিকাটি গ্রহণ করেছে অজাতশত্রু। সে মঞ্চে উল্লিখিত না হয়েও নাট্যেতিবৃত্তে ব্যাহৃত। তাই তত্ত্বাভিনিবেশী প্রেক্ষকবর্গ অজাতশত্রুর আহার্যগ্রহণকারী কোনও পুরুষ চরিত্রকে দর্শন করতে না পারলেও তার নিঃশব্দে পদচারণা অনুভব করতে পারে। তাই প্রেঙ্খণ-এর এই অন্তরঙ্গ বিধিটি *নটীর পূজা*-য় কিঞ্চিৎ বিবর্তিত।

❖ **গৌণ অন্তরঙ্গ সাযুজ্য :**

এই বিষয়টি দুটি দিক থেকে প্রেক্ষণীয়। নাট্যকার তাঁর রচনায় নাট্যঘটনায় কোন্ ধরণের স্থানের উল্লেখ করেছেন এবং নাট্যনির্দেশনায় সেই বিধি কতখানি পালিত হচ্ছে বা ক'তখানি লঙ্ঘিত হচ্ছে নান্দনিক সৌজন্যে; তা অনুধাবনযোগ্য। আবার এই *নটীর পূজা*-য় প্রাচীন ভারতীয় নাট্যনির্দেশনা অর্থাৎ যে বিষয়গুলি নাট্যে কোনও চরিত্রের মাধ্যমে বর্ণিত হলেও মঞ্চোপরি দর্শিত হওয়ার অযোগ্য; সেই বিষয়টি কীভাবে উপস্থাপিত হয়ে একটি প্রেঙ্খণ-এর রীতিকে কোনওভাবে ব্যাহত করেছে কিনা তাও বিচার্য। যেহেতু এই দুটি বিষয়ের সঙ্গে একটি নাট্যরচনার প্রেঙ্খণত্ব উপাধি প্রাপ্তিতে বিশেষ সম্পর্ক না থাকায় এ দুটিকে গৌণ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল।

▪ **নাট্যঘটনার স্থান এবং মঞ্চসজ্জার ঔচিত্যবিচার :**

নটীর পূজা নাট্যটি মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য। এই নাট্যের চারটি অঙ্কের বর্ণনীয় বিষয় গৃহাভ্যন্তরভাগে কথিত নয়। প্রথম অঙ্কের স্থান 'মগধপ্রাসাদ কুঞ্জবন', দ্বিতীয় অঙ্ক এবং তৃতীয় অঙ্কদুটি সম্পাদিত হয়েছে 'রাজোদ্যান'-এ এবং চতুর্থ অঙ্কের স্থান 'অশোকতল'।

সৌগন্ধিকাহরণ নাট্যটিও পথের মধ্যেই সম্পাদিত। এমনকি কামদহন বা বালিবধের ঘটনাও উন্মুক্ত কোনও পরিবেশেই হয়েছিল *কুমারসম্ভব* বা বাল্মীকির *রামায়ণ* অনুযায়ী। *নৃসিংহবিজয়*-এর বিষয়টি অভ্যন্তরভাগের। তবে indoor বা outdoor যাই হোক না কেন; এই উপরূপকগুলিতে 'পুস্ত' (stage craft, props) আহার্যের বিশেষ প্রয়োজন নেই। শুধু এই নাট্যটিই নয়; *উন্মত্তরাঘব*-এও মঞ্চসজ্জার প্রয়োজন নেই। সেখানে রামচন্দ্রের

বিভিন্ন বৃক্ষ, গুল্ম, লতাকে ঘিরে অভিবেদনার প্রসঙ্গ রয়েছে তথাপি নাট্যমধ্যেই এহেন অনুবেদন রয়েছে যেখানে বোঝা যায় যে কোনও কৃত্রিম বৃক্ষের প্রয়োজন নেই। নাট্যপ্রস্তাবনায় সেখানে নাট্যক্রিয়ার স্থান উল্লেখ করা হয়েছে সূত্রধারের বচনে – "সীতালক্ষ্মণসেবিতো রঘুপতিঃ প্রাপ্তঃ বনং দণ্ডকাম্"[৯৮]। অর্থাৎ এটি দণ্ডকারণ্যের পঞ্চবটী নামক স্থানে রামসীতার বনবাসজীবন ঘটেছে। এমনকি সীতাহরণের পরে রাম এবং লক্ষ্মণ ফিরে এলে বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশ দেওয়া রয়েছে – "উভৌ পরিক্রম্যোটজাভ্যন্তরং প্রবিশ্য সীতামদৃষ্ট্বা সসংভ্রমমিতস্ততো'ন্বিষ্যতঃ"[৯৯]। অর্থাৎ একটি পর্ণকুটিরের আবহ থাকলেই তা দণ্ডক বনের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। যেহেতু অরণ্য বিবিধ বৃক্ষের সমষ্টি, তাই সেখানে আম, অশোক ইত্যাদি বৃক্ষের সজ্জীকরণ প্রয়োজনীয় নয় এবং রামচন্দ্রের উক্তিতেই 'সহকার', 'রক্তাশোক', 'বালাশোক' শব্দগুলি উল্লিখিত। এটিই প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে বৃক্ষগুলির নামোল্লেখের মাধ্যমেই সহৃদয় জ্ঞাত হবে যে উল্লিখিত বৃক্ষের সম্মুখে রামচন্দ্র উপস্থিত। তাই উপরূপকে মঞ্চসজ্জার প্রথা যে থাকত না, সেকথা বললেই চলে।

শান্তিদেব ঘোষের অতীতচারণভাষ্য *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য* -তে পাওয়া যায় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী-তে *নটীর পূজা* অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় শিল্পগুরু সুরেন্দ্রনাথ কর মাটির কলসিকেই বৌদ্ধস্তূপের আকৃতি দিয়েছিলেন –

গুরুদেবের জন্মদিনে "নটীর পূজা" প্রথম অভিনয় হয় "কোনার্ক" বাড়িটিতে। বাড়িটির পূর্ব পশ্চিম দিকে ছিল খোলা নিচু বারান্দা। দুই দিকের বারান্দার মাঝে ছিল বড় ঘরের মত চার কোনা উঁচু একটি মেঝে। তাকেই নটীর পূজা অভিনয়ের মঞ্চ করা হয়েছিল। অভিনয় হয়েছিল, পূব দিকে মুখ করে।... অভিনয় মঞ্চের পিছনে, বা মঞ্চের পশ্চিম দিকের নীচু বারান্দায়, মাটির কয়েকটি বড় জালা উপুড় করে বসিয়ে, নানা আকারের বৌদ্ধ স্তূপ রচনা করেছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ কর। সন্তোষ মজুমদারের নেতৃত্বে ; আমাদের মত একদল ছাত্র, দু-দলে বিভক্ত হয়ে, হিন্দু ও বৌদ্ধ নাগরিক সেজেছিলাম। লাঠি, মশাল ও অস্ত্রাদি হাতে, নাটকে উল্লেখিত মন্ত্রগুলি উত্তেজিত কণ্ঠে আবৃত্তি করে, দু-দলে, বিভক্ত হয়ে, আমাদের ধর্মযুদ্ধের অভিনয় করতে হয়েছিল। স্তূপের মত সাজানো মাটির জালাগুলিকে লাঠির ঘায়ে ভাঙার সঙ্গে, মশালের আলো এবং ধোঁয়ার মধ্যে, উচ্চসুরে মন্ত্র আবৃত্তি নাটকের মাঝে মাঝে বেশ একটি উত্তেজক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল।[১০০]

এমনকি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য থেকে বলতেই হয় যে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দেও 'শিক্ষাসত্র' থেকে পরিচালিত *নটীর পূজা* -র মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সেক্ষেত্রে মঞ্চের পিছন দিকে একটি বৌদ্ধ স্তপের প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল এবং মঞ্চের একদিকে আলপনার সাহায্যে একটি রাজগৃহের তোরণের আকৃতির cutout ব্যবহৃত হয়েছিল।

যদিও গ্রন্থমধ্যে প্রতিটি অঙ্কের জন্য নির্দিষ্ট কিছু সরঞ্জামের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উল্লেখ নেই তথাপি বিমূর্তকে আবির্ভূত করার জন্যই বৌদ্ধ স্তপের প্রয়োজন। মূল নাট্যবৃত্তান্তের সঙ্গে বৌদ্ধ স্তপের সংযোগ রয়েছে কিন্তু তারই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধের পঙক্তিমালাও বিচার্য। যথা –

ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকরের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।[১০১]

অর্থাৎ যে রবীন্দ্রনাথ নাট্যকার হিসেবেই নাট্যগ্রন্থনায় কোনও দৃশ্যপটের বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেননি, সেক্ষেত্রে নবতর শৈল্পিক সংযোজন নান্দনিক হলেও অত্যাবশ্যক নয়।

যেহেতু রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় *নটীর পূজা*-র অভিনয়ে বৌদ্ধ স্তুপের ব্যবহার ছিল, তাই এক্ষেত্রে বর্তমানে বা ভবিষ্যৎকালে এই নাট্য মঞ্চায়িত হলে তার ব্যবহারেই রাবীন্দ্রিকতার রস অভিব্যক্ত হবে এমনটি নয়। উন্মুক্ত মঞ্চে কোনওরূপ পুস্তাহার্যের ব্যবহার না করেও ভাবটিকে অনির্বচনীয় আনন্দে পরিণত করা সম্ভব।

- **অদর্শনীয় বিষয়ের মঞ্চায়ন :**

উপরিকথিত শান্তিদেব ঘোষের কথাগুলি প্রমাণ করে সেই অভিনয়কালে বেশ কিছু অশাস্ত্রীয় নাট্যকলা প্রযুক্ত হয়েছিল। *সাহিত্যদর্পণ*-এ অঙ্কে অদর্শনীয় বিষয়ের তালিকায় যুদ্ধ, মৃত্যু সমুজ্জ্বল। অথচ এখানে এই দুটির জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে। তেত্রিশ প্রকর ব্যভিচারিভাবের তালিকায় ‘মৃত্যু’ একটি কিন্তু সেই মৃত্যু রঙ্গমঞ্চেই দৃশ্য এমন বিষয় অনুমোদিত নয় –

দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ ।
বিবাহো ভোজনং শাপৌৎসর্গৌ মৃত্যু রতং তথা ।।[১০২]

বালিবধ, কামদহন, নৃসিংহবিজয় এই তিনটে প্রেঙ্খণ-এই মৃত্যুর প্রসঙ্গ রয়েছে কিন্ত এগুলিতে নাট্যকারগণ কীভাবে তার উল্লেখ করেছিলেন এবং মঞ্চে কীভাবে তা দৃশ্যমান হয়েছিল, সে সম্পর্কে নির্ভুল প্রামাণ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। উন্মত্তরাঘব যেহেতু মৃত্যুদণ্ড বা নরসংহারমূলক আখ্যান নয়, তাই সেখানে তার প্রসঙ্গ আসেনি। তবে সেখানেও রাবণ কর্তৃক সীতার অপহরণ দৃশ্যটি বর্জিত হয়েছে। *নটীর পূজা*-য় উৎপলপর্ণার মৃত্যুসংবাদ নেপথ্যে রয়ে গেছে কিন্তু শ্রীমতীর মৃত্যু ঘটে মঞ্চেই। আবার, নাট্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উল্লেখ নেই কিন্তু শান্তিদেব ঘোষ যেভাবে তার চিত্রকল্প তুলে ধরেছেন, সেখানে বোঝা যায় মুষ্টিযুদ্ধ, প্রহার, আঘাত ইত্যাদির দৃশ্যায়ন ঘটেছিল। তাই শুধু উপরূপকের ক্ষেত্রেই নয়; প্রাচীন ভারতের নাট্যধারায় সঙ্গে *নটীর পূজা*-র এই ব্যবধানকে অস্বীকার করার পথ নেই।

সুতরাং প্রেঙ্খণ উপরূপকের শৈলির সঙ্গে *নটীর পূজা*-র অন্তরঙ্গ সংযোগের তুলনামূলক আলোচনায় যে যে বিষয়গুলি পরিস্ফোটন ঘটেছে, সেগুলি হ’ল –

- উভয়ক্ষেত্রেই অমিত উৎসাহী নায়ক বা নায়িকা চরিত্র বর্তমান। নাট্যফললাভে তাদের আত্যন্তিক প্রয়াস প্রশংসনীয়। এই বীর রস শুভত্বের এবং কল্যাণের প্রতীক।

- উভয়ক্ষেত্রেই বীর এবং রৌদ্র রসের ব্যঞ্জনার জন্য ভারতী বৃত্তির আশ্রয়গ্রহণ ঘটেছে। অর্থাৎ স্বর, ছন্দ, যতি ইত্যাদি বিষয়কে মান্যতা দিয়েই বাচিক অভিনয় প্রধানভাবে স্বতন্ত্রী।
- উভয়েই মুক্তাঙ্গনে অভিনীত হওয়ার দাবি জানায়। প্রেঙ্খণ নাট্যধারা এবং *নটীর পূজা*-র মধ্যে অভিনেতৃবর্গের সঙ্গে পাত্রপাত্রীর তাদাত্ম্য সম্বন্ধের জন্যই অঙ্গরচনা এবং অলংকরণের প্রয়োজন। তদ্ব্যতিরিক্ত মঞ্চসজ্জার বিশেষ স্থান নেই। তবে ক্ষেত্রবিশেষে নাট্যনির্দেশনায় মঞ্চসজ্জার প্রসঙ্গ আসতে পারে।
- প্রেঙ্খণ গোত্রের উপরূপকে পদার্থাভিনয়প্রধান ভাবাশ্রয়ী নৃত্যকলা বাঞ্ছনীয় নয়। শ্লোকাবৃত্তি, চিত্রাভিনয়ের বারংবার প্রয়োগ ঘটলেও তথাকথিত নৃত্য এখানে উপেক্ষিত। *নটীর পূজা*-ও রবীন্দ্রনাথের লেখনীপ্রসূত কোনও 'নৃত্যনাট্য' নয়। এখানে নৃত্য কেবল নাট্যবৃত্তের একটি অংশমাত্র।

সুতরাং প্রস্তাবিত গবেষণাকার্যের এই অধ্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা হ'ল রবীন্দ্রনাথের *নটীর পূজা* রচনাটি গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্য অপেক্ষা স্বতন্ত্র একটি নাট্যকৃতি। এমনকি গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যের অন্তর্বর্তীকালীন কোনও নাট্যরচনা নয়; বরং এটি সংগীতময় নাট্য। এই নাট্যে গানের ভূমিকাও নগণ্য নয়। তাই প্রেঙ্খণ বিশেষিত উপরূপকের একটি আধুনিক সংস্করণরূপে যদি *নটীর পূজা*-কে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে বলতে হয় একটি আদর্শ প্রেঙ্খণ-এর জ্যামিতিক কাঠামোয় এর রচনা হয়নি। এমনকি এই নাট্য প্রাচীন ভারতীয় নাট্যরীতিকে অবজ্ঞা করেছে মঞ্চোপরি হত্যাদৃশ্যের অনুষঙ্গ দ্বারা। একটি বিশুদ্ধ প্রেঙ্খণ যে ক'টি নাট্যতাত্ত্বিক বিশিষ্টতাকে লালন করে, *নটীর পূজা* তার প্রতিটিকেই শাসনে আবিদ্ধ করেনি। তথাপি তার আবশ্যিক শর্তাবলি তথা বার্তাটিকে সহৃদয় রসিকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাতে সক্ষম। অর্থাৎ নৃত্যকে সঙ্গী ক'রেই বীররসের উদ্দীপনাকে অভিব্যক্ত করায় প্রেঙ্খণ নাট্যধারার একটি নবনির্মাণ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদে। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসম্ভারে এমনই একটি সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে যা অচেতনভাবেই প্রাচীনকে জড়ত্বের অভিশাপ না দিয়ে তাকে সজীবতায় ভরিয়ে তুলেছেন।

উল্লেখপঞ্জি

১. *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য,* দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ২১

২. *নটীর পূজা : রবিপরিক্রমা,* অভিনয়ের পাঠভেদ, পৃষ্ঠা - ৮৩

৩. *তদেব,* (পৃষ্ঠাঙ্কবর্জিত) পরিশিষ্ট : জোড়াসাঁকো প্রথম অভিনয়ের পুস্তিকা

৪. *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য,* দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ২৫-২৬

৫. *নটীর পূজা : রবিপরিক্রমা,*(পৃষ্ঠাঙ্কবর্জিত) পরিশিষ্ট

৬. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ২৭

৭. *তদেব,* (পৃষ্ঠাঙ্কবর্জিত) পুস্তিকা

৮. *बौद्ध धर्म के इतिहास का प्रामाणिक ग्रंथ दीपवंस*, সম্পাদক – পরমানন্দসিংহ, ৩/৪৭-৪৮, পৃষ্ঠা - ৫২

৯. *A History of India : Vol 1*, Republics and Kingdoms, পৃষ্ঠা - ৫৬

১০. *Avadāna-śataka*, সম্পাদক – P. L. Vaidya, শ্রীমতী, পৃষ্ঠা - ১৩৬-৩৭

১১. *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ : তৃতীয় খণ্ড*, সম্পাদক – দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, হীনযান ও মহাযান : প্রাসঙ্গিক তথ্য, পৃষ্ঠা - ১১

১২. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২২৯

১৩. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, নটীর পূজা*, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩০৫

১৪. *তদেব, নটীর পূজা*, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩০৬

১৫. *তদেব, নটীর পূজা*, প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ২৯৮

১৬. *তদেব, নটীর পূজা*, প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ২৯৫

১৭. *তদেব, নটীর পূজা*, প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ২৯৮

১৮. *তদেব, নটীর পূজা*, সূচনা , পৃষ্ঠা - ২৯৩

১৯. *তদেব, নটীর পূজা*, প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ২৯৫

২০. *তদেব, নটীর পূজা*, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩০৪

২১. *তদেব, নটীর পূজা*, প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ২৯৫

২২. *তদেব, নটীর পূজা*, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩১২

২৩. *তদেব, নটীর পূজা*, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩০৩

২৪. *তদেব, নটীর পূজা*, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩১০

২৫. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২২৯

২৬. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৮৬-৮৭, পৃষ্ঠা - ৪২৫-২৬

২৭. *তদেব*, ৬/১৩২, পৃষ্ঠা - ৩৫৯

২৮. *তদেব*, ৬/১৩৩, পৃষ্ঠা - ৩৫৯

২৯. *তদেব*, ৬/১৩৪, পৃষ্ঠা - ৩৬০

৩০. *তদেব*, ৬/১০২, পৃষ্ঠা - ৩৪০

৩১. *তদেব*, ৬/২৮৬-৮৭-এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৪২৬

৩২. *সচিত্র শ্রীমদ্বাল্মীকি-রামায়ণ [হিন্দীভাষানুবাদ সহিত] : কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড – ৫*, অনুবাদক – দ্বারকাপ্রসাদ শর্মা, ১৮/১-৬৭, পৃষ্ঠা - ১৬৫-৮০

৩৩. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড*, নটীর পূজা, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩১২

৩৪. *তদেব, নটীর পূজা*, চতুর্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩২৩

৩৫. *তদেব, নটীর পূজা*, চতুর্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩২২

৩৬. *তদেব, নটীর পূজা*, চতুর্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩২৩

৩৭. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/১২২, পৃষ্ঠা - ৩৫৩

৩৮. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol I*, সম্পাদক – M. Ramkrishna Kavi, ৬/৩৯, পৃষ্ঠা - ২৯৫

৩৯. *তদেব*, ৬/৪০, পৃষ্ঠা - ২৯৫

৪০. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২০৪, পৃষ্ঠা – ১৯৯

৪১. *মহাকবিশ্রীজগন্নাথপণ্ডিতরাজবিরচিতো নাগেশভট্টকৃতটীকয়া চ সহিতো রসগঙ্গাধরঃ*, সম্পাদক -দেবর্ষিভট্টশ্রীমথুরানাথশাস্ত্রী, পৃষ্ঠা - ৫৭

৪২. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol II*, সম্পাদক – (প্রয়াত) M Ramkrishna Kavi, পুনঃসম্পাদক – V M Kulkarni, Tapasvi Nandi, ৬/১৭ - অভিনবভারতী, পৃষ্ঠা - ২৬৭

৪৩. *তদেব,* অভিনবভারতী - অথ শান্তরসবিচারঃ, পৃষ্ঠা - ৩৪০

৪৪. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, নটীর পূজা,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ২৯৭

৪৫. *তদেব, নটীর পূজা,* চতুর্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩২১

৪৬. *নৈবেদ্য,* ৩০নং কবিতা, পৃষ্ঠা - ৪১

৪৭. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২০৬ - এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ২০১

৪৮. *The Manusmṛti with the commentary Manvartgamuktāvalī of Kullūk*a, সম্পাদক – নারায়ণ রাম আচার্য কাব্যতীর্থ, ৭/১-এর টীকাংশ, পৃষ্ঠা - ২৪৭

৪৯. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২২৭-২৩২

৫০. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২২৭

৫১. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, নটীর পূজা,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ২৯৮

৫২. *তদেব, নটীর পূজা,* সূচনা, পৃষ্ঠা - ২৯৩

৫৩. তত্রৈব

৫৪. *তদেব, নটীর পূজা, প্রথম অঙ্ক,* পৃষ্ঠা - ৩০৩

৫৫. তত্রৈব

৫৬. *তদেব, নটীর পূজা,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩০৪

৫৭. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২২৮-২২৯

৫৮. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, নটীর পূজা,* দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩১০

৫৯. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২২৯-২৩১

৬০. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২৩১-২৩২

৬১. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২২৯

৬২. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২৩২

৬৩. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২৩৩-২৩৬

৬৪. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/১২৮, পৃষ্ঠা - ৩৫৭

৬৫. *তদেব,* ৬/১২৯, পৃষ্ঠা - ৩৫৭

৬৬. *তদেব,* ৬/১৩০, পৃষ্ঠা - ৩৫৭

৬৭. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, নটীর পূজা,* তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩১৫

৬৮. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/১৩০, পৃষ্ঠা - ৩৫৮

৬৯. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড,* নটীর পূজা, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩০৮

৭০. *তদেব, নটীর পূজা,* প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩০০

৭১. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/১৩১, পৃষ্ঠা - ৩৫৮

৭২. *তদেব,* ৬/১৩১, পৃষ্ঠা - ৩৫৮

৭৩. দ্রষ্টব্য : দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৮৮

৭৪. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২৩৬

৭৫. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২৩৬

৭৬. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৫৭-এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৩১২

৭৭. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol II*, সম্পাদক – (প্রয়াত) এম রামকৃষ্ণ কবি, পুনঃসম্পাদক – V. M. Kulkarni ও Tapasvi Nandi, ১৮/২১, পৃষ্ঠা - ৪১৯

৭৮. *ঘরোয়া*, পৃষ্ঠা - ১৪২

৭৯. *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন*, রবীন্দ্রনাথের অভিনয়, পৃষ্ঠা - ৭৬

৮০. *রবীন্দ্রায়ণ : দ্বিতীয় খণ্ড*, কবির সংস্পর্শে, পৃষ্ঠা - ২৪৭

৮১. *দেশ*, পত্রাবলী, পৃষ্ঠা - ১৫

৮২. *প্রবাসী* : শ্রাবণ সংখ্যা, বঙ্গে নাট্য ও নৃত্য, পৃষ্ঠা - ৬৪৭

৮৩. *নিজেরে হারায়ে খুঁজি : প্রথম পর্ব*, পৃষ্ঠা - ৫৩৮

৮৪. *The Saugandhikāharana of Viśvanāthakavi*, সম্পাদক – মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবদত্ত এবং কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব, পৃষ্ঠা - ২

৮৫. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা ১০,পৃষ্ঠা - ৩

৮৬. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা ১১৯,পৃষ্ঠা - ২৮

৮৭. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/২০৪, পৃষ্ঠা - ১৯৯

৮৮. *The Saugandhikāharana of Viśvanāthakavi*, সম্পাদক – মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবদত্ত এবং কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব, শ্লোকসংখ্যা ২৭, পৃষ্ঠা - ৭

৮৯. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/২০৪-০৫, পৃষ্ঠা - ১৯৯

৯০. *The Saugandhikāharana of Viśvanāthakavi*, সম্পাদক – মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবদত্ত এবং কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব, পৃষ্ঠা - ১৩

৯১. তত্রৈব

৯২. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/২০৫, পৃষ্ঠা - ২০১

৯৩. *তদেব*, ৩/২০৫, পৃষ্ঠা - ২০১

৯৪. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, নটীর পূজা*, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ৩০৯

৯৫. *Kumārasambhava of Kālidāsa*, সম্পাদক – M. R. Kāle, ৩/৪৬-৫০, পৃষ্ঠা – ৫০-৫১

৯৬. *শ্রীমদ্ভাগবতম্ : মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীতম্ : সপ্তম স্কন্ধ*, সম্পাদক – পঞ্চানন তর্করত্ন, ৭/৮/১৪-৩১, পৃষ্ঠা - ১০০-০৬

৯৭. দ্রষ্টব্য : দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ১০২-১০৩

৯৮. *Unmattarāghava by Virūpakṣadeva*, সম্পাদক – V. Krishnamacharya, শ্লোকসংখ্যা ৮, পৃষ্ঠা - ৩

৯৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ৯

১০০. *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য*, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ২২

১০১. *রবীন্দ্র-রচনাবলী : পঞ্চম খণ্ড, রঙ্গমঞ্চ*, পৃষ্ঠা - ৪৫১-৫২

১০২. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/১৬, পৃষ্ঠা - ২৯১

ষষ্ঠ অধ্যায়

ত্রোটক ও *শাপমোচন* : একটি সমীক্ষা

মায়ার খেলা এবং *নটীর পূজা*-র পরে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ তথা শেষ অধ্যায়ে যে রবীন্দ্রনাট্যটি বিবেচ্য, তা হ'ল *শাপমোচন*। এই নাট্যটি রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালের শেষ শেষ দশকের রচনা এবং বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে *শাপমোচন* সর্বভারতীয় স্তরে পৌঁছায়। একটি সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্য না হওয়া সত্ত্বেও এর লোকবিশ্রুতি বর্তমান সময়ে একে রবীন্দ্রনৃত্যের ইতিহাসে ধ্রুপদিয়ানার মান দিয়েছে। স্বয়ং নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ এটিকে 'কথিকা' বলেছেন। অর্থাৎ উপরূপকপদে অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস এখানে করা হলেও এর একটি রাবীন্দ্রিক অভিধা রয়েছে। অষ্টাদশ উপরূপকের মধ্যে যে সংরূপের সঙ্গে এর সাদৃশ্য সম্বন্ধ রয়েছে বলেই প্রত্যয় জন্মায়, তা হ'ল ত্রোটক যার স্থান নাটিকার পরেই[১]। এই উপরূপকবিষয়ে গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং এটি একটি উপরূপক কিনা; তাও নির্ণয় করা হয়েছে[২]। অর্থাৎ প্রবর্তিত অধ্যায়ে ত্রোটক-এর ধ্যানধারণা *শাপমোচন*-এ কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে বা কতখানি অপসৃত হয়েছে, তা তুলে ধরা হবে। পূর্ববর্তী দুটি অধ্যায়ের ন্যায় এখানেও অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ এই দুদিক থেকেই এর যাথার্থ্য নিরূপিত হবে।

৬.১ *শাপমোচন* : উৎস, মঞ্চায়ন এবং বিবর্তন :

শাপমোচন এমন একটি রবীন্দ্রনাট্য যার উৎস একাধিক সাহিত্য এমনটিই বলা যেতে পারে। যেমন ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্গত *অবদানশতক*-এর 'কুশজাতক' এবং তদাশ্রিত রবীন্দ্রনাটক *রাজা* । রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন –

> যে বৌদ্ধ-আখ্যান অবলম্বনে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল। এর গানগুলি পূর্বরচিত নানা গীতিনাটিকা হতে সংকলিত।[৩]

এছাড়াও *শাপমোচন*-এর ইতিবৃত্তভাবনায় স্বর্গরাজ্যে অভিসম্পাত এবং তজ্জন্য মর্ত্যবাসের যে কাঠামো, তা অনেকাংশেই মহাকবি কালিদাস *বিক্রমোর্বশী* ত্রোটক এবং বাংলার মনসামঙ্গল কাব্যধারার ঊষা ও অনিরুদ্ধের আখ্যানের প্রভাব রয়েছে বলেই অনুমান করা যায়। এই *শাপমোচন* কথিকার প্রথমাংশে স্বর্গলোকের দৃশ্যকল্পনায় দেখা যায় বিক্রমোর্বশী 'ত্রোটক' এবং বাংলার মনসামঙ্গল কাব্যধারার প্রভাব। *শাপমোচন* ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই একটি কবিতা রচনা করেন যার, নাম 'স্বর্গ হতে বিদায়' (১৩০২ বঙ্গাব্দ)[৪]। এই কবিতাটিই *চিত্রা* কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সুতরাং উর্বশীকে কেন্দ্র ক'রে স্বর্গ-মর্ত্যের মেলবন্ধনের চিন্তা যে তিনি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দেই করেছিলেন একথা বলা যায়। তবে *বিক্রমোর্বশী* ত্রোটক-এর যে ইতিবৃত্ত, তা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৫তম সংবাদ সূক্ত। অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর *বিক্রমোর্বশী*-র ভাবানুবাদমূলক একটি বাংলা নাট্যরচনা করেন যা প্রকাশিত হয় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে। যদিও সেই সূক্তের অন্তর্ভুক্ত ১৮টি মন্ত্রের কোথাও স্বর্গে উর্বশীর নাট্যাভিনয়ে

প্রমাদ এবং তজ্জন্য ইন্দ্রের অভিশাপ বর্ষণের ইঙ্গিত নেই।[৫] *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য* এই গ্রন্থে শান্তিদেব ঘোষ জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর জন্য *বিক্রমোর্বশী*-র দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন –

...অন্যমনস্কতাজনিত ত্রুটির অপরাধে নটী অথবা সঙ্গতকারকে যে স্বর্গ থেকে বিচ্যুত করে কিছুকালের জন্য মর্ত্যে পাঠানো হয়েছিল তার উল্লেখ আমরা পাই প্রাচীন সংস্কৃত নাটক "বিক্রমোর্বশী"তে..এবং বাংলা পদ্যে রচিত "শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণে"।[৬]

মনসামঙ্গলের 'দেবখণ্ড' অংশে স্বর্গরাজ্যে ঊষা-অনিরুদ্ধের নৃত্যে ছন্দবিচ্যুতির আখ্যান পাওয়া যায়। যেমন বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের *মনসামঙ্গল* -এর ৮ম পালায় ১২শ গানে পয়ার ছন্দে পাওয়া যায় –

তাল ধরি নৃত করি গায় সুললিত ।
দৈবযোগে তালভঙ্গ হইল আশ্চম্বিত ।।
কোপানলে সুরপতি একদিষ্টে চায় ।
তালভঙ্গ দোষ ইন্দ্র শাপ দিল তায় ।।
মনসারে আজ্ঞা দিলা সুর অধিকারী ।
লৈয়া যাও পাপিষ্ঠ জন্মাও মর্ত্যপুরী ।।[৭]

আবার অভিসম্পাত বিষয়টিকেই যদি *শাপমোচন*-এর ক্রিয়াকেন্দ্রে রাখা হয়, তবে এক্ষেত্রে কালিদাসের *মেঘদূত* এবং *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* -এর দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। *মেঘদূত*-এর প্রথম শ্লোকেই বলা হয়েছে –

কশ্চিদ্কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ ।
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ ।।[৮]

কর্তব্যকর্মে অবহেলার জন্যই কুবের যক্ষকে শাপিত এবং সন্তপ্ত করে। আবার *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-এর চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে বিষ্কম্ভক অংশে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কথোপকথনের মধ্যে নেপথ্য থেকে শ্রুত হয় ক্রোধবশা দুর্বাসার নিকষ অভিশাপ। সেখানেও বিরহিণী নায়িকা শকুন্তলা ছিল পতিচিন্তায় বিভোর। তাই সে অতিথিসৎকারকর্মকে অগ্রাহ্য ক'রে ফেলে[৯]। তাই যা সমাজসংসারে করণীয়, সেই নীতিশিক্ষার অভাব যক্ষ এবং শকুন্তলার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। তাই *শাপমোচন*-এ ইন্দ্রসভায় সৌরসেনের তালবাদ্যবাদন-ই প্রধান কর্ম। সেখানে প্রিয়তমার অনুপস্থিতিতে বিরহে যদি তালভঙ্গ হয়, তবে তা অকল্যাণকর। তাই *শাপমোচন*-এর এই ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথ অনেকখানিই কালিদাসের মার্গ থেকে গ্রহণ করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাস এবং *মেঘদূত, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নিয়ে *শাপমোচন* রচনার পূর্বকালেই একাধিক কবিতা এবং প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যেমন মানসী কাব্যগ্রন্থভূত 'মেঘদূত' কবিতা (১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ)[১০], *প্রাচীন সাহিত্য* প্রবন্ধসংকলনগ্রন্থগত 'মেঘদূত'[১১], 'কুমারসম্ভব'[১২], 'শকুন্তলা'[১৩], *লিপিকা* কাব্যগ্রন্থের 'মেঘদূত' কবিতা (১৯২২ খ্রিস্টাব্দ)[১৪] ইত্যাদি। তাই সেই ভাবনাটি এখানেও লক্ষ্য করা যায় –

গন্ধর্ব সৌরসেন সুরসভায় গীতনায়কদের অগ্রণী। সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরুশিখরে সূর্যপ্রদক্ষিণে। সৌরসেনের বিরহীচিত্ত ছিল উৎকণ্ঠিত। অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে, নৃত্যে উর্বশীর শমে পড়ল বাধা, ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে।[১৫]

ফলতঃ সবদিকের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক'রে বলতে হয় যে *শাপমোচন* কথিকার কোনও একক উৎস বর্তমান নয়। এখানে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বিভিন্ন সাহিত্যের ফল্গুধারা এসে শাপমোচন নামাঙ্কিত একটি স্রোতস্বিনী রবীন্দ্রপ্রবাহের আনন্দধারার জন্ম দিয়েছে।

প্রথমে আসা যাক বৌদ্ধকাহিনির বিষয়ে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে *রাজা* নাটকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছেন *মহাবস্তু -অবদান* গ্রন্থের 'কুশজাতক' অবলম্বনে। পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* শীর্ষক গ্রন্থেও এই কাহিনি অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে[১৬]। কুশ নামের এক রাজা এবং তার মহিষীর কাহিনি রাজা নাটকে প্রতিফলিত হলেও *শাপমোচন* কিন্তু সেই ধাপ অতিক্রম ক'রে গেছে। *রাতের তারা দিনের রবি* এই প্রবন্ধসংকলনগ্রন্থে 'অমেয় প্রেমের মন্ত্র বুদ্ধের শরণ লইলাম' প্রবন্ধে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহাশয়-ও স্বীকার করেছেন যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংকলিত বহু বৌদ্ধ কাহিনির আশ্রয়ে কথা কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের-ই সৃষ্টি[১৭]। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধচর্চা প্রবন্ধসংকলনগ্রন্থের প্রবোধচন্দ্র সেনের 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি' প্রবন্ধে দেখি –"...ব্রাহ্মণ্যধর্মের জ্ঞান মূলত তত্ত্ব মুখী, আর বৌদ্ধধর্মের জ্ঞান মূলত প্রেমমুখী"[১৮]। এই বক্তব্যের সার আমরা *শাপমোচন*-এ একটি দিক থেকে মিলিয়ে দেখতে পারি। বৈদিক সূক্ত থেকে প্রভাবিত বিক্রমোর্বশী ত্রোটক থেকে তিনি যেমন প্রথমাংশের ভিত্তি প্রস্তুত করেছেন, তেমনই এর আদিপর্বে ছিল বৌদ্ধ আখ্যানের ছায়া। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির যুগপৎ মেলবন্ধনে এই রচনা অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে উঠেছে এবং প্রেম-ই সর্বোৎকৃষ্ট সাধনা তাও অবলীলাক্রমে প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'কুশজাতক' থেকে রবীন্দ্রনাথ *শাপমোচন*-এর যে অংশগুলি গ্রহণ করেছেন, তা হ'ল অলিন্দা দেবীর কৃত অপরাধে দেবরাজ ইন্দ্রের অভিশাপে কুশের কুশ্রী হওয়া, নায়িকা কমলিকার পিতৃকুল মদ্রকরাজবংশীয়, বহু পুরুষের মধ্যে কমলিকার রাজাকে দর্শন, কমলিকার রাজার কুৎসিত রূপকে ধিক্কার জানানো এবং রাজা অরুণেশ্বরের বীণাবাদন[১৯]। যদিও 'কুশজাতক'-এ সুদর্শনার প্রথমবার রাজা কুশকে দেখার বিষয়টি এরূপ ছিল যে সে একদিন তার শ্বশ্রূমাতা অলিন্দা দেবীকে অনুরোধ জানায় যে সে রাজাকে সশরীরে প্রত্যক্ষ করবে। তখন মহাদেবী অলিন্দা যুবরাজ কুশদ্রুমকে রাজার বেশধারণ করিয়ে তার ছত্রধারকরূপে কুশ-কে নিযুক্ত করে। রাজহর্ম্যের বাতায়ন থেকেই সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ ক'রে সুদর্শনা বলে –

তস্যা দানি সুদর্শনাযে তং রাজক্যং ছত্রধরং দৃষ্ট্বা মনসং প্রত্যাহৃতং, দুঃখদীর্মনস্যজাতা সংবৃতা। . .. এদৃশো ছত্রধারো বিকৃতরূপো স্থূলোষ্ঠো স্থূলশিরো স্থূলপাদো মহোদরো কালো মষিরাশিবর্ণো। এতেন ছত্রধারেণ সর্বা সা রাজক্যপরিষা(?)রী উপহৃতা।[২০]

অর্থাৎ স্থূল ওষ্ঠ, স্থূল মস্তক, স্থূল পাদ এবং কৃষ্ণবর্ণতার দরুণ বিকৃতরূপ কুশ ছিল রাজপরিষদের অন্যান্যদের তুলনায় কুৎসিত এবং অযোগ্য। এই বিষয়টিই *শাপমোচন*-এ কমলিকার কথায় পাওয়া যায় এভাবে –

দেখলেম নাচ। যেন মঞ্জরিত শালতরুশ্রেণীতে বসন্তবাতাসের অধৈর্য। যেন চন্দ্রলোকের শুক্লপক্ষে লেগেছে তুফান। কেবল একজন কুশ্রী কেন রসভঙ্গ করলে। ও যেন রাহুর অনুচর। কী গুণে ও পেল প্রবেশের অধিকার।[২১]

'কুশজাতক'-এ পদ্মসরোবরে সুদর্শনা রাজাকে দেখে মন্তব্য ক'রে 'উদকরাক্ষস' সদৃশ অসৎ ব্যক্তি ব'লেই গণ্য করে।[২২] অর্থাৎ 'রাহু'-র উপমা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট হলেও 'কুশজাতক'-এ সুদর্শনার ভাবনাগুলিও এর পশ্চাতে রয়েছে।

আবার সুদর্শনা যখন পিত্রালয়ে চলে যায় কাশীর রাজসদন পরিত্যাগ ক'রে, তখন কুশ সেখানে উপস্থিত হতে পথে বেরিয়ে পড়ে। সেখানেই কাণ্যকুব্জের কোনও একটি গ্রামে সে বীণাবাদন করে – "তেন দানি রাজ্ঞা কুশেন তাদৃশী বীণা বাদিতা গীতকং গাযিতং যং সর্বো গ্রামজনো আরাধ্যতি"[২৩]। *রাজা* নাটকে রাজার সংগীতনিপুণতার কোনও উল্লেখ নগণ্য অথচ *শাপমোচন*-এ রবীন্দ্রনাথ তন্ত্রীবাদ্য বীণার বহুধা উল্লেখ করেছেন। যেমন কমলিকার সঙ্গে অরুণেশ্বরের বীণারই বিবাহ সম্পন্ন হয় -

যথালগ্নে রাজহস্তী পৃষ্ঠে রত্নাসনে রাজার প্রতিনিধি হয়ে এল অরুণেশ্বরের বক্ষোবিহারিণী বীণা, রাজার অশ্রুত আহ্বান সঙ্গে করে।...অন্তঃপুরিকারা বীণাখানিকে বরণ করে নিয়ে এল বিবাহের আসরে,...বীণার সঙ্গে রাজকুমারীর মালা বদল হল। সখীরা এই বীণা সুন্দরকে উৎসর্গ করে গাইলে।[২৪]

অর্থাৎ অরুণেশ্বরের অঙ্কবিহারিণী বীণার ভূমিকা যেন অভিজ্ঞানশাকুন্তল নাটকের মহর্ষি কণ্বের তপোবনতুল্য।

তবে *রাজা, অরূপরতন* (রাজার সংক্ষিপ্ত অভিনয়যোগ্য সংস্করণ) এবং *শাপমোচন* এই তিনটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে 'কুশজাতক' আখ্যানের শেষ অংশটি গৃহীত না হয়ে বর্জিত হয়েছে। মূল জাতককথায় পাওয়া যায় যে কাশীনরেশ কুশ জ্যোতীরত্নের প্রভাবে সুদর্শন হয়েছিল এবং সেই রূপের মোহেই সুদর্শনা তাকে পতিরূপে বরণ করে। রবীন্দ্রনাথ কোনওভাবেই এই বিষয়টিকে সাহিত্যে স্থান দেননি। বলা যায় অরূপসাধক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিমূর্ত সৌন্দর্যের তাপস। তিনি ব্রাহ্মধর্মের নিরাকার অনভিব্যক্ততেই পরম সত্যের সন্ধান পেতে চেয়েছিলেন। তাই রাবীন্দ্রিক দর্শনে এই ধরণের রত্নপ্রভার মোহান্ধতাকে তিনি সমূলে উচ্ছেদ করেছেন তাঁর রচনায়। *শাপমোচন*-এ অরুণেশ্বর কমলিকাকে বলে –

অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান। সূর্যরশ্মি কালো মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু, তার লজ্জাকে সান্ত্বনা দেবার তরে। মর্তের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো সুন্দরের আবির্ভাব।[২৫]

তাই *শাপমোচন* রবীন্দ্রদর্শনের একটি প্রামাণ্য নথি। যদিও *শাপমোচন*-এর মর্ত্যলোকের বৃত্তান্তে 'কুশজাতক'-এর অবদান ছিল তবুও তা অবিকল প্রতিলিপি নয়। মূলতঃ রূপ-অরূপের দ্বন্দ্বকেই তিনি উৎসরূপে স্বীকার করেছেন।

এবারে আসা যাক *শাপমোচন*-এর মঞ্চায়নের প্রসঙ্গে। গুরুদেব *রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য* গ্রন্থে শান্তিদেব ঘোষ এই নৃত্যনাট্যের মূল রূপ, তার পরিমার্জনা, সংশোধনা, বিবর্তন নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা ক'রে গেছেন এবং কোন্ কোন্ অভিনয়ে কোন্ চরিত্রে কে অভিনয় করেছেন, তাও উল্লেখ করতে পিছিয়ে আসেননি। এর ফলে এর কলি থেকে পুষ্পস্তবক হয়ে ওঠার দীর্ঘ যাত্রাপথ কুয়াশাচ্ছন্ন না হয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল হয়েছে।

শাপমোচন-এর প্রথম অভিনয় হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতার জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে। সেই সময় সহৃদয় দর্শক-শ্রোতাদের সুবিধার্থেই একটি প্রচারপুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সেই পুস্তিকায় *শাপমোচন* -এর মুদ্রণে একেবারে শেষ পঙক্তিটি ছিল – "কখন দুজনেরই অগোচরে বিরহবেদনার তাপে ইন্দ্রের শাপ-স্খালিত হয়ে পড়ে আছে"[২৬]। পরবর্তীতে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে *শাপমোচন*-এর পুনর্মুদ্রণে এই পঙক্তিটি পরিত্যক্ত হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর ছাড়াও কৌতূহলী রসিকবর্গের জন্যই ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি *শাপমোচন* কথিকাটি পুনরায় মঞ্চস্থ হয়। এই নাট্যের প্রথম মঞ্চায়নে যিনি রাজা অরুণেশ্বরের ভূমিকায় ভাবনৃত্যের প্রদর্শন করেন, তিনি Dr. Timbers এবং কমলিকার চরিত্রে রূপদান করেন অমিতা সেন। এরপরে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ৬ই এবং ৭ই মার্চ উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরের কাইজারবাগ বরদারীতে। সেখান থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পরে ১২ই মার্চ দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় বিশ্বভারতী-র উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে *শাপমোচন* পুনরায় নৃত্যাকারে অভিনীত হয়। এরপর বম্বেতে (বর্তমানে মুম্বই) *শাপমোচন*-এর পুনরভিনয়ের পরেই ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী সিংহলযাত্রা (বর্তমানে শ্রীলংকা রাষ্ট্র) করে *শাপমোচন*-এর মঞ্চায়নের নিমিত্ত। সেখানে কলম্বোতে ১২ই মে প্রথম অভিনীত হয়। এরপর সেই বছরেই অক্টোবর মাসে মাদ্রাজ শহরে (অধুনা চেন্নাই) এই কথিকা অভিনীত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় এর অন্তিম অভিনয় ঘটে বিশ্বভারতী-র সিংহসদনে[২৭]। সুতরাং *শাপমোচন* এমনই একটি রবীন্দ্রনাট্য যা গীত-বাদ্য-নৃত্যকলায় সম্পূর্ণ আলিঙ্গিত। তাই এটিই প্রথম সাংগীতিক রবীন্দ্রনাট্য যা ব্রিটিশ যুগের ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ চারটি দিকেই খ্যাতিলাভ করেছিল। এমনকি বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতেও *শাপমোচন* সেই জনপ্রিয়তা হারায়নি। বিশ্বভারতী-র সংগীতভবনের উদ্যোগে এই কথিকা ২০১২ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় শ্রীলংকায় অভিনীত হয়। ১৯৩৪ সালের ভারতের মানচিত্রে শ্রীলংকা ভারতের মধ্যেই অবস্থান করলেও ২০১২ খ্রিস্টাব্দে একটি সম্পূর্ণ পৃথক রাষ্ট্র। তাই আন্তর্জাতিক স্তরে এই কথিকার মান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যায় যে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের বসন্ত উৎসবের সন্ধ্যায়, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের শতবর্ষে সংগীতভবন অনুষ্ঠানেও *শাপমোচন* অভিনীত হয়েছে।

বর্তমানে *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড*-তে ২৯টি গান সংবলিত *শাপমোচন*-এর যে সংস্করণটি পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতেই এই অধ্যায়ে মূল্যায়ন করা হবে। তবে এই প্রসঙ্গে এটিও উল্লেখ্য যে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে

শুরু ক'রে বর্তমানে প্রাপ্ত সংস্করণের যাত্রাপথ একই রূপরেখায় সীমানা পায়নি। তবে মূল নাট্যবস্তুটি এক থাকলেও বিভিন্ন সময়ে অভিনয়সৌকর্যার্থে এর পাঠভেদ লক্ষিত হয়। প্রথমে নাট্যবস্তুটির সারাংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হোক।

ইন্দ্রসভায় একদিন উর্বশীর নৃত্যের সঙ্গে আনদ্ধ বাদ্যবাদনে সৌরসেনের ত্রুটি দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ দেবরাজ কর্তৃক সে অভিশপ্ত হয়। তার প্রেয়সী মধুশ্রী-ও তারই সঙ্গে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করে। মর্ত্যে গান্ধার রাজকুলে হতশ্রী রূপে অরুণেশ্বরের জন্ম হয়।অন্যদিকে কমলিকা নামে মদ্র রাজকুলে মধুশ্রীর পুনর্জন্মলাভ ঘটে। কমলিকার আলেখ্যদর্শনেই প্রীত হয়ে অনুরক্ত অরুণেশ্বর বিবাহের প্রস্তাব দেয় মদ্ররাজবংশে। রাজসম্মতিতে বিবাহ স্থির হয়। শুভলগ্নে রাজা উপস্থিত না হয়ে তার বীণা বিবাহস্থলে উপস্থিত হয়। অতঃপর বিবাহ সম্পন্ন হলে পরিণীতা কমলিকা পতিগৃহে আসে। তবে অরুণেশ্বর থাকে ঘন অন্ধকারে। তার রূপ কমলিকা প্রত্যক্ষ করতে পারেনা। ক্রমশঃ সে অধীর হয়ে উঠলে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে বসন্তোৎসব সখাদের সঙ্গে অরুণেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে কমলিকা কিন্তু সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারেনা। তারপর বহু অনুরোধে সত্য প্রকাশিত হলে কমলিকা আত্মবঞ্চনার ভাবনায় গৃহত্যাগ করে। বনে একাকী দিনযাপনের মধ্যে বিরহব্যথার অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে কেবলই সুরের প্রেমে সে ফিরে আসে অরুণেশ্বরের কাছে।

এরপর এই বিভিন্ন সংস্করণগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক। *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য* গ্রন্থে শান্তিদেব ঘোষ প্রতিটি অভিনয়ের পাণ্ডুলিপি তুলে ধরেছেন। এই পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা শান্তিদেব ঘোষ তুলে ধরেছেন উক্ত গ্রন্থেই –

যে কোন নাটকের অভিনয়কালে গুরুদেব কখনো এক জায়গায় থেমে থাকতেন না। নাটক রচনার পর মহড়া চলাকালে, অভিনয়ের আগের দিন, একরাত্রি অভিনয়ের পর, এবং কয়েক মাস বা বাৎসরিক কাল পরে যখন একই নাটকের অভিনয় করাতেন তখন তার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটত। অধিকাংশ সময়ে কতগুলি বাস্তব কারণে এইরূপ পরিবর্তন তাঁকে করতে হয়েছে।[২৮]

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ২৮শে মার্চ কলিকাতার নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে *শাপমোচন*-এর অভিনয়কালে প্রথম এবং শেষ গানরূপে যথাক্রমে "এ শুধু অলস মায়া" এবং "বড় বিস্ময় লাগে" যুক্ত হয়। এমনকি ষষ্ঠ দৃশ্যে কমলিকার পতিগৃহে যাত্রাকালে "রাঙিয়ে দিয়ে যাও" গানটিও এই সংস্করণেই যুক্ত হয়েছিল। এই সংস্করণটিই বর্তমানে প্রচলিত। *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য* -এ এই সংস্করণটি দৃশ্যসংখ্যা এবং ভেদসহ উল্লিখিত হয়েছে[২৯]। তাই *শাপমোচন*-এর বিবিধ পাঠ থাকলেও রবীন্দ্রনাট্যের করঙ্কে এই তৃতীয় সংস্করণটিই মান্যতা পেয়েছে যার প্রথম অভিনয় হয়েছিল কলিকাতায়। শান্তিদেব ঘোষের বর্ণনায় অরুণেশ্বরের ভূমিকায় স্বয়ং শান্তিদেব ঘোষ এবং কমলিকার ভূমিকায় যমুনা দেবীর নাম আসে[৩০]।

এরপরে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সিংহলে *শাপমোচন*-এর অভিনয়রীতিটিই আকর্ষণীয়। সেটি মুদ্রিত না হলেও উপরূপকের প্রেক্ষিতে বিচারের জন্য তথ্যগুলি প্রয়োজনীয়। প্রাচীন উপরূপকে নৃত্যগীতের প্রতুলতা উপরূপকের লাক্ষণিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। শান্তিদেব ঘোষের আত্মকথায় জানতে পারি যে সেই ১২ই মে-র অভিনয়ে মোট দশটি দৃশ্য ছিল। সেখানে একটি দৃশ্যকেই কয়েকটি উপদৃশ্যে বিভক্ত করা হয়েছিল। যেমন দ্বিতীয় দৃশ্যে কমলিকার কাছে রাজার চিঠি এসে পৌঁছানো এবং অন্যদিকে বিরহকাতর রাজার অতীতস্মৃতির গান "সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে" এদুটিকে ভিন্ন দৃশ্য ব'লেই স্বীকৃতি দিয়েছেন শান্তিদেব ঘোষ। এমনকি বিবাহদৃশ্যের নৃত্যগীত "তোমার আনন্দ ওই এ'ল দ্বারে", "সে আসে ধীরে", "লহ লহ তুলে লহ" এবং "ওগো বধূ সুন্দরী" এই তিনটি গানকেও অন্য আরেকটি দৃশ্য ব'লে বিবেচনা করেছেন[৩১]। এক্ষেত্রে যেহেতু চরিত্রবদল হয়ে যাচ্ছে; তাই দ্বিতীয় দৃশ্যের তিনটি উপবিভাগকেই স্বতন্ত্র দৃশ্য ব'লেই মানতে হয় নৃত্যসংযোজনার সুবিধার্থে। তাই শাস্ত্রবচন যতই থাকুক, প্রয়োগদশায় তার রূপের বহুবিধ পরিবর্তন হতেই থাকে। সিংহলে *শাপমোচন*-এর অভিনয়ে প্রথম দৃশ্যটিকে রবীন্দ্রনাথ অনুপম অতুলনীয় স্বর্গীয় বৈভবে অলংকৃত করেছিলেন। সেখানে তৌর্যত্রিকের কোনও অনুষঙ্গের অভাব রাখেননি তিনি। স্বর্গসভায় শান্তিদেব ঘোষ স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সূচনায় "বাকি আমি রাখব না কিছুই" গানের সঙ্গে পাঠছিল সমান্তরালভাবে –

নব বসন্তের অভ্যর্থনা গানের ছন্দে ইন্দ্রসভায় অপ্সরাদের নৃত্য চলচে । গন্ধর্ব সৌরসেনের ডাক পড়ল । উর্বশীর নাচে তিনি মৃদঙ্গ বাজাবেন।[৩২]

ইন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানানোর গান ছিল "নমো নমো শচীচিতনন্দন"। ইন্দ্র আসন গ্রহণ করলে তার আদেশম'ত কোনও একজন নর্তকী এস্রাজ নিয়ে প্রবেশ করে সামান্য নৃত্যছন্দে। তারপর গান শুরু হ'ত। এমনকি দেবরাজ ইন্দ্রের ভূমিকায় শান্তিদেব ঘোষ এস্রাজ বাদন করেছিলেন। তিনি বলেছেন –

সিংহলের সবকটি অভিনয়ে এভাবে ইন্দ্রকে এস্রাজ বাজাতে হয়েছে। ইন্দ্রের ক্রোধের নাচের সময় কথাকলি নাচের 'কলাসম' নামক নৃত্যগুলিকে নানাভাবে গানের সঙ্গে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ইন্দ্রের হাতে থাকতো আফ্রিকা দেশের হাতচারেক লম্বা একটি কাঠের বল্লম।[৩৩]

তারপর অপ্সরার নৃত্য "নির্দয় অতি করুণা তোমার" গানে। উর্বশী প্রবেশ করার পরে সৌরসেনের সঙ্গে একটি গান ছিল "নির্মল কান্ত নমো" এবং তারপরে উর্বশীর একক নৃত্য "দেখা না দেখায় মেশা" গানে[৩৪]। বর্তমানে বিশ্বভারতী-র প্রযোজনায় ইন্দ্র চরিত্রের কোনও গান না থাকলেও সে সময় "হৃদয় মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু" গানটি ছিল।

অর্থাৎ *শাপমোচন*-ই এমন এক রবীন্দ্রনাট্য যা প্রথম সংগীতদৃষ্ট পথেই গমন করেছে। কথিকা হলেও রসিকচিত্তসমাজে এটি 'নৃত্যনাট্য' ব'লেই বিবেচিত। *নটীর পূজা* নাট্যে যেমন নারীর নৃত্যের প্রাসঙ্গিকতা রেখে গেছেন, তেমনই *শাপমোচন*-এও যেখানে পুরুষ চরিত্র বা প্রয়োজনে পুরুষের নৃত্যপ্রযোজনার কথা তিনি চিন্তা

করেছেন, সেখানেও তার নৃত্যের প্রাসঙ্গিকতাকে হারিয়ে যেতে দেননি। সৌরসেন "গীতনায়কদের অগ্রণী" এই বিশিষ্টতাই প্রমাণ করে সে কলাবিদ্যায় হবে অনিন্দ্য। স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রসভায় দেবতাদের ভোগলিপ্সার দৃশ্য দর্শিত না হলে মর্ত্যলোকের ব্যথা, বেদনা, ক্রন্দন ইত্যাদি মানবীয় অনুভূতিগুলির সঙ্গে বৈপরীত্য তৈরি হ'তনা। এই সিংহলে এই কলাবিদ্যার সমূহ সমুচিত প্রয়োগ ঘটেছিল। সেই সঙ্গে উপরূপকের যে ধারাটি ললিতোপচারাশ্রিতা, তার সঙ্গেও একাত্মীকরণ হয়ে গেছিল।

যেহেতু একটি নাট্যরচনা তার অভিনয়প্রদর্শনেই সম্পূর্ণ মর্যাদা পায়, তাই আমরা এই প্রযোজনার বিভিন্ন দিকের প্রেক্ষিতেই তার গুণমান বিচার করতে সক্ষম হতে পারি। তবে বর্তমানে প্রাপ্ত সংস্করণটির ভিত্তিতে আমরা এর দৃশ্যবিভাগ কল্পনা ক'রে নিতে পারি। এই সংস্করণে সরাসরি তার উল্লেখ না থাকলেও একটি hi fen মুদ্রিত হয়েছে বলেই মোট পাঁচটি দৃশ্য দেখা যায়।

প্রথম দৃশ্য : সুরসভায় গন্ধর্ব সৌরসেনের উর্বশীর নৃত্যের সময় মৃদঙ্গবাদনে তালভঙ্গের অপরাধে সুরসভার অভিশাপে বিকৃত রূপে গান্ধাররাজগৃহে অরুণেশ্বর নামে জন্ম। এমনকি তার প্রেয়সী মধুশ্রী-ও স্বেচ্ছায় স্বর্গ থেকে বিদায় নেয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য : মধুশ্রীর মদ্ররাজকুলে কমলিকা রূপে নব জন্মলাভ। পূর্বস্মৃতিবহন করে চলা অরুণেশ্বর কমলিকার রাজদরবারে বিবাহ-প্রস্তাব প্রেরণ এবং যথালগ্নে রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ বীণার সঙ্গে কমলিকার বিবাহ।

তৃতীয় দৃশ্য : অন্ধকারে অরুণেশ্বরের সঙ্গে কমলিকার মিলন এবং তার দর্শনলাভের উৎসুকতা।

চতুর্থ দৃশ্য : বসন্ত-উৎসবে রাজার নৃত্য কমলিকার স্বচক্ষে দর্শন। সেই রাত্রেই কমলিকার অদম্য ইচ্ছায় অরুণেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং গৃহত্যাগ।

পঞ্চম দৃশ্য : কমলিকার বনবাসজীবন, বিরহতাপে আত্মশুদ্ধি এবং অরূপরতনের সন্ধানে রাজা অরুণেশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলন।

তবে বর্তমানে বিশ্বভারতী-র সংগীতভবন, পাঠভবন এবং শিক্ষাসত্রের প্রযোজনায় *শাপমোচন* কথিকাটি যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সেটি বর্তমানে উপর্যুক্ত মুদ্রিত সংস্করণটি অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র। সেখানে কিছু গ্রহণ-বর্জন ঘটে থাকে। ২০০৭ ও ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের বসন্তোৎসব এবং ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের শতবর্ষে সংগীতভবনের প্রযোজনাত্রয়ের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যসৌজন্যে নিম্নোক্ত বিবরণ প্রদত্ত হ'ল।

"এ শুধু অলস মায়া" গানটি নেপথ্যে গীত হয়। সেই সময় মঞ্চ থাকে অন্ধকার। গানটির শেষে মঞ্চে কারিগরি পদ্ধতিতে আলোকপাত হ'লে সুরকন্যাদের প্রবেশ ঘটে পুষ্পার্ঘ্য নিয়ে। অতঃপর সুষির বাদ্য শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে দেবরাজ ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণী শচীর প্রবেশ। তৎসহ ছত্রধর এবং পারিষদবর্গের প্রবেশ এবং চামরব্যজন। সুরকন্যাদের দেবরাজের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য-নিবেদন। সৌরসেন যথাস্থানে আসনগ্রহণ করলে কথকের পাঠ। নির্দিষ্ট

অংশ "...বিরহীচিত্ত ছিল উতলা"-র পরে উর্বশীর প্রবেশ। ইন্দ্র-ইন্দ্রাণীর প্রতি নত হলে দেবরাজের ইশারায় তার নৃত্যপরিবেশন। তাললয়াশ্রিত বাণীহীন ভাবনৃত্যের পরেই "স্খলিতছন্দ..." ইত্যাদি বাক্যের পরেই উর্বশীর বিদায় এবং ইন্দ্র কর্তৃক অভিশাপপ্রদান। মধুশ্রী ত্বরিত গতিতে নাট্যকথনানুসারে তদভিনয়ের পরেই মঞ্চ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র, শচী এবং সুরকন্যাদের বিদায়। তারপর মধুশ্রীর "ভরা থাকে স্মৃতিসুধায়" গানের সঙ্গে ভাবনৃত্য।

এভাবে প্রথম দৃশ্য শেষ হলে মঞ্চে ক্ষীণ আলোকে দেখা যায় অরুণেশ্বরকে। নাট্যানুসারে কথকের পাঠানুসারে অরুণেশ্বরের আঙ্গিক এবং সাত্ত্বিক ভাবানুযায়ী অভিনয় এবং তৎসঙ্গে গানের সঙ্গে নৃত্য। এক্ষেত্রে একমাত্র "এসো এসো হে তৃষ্ণার জল" গানটি গীত হয়না।

অন্যদিকে "দে পড়ে দে" গানের সঙ্গে সখীসহ কমলিকার প্রবেশ এবং নৃত্য। সখীদের "বাজিবে সখী বাঁশি বাজিবে" গানটিতে কমলিকার কেবলই ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। আবার অরুণেশ্বরের "সেদিন দুজনে" গানে স্বর্গরাজ্যের স্মৃতি উদিত হলে মঞ্চের একধারে সৌরসেন এবং মধুশ্রীর প্রবেশ এবং যুগলনৃত্য। এই গানটির সঞ্চার অংশ "এখন আমার বেলা নাহি" অংশের পূর্বেই উভয়ের প্রস্থান এবং শেষাংশে অরুণেশ্বরের নৃত্য পরিবেশন থাকে। এরপর উপদৃশ্যে মদ্ররাজকুলের কথা। "তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে" গানের পরেই "অন্তঃপুরিকারা বীণাখানি বরণ করে নিয়ে এল বিবাহের আসরে" কথনের সঙ্গেই সখীদের বীণা-আনয়ন নৃত্যভঙ্গিমায়। "বাজোরে বাঁশরি বাজো" গানের পরেই চারু অভিনয়ের সঙ্গেই কমলিকার সঙ্গে অরুণেশ্বরের বীণার বিবাহ। এই দৃশ্যের শেষ গান "রাঙিয়ে দিয়ে যাও" গানের অন্তরার "রং যেন মোর মর্মে লাগে" অংশ থেকে কমলিকার আনন্দানুভবের নৃত্য এবং বিদায়।

তৃতীয় দৃশ্যটি নাট্যগ্রন্থনানুসারেই অভিনীত হয়। অরুণেশ্বর এবং কমলিকার নৃত্যগুলির পরে চতুর্থ দৃশ্যে বসন্তোৎসবে সখাদের সঙ্গে অরুণেশ্বরের নৃত্য। সেই উজ্জ্বল নৃত্যের শেষে কমলিকার বারংবার উপরোধহেতু অরুণেশ্বর তার দেহজ রূপ প্রকাশ করতে উদ্যত হওয়ার সঙ্গে মঞ্চে আলোকক্ষেপণ বৃদ্ধি পায় এবং কমলিকা সেই রূপদর্শনে নিজেকে প্রতারিত ভাবলে সেটি চিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে যথাসম্ভব রসবন্ত ক'রে তোলা হয়। রাজার মিনতিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রেই মধুশ্রীর গৃহত্যাগ।

পঞ্চম তথা শেষ দৃশ্যে বনমধ্যে তার নিঃসঙ্গ একাকিনী জীবনের দ্যোতক গানগুলির সঙ্গে কেবলই শরীরী হেলন মথিত হয়। "সখী ওই বুঝি বাঁশি বাজে" গানের সঙ্গে তালকে সঙ্গী ক'রেই প্রয়োজনানুগ ভাবনৃত্য অভিব্যঞ্জিত হয়। অরুণেশ্বরের "মোর বীণা ওঠে" গানে যথাযথ নৃত্যসুষমা প্রদর্শিত হয়। একেবারে নাট্যযোগাংশে কমলিকা প্রদীপসহ প্রবেশ করে এবং তার আত্মস্বীকৃতির নতি পরিস্ফুট হয় "বড় বিস্ময় লাগে" গানটিতে।

অর্থাৎ "পাছে সুর ভুলি" এবং "এসো এসো হে" গানদুটি ব্যতীত এই নাট্যটি গ্রন্থানুসারেই রসের সরণিতে বিচরণ করে। এই নাট্যটি এমনই একটি নাট্য যেখানে কথকের দ্বারা উক্ত ভাষণটি অবশ্যই অভিনেয়। যথা দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজার প্রতিনিধিত্বজ্ঞাপক বীণাবাদ্যের সঙ্গে কমলিকার বিবাহবন্ধন। এছাড়াও প্রথম দৃশ্যটিতে

প্রথমেই সকল পাত্রপাত্রী মঞ্চস্থ না থেকে আবহরচনার জন্যই দৃশ্যটি প্রারম্ভদশা থেকেই অভিনীত হয়। ইন্দ্রের সভায় সুরকন্যা, সেবকবৃন্দ এই চরিত্রগুলি নাট্যে উহ্য থাকলেও নাট্যপরিস্থিতি অনুসারে প্রাসঙ্গিকতাবাহী। এমনকি তারা নিশ্চল নয়; পুষ্পার্ঘ্যদান বা চামরব্যজন, ছত্রধারণের মাধ্যমেই তার ক্রিয়াস্পন্দন দৃশ্য। এভাবেই *শাপমোচন* কথিকাটি বিশ্বভারতী-তে একটি ধারাবাহিক সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অভিনীত হয়ে চলেছে।

৬.২ ত্রোটক ও *শাপমোচন* : বহিরঙ্গ সাযুজ্য :

এতক্ষণ পর্যন্ত *শাপমোচন* কথিকার নির্মাণ এবং নিরঙ্কুশ মঞ্চায়নের তথ্য প্রদান করা হ'ল। এরপর বিচার্য বিষয় ত্রোটক উপরূপকের সঙ্গে এর সম্পর্কে কতখানি আত্মিকতা রয়েছে। এই আলোচনাটিকেও পূর্ববৎ দুটি পর্বে বিন্যস্ত করা হ'ল। যথা বহিরঙ্গ সাযুজ্য এবং অন্তরঙ্গ সাযুজ্য। যেহেতু পূর্ববর্তী দুটি অধ্যায়েই বহিরঙ্গের দিক প্রথমে আলোচিত হয়েছে, তাই এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবেনা। বহিরঙ্গের বিষয়টি এখানে সাহিত্যদর্পণোক্ত নাটক[৩৫] এবং ত্রোটকের[৩৬] লক্ষণে উক্ত পদগুলির ব্যাখা করা হয়েছে। একমাত্র নাট্যবৃত্তির ক্ষেত্রে বিশ্বনাথ কথিত বৃত্তিভাবনাটিকেই আদর্শ ধরা হয়েছে।

❖ **দিব্যমানুষসংশ্রয় :**

ত্রোটক সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। তারই প্রামাণ্যীকরণে বলা যায় যে ত্রোটক নাটকেরই বিকৃতি বা বিশেষ সংরূপ। বিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে নাটকের যে লক্ষণগুলি তুলে ধরেছেন, তার সবই এই উপরূপকে থাকবে কিন্তু বিশেষ শর্তটি হ'ল দিব্য এবং অদিব্য মানুষের সংশ্রয় থাকবে – "সপ্তাষ্টনবপঞ্চাঙ্কং দিব্যমানুষসংশ্রযম্"[৩৭]। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে সাগরনন্দীর *নাটকলক্ষণেত্নকোশ* গ্রন্থে এই স্বর্গ-মর্ত্যের মেলবন্ধন নিয়ে একটি বিষয়ের সমাধান করা হয়েছে। তিনি অশ্মকুট্টের উক্তিকে উদ্ধৃত করেছেন – "দিব্যমানুষসংযোগো'প্যঙ্কে'ঙ্কে বিদূষকঃ"[৩৮]। আবার নখকুট্টের মতকেও গ্রহণ ক'রে সেই উদ্ধৃতির ব্যবহার করেছেন – "দিব্যমানুষসংযোগস্তোটকং নাটকার্থকম্"[৩৯] এবং পরিশেষে বাদরায়ণের অভিমতকেও গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন – "তোটকং তদ্ধি বিজ্ঞেযং দিব্যামানবসংগমম্। তদেষাং দিব্যাযা মানুষেণ সহ সঙ্গমো যস্তদেব মহল্লক্ষণম্"[৪০]। অর্থাৎ 'দিব্যমানুষ' এবং 'দিব্যামানব' এই দুটি পদার্থ উপলব্ধ। সেখানে বাদরায়ণের মতানুসারে নায়িকা হবে দিব্য এবং নায়ক হবে মর্ত্যবাসী মানুষ। অর্থাৎ উভয়েই স্বর্গবাস থেকে অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্যে আগমন করবে না। তাই বাদরায়ণের মতটি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্বশী ত্রোটকে গৃহীত। অথবা এমনটিও হওয়া অসম্ভব নয় যে *বিক্রমোর্বশী* সহ বিভিন্ন নাট্যগ্রন্থের উপস্থিতিতেই ত্রোটক বিষয়ে এমন মত ধার্য করেছেন বাদরায়ণ পণ্ডিত।

শাপমোচন কথিকায় কিন্তু বাদরায়ণকথিত মতের সমর্থন মেলেনা। সেখানে সৌরসেন প্রধানতঃ অভিশপ্ত হয়েছিল। মধুশ্রী তার সঙ্গে সহযন্ত্রণাভোগের প্রার্থনা করে ইন্দ্রাণীর কাছে। ইন্দ্র মধুশ্রীর আবেদনকে গ্রহণ ক'রে তাকেও মর্ত্যে প্রেরণ করে। *বিক্রমোর্বশী*-তে নায়িকা উর্বশী ছিল অভিশপ্ত কিন্তু পুরুরবা মর্ত্যলোকের চন্দ্রবংশীয়

রাজা। তাই এই দিব্য-মানুষ-সংযোগের দিক থেকে যে পার্থক্যটি রয়েছে, তা হ'ল ত্রোটক-এ নায়িকা কোনও কারণে শাপিত হয়ে সেই জন্মেই মর্ত্যে নির্বাসনদণ্ড প্রাপ্ত হলে কোনও মনুষ্য নায়কের সঙ্গে তার মিলন ঘটে। অন্যদিকে *শাপমোচন* কথিকায় নায়ক সৌরসেন ইন্দ্রশাপে মৃত্যুবরণ করে এবং পুনরায় মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করে। মধুশ্রীও একইসঙ্গে মর্ত্যে পুনর্জন্ম লাভ করে। তারাই অরুণেশ্বর-কমলিকারূপে মিলিত হয় নাট্যফলাংশে। তাই ভিন্ন নায়ক বা নায়িকার অবতারণা এই রবীন্দ্ররচনাতে সৃষ্ট বা দৃষ্ট নয়। *শাপমোচন*-এ কেবলমাত্র স্বর্গ থেকে মর্ত্যে পতনের অংশটিই সাযুজ্যপূর্ণ হয়েছে ত্রোটক-এর লক্ষণগত দিক থেকে।

❖ **খ্যাতবৃত্ত :**

উপরিভাগে উক্ত বিষয়টির সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ত্রোটক জাতীয় উপরূপকের উৎস। দিব্যা নায়িকা এবং অদিব্য নায়কের মিলন হলেও সেই চরিত্র তথা চরিত্রযুত কথাবস্তুর উৎসবিষয়ে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। নাটকের সঙ্গে ত্রোটক-এর একটি সম্বন্ধ থাকায় সাহিত্যদর্পণোক্ত নাটকের লক্ষণে নাট্যবস্তুর লক্ষণটি কীরূপ, তা দেখা যাক। "নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাত্..."[৪১] এই লক্ষণটি প্রমাণ করে ত্রোটক উপরূপকও হবে প্রখ্যাতবৃত্তোদ্ভূত। *বিক্রমোর্বশী*-র ইতিবৃত্তের সূত্র *ঋগ্বেদ সংহিতা*-র দশম মণ্ডলের ৯৫নং সংবাদ সূক্ত। তাই বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে "রামাযণাদি প্রসিদ্ধং বৃত্তম্"[৪২] এই বিবৃতি যেমন *বিক্রমোর্বশী* ত্রোটক-এ প্রতিফলিত হয়েছিল, তদ্বৎ *শাপমোচন* নাট্যেও নাট্যেতিবৃত্ত *মহাবস্তু* অবদান-এর 'কুশজাতক' অবদানকথা থেকে গৃহীত। আবার এখানে ইন্দ্র, শচী, উর্বশী এই ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরাণিক চরিত্রগুলির নিয়োগকারণে এখানে প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদেরও একটি ভূমিকা থেকেই যায়। তাই দুটি ধর্মদর্শনের ঐক্যবোধ *শাপমোচন*-এ লক্ষণীয়। *মহাবস্তু অবদান*-এর 'কুশজাতক' কাহিনিটিকেই তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদে প্রলিপ্ত করেছেন। প্রস্তরটি বৌদ্ধধর্মের হলেও সেই প্রস্তরগাত্রে যে অভিলেখ খোদিত হয়েছে, তা ব্রাহ্মণ্যবাদিতার। তাই স্বর্গরাজ্যের দেবদেবীদের মধ্যেও দেবরাজ ইন্দ্র মূলতঃ বৈদিক চরিত্র। ঋগ্বেদ সংহিতার সূক্তগুলিতে ইন্দ্র দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। সেই ইন্দ্রের প্রতি কুশের মাতা অলিন্দা দেবী তার সঙ্গে রমণক্রীড়ায় সম্মত না হওয়ায় ইন্দ্রের অভিশাপে রাজমহিষী দুর্ধর্ষ পুত্রসন্তসনের জন্ম দেয়। তাই নাটকের বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে তার বস্তুভাবনার যে নির্দেশ, তা *শাপমোচন* একটি কথিকারূপী নাট্য হয়েও তাকে বরণ করেছে। বৌদ্ধসংস্কৃতিতে এই গ্রন্থের মান্যতা ব্রাহ্মণ্যবাদী মহাপুরাণ এবং উপপুরাণতুল্য। তাই এই আখ্যানটিকে প্রখ্যাতবৃত্তজাত বলতে দ্বিধা নেই।

সাধারণতঃ আধিকারিক এবং প্রাসঙ্গিক[৪৩] এই দুভাবে ইতিবৃত্তকে বিভক্ত করা হয়ে থাকলেও *শাপমোচন*-এ কেবল আধিকারিক ইতিবৃত্ত-ই প্রধানভাবে প্রাপ্ত। এখানে পরিব্যাপ্ত কোনও দীর্ঘ উপবৃত্তান্তের রচনা হয়নি। সৌরসেন এবং মধুশ্রী উভয়ে যথাক্রমে অরুণেশ্বর এবং কমলিকারূপে পুনর্জন্মলাভ করেছে। তাই স্বর্গীয় আখ্যানটিকে প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত বলা যায়না। সৌরসেন এবং মধুশ্রীর শুধুমাত্র নামটুকুই পরিবর্তিত হয়েছে। নয়তো প্রথম থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত নায়ক সৌরসেন এবং নায়িকা মধুশ্রী।

প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের মধ্যে এখানে পতাকা[৪৪] বৃত্তের সমুল্লেখ না থাকলেও প্রকরী[৪৫] বৃত্তের দীপ্ত উপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রথম দৃশ্যে কথকের ভাষায় –

স্খলিতচ্ছন্দ সুরসভার অভিশাপে গন্ধর্বের দেহশ্রী হল বিকৃত, অরুণেশ্বর নামে তার জন্ম হল গান্ধাররাজগৃহে। মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল, বললে, "ঘটিয়ো না বিচ্ছেদ দেবী, গতি হোক আমাদের একই লোকে, একই দুঃখভোগে, একই অবমাননায়।" শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন। ইন্দ্র বললেন, "তথাস্তু, যাও মর্তে, সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে। সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয়।"[৪৬]

এখানে "একদেশভাক্" দেবরাজ ইন্দ্রের অভিশাপের কারণেই নাট্যের সূচনা। এই অভিশাপ এবং শাপমোচন কীভাবে ঘটেছিল, তার জন্য দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম দৃশ্যের ক্রমিক বিস্তার। অর্থতঃ ইন্দ্রকে প্রকরীবৃত্তের কর্তৃত্বস্বরূপ পাত্র হিসেবে বিবেচিত করা যায়।

❖ **প্রত্যক্ষনেতৃচরিত্র :**

নায়ক-নায়িকা সম্পর্কেও "দিব্যমানুষসংশ্রযম্" পদটি প্রযোজ্য। যেহেতু ইতিবৃত্ত নায়কাদি চরিত্রদ্বারাই সৃষ্ট, তাই বৃত্তমুখী নায়ক বা নায়িকার গুণাবলির অন্যতম শর্ত দাঁড়ায় তাদের স্বর্গীয় অনুষঙ্গতা।এছাড়াও নাটকের লক্ষণে *সাহিত্যদর্পণ*-এর উক্তি –

প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্ ।
দিব্যো'থ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্নাযকো মতঃ ।।[৪৭]

সুতরাং ত্রোটকস্থ নায়ককে হতে হবে খ্যাতবংশজাত, রাজর্ষি, ধীরোদাত্ত, প্রতাপশালী, দিব্য বা দিব্য হয়েও অদিব্য বা সাধারণ মানুষের গুণসম্পন্ন।

এক্ষেত্রে *শাপমোচন* কথিকার নায়ককে দুটি দিক থেকে বিচার করতে হয়। প্রথমতঃ 'কুশজাতক' গ্রন্থানুসারে সে ইক্ষ্বাকু বংশীয় কাশীর অধিপতি। আদিকবির *রামায়ণ*-এও ইক্ষ্বাকু বংশের উল্লেখ রয়েছে। তাই এই বংশটিকে 'প্রখ্যাত' বলা যায়। *শাপমোচন* কথিকার নবজন্মরূপী অরণেশ্বরের পরিচয় – "অরুণেশ্বর নামে তার জন্ম হল গান্ধাররাজগৃহে"[৪৮]। বৈয়াসিক *মহাভারত* অনুসারে ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী ছিল গান্ধারকুলকন্যা। আবার, প্রাচীন ভারতে ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে কাশী, গান্ধার, মদ্র তিনটিই ছিল উচ্চকোটির স্থান। যদিও মহাভারতের যে রাজবংশের কথা উচ্চারিত হয়েছে, অরুণেশ্বর সেই রাজবংশের রাজা কিনা তা সঠিকভাবে বোঝা যায়না। তবে মহাজনপদরূপে গান্ধার এবং মদ্র স্থানমাহাত্ম্যে যথেষ্টই প্রখ্যাত,সম্ভ্রান্ত এবং সমৃদ্ধশালী ছিল। আবার, রাজর্ষি সে-ই যে রাজা হয়েও নিস্পৃহ ঋষিতুল্য পুরুষ। অরুণেশ্বর রাজা হলেও *শাপমোচন* কথিকায় রাজতন্ত্রের কোনও ছায়া পরোক্ষভাবেও পতিত হয়নি নাট্যভূমিতলে। কেবলমাত্র কমলিকার গৃহত্যাগের পরেই সে যেখানে আশ্রয় নেয়, সেই স্থানটি হ'ল "বনের মধ্যে মৃগয়ার জন্যে যে নির্জন রাজগৃহ আছে সেইখানে"। *মনুসংহিতা*-র সপ্তম অধ্যায় 'রাজধর্মপ্রকরণ'-এ রাজার কাগজ ব্যসনের মধ্যে একটি হ'ল মৃগয়া বা শিকার –

মৃগযাক্ষো দিবাস্বপ্ন পরিবাদ স্ত্রিযো মদঃ।
তৌর্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ ।।[৪৯]

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেননি যে সেটি রাজা অরুণেশ্বররেই মৃগয়াবাটিকা। আবার, কমলিকা পিতৃগহে গমন করেছিল এমনতর ইঙ্গিতও প্রদত্ত নয়। আবার, রাজার বীণাধ্বনি সে প্রত্যক্ষ করতে পারত শ্রবণে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "পথের শুকনো পাতা পায়ে পায়ে বাজিয়ে দিয়ে গেল সে অশথতলায় - সেখানে বীণা বাজছে"[৫০]। তাই এক্ষেত্রে অরুণেশ্বরের সেই মৃগয়াবাটিকাতেই বীণাবাদনসহ নৃত্য ঘটেছে ব'লেই প্রতীতি জন্মায়। তাই স্থানটি গান্ধাররাজের সংস্রবযুক্ত কোনও স্থান চিহ্নিত হয়। তাই অরুণেশ্বরের রাজা হওয়ার এই একটি লক্ষণ 'মৃগয়া' পরিস্ফুট হয়েছে। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকে যেমন দুষ্যন্তের কয়েকটি রাজোচিত গুণের আভাস রয়েছে। এমনকি *বিক্রমোর্বশী* ত্রোটক-এও পুরুরবার বিক্রমবাচী কিছু গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। অথচ *শাপমোচন*-এ অরুণেশ্বরের রাজাত্ব পরিচয়েই সীমায়িত। ঋষিতুল্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তার জ্ঞান সুষুপ্তিদশায় নিমগ্ন নয়। সে জানে জগতের সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য। সুন্দর এবং অসুন্দরের তুলনায় ব'লে ওঠে "কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা"[৫১] এবং কমলিকার তার থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরেও তার দিনযাপনের সঙ্গী হয়েছে বীণা। একাকীত্বে অবিচলিত না হয়ে সে ধৈর্য এবং স্থৈর্যকে মিত্রের মর্যাদা দিয়েছে। তাই শেষে কমলিকা প্রত্যাবর্তন করলে তাকে বলে "ভয় কোরো না, প্রিয়ে, কোরো না"[৫২]। কমলিকাকে ক্ষমা করা এবং তারই সঙ্গে তাকে পুনরায় গ্রহণ করার যে উদারতা, সেই গুণই তাকে 'রাজর্ষি' ক'রে তুলেছে।

ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ কতখানি অরুণেশ্বরের মধ্যে রয়েছে, তা যেমন বিচারসাপেক্ষ, তেমনই এটিও স্মতর্ব্য যে তার মধ্যে ধীরললিত নায়কত্বও ক্ষীণ নয়। ধীরোদাত্ত নায়কসম্বন্ধে *সাহিত্যদর্পণ*-এ পাওয়া যায় –

অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ ।
স্থেযান্ নিগূঢমানো ধীরোদাত্তো দৃঢব্রতঃ কথিতঃ ।।[৫৩]

অর্থাৎ এই নায়ক হবে আত্মশ্লাঘারহিত, ক্ষমাপরায়ণ, স্বভাবতঃ গম্ভীর, আনন্দ বা শোকাদি দ্বারা অনভিভূত সত্ত্বগুণান্বিত, স্থিরতাভাবসম্পন্ন, বিনয়ের দ্বারা গর্ব আচ্ছন্ন এবং কৃতসংকল্পে অনড়।

এই গুণগুলি অরুণেশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান। সে গান্ধারনৃপতি; তাই তার শ্লাঘ্য পদ অবিসংবাদিত। অথচ সে কমলিকার পিতাকে পত্রপ্রেরণ করে অযাচিতভাবেই। তার মধ্যে শ্লাঘনীয় কোনও গুণ প্রকাশ পায়না। সে ক্ষমাশীল উদারচেতা ব্যক্তি। তাই কমলিকা যখন তার রূপকে ধিক্কার জানিয়ে তাকে ত্যাগ ক'রেও পরে ফিরে আসে তারই দ্বারে, তখন সে কেবলই তাকে ভয় করতে বারণ ক'রে তার মনে সাহস জাগিয়ে তুলতে চায়।

অর্থাৎ পুনরায় তাকে গ্রহণ এবং স্ত্রীর মর্যাদাদানে কোনওরূপ দ্বিধা দেখা যায়না। তার গাম্ভীর্যের নিদর্শন রয়েছে এই অংশেই। কমলিকার আত্মসমর্পণে অরুণেশ্বরের কোনও উছলতা প্রকাশ পায়না। এমনকি কমলিকার সঙ্গে

দিবানিশি সে একটি অন্তরাল বজায় রেখে চলেছে। কমলিকা তাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করার আবেদন জানালে সে বলে –

আমার গানেই তুমি আমাকে দেখো। আগে দেখে নাও অন্তরে, বাইরে দেখবার দিন আসবে তার পরে। নইলে ভুল হবে, ছন্দ যাবে ভেঙে।[৫৪]

এই গাম্ভীর্য তার চরিত্রের অনন্যতা। এমনকি যখন তার আজন্মলালিত বীণা তারই প্রতিনিধিস্বরূপ বিবাহস্থলে উপস্থিত হয়, সেই সময়ের বর্ণনায় পাওয়া যায় – "যথালগ্নে রাজহস্তী পৃষ্ঠে রত্নাসনে রাজার প্রতিনিধি হয়ে এল অরুণেশ্বরের বক্ষোবিহারিণী বীণা, রাজার অশ্রুত আহ্বান সঙ্গে করে"[৫৫]। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকে যেমন পঞ্চম অঙ্কে রাজা দুষ্যন্তের আতিথেয়তায় মুগ্ধচিত্তে শার্ঙ্গরব বলে –

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈ-
-র্নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ
স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্ ।।[৫৬]

অর্থাৎ আম্রতরু যেমন ফলভারে নত, সজল মেঘ যেমন সদা ধরিত্রীর প্রতি নত, তেমনই সমৃদ্ধশালী রাজা ক্ষমতাবান হয়েও গুণভারে নত। রাজতন্ত্র পরিচালনার দিকটি সম্পূর্ণই উহ্য থেকেছে এখানে। এরূপ কোনও রাজোচিত গুণ *শাপমোচন*-এ চিত্রায়িত অরুণেশ্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়নি মূলস্রোতকে আহত না করার জন্যই। কেবলমাত্র রাজহস্তীর ব্যবহার তার রাজোচিত গাম্ভীর্যেরই একটি প্রতীক। অরুণেশ্বর মহাসত্ত্ব ব্যক্তিত্ব, তার কারণ কমলিকার গৃহত্যাগে সে শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়েনা। শুধু গানের মাধ্যমে বলে –

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
মিলনপিয়াসি মোরা, কথা রাখো, কথা রাখো।[৫৭]

আবার পুনর্মিলনেও সে উদ্বেলিত নয়। যথাসম্ভব ব্যাপারটিকে স্থৈর্যের সঙ্গে নিস্তরঙ্গেই স্বীকার করে। তাই এই প্রসঙ্গে তার স্থেয়ত্ব গুণটিও প্রকাশিত। তার মধ্যে গর্ব আচ্ছন্ন রয়েছে এমন কোনও নাট্যিক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যে তা ব্যাখ্যাত হবে। তবে এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে নাট্যসমাপ্তি পর্বে তার জয় ঘটেছে। এই জয় চিরসুন্দরের চিরস্থায়ী বিজয়। তাই কমলিকার প্রতি বাক্যবাণ বর্ষিত হয়নি। তার জয়কে সে নিরাভরণরূপেই বরণ করেছে। তার প্রাপ্য পুরস্কার কমলিকার দাক্ষিণ্যলাভ। স্বর্গলোকে কৃত অপরাধের বশে সহনশীলভাবে মর্ত্যে বাস ক'রে নারকীয় যন্ত্রণাভোগের শেষে প্রেয়সী মধুশ্রীর সঙ্গলাভ-ই ছিল তার *শাপমোচন* । তাই এই জয়ের উল্লাস অপ্রশস্ত নয়। তবুও এই গর্বকে সে তার আচরিত শিক্ষার দ্বারা আবৃত করেছে। অর্থাৎ একজন সংযমী সৎপুরুষরূপেই অরুণেশ্বরকেই আবিষ্কার করা যায়। একইসঙ্গে তার সংকল্পে স্থিরতার প্রসঙ্গটি বিধৃত। ইন্দ্রের শাপকে সে মস্তকে ধারণ ক'রেই মর্ত্যবাস করেছে এবং অসহনীয় বিরহকে জয় করার মাধ্যমেই তার দৃঢ়তার

পরিচয় পাওয়া যায়। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকে ষষ্ঠ অঙ্কে দুষ্যন্তের স্মৃতি জাগ্রত হলে সেই শোকাতুর দশাতেও সে দেবাসুরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেবতাপক্ষে। অর্থাৎ কর্তব্যকর্মে সে অবিচল। আত্মকেন্দ্রিকতার বিসর্জনের পরেই যে পরার্থে কর্মসম্পাদন একজন গুণবান রাজার কর্ম, সেই তত্ত্ব সেখানে পাওয়া যায়। তবে সেরকম অনুষঙ্গ *শাপমোচন*-এর পরিসরে না থাকায় অরুণেশ্বরের ব্যক্তিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই তার নায়কোচিত গুণাবলিকে পরীক্ষা করতে হয় এবং সেই পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ। অর্থাৎ একজন ধীরোদাত্ত প্রকৃতির নায়করূপেই *শাপমোচন*-এ অরুণেশ্বর চিত্রিত।

তবে ধীরললিত গুণগুলিও অরুণেশ্বরের মধ্যে উপস্থিত। এরূপ নায়কের বৈশিষ্ট্য চতুর্থ অধ্যায়ে *মায়ার খেলা* গীতিনাট্যের অমরের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাত হয়েছে[৫৮]। অরুণেশ্বরের মধ্যেও দেখা যায় সে নিরুদ্বেগচিত্ত, কোমল স্বভাবী এবং গান্ধর্বকলাবিদ্যায় পারদর্শী। কমলিকার তার প্রতি অবমাননায় সে নিরুদ্বেগচিত্ত হয়ে আপন মনে সংগীতচর্চায় দিন অতিবাহিত করে। স্বর্গরাজ্যে সৌরসেন ছিল মৃদঙ্গবাদক এবং মর্ত্যে অরুণেশ্বররূপে সে বীণাবাদক। এই ধীরললিত গুণ *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকেও রাজা উদয়নের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই নাটকসদৃশ নায়ক যে উদাত্ত হয়েও ললিত হতে পারে, তার প্রমাণ *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটক। সেখানে ষষ্ঠ অঙ্কের শুরুতেই বিষ্কম্ভকে প্রতীহারীর উক্তিতে জানা যায় রাজার বীণার প্রতি আসক্তি –

কুতো'স্য বীণাযা আগম ইতি। তেন ভণিতম্ – অস্মাভির্নর্মদানদীতীরে কুঞ্জগুল্মলগ্না দৃষ্টেতি। যদি প্রয়োজনমনযা উপনীযতাং ভর্ত্রেতি। তাং চোপনীতামঙ্কে কৃষ্ণা মোহং গতো ভর্ত্তা।[৫৯]

সাহিত্যদর্পণকৃত নাটকলক্ষণে ধীরোদাত্ত নায়কের কথা জোর দিয়ে বলা হলেও সমান্তরালভাবে ধীরললিত যে হতে পারেনা এমনটি হয়ত নয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে নায়ক ধীরললিত স্বভাবের হোক বা না হোক; ধীরোদাত্ত হতেই হবে। তাই অরুণেশ্বর ধীরললিতভাবাশ্রিত ধীরোদাত্ত নায়ক।

এরপর আসতে হয় প্রতাপের প্রসঙ্গে। *শাপমোচন*-এ অরুণেশ্বরের রাজোচিত প্রতাপ ব্যক্ত নয়। অভিজ্ঞানশাকুন্তল নাটকে দুষ্যন্তের অপরাধীদের দণ্ডবিধানের ক্ষমতার ইঙ্গিত রয়েছে ষষ্ঠ অঙ্কে ধীবরবৃত্তান্তে। এছাড়াও *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকেও উদয়নের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহ যে একটি রাজনৈতিক কূটনীতির অবলম্বন তাও প্রথম অঙ্কে যৌগন্ধরায়ণের উক্তিতে পরিষ্কৃত এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাহের অচিরেই রাজ্যবল বৃদ্ধি পেলে পুনরায় উদয়নের স্ত্রী বাসবদত্তা রাজমহিষীর মর্যাদা লাভ করবে; কারণ সংসারে ভাগ্যের চক্রাবর্তন অনিবার্য –

পূর্ব্বং ত্বযাপ্যভিমতং গতমেবাসী-
-চ্ছ্লাঘ্যং গমিষ্যসি পুনর্বিজযেন ভর্ত্তুঃ ।
কালক্রমেণ জগতঃ পরিবর্ত্তমানা
চক্রারপঙক্তিরিব গচ্ছতি ভাগ্যপঙক্তিঃ ।।[৬০]

অথচ *শাপমোচন* কথিকায় এরূপ কোনও রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবকাশ নেই। তাই এক্ষেত্রে প্রতাপ বলতে তার কৃতসংকল্পে দৃঢ়তাকেই নির্দিষ্ট করতে হয় যা পূর্বেই উক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে তার তেজস্বী স্বভাব ব্যক্তিত্বের আলোকে উদ্ভাসিত। স্বর্গে শাপিত হয়েও মর্ত্যে সেই অভিশাপমোচনের যাত্রাপথই তার তেজস্বিতার স্বাক্ষর। তবে দিব্য বা দিব্যাদিব্য চরিত্ররূপে অরুণেশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়না। স্বর্গীয় উপসর্গ থাকলেও তাকে দুষ্যন্তের ন্যায় 'রাজর্ষি' বলাই সমীচীন।

❖ **রসভাবসমুজ্জ্বল :**

নাটকের অঙ্গিরসপ্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকারের উক্তি "এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গার বীর এব বা"[৬১]। অর্থাৎ নাটক নামক রূপকের রস হবে শৃঙ্গার অথবা বীর কিন্তু ত্রোটক উপরূপকের অঙ্গিরস হবে কেবলমাত্র শৃঙ্গার-ই। যেহেতু বিশ্বনাথ কবিরাজ এটি বৃত্তিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন[৬২], তাই রসসাম্যে ত্রোটক নাটকের একদেশভাক্। *বেণীসংহার, মুদ্রারাক্ষস* ইত্যাদি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের মুখ্য রস বীর। তাই ত্রোটক এই জাতীয় নাটকতুল্য নয়। আবার শৃঙ্গার রস যেহেতু সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভাত্মক; তাই ত্রোটক-এ কোন্ প্রকার শৃঙ্গার রস ধ্বনিত, তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে *সংগীতদামোদর* গ্রন্থের বিধান যে এটি হবে "বিপ্রলম্ভগহনো"[৬৩] বা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গাররসধর্মী। তিনি উদাহরণস্বরূপ *বিক্রমোর্বশী* রচনাকেই আদর্শ ত্রোটকরূপেই স্বীকার করেন[৬৪]। সুতরাং আচার্য শুভঙ্করের দৃষ্টিতে এই নাট্যটি বিপ্রলম্ভতায় রসাবিষ্ট। সাহিত্যদর্পণদিশায় সম্ভোগ শৃঙ্গারের লক্ষণটি হ'ল –

দর্শনস্পর্শনাদীনি নিষেবেতে বিলাসিনৌ ।
যত্রানুরক্তাবন্যোন্যং সম্ভোগো'যমুদাহৃতঃ ।।[৬৫]

অর্থাৎ সাহিত্যকর্মে যদি নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি প্রীতিবশতঃ দর্শন, স্পর্শজনিত কারণে মিলন সম্পাদিত হয়, তবে তা সম্ভোগাত্মক শৃঙ্গার রস। সম্যকভাবে ভোগ বা কামেচ্ছা চরিতার্থ হয়, তবেই তা সম্ভোগ। *বিক্রমোর্বশী*-তে পুরুরবা এবং উর্বশী মর্ত্যবাসে উক্ত সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত ছিলনা। তাই অঙ্গিরস হিসেবে সেখানে সম্ভোগত্ব বর্তমান থেকেছে। পঞ্চম অঙ্কে রাজা সাময়িক মনোব্যথা প্রকাশ পেলেও পরে দৈবকৃপায় আজীবন উর্বশীর সঙ্গলাভের বর পায়। সুতরাং শৃঙ্গারের প্রবাসরূপ বিপ্রলম্ভত্বও এখানে ব্যঙ্গ্য হয়না। তুলনায় *শাপমোচন* কথিকায় বিপ্রলম্ভরূপে শৃঙ্গার হৃদয়গম্য হয়। এই রসের লক্ষণে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন "যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্ভো'সৌ"[৬৬]। যেখানে রতি অভীষ্ট নায়ক বা নায়িকাকে সম্ভোগে ব্যর্থ, সেখানেই বিপ্রলম্ভতা ঘটে থাকে। এই কালিকার অব্যবহিত পরবর্তী বিপ্রলম্ভতার চতুর্বিধ ভেদ প্রদর্শিত হয়েছে। যথা পূর্বরাগ, মান, প্রবাস এবং করুণ। সেই কারিকাটি হ'ল "স চ পূর্বরাগ-মান-প্রবাস-করুণাত্মকশ্চতুর্ধা স্যাত্"[৬৭]। এর মধ্যে *শাপমোচন*-এ অঙ্গিরসরূপে যেটি ব্যঞ্জিত, তা হ'ল প্রবাস। প্রবাসপ্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণদ্বারা উক্ত –

প্রবাসো ভিন্নদেশিত্বং কার্য্যাচ্ছাপাচ্চ সম্ভ্রমাত্ ।
অত্রাঙ্গচেলমালিন্যমেকবেণীধরং শিরঃ ।
নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসরুদিতভূমিপাতাদি জায়তে ।।[৬৮]

এখানে বলা হয়েছে যে কার্য, শাপ এবং ভয়জনিত কারণে দেশান্তরগমন-ই প্রবাস বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রস। *শাপমোচন*-এর প্রথম দৃশ্যেই গন্ধর্ব সৌরসেন উর্বশীর নৃত্যে তালভঙ্গের অপরাধে দেবরাজ কর্তৃক শাপে দুষ্ট হয়। ফলে মধুশ্রীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে এবং স্বর্গ থেকে তার বিদায় ঘটে। যদিও মধুশ্রীও স্বেচ্ছায় মর্ত্যে জন্ম নেয় তথাপি পুনর্জন্মে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রয়েই যায় –"ঘটিয়ো না বিচ্ছেদ দেবী, গতি হোক আমাদের একই লোকে, একই দুঃখভোগে, একই অবমাননায়"[৬৯]। এই প্রবাস বিপ্রলম্ভে দেহ এবং বসনভূষণের মালিন্য, (নায়িকার) একপার্শ্বে বেণীবন্ধন, নিঃশ্বাস, উচ্ছ্বাস, অশ্রুপাত, ভূমিতে পতন ইত্যাদি অনুভাবের অবকাশ রয়েছে। *শাপমোচন* -এ কমলিকার বিরহদশার উল্লেখ পাওয়া যায় এভাবে –

রাজমহিষী বিছানায় উঠে বসে, স্রস্ত তার বেণী, ত্রস্ত তার বক্ষ। বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় অন্তহীন অভিসারের পথ। রাগিণীবিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন।[৭০]

এখানে কমলিকার শিথীল কেশবন্ধনের কথা উল্লিখিত।

রাতের পর রাত যায়। অন্ধকারে তরুতলে যে মানুষ ছায়ার মতো নাচে তাকে চোখে দেখি নে, তার হৃদয় দেখি-জনশূন্য দেওদার-বনের দোলায়িত শাখায় যেন দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ার হাহাকার। রানী মনে ভাবে, যখন সে কাছে এল তখন ছিল কৃষ্ণসন্ধ্যা। যখন চাঁদ উঠল তখন তার মালাখানি রইল, সে রইল না।[৭১]

উপরিকথিত এই বাক্যগুলি যখন নেপথ্য থেকে শ্রুত হয়, তখন অভিনয়কালে কমলিকার ভূমিশয্যা, নিঃশ্বাস, উচ্ছ্বাসের ভাবাভিনয় ঘটতে থাকে। এই আঙ্গিক অভিনয়-ই সেই চরিত্রের প্রায়দায়িনী অব্যর্থ শক্তি। আবার, বিবাহপূর্বকালে অরুণেশ্বরের মধ্যে পূর্বজন্মের স্মৃতি দোলায়িত হয় "সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে" গানটির মধ্যে। আবার "জাগরণে যায় বিভাবরী" গানের কয়েকটি চরণ-ও অরুণেশ্বরেরও অশ্রু সাত্ত্বিক ভাব, নিঃশ্বাসেরই বাণীসঞ্চয় –

এই হিয়া-ভরা বেদনাতে
বারি-ছলছল আঁখিপাতে
ছায়া দোলে তারি ছায়া দোলে
ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি॥[৭২]

তবে এই কথিকায় বিপ্রলম্ভরূপ শৃঙ্গারের 'পূর্বরাগ' বিষয়টিও লক্ষণীয়। পূর্বরাগের লক্ষণে বিশ্বনাথ কবিরাজের বচন –

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মিথঃ সংরূঢরাগযোঃ ।
দশাবিশেষো যো'প্রাপ্তৌ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ।।[৭৩]

অর্থাৎ নায়ক বা নায়িকার গুণ, রূপ, চারিত্রিক সাধুতা ইত্যাদি বিষয়ে নায়ক বা নায়িকা দৃষ্ট বা শ্রুত হলে তার প্রতি যে মিলনবাসনা ইঙ্গিত হয় কিন্তু মিলন সাধিত হয়, তখন তা পূর্বরাগ। আবার, এই দর্শন সাক্ষাৎ ব্যতীত বিভিন্ন পদ্ধতিতেও হতে পারে। যথা ইন্দ্রজাল, স্বপ্ন, আলেখ্য ইত্যাদি – "ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাত্ স্বপ্নে চ দর্শনম্"[৭৪]। অরুণেশ্বর কমলিকার চিত্রদর্শনে তার প্রতি অনুরাগ জন্মায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

কেমন করে কমলিকার ছবি এসে পড়ল গান্ধারে রাজ-অন্তঃপুরে। মনে হল, যা হারিয়েছিল এই-জন্মের আড়ালে, তাই যেন ফিরে ধরা দিল অপরূপ স্বপ্নরূপে।... ছবিখানি দিনের চিন্তা রাতের স্বপ্নের পরে আপন ভূমিকা রচনা করলে।[৭৫]

আবার, অন্যদিকে কমলিকা পায় অরুণেশ্বরের দূত কর্তৃক প্রেরিত সেই পত্র। সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

চিঠি পৌঁছল রাজকন্যার হাতে। অজানার আহ্বানে তার মন হলো উতলা। সখীদের নিয়ে বারবার করে পড়লে সেই চিঠি।[৭৬]

সেই পূর্বরাগদশায় কমলিকার অভিব্যক্তি একটি গানে ব্যক্ত হয়েছে –

দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে,
তার দূরের বাণীর পরশমানিক লাগুক আমার প্রাণে এসে।[৭৭]

অরুণেশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শনের পূর্বেই তার কথা জানতে পেরেই কমলিকাও পূর্বরাগের বশবর্তিনী হয়ে পড়ে। অর্থাৎ শাপমোচন কথিকায় প্রবাসরূপী বিপ্রলম্ভতার গর্ভেই পূর্বরাগের অনুকুল পরিস্থিতি নাট্যায়িত হয়েছে। তাই বলা যেতে পারে যে প্রবাস বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার যেমন *শাপমোচন* কথিকার অঙ্গিরস, তেমনই পূর্বরাগ এখানে অঙ্গরস। তাই বিশ্বনাথ কবিরাজের প্রণিধানানুযায়ী শৃঙ্গার যে এখানে অঙ্গিরস, সে বিষয়ে কোনও দ্বিধা নেই।

❖ **পঞ্চসন্ধিসমন্বিত :**

ত্রোটক উপরূপকের সন্ধি নিয়ে যে পণ্ডিতমহলে কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য রয়েছে তা প্রথম অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে।। অর্থাৎ পাঁচটি সন্ধিই এখানে কার্যকর। এখন নাটকের সন্ধিবিষয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজের মতটি দেখে নেওয়া যাক। তিনি *সাহিত্যদর্পণ*-এর যেমন বলেছেন নাটক হবে "পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্", তেমনই আবার বলেছেন "অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে কার্য্যো নির্বহণে'ভুতঃ"[৭৮]। অর্থাৎ নির্বহণ সন্ধিতে অদ্ভুত রসের প্রয়োগ থাকবে। যাই হোক *শাপমোচন*-এ পাঁচটি সন্ধির উপস্থিতি বিচার্য।

▪ **মুখসন্ধি :**

প্রথম নাট্যসন্ধির জন্য বীজ এবং আরম্ভ অবস্থার অনুসন্ধান করণীয়।[৭৯] *শাপমোচন* -এ বীজ উপ্ত হয়েছে প্রথম দৃশ্যের "তথাস্তু যাও মর্ত্যে..." ইত্যাদি ইন্দ্রবচনের মধ্যেই। সৌরসেন এবং মধুশ্রীর মর্ত্যলোকে যথাক্রমে অরুণেশ্বর এবং কমলিকার মিলন একটি বন্ধুর পথ অতিক্রম ক'রে সম্পন্ন হয়েছে। ইন্দ্রবচনের মধ্যে "দুঃখ পাবে, দুঃখ

দেবে” এই বাক্যদ্বয়টি ফলিত হয়েছে কমলিকার অরুণেশ্বরের রূপসাক্ষাতে তার প্রতি নিদারুণ অবমাননায়। অর্থাৎ সে দুঃখ দিয়েছে অরুণেশ্বরকে। আবার, দুঃখভোগের শরিক দুজনেই। অরুণেশ্বর যেমন কমলিকার জন্য ব্যথিত হয়েছে, তেমনই একাকিনী কমলিকার চৈতন্যোদয়ের প্রাক মুহূর্ত পর্যন্ত সে বনবাসজীবনে যথেষ্ট দুঃখতাপিত হয়েছে। গানেই তার প্রকাশ ঘটেছে –

ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহমিলনমিলিত রাগে।
সুখে কি দুখে ও পাওয়া না-পাওয়া,
হৃদয়বনে ও উদাসী হাওয়া,
বুঝি শুধু ও পরমকামনা॥[৮০]

আবার, “সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয়” এই নির্দেশটিও নাট্যের পরিণামে সহৃদয়ের সম্মুখে অভিব্যক্ত। তার কারণ, কমলিকার অব্যক্ত মনস্তাপ পরিশেষে অরুণেশ্বরের স্নিগ্ধকোমল চিত্তের কাছে পরাজিত হয়েছে। আত্মগরিমা এবং রূপপিপাসাও অরুণেশ্বরের নির্মল নীররাশিতে বিলীন হয়েছে। সে বলেছে –

তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজে না বাঁশি,
এই আলো এই হাসি ডুবে আঁধারে॥[৮১]

তাই বীজ যে মহীরুহে পরিণত হয়েছে, তার প্রমাণ স্বয়ং নাট্যফল।

আবার আরম্ভ অবস্থার চিহ্ন রয়েছে দ্বিতীয় দৃশ্যে। সেখানে বীজের যুক্তীকরণ লক্ষ্য করা যায় উভয়েরই নবজন্মলাভে। “গন্ধর্বের দেহশ্রী হল বিকৃত” এই ইন্দ্রাভিশাপ যে বাস্তবায়িত হয়েছে, তা বোঝা যায় অরুণেশ্বর যখন নিজরূপকে সন্তর্পণে অপ্রকাশিত রেখে বীণাপ্রেরণ করে মদ্ররাজকুলে কমলিকার পিতৃগৃহে। তাই নাট্যফলের প্রতি ঔৎসুক্য লক্ষ্য করা গেছে বিবাহের মাধ্যমে। তাই প্রথম এবং দ্বিতীয় অঙ্কের সামগ্রিক পরিসরে মুখসন্ধি নির্ণীত।

- **প্রতিমুখ সন্ধি :**

এই দ্বিতীয় সন্ধির প্রসঙ্গে আসে বিন্দু এবং প্রযত্ন-এর সহযোগিতা[৮২]। তৃতীয় দৃশ্যটিকে এই সন্ধির নিবাসস্থলরূপে চিহ্নিত করা যায়। অবান্তর বা প্রাসঙ্গিক বৃত্তের অর্থবিচ্ছেদের জন্য যখন বিন্দুরূপী বীজের প্রয়োজন পড়ে, তখনই বোঝা যায় নাট্যফল স্রোতের বিপরীতে বয়ে চলেছে। তৃতীয় দৃশ্যে কমলিকা অরুণেশ্বরের রূপপ্রত্যক্ষ করতে উদগ্রীব। সে বলে “প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার দিন, আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও”[৮৩] অথচ অরুণেশ্বর তাকে বলে –

আমার গানেই তুমি আমাকে দেখো। আগে দেখে নাও অন্তরে, বাইরে দেখবার দিন আসবে তার পরে। নইলে ভুল হবে, ছন্দ যাবে ভেঙে।[৮৪]

সাধারণভাবে মধুশ্রীর আকাঙ্ক্ষা সহৃদয়বর্গকে ভাবিত করে যে দর্শনমাত্রেই উভয়ের মধ্যে চির বিচ্ছেদের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠবে। তাহলে পূর্বজন্মকৃত অপরাধের ক্ষয় ঘটবেনা। তাই কমলিকার এই মনোবাসনা এবং অরুণেশ্বরের প্রতি অভিযোগ যখন একটি বিপরীত স্রোতে চলমান, তখনই প্রতিমুখসন্ধির গ্রন্থনা। বিন্দু হিসেবে এখানে উল্লেখ করা যায় যে অরুণেশ্বরের চৈত্রসংক্রান্তির দিনে প্রকাশ্যে দিবালোকে নৃত্যের দিনে কমলিকার তাকে দর্শন করার অনুমতিদানে একটি দার্শনিক সত্যকথন। অথচ কমলিকা যখন বহুজনের সঙ্গে তাকে শনাক্ত করবে কীভাবে, তখন তার উত্তর অরুণেশ্বর দেয় – "যেমন খুশি কল্পনা করে নিয়ো। সেই কল্পনাই হবে সত্য"[৮৫]। অর্থাৎ কমলিকা স্বপ্নালোকে যে অনুপম সুন্দর মূর্তি কল্পনা করবে, সেই কল্পিত রূপেই সে সন্তুষ্ট হবে এবং উভয়ের নিভৃত মিলনে কোনও উপদ্রব থাকবে না। তাই এই উক্তিটিকেই বিন্দু বলা যায়।

আবার ফললাভের জন্য প্রযত্ন অরুণেশ্বরের মধ্যেই লক্ষিত হয়। কমলিকার উদ্বেগ নিরসনের জন্য সে বলে–

প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে নষ্ট কোরো না, এই মিনতি। এখনো তুমি অন্যমনে আছ, শুভদৃষ্টির সময় তাই এল না।[৮৬]

অর্থাৎ সে জানে তার রূপ কমলিকা প্রত্যক্ষ করলে তাদের মিলন বিঘ্নিত হবে। তাই প্রতিকুল দশার মধ্যেই নাট্যফললাভের জন্য তরান্বিত হওয়া অরুণেশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান।

- **গর্ভ সন্ধি :**

তৃতীয় নাট্যসন্ধি এই রবীন্দ্রনাট্যে চতুর্থ দৃশ্য থেকে পঞ্চম দৃশ্যের কমলিকার বোধোদয় লগ্ন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সন্ধি মুহুর্মুহু উপায়-অপায়ের দ্বারা পরিচালিত।[৮৭] চতুর্থ দৃশ্যে কমলিকার সখাসহ অরুণেশ্বরের নৃত্যদর্শনের পর সমালোচনায় অপায় দর্শিত। আবার অরুণেশ্বরের গানে উপায়লাভ –

বাহিরে ভুল ভাঙবে যখন
অন্তরে ভুল ভাঙবে কি।
বিষাদ বিষে জ্বলে শেষে
রসের প্রসাদ মাঙবে কি ।[৮৮]

এতদসত্ত্বেও কমলিকার পীড়াপীড়িতে অরুণেশ্বরের প্রকাশ্যে উপস্থিতিতে কমলিকার আত্মবঞ্চনার অনুভবে গৃহত্যাগের সিদ্ধান্তগ্রহণে অপায় পুনরায় দর্শিত। এরপর বনবাসের জীবনে কমলিকার বিরহ –

রাত্রি যখন দুইপ্রহর, আধোঘুমে সে শুনতে পায় এক বীণাধ্বনির আর্তরাগিণী। স্বপ্নে বহুদূরের আভাস আসে। মনে হয়, এই সুর চিরদিনের চেনা। চিরবিরহের সঞ্চিত অশ্রু বুকের মধ্যে উছলে ওঠে।[৮৯]

সে পতিগৃহত্যাগ করেছে স্বেচ্ছায় অথচ অরুণেশ্বরের বীণাধ্বনির অনুরণন তার প্রেমী হৃদয়কে অকালনিদ্রা থেকে উত্থিত ক'রে তোলে। তাই এখানে নাট্যবীজ মেঘের মধ্যেও কিয়দংশে প্রকাশিত হতে সচেষ্ট। আবার, তার নিষ্ঠুর হৃদয় পরিত্রাণ পেতে তখনও প্রস্তুত নয়। তাই গানে রবীন্দ্রনাথ বলেন –

যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা, মিছে মরি ভয়ে লাজে।
কী জানি কোথা সে বিরহহুতাশে ফিরে অভিসারসাজে-
বনমাঝে কি মনোমাঝে॥[৯০]

তার মনের দ্বন্দ্বকে সে সহজেই রিক্ত করতে অক্ষম। তার আর্তি কণ্ঠদেশেই বদ্ধ। সে অহংশূন্য হয়ে খণ্ডতাকে ভুলে পূর্ণতার দিকে যাত্রা করতে পারেনা। তাই "ওই বুঝি বাঁশি বাজে" গানটি পর্যন্তই দ্বন্দ্ববাহুল্যে নাট্যে গর্ভসন্ধি অবস্থিত। এই সন্ধির প্রসঙ্গেই আসে পতাকা অর্থপ্রকৃতি এবং প্রাপ্ত্যাশা অবস্থার প্রসঙ্গ[৯১]। এখানে কোনও প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের অবকাশ রাখেননি নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ। যে নাট্যিক দ্বন্দ্ব উত্থাপিত হয়েছে, তা কেবলই কমলিকার দুটি পৃথক সত্তায়। একটি সত্তা চায় জীবনবোধের ক্ষুদ্রত্বকে এবং দ্বিতীয় সত্তাটি চায় বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে একত্ব। এ যেন জীবাত্মা এবং পরমাত্মার প্রতিচ্ছবি। তবে নাট্যফললাভের জন্য সম্ভাবনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে নিম্নোক্ত কথকতায় –

বীণায় বাজতে থাকে কেদারা বেহাগ, বাজে কালাংড়া। আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র। বীণাধ্বনি যেন আজ আর বাইরে নেই; এসেছে তার অন্তরের তন্তুতে তন্তুতে।[৯২]

রাজমহিষী কমলিকার অন্তরের রন্ধ্রে বীণাধ্বনিতে মূর্ছিত রাগ-রাগিনী প্রকৃততঃ রাজা অরুণেশ্বরের অনুরাগ। তাই কমলিকার হৃদয়গহ্বরের কঠিন শিলার গলনাঙ্ক অনুভববেদ্য এই উক্তিতে। তাই এখানে একটি প্রাপ্তিসম্ভব লক্ষিত।

- **বিমর্ষ বা অবমর্শ সন্ধি :**

চতুর্থ নাট্যসন্ধি বিমর্ষ বা অবমর্শ[৯৩] এই নাট্যের কমলিকার অরুণেশ্বরের কাছে ফিরে আসার সংকল্পগ্রহণে নির্দেশিত। যখন "মোর বীণা ওঠে" গীত হয়, তার পূর্বেই কমলিকা স্বগতোক্তিতে বলে ওঠে –

ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না। আর দেরি নেই, দেরি নেই।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবেছে অমাবস্যার তলায়। আঁধারের ডাক গভীর। রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "যাব আজ। আর ভয় করি নে আমার দৃষ্টিকে।"[৯৪]

এখানে অপায়ভাব দৃষ্ট। অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার মিলনের পথ অনেকখানিই প্রসারিত হয়ে উঠেছে। পূর্ব সন্ধির ন্যায় এখানেও নিয়তাপ্তি[৯৫] অবস্থা পরিলক্ষিত হলেও প্রকরী অর্থপ্রকৃতির উল্লেখ নেই।

- **উপসংহৃতি বা নির্বহণ সন্ধি :**

পঞ্চম তথা শেষ নাট্যসন্ধি উপসংহৃতি বা নির্বহণ নায়ক-নায়িকার মিলনে নিষ্পাদিত। কমলিকা তার মনোমালিন্যকে দমন করে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ পঞ্চ তন্মাত্রের ডাককে পিছনে রেখে নিরাকারের দিকে অগ্রসর হয়েছে। তাই এখানে কার্য অর্থপ্রকৃতি এবং ফলাগম অবস্থার যৌথ তৎপরতায়[৯৬] একটি মধুর সমাপ্তি ঘটেছে। ইন্দ্রকথিত বচনে ছিল অপরাধের ক্ষয় তথা অরুণেশ্বর-কমলিকারূপী সৌরসেন এবং মধুশ্রীর শৃঙ্গারমিলন ঘটবে অধি-আত্মিক বিরহযন্ত্রণাভোগের মাধ্যমে। এই বীজটিকেই ফলে পরিণত করার জন্য যাবতীয় নাট্যকথাবস্তুর গ্রন্থনা। তাই উদ্দিষ্ট কার্য সাধিত এবং তৎসঙ্গে নাট্যফল-ও ঘোষিত। তাই পঞ্চম সন্ধিটিও সার্থক এই নাট্যে।

এরপরের লক্ষ্য অবমর্শ সন্ধির দ্বারা স্পষ্টভাষণ এবং নির্বহণ সন্ধিতে অদ্ভুত রসের দ্যোতনাপ্রসঙ্গে। অবমর্শ সন্ধি যে এই নাট্যে স্বল্পদৈর্ঘ্যের একথা অনস্বীকার্য কিন্তু শূন্য সেকথা বলা যায়না। তেমনই গর্ভ সন্ধি-ও নাট্যশরীরের একটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিধৃত। আচার্য শুভঙ্করের মতানুসারে ত্রোটক উপরূপক হয় – "পঞ্চাষ্টাঙ্কবিনির্মিতঃ স্ফুটকথনস্যোক্ত'বমর্ষেণ"[৯৭]। এখানে 'স্ফুট' বলতে সূক্ষ্ম গভীর বোধের স্বচ্ছতাকে অভিহিত করা যেতে পারে। *শাপমোচন* কথিকার চতুর্থ সন্ধিটি নাট্যনির্মিতির সাপেক্ষে তার অবস্থানের সীমানা কতখানি প্রাসঙ্গিক এবং রসানুসারী হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য। গর্ভ সন্ধি বিস্তৃত এবং প্রবলতর হয়ে ওঠে নাট্যগঠনের প্রেক্ষিতে। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-এর ম'ত প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে চরিত্রের সংখ্যা এবং জালবিস্তারহেতুই সেখানে একাধিক ঘাত-প্রতিঘাত লক্ষণীয়। যেহেতু *শাপমোচন* রচনাটি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক অপেক্ষা অনেকখানিই ক্ষুদ্র এবং অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক চরিত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই এখানে অবমর্শসহ প্রতিটি সন্ধিই স্বল্পপরিসরে স্থিতিশীল। প্রথম থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক পর্যন্ত মুখসন্ধি ব্যাপ্ত হলেও একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে দ্বিতীয় দৃশ্যে অরুণেশ্বরের সঙ্গে কমলিকার বিবাহের পদ্ধতিটি বর্ণিত। তৃতীয় দৃশ্যটিও পাঁচটি গান এবং কিছু কথকতায় নিবদ্ধ। অথচ এই দৃশ্যটি নাট্যফলনিমিত্ত প্রতিকুল পরিস্থিতি গড়ে তুলেছে। এরপরের দৃশ্যে অরুণেশ্বরের নৃত্যোৎসব, কমলিকার কাছে সত্যপ্রকাশ, গৃহত্যাগ এবং মনোবেদনার জাগরণে গর্ভ সন্ধি। গান এবং নেপথ্যোক্তির নিরীখেই সন্ধির সংকোচন বা প্রসারণ নির্ণেয় নয়। ঘটনাগুলির গভীরতায় তা বিচার্য। তাই চতুর্থ সন্ধিটির ক্ষেত্রে কমলিকার মনের জড়ত্বনাশের প্রস্তুতিই বর্ণিতব্য। ক'তগুলি গান ব্যবহৃত হয়েছে এবং নেপথ্য ভাষণের পরিমাণ কতখানি তার সাপেক্ষে সন্ধির স্বল্পতা বা দীর্ঘতা অনর্থক। এই নাট্যের যে অংশটি অবমর্শ সন্ধিরূপে বিবক্ষিত হ'ল, সেই অংশটিকে গর্ভ সন্ধির-ই বর্ধিতাংশ ব'লে নিরূপণ করা যায়না। "আর দেরি নেই, দেরি নেই" এই বাক্যটি দ্বন্দ্বকে কাটিয়ে উঠে মিলনের প্রতিজ্ঞাগ্রহণ করে। তাই এখান থেকেই বাচ্য হয়ে উঠেছে যে কমলিকা অরুণেশ্বরের কাছেই আপন অহমিকাচ্ছন্ন অন্তঃকরণের বিসর্জন দিতে চলেছে। আবার, এটি নির্বহণ-এর স্তরেও পৌঁছায়নি। উপসংহৃতিতে নাট্যফলের যথাযথ সম্পাদনা করা হয়ে থাকে। তাই এটি বীজবন্ত হলেও ফললাভ নয়। তাই বলা যায় *শাপমোচন*-এ চতুর্থ সন্ধি সংক্ষিপ্ত তথা পরিমিত আকারে ব্যক্ত।

একইভাবে শেষ সন্ধি বা উপসংহারের ক্ষেত্রেও কমলিকার নত হওয়া ব্যতীত বিভিন্ন ঘটনার ক্রমঃসংকুচিত হয়ে গোপুচ্ছাগ্রন্যায়ের প্রতিফলন ঘটেনি। *সাহিত্যদর্পণ*-এ নাট্যগঠনশৈলী সম্পর্কে বলা হয়েছে "গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রং তু বন্ধনং তস্য কীর্ত্তিতম্"[৯৮]। অর্থাৎ আদিতে যে সমস্ত কথাবস্তুর রচনা হয়েছে, তা ক্রমে সংকুচিত হয়ে একটি বিন্দুতে মিলিত হবে। যেহেতু *শাপমোচন*-এ বিবিধ কথাবস্তুর রচনা ঘটেনি, তাই একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সংকুচিত হওয়ার প্রসঙ্গ অযৌক্তিক হয়ে যায়। শুধুমাত্র আধিকারিক বৃত্তটিই পূর্ণতা পেয়েছে উক্ত নাট্যে। অর্থাৎ অবমর্শ সন্ধির স্বল্পতার বিধানটি এখানে যুক্তিযুক্ত নয়। তাই বিশ্বনাথ কবিরাজের মতানুসারে ত্রোটক-এর সন্ধিলক্ষণ *শাপমোচন*-এ প্রতিফলিত হলেও শুভঙ্করের মতের ঘাটতি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

আবার নির্বহণ সন্ধিকালে অদ্ভুত রসের প্রয়োগের যে বিধি *সাহিত্যদর্পণ*-এ প্রাপ্ত, সেটি এখানে উপলব্ধ। এই রসের স্থায়িভাব বিস্ময়। *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে এভাবে – "অদ্ভুতো বিস্ময়স্থাযিভাবো গন্ধর্বদৈবতঃ"[৯৯]। *শাপমোচন* -এর শেষ গানটিতে কমলিকা বলেছে –

বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদিমাঝারে।[১০০]

এখানে বিস্ময় শব্দটির উল্লেখমাত্রেই অদ্ভুত রস ব্যঞ্জিত হয়েছে এমনটি প্রথমেই বলা যায়না। তাই সাধারণতঃ সহৃদয়াস্বাদ্য সাহিত্যরস সশব্দবাচ্য না হলেও এখানে দেখতে হবে যে অদ্ভুতরস ভাবানুকুল্য লাভ করে অলৌকিক স্তরে উন্নীত হয়েছে কিনা। অদ্ভুত রসের প্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণ*-এ বলা হয়েছে -

পীতবর্ণো বস্তু লোকাতিগমাবলম্বনং মতম্ ।।
গুণানাং তস্য মহিমা ভবেদুদ্দীপনং পুনঃ ।
স্তম্ভঃ স্বেদো'থ রোমাঞ্চগদ্গদস্বরসংভ্রমাঃ ।।
তথা নেত্রবিকাশাদ্যা অনুভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
বিতর্কাবেগসংভ্রান্তিহর্ষাদ্যা ব্যভিচারিণঃ ।।[১০১]

অর্থাৎ কোনও অলৌকিক বস্তু হয় এই পীতাভ রসের আলম্বন বিভাব এবং তার গুণগত মহিমাকীর্তন উদ্দীপন বিভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদগদ, স্বরভঙ্গ, সংভ্রম, নেত্রবিকাশাদি এই রসের অনুকূল অনুভব। আবার বিতর্ক, আবেগ, ভ্রান্তি, হর্ষ ইত্যাদি এখানে ব্যভিচারিভাব। "বড় বিস্ময় লাগে" গানটির মধ্যে কমলিকার দৈন্যের অপসারণ ঘটেছে অরুণেশ্বর মঙ্গলময় প্রেমসৌন্দর্যে। সে বলে –

ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালোবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে।
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে,
তুমি চিরপুরাতন চিরজীবনে।[১০২]

এই বিস্ময় তথা প্রশ্ন কমলিকার নিজের প্রতি। যে কমলিকা একদিন রূপের দম্ভে যে কোনও জন্মলব্ধ রূপকে ঘৃণা করত, দুর্বিনীত আচরণ করত, সেই কমলিকা-ই আজ বিস্মিত। সে যেন তার স্বরূপকে আবিষ্কার করে এক গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে। একদিকে যেমন অরুণেশ্বরের রূপজ কুরূপতাকে উপেক্ষা করেছে, তেমনই তার উদার, মহৎ সত্তাকেও প্রণাম করেছে। সে দীপার্ঘ্য দান করেছে তার মহত্বের সম্মুখে। তাই তাকে 'প্রভু' সম্বোধনেও পিছিয়ে হয়নি। তাই এখানে আলম্বন বিভাব অরুণেশ্বরকে ধরলে এবং তার প্রতি তার স্ত্রী কমলিকার যশোগাথাকে উদ্দীপন বিভাবরূপে স্বীকৃতি দিলে ভ্রান্তি ঘটেনা। স্তম্ভ, স্বেদ ইত্যাদি অনুভাব নাট্যপাঠে উপলব্ধ নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের উক্তি রয়েছে এই প্রসঙ্গে –

গলার স্বর জলে-ভরা মেঘের দূর দুরুদুরু ধ্বনির মতো।
"কিছু ভয় নেই আমার, জয় হল তোমারই।"[১০৩]

এখানে কমলিকার স্বরে গদ্গদভাব অনুমেয়। এমনকি নৃত্যাভিনয়কালে নেত্রবিকাশও করণীয় অনুভাব। নানাবিধ ব্যভিভারিভাবের মধ্যে আবেগমিশ্রিত আনন্দ উপরিউক্ত গানটিতে প্রকাশিত –

তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজে না বাঁশি,
এই আলো এই হাসি ডুবে আঁধারে ॥[১০৪]

অতএব উপসংহারপর্বে অদ্ভুত রস ধ্বনিত হয়েছে শৃঙ্গার রসের অবিরোধেই। তাই নাটকত্ববিচারে প্রাচীন বিধির সঙ্গে *শাপমোচন* -এর সন্ধিগত সাযুজ্য পরিস্ফুট।

❖ **অত্র অঙ্ক :**

ত্রোটক উপরূপকবিষয়ে *সাহিত্যদর্পণ*-এর মতটি ইতোমধ্যেই কথিত হয়েছে। এটির অঙ্কসংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। যথা পঞ্চ, সপ্ত, অষ্ট এবং নব। উদাহরণস্বরূপ *সাহিত্যদর্পণ*-এ প্রদত্ত হয়েছে *বিক্রমোর্বশী* পঞ্চাঙ্কনির্মিত এবং স্তম্ভিতরম্ভ সপ্তাঙ্কনির্মিত ত্রোটক। নাটকের সঙ্গে ত্রোটক-এর একটি বৈলক্ষণ্য বর্তমান। নাটকের অঙ্কবিষয়ে *সাহিত্যদর্পণ*-এ পাওয়া যায় – "পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ"[১০৫]। অতএব নাটকের অঙ্কে পঞ্চ থেকে দশ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যার গ্রহণ হয়েছে। ত্রোটক-এ ষড় এবং দশ এই দুটি সংখ্যার বর্জন ঘটেছে।*শাপমোচন* কথিকায় অঙ্কনির্দেশ নেই। *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড* -তে মুদ্রিত এবং বর্তমানে প্রচলিত *শাপমোচন*-এর ধরণ অনুযায়ী পাঁচটি দৃশ্যে বিভক্তীকরণ পূর্বেই নির্ণীত। এগুলিকে দৃশ্য বা অঙ্ক যেরূপেই কল্পনা করা হোক না কেন; ত্রোটক-এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছে।

❖ **শৃঙ্গারে কৈশিকী :**

চতুর্বিধ বৃত্তিব্যাপারে *সাহিত্যদর্পণ* কোনও মন্তব্য প্রদান করেনি। একমাত্র *সংগীতদামোদর* ত্রোটক-এর বৈশিষ্ট্যনিরূপণে বলেছেন – "প্রত্যুল্লসত্ কৈশিকঃ"[১০৬]। তাই *শাপমোচন*-এ বৃত্তির বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত

করা প্রয়োজনীয়। যেহেতু এই নাট্যের মুখ্য রস শৃঙ্গার, তাই বিধি-অনুসারে এখানে কৈশিকী বৃত্তির অবস্থান হওয়া উচিত। এই বৃত্তির লক্ষণানুসারে মনোহর বেশবৈচিত্র্য, স্ত্রী চরিত্র, সংগীত এবং কামোপচারের অমিত অনুষঙ্গতা উল্লেখযোগ্য। *শাপমোচন*-এর প্রথম দৃশ্যে ইন্দ্রসভায় উর্বশীর নৃত্য ও সৌরসেনের মৃদঙ্গবাদন, চতুর্থ দৃশ্যে অরুণেশ্বরের নৃত্যোৎসব বিশেষতঃ উল্লেখনীয় 'পুষ্কলনৃত্যগীতা' এই পদটির সঙ্গতির জন্য। এছাড়াও সংগীত এই নাট্যে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র। অরুণেশ্বরের বক্ষবিহারিণী বীণার সুর-ই কমলিকার ভাবান্তরণ ঘটিয়েছে। তাই সংগীতপ্রাধান্য এই নাট্যের একটি একক বৈশিষ্ট্য। মনোহর বেশবৈচিত্র্যটি অনুমিত হয় অরুণেশ্বরের নৃত্যোৎসবে। কামোপচার এই নাট্যে উপজীব্য নয়; কারণ অনবদমিত কামের বশেই সৌরসেনের তালভঙ্গের অপরাধ ঘটে। অর্থাৎ কামের পথে এই নাট্য সঞ্জীবিত হয়নি। বলা যেতে পারে যে অনিয়ন্ত্রিত কাম যে কতখানি কদর্য এবং নিন্দ্য, তার একটি বার্তা *শাপমোচন* সঞ্চার করেছে। তাই কামোপভোগ এখানে ধ্বনিত নয়।

আবার এই বৃত্তির চারটি অঙ্গ-ও বর্তমান। নর্ম[১০৭] বা প্রার্থিতজনের প্রীতিসম্পাদক নিপুণতা অরুণেশ্বরের সংগীতসাধনায় লক্ষ্য করা যায়। সে চেয়েছে সংগীতের দ্বারাই কমলিকার হৃদয়ে আসন লাভ করতে। তাই রবীন্দ্রনাথ অরুণেশ্বর-কমলিকার দাম্পত্যজীবনের চিত্রাঙ্কন করেছেন এভাবে –

অন্ধকারে বীণা বাজে। অন্ধকারে গান্ধর্বীকলার নৃত্যে বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে। সেই নৃত্যকলা নির্বাসনের সঙ্গিনী হয়ে এসেছে তার মর্তদেহে। নৃত্যের বেদনা রানীর বক্ষে আঘাত করে; নিশীথরাত্রে সমুদ্রে জোয়ার এলে তার ঢেউ যেমন লাগে তটভূমিতে, অশ্রুতে দেয় প্লাবিত করে।[১০৮]

মিলনের প্রথমে আনন্দ এবং শেষে ভয়ের সঞ্চার হলে তখন তা নর্মস্ফূর্জ[১০৯]। অরুণেশ্বর এবং কমলিকার অন্ধকারে মিলনে অসন্তোষ দৃশ্য হওয়ায় এই অংশে নর্মস্ফূর্জ নামক অঙ্গের অবস্থান বলা যায়।

শৃঙ্গার রস ঈষৎ আভাসিত হলে তা নর্মস্ফোট[১১০]। তাই এটি এই নাট্যে কমলিকার চিত্রদর্শনকালে অরুণেশ্বরের পূর্বরাগদশায় সূচিত।

আবার অরুণেশ্বর আপন সত্তাকে বিকশিত করলেও সম্পূর্ণরূপে রূপ-রস-স্পর্শে কমলিকার কাছে ব্যক্ত করেনা এবং দূতমাধ্যমে পত্রালাপ করে, তখন তা নর্মগর্ভ[১১১] নামক বৃত্ত্যঙ্গের ইঙ্গিত যেহেতু এখানে নায়কের ভাব প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। সুতরাং সাঙ্গ কৈশিকী বৃত্তি এখানে অবলীলাক্রমে রসৌচিত্য বহন করেছে।

- **স-বিদূষক :**

সাগরনন্দীর *নাটকলক্ষণেত্নকোশ* গ্রন্থ থেকেই একটি বিতর্কিত লক্ষণের সম্ভাবনা উদ্ভূত হয়েছে। ত্রোটক-এর প্রতি অঙ্কে বিদূষকের উপস্থিতি মাননীয় নির্দেশ কিনা সে বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে[১১২]। তবে উক্ত বিবাদ থেকেই পরোক্ষভাবে একটি বিষয় প্রমাণিত যে এই উপরূপক বিদূষকবর্জিত নয়। এটি এমন এক গোত্রের উপরূপক যেখানে বিদূষক বাঞ্ছনীয়। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের মধ্যে *উত্তররামচরিত* এমন একটি নিদর্শন যা বিদূষকরহিত রচনা। তাই নাটকের লক্ষণে বিশ্বনাথ কবিরাজ বিদূষকবিষয়ে কারিকায় পাদব্যবহার করেননি।

অথচ নাটকবৎ ত্রোটক সবিদূষক নাট্যরচনা ব'লেই মেনে নিতে হয়। এটিকে বিশ্বনাথ কবিরাজও স্বীকৃতি দিয়েছেন – "ত্রোটকং নাম তত্ প্রাহুঃ প্রত্যঙ্কং সবিদূষকম্"[১১৩]। এই নাট্যে এই উপলক্ষণটিকে চিহ্নিত করা যায়না। বিদূষক বা বিদূষকের আচরণসদৃশ কোনও চরিত্র এখানে দৃষ্ট নয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত চলাকালীন আলোচনার মাধ্যমে ত্রোটক উপরূপকের লাক্ষণিক দিক *শাপমোচন* কথিকায় ক'তখানি প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তার একটি তালিকা নাতিদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করা যাক।

- ত্রোটক উপরূপক পর্যায়বাচী হলেও তা নাটক রূপকের রূপগত সন্নিকর্ষ লাভ করায় নাটকলক্ষণের একাধিক বিষয় ত্রোটক-এ অন্তর্ভুক্ত। তাই নাটকে যেমন রামায়ণাদি প্রখ্যাত ইতিবৃত্ত বা ইতিহাসের আশ্রয়ে নাট্যশরীর নির্মিত হয়, তেমনই *শাপমোচন* কথিকায় একদিকে বৌদ্ধ গ্রন্থ *মহাবস্তু-অবদান* এবং অন্যদিকে ঋগ্বেদ, বৈয়াসিক মহাভারতের কয়েকটি চরিত্রের অবলম্বনে নাট্যদেহ রূপায়িত হয়েছে। তবে এই নাট্যে আধিকারিক ইতিবৃত্ত-ই প্রাপ্ত। প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের শাখাপ্রশাখা অনুপলব্ধ। এমনকি অরুণেশ্বর-কমলিকা উভয়েই মর্ত্যবাসী হলেও পূর্বজন্মে তারাই স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা হওয়ায় শুধুমাত্র নায়িকার দিব্যত্ব স্বীকৃত হয়না।
- *শাপমোচন*-এর অরুণেশ্বরে ধীরোদাত্ত এবং ধীরললিত এই দু'ধরণের নায়কগুণ বর্তমান। যদিও নাটকের নায়ক প্রধানতঃ ধীরোদাত্ত গুণে অলংকৃত হয় তথাপি *শাপমোচন*-এর নায়কে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য ধীরললিত স্বভাব।
- ত্রোটকবৎ *শাপমোচন*-এ শৃঙ্গার রস-ই এক এবং অদ্বিতীয়রূপে সহৃদয়চিত্তকে রঞ্জিত করেছে। তবে এই রস শৃঙ্গারের বিপ্রলম্ভধর্মিতাকে গুরুত্ব দিয়েছে যা শাস্ত্রানুগ।
- ত্রোটক-এর অঙ্ক সংখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকলেও পঞ্চাঙ্কসমন্বিত ত্রোটক শাস্ত্রসিদ্ধ। তাই বর্তমানে সম্পাদিত তথা মুদ্রিত *শাপমোচন*-এও পরোক্ষভাবে পাঁচটি দৃশ্য থাকায় অঙ্কগত সাযুজ্য বজায় থেকেছে।
- *শাপমোচন*-এ আদর্শ নাটক তথা ত্রোটকের ন্যায় সন্ধিপঞ্চক অবস্থিত। তবে তৎসহ প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যশ্রব্যকাব্যের তুলনায় গর্ভ সন্ধি-ও জটিলতার পাশে বন্দি নয়।
- *শাপমোচন*-এ 'কৈশিকী' বৃত্তি স্বমহিমায় বিরাজিত।
- ত্রোটক-এর লক্ষণে বিদূষকের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় ব'লেই প্রাচীন নাট্যবেত্তাগণের অভিমত। তবে *শাপমোচন*-এ বিদূষক বা বিদূষকরূপী কোনও চরিত্রের লেশমাত্র উপলব্ধ নয়। ফলে এই লক্ষণটি এখানে ব্যাহত হয়েছে।

৬.৩ ত্রোটক ও *শাপমোচন* : অন্তরঙ্গ সাযুজ্য :

বর্তমানে কেবলমাত্র একটি ত্রোটক-ই উপলভ্য এবং তা মহাকবি কালিদাসের নাট্যত্রয়ীর অন্যতম *বিক্রমোর্বশী*। তবে সকলেই যে *বিক্রমোর্বশী*-কে ত্রোটকরূপে স্বীকার করেছেন বা সম্পাদনার সময় প্রস্তাবনা অংশে 'ত্রোটক' শব্দের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন এমনটি নয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে শঙ্কর পি পণ্ডিত ও ভাস্কর রামচন্দ্র

আত্রে কর্তৃক সম্পাদিত এবং গভঃ ওরিয়েন্টাল বুক ডিপো (বম্বে) কর্তৃক প্রকাশিত *The Vikramōrvaśīyam, A Sanskrit play, by Kālidāsa* (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থে এর পরিচয় 'নাটক'। এই গ্রন্থের 'CRITICAL NOTICE (FIRST EDITION)' অংশে প্রথম সংস্করণের বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রতিবেদনটি মুদ্রিত রয়েছে। সেখানে জানা যায় যে তিনি বেশ কয়েকটি বিক্রমোর্বশী-র পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা করেছেন। তার মধ্যে প্রথম পাণ্ডুলিপি যেটির বয়স প্রকাশনের সময় থেকে অন্ততঃ ২০০-২৫০ বছরের প্রাচীন ছিল, সেখানে পুষ্পিকায় তিনি পেয়েছিলেন 'নাটক' শব্দটি – "সমাপ্তমিদং বিক্রমোর্বশীযং নাটকম্"[১১৪]। আবার দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি যেটির বয়স তিনি তখন অনুমান করেছিলেন ৭০-৭৫ বছরের প্রাচীন, সেখানে তিনি স্পষ্ট লক্ষ্য করেছিলেন 'ত্রোটক' শব্দের ব্যবহার – "ইদং ত্রোটকাখ্যমুপরূপকং ন তু নাটকম্। যথোক্তং সাহিত্যদর্পণে।...লোকে তু নাটকমিদং বদংতি"[১১৫]। আবার ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে M. R. Kale -র সম্পাদনায় *The Vikramorvasiya of Kalidasa* গ্রন্থটির ষষ্ঠ সংস্করণ যা গোপাল নারায়ণ এণ্ড কোং, বম্বে থেকে প্রকাশিত, সেখানেও দেখা যায় এটির পরিচয় 'নাটক'। সূত্রধারের উক্তিতে তার প্রমাণ রয়েছে – "সো'হমদ্য বিক্রমোর্বশীযং নাম নাটকমপূর্বং প্রযোক্ষ্যে"[১১৬]। অন্যদিকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় প্রকাশিত বিদ্বান্ পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বসম্পাদিত গ্রন্থের ওপর তাঁর পুত্রদ্বয়পুত্রদ্বয় আশুবোধ বিদ্যাভূষণ এবং নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন কর্তৃক পরিশোধিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ *বিক্রমোর্বশী [ত্রোটকম্]* গ্রন্থে এটিকে 'ত্রোটক'রূপেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে প্রস্তাবনা অংশে দেখা যায় সূত্রধার বলেছে "অহমস্যাং কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা নবেন ত্রোটকেন উপস্থাস্যে"[১১৭]। অর্থাৎ এর পাণ্ডুলিপিগত এবং সম্পাদনাগত দ্বৈবিধ্যের কারণেই এটির পরিচয় সংশয়পূর্ণ। মহাকবি কালিদাস এটিকে কী রূপে গণ্য করেছিলেন বা তিনি কী উদ্দেশ্যে এই নাট্যসৃজন করেছেন, তা জানার লৌকিক প্রত্যক্ষ উপায় নেই। তবে যেহেতু বিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থেই পঞ্চাঙ্ক 'ত্রোটক' উপরূপকের উদাহরণে *বিক্রমোর্বশী*-কেই মান্যতা দিয়েছেন, তাই প্রাচীনতার দিক থেকে এবং একজন উপরূপকতত্ত্বচিন্তকের অভিমত হিসেবে এটিকে 'ত্রোটক' নামাঙ্কিত উপরূপকরূপেই স্বীকার করা বিধেয় ব'লেই মনে হয়। এমনকি নাট্যটির নামকরণ 'বিক্রমোর্বশীয়' নাকি 'বিক্রমোর্বশী'; তা নিয়েও দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হতে পারে। এক্ষেত্রেও সাহিত্যদর্পণকারকেই তার প্রবীণতার (বর্তমান সময় থেকে প্রায় ৭০০ বছরের প্রাচীন) দিক থেকেই প্রামাণ্যরূপে ধার্য করা হয়েছে। তিনি ত্রোটকের উদাহরণে "বিক্রমোর্বশী" শব্দ-ই ব্যবহার করেছেন[১১৮]। তাই যেহেতু এই গ্রন্থটি ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও ত্রোটকরূপী উপরূপকের সন্ধান অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি, তাই *বিক্রমোর্বশী*-র পরিপ্রেক্ষিতেই *শাপমোচন* কথিকায় বহিরঙ্গগত সাযুজ্যবিধান করণীয়। এখানে বহিরঙ্গের যে যে দিকগুলি আলোচিত হয়ে চলেছে, সেগুলি হ'ল নাট্যগঠন, চরিত্রচিত্রণ এবং নৃত্যপদ্ধতি। প্রত্যেকটি নিম্নে ব্যাখ্যা করা যাক।

- **নাট্যগঠন :**

এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাট্যের শ্রেণিবিভাজন করার সময়েই 'কথিকা' বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিবারে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সেই প্রসঙ্গটি পুনরুত্থিত করতে হয় *শাপমোচন*-কে ত্রোটকরূপে স্থাপিত করার তাগিদেই। প্রণয়কুমার কুণ্ডুর *রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য* গ্রন্থে 'কথিকা' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

'শাপমোচনে'র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে – একজনের আঙ্গিক কথকতায় আর হয়ে উঠল না, কয়েকজন নটনটীর অবতারণা করা হলো রঙ্গমঞ্চে। এতেও কথকতা একেবারে বর্জিত নয়, সব গানগুলি এর জন্যই রচিত হয়নি অর্থাৎ মনে হয়, (প্রকরণ বিচারের দ্বারা মনে হওয়াটা প্রমাণ করা সঙ্গত) কবিতা, কথকতা এমনকি গানের আশ্রয়ে কয়েকজন নটনটীর অন্যোন্যমুখী নৃত্যাভিনয়, কয়েকটি উপাদানের (কাব্য, সুর, নৃত্য ও অভিনয়) সুন্দর সংযোগ। শাপমোচন বাস্তবিকপক্ষে লোকোত্তর কোনো বৃহত্তর সম্ভাবনার রবীন্দ্র-সৃষ্টির প্রথম আভাস বা প্রতিশ্রুতি।[১১৯]

আবার *রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য : একটি নারীবাদী পাঠ* গ্রন্থে শেফালী মৈত্র বলেছেন –

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের মধ্যে সর্বাধিক চর্চিত এবং অভিনীত তিনটি নৃত্যনাট্য হল চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা – শাপমোচন নয়। কেন নয়, সে রহস্য দুর্বোধ্য। জমাট কোনও প্লট না থাকাটা একটা কারণ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে এটি তাঁর প্রিয় এবং মঞ্চসফল প্রযোজনার অন্যতম।

...

রাজা নাটকে কেন্দ্রীয় ভাবটি বিমূর্ত। রানি সুদর্শনা এখানে মুখ্য চরিত্র, যেমন শাপমোচন-এ কমলিকা। উভয় নাটককে এগিয়ে নিয়ে গেছে রানির আকুল প্রশ্ন, 'পরমকে জানব কী করে?'[১২০]

আবার, তিনি উক্ত গ্রন্থেই কলম্বোতে (১২ই মে, ১৯৩৪) অভিনীত *শাপমোচন* -এর ইংরেজি ইস্তাহারের উল্লেখ করেছেন যেটি শান্তিদেব ঘোষের *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য* গ্রন্থে মুদ্রিত। যথা

I am requested to give our audience some idea of the story upon which the musical play to be performed tonight is based. Let me confess that the story is immaterial, it can be ignored with impunity. I ask my audience not to distract their attention by seeking meaning which belongs to the alien kingdom of language; but keep their mind passive in order to be able to receive in immediate impression of the whole, to capture the spirit of art which reveals itself in the rhythm of movements, in the lyric of color, form and sound, and refused to be defend or described by words.[১২১]

এখান থেকেই গ্রন্থকর্ত্রীর ধারণা –

শাপমোচন-এর আখ্যান না বুঝলেও চলবে। গল্পটিকে অগ্রাহ্য করলেও কিছু যাবে আসবে না। অর্থ খুঁজতে গেলে মনোযোগ নষ্ট হবে। বর্ণ, ছন্দ এবং নৃত্যবিভঙ্গের মধ্যে এখানে সমগ্রকে গ্রহণ করতে হবে। এই সমগ্রই হল অনির্বচনীয়।[১২২]

উল্লিখিত দুটি গ্রন্থসাহায্যে একটি বিষয়ে প্রতীতি জন্মায় যে *শাপমোচন*-এর অভিনয়ের জন্য 'নৃত্য' অতুল্য এবং শ্রেষ্ঠ উপায়। নৃত্য অভিনয়মাধ্যম হলেও নেপথ্য থেকে সু-উচ্চারিত বক্তব্যগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন প্রারম্ভেই " গন্ধর্ব সৌরসেন..." ইত্যাদি বাক্য অশ্রুত হলে কথাবস্তুর অর্থগ্রহণে বিঘ্নোৎপত্তি ঘটে। ইন্দ্রসভায় উর্বশীর নৃত্যে

সহৃদয় এটুকুই বুঝতে পারে যে স্বর্গরাজ্যে অপ্সরাদের ললিত নৃত্যপ্রদর্শন চলছে কিন্তু পরবর্তীতে অভিশাপটি শ্রুত হওয়া আবশ্যক। আবার তৃতীয় দৃশ্যে অরুণেশ্বর যখন কমলিকাকে বলে যে আগামিকাল তার নৃত্যোৎসবের আয়োজন হতে চলেছে এবং কমলিকা তা যেন প্রাসাদশিখর থেকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে, সেই নাট্যোক্তিগুলির শ্রবণগুরুত্ব অনস্বীকার্য। *শাপমোচন*-এর ক্ষেত্রে কেবলই "নাট্যের সূত্রে গানের মালা"-র ব্যবস্থাপনা নেই; রয়েছে নাট্যোক্তি। তবে সেই নাট্যোক্তিগুলি নৃত্যশিল্পীদের দ্বারা উক্ত হয়না। যদি এমনটি হত যে নৃত্যাভিনেতা বা নৃত্যাভিনেত্রীগণ-ই পারস্পরিক কথোপকথনে সাবলীল হ'ত,তবে এটির গোত্র হ'ত পৃথক। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র কথকের দায়িত্ব থাকত শুধু প্রসঙ্গোত্থাপনের। এমনকি *শাপমোচন* অভিনীত হওয়ার সময়ে নাট্যোক্তিগুলি একজন পুরুষ এবং একজন নারী বাচিক শিল্পীর দ্বারা কথিত হয়। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী আয়োজিত বসন্তোৎসবের সন্ধ্যায় *শাপমোচন*-এ ইন্দ্র, অরুণেশ্বর ও কমলিকার পিতার উক্তিগুলি পাঠ করেছেন অধ্যাপক ড. অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় এবং মধুশ্রী ও কমলিকার উক্তিগুলি পাঠ করেছেন অধ্যাপক ড. স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। অর্থাৎ এই উক্তিগুলি যদি নৃত্যশিল্পীরাই বাচিক অভিনয়ে প্রকাশ করতেন, তবে এটি 'কথিকা'র সীমানাকে অতিক্রম করে ভিন্ন প্রকার নাট্য হয়ে উঠত। ফলতঃ *শাপমোচন*-এ যে চরিত্রগুলির মধ্যে কথোপকথনের অবকাশ নেই এমনটি নয় কিন্তু দীর্ঘদিনের ধারায় এটি প্রযোজিত হলে নৃত্যাভিনয় এবং বাগভিনয়ের পৃথক গোষ্ঠীর প্রয়োজন পড়ে ঐতিহ্য এবং পরম্পরার ধারাবাহিকতাতেই।

অন্যদিকে *বিক্রমোর্বশী* ত্রোটকটি এরূপ নয়। সেটি যে কোনও নাট্যরচনার আদর্শেই প্রণীত। সেখানে ঘটনাক্রমে চরিত্রেরা এসে উপস্থিত হয়, বাগভিনয় সম্পন্ন করে এবং প্রসঙ্গানুসারে নৃত্যে বা গীতে রত হয়। তাই *শাপমোচন*-কে একটি ত্রোটক-এর গঠনগত বিন্যাসের দিক থেকে সমতুল্য মনে করা উচিত কিনা সে বিষয়ে একটি জিজ্ঞাসা রয়ে যায়। এর সমাধানের পথ দুটি –

প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ নাট্যটিকে যেভাবে সজ্জীকৃত করেছেন, সেখানে তার মধ্যে দৃশ্যবিভাজন রয়েছে, চরিত্রের মধ্যে উক্তিবিবিনয় রয়েছে এবং সর্বদাই চরিত্রগুলি মনের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বকে গানে বিস্তৃত করেছে। যেমন তৃতীয় দৃশ্যে রয়েছে –

একদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহর, শুকতারা পূর্বগগনে; কমলিকা তার সুগন্ধি এলোচুলে দিলে রাজার দুই পা ঢেকে; বললে, "আদেশ করো আজ উষার প্রথম আলোকে তোমাকে প্রথম দেখব। নইলে আমি বিদায় নিয়ে যাই, রেখে যাই আমার কান্না এই অন্ধকারের বুকে- যতক্ষণ না আমাকে ফিরে ডেকে আন তোমার আলোর সভায়।"[১২৩]

এখানে কমলিকার একটি দীর্ঘোক্তি রয়েছে এবং তারপরেই একটি গান –

আমি এলেম তোমার দ্বারে,
ডাক দিলেম অন্ধকারে ।
আগল ধ'রে দিলেম নাড়া, প্রহর গেল, পাই নি সাড়া,

দেখতে পেলেম না যে তোমারে ।
তবে যাবার আগে এখান থেকে
এই লিখনখানি যাব রেখে।[১২৪]

এটি গানটির স্থায়ী এবং অন্তরার বাণী। এখানে কমলিকার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। তার প্রতীক্ষা প্রহরকালকে অতিক্রম করেছে। এমনকি তার বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাওয়ার বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভিযোগও ব্যক্ত। অথচ এই গানটির পূর্বতন উক্তিতেই সে বলেছিল একই কথা যে "নইলে আমি বিদায় নিয়ে যাই"[১২৫] অথচ দ্বিরুক্তিদোষ এখানে পরিহৃত। এই গানটিই প্রমাণ করে দেয় কমলিকার তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে। নাট্যে বারংবার একই উক্তিই কথিত হওয়ার অবকাশ নেই। তাই তার অনুযোগের রেশটি যে দীর্ঘদিন ধরে চলেছে, সেই ব্যাপ্তি সুরের মায়ায় আন্দোলিত করেছে সহৃদয় রসিককে।

অনুরূপভাবে "আনমনা, আনমনা" গানটির মধ্যেও অরুণেশ্বরের আত্মভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় –

বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে,
তোমারো মন জানব না ।
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌনমধুর সাঁঝে,
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,
দেব' তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা ।[১২৬]

এই গানটির পূর্বেই সে বলেছিল এখনও কমলিকা তন্দ্রাচ্ছন্ন। তাই শুভদৃষ্টির সময় সমাগত নয়। তাই এই গানটিতে কমলিকাকে প্রবোধ দেওয়ার আশা তীব্র হয়ে উঠেছে। যখন আলোক হবে ম্লান, যখন রূপের প্রতি আকর্ষণ হবে বিকর্ষণ, সেই পরম মুহূর্তে তাদের দৃষ্টিমৈত্রী ঘটবে।

কিন্তু *বিক্রমোর্বশী*-তে অন্যান্য সংস্কৃত নাট্যের ন্যায় যেখানে কবিবৈদগ্ধ্যের যথেচ্ছ অবসর রয়েছে, যেখানে রাজার বীরত্বের নানাবিধ দিক তুলে ধরা আবশ্যক, যেখানে কামমোহিতদশার অনুকূল পটভূমিকা উদ্দীপনার আয়োজন করেছে, সেখানেই শ্লোকের রচনা। যেমন প্রথম অঙ্কে পুরুরবা উর্বশীকে কেবল দৈত্যের থেকে উদ্ধার করে অপর অপ্সরাদের কাছে উপস্থিত হলে বলে ওঠে –

আবির্ভূতে শশিনি তমসা মুচ্যমানেব রাত্রিঃ
নৈশস্যার্চির্হুতভুজঃ ইব চ্ছিন্নভূয়িষ্ঠধূমা ।
মোহেনান্তর্বরতনুরিযং লক্ষ্যতে মুক্তকল্প্যা
গঙ্গা রোধঃপতনকলুষা গৃহ্ণতীব প্রসাদম্ ।।[১২৭]

অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে চন্দ্রোদয়কালে যেমন রাত্রি তমসা থেকে মুক্ত হয়ে লাবণ্যময়ী হতে থাকে, রাত্রির অগ্নিশিখা যেরূপে ধূমমুক্ত হয়ে ঔজ্জ্বল্যবিধান করে, গড়ার পাড়ে ভগ্ন হলে যেমন নির্মলতা ফিরে আসে; তেমনই অন্তর্মোহাবিষ্ট এই সুন্দর তন্বী রমণী (উর্বশী) পুনঃ কান্তিমতী হয়ে উঠল।

এহেন আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে। যখন বিদূষকসহ রাজা পুরুরবা প্রমদবনে প্রবেশ করছে, তখন রাজা তার মদনপীড়ার সঙ্গে নদীর স্রোতের বিপরীতে সন্তরণের উপমা দিয়েছে –

বিবিক্ষুর্যদিদং তূর্ণমুদ্যানং নাঘশান্তয়ে ।
স্রোতোজবোহ্যমানস্য প্রতীপতরণং মহত্ ।।[১২৮]

এ তো গেল একটি ত্রোটক-এ গদ্য-পদ্যের বিন্যাস সঙ্গে *শাপমোচন*-এর গদ্য-গানের গ্রন্থনার বৈসাদৃশ্য। এরপর দ্রষ্টব্য উভয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ কার্য নাট্যে প্রত্যক্ষভাবে স্থান পেয়েছে এবং কোন্ কোন্ কার্য উহ্য রয়ে গেছে। এ বিষয়ে প্রথমেই বলতে হয় অভিশাপবচনের প্রসঙ্গটি। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী *বিক্রমোর্বশী*-তে তৃতীয় অঙ্কের সূচনায় একটি বিষ্কম্ভকের মাধ্যমে দু'জন ভরতশিষ্যের কথোপকথনে উর্বশীর ওপর উপাধ্যায়ের শাপবৃত্তান্তটি বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ প্রাচীন যুগের নাট্যে এই জাতীয় অনিষ্টবাচক বস্তু নাট্যে দৃশ্যমান হ'তনা। *সাহিত্যদর্পণ*-এ অঙ্কে অদর্শনীয় বিষয়ের তালিকায় রয়েছে 'শাপ'।[১২৯] তাই যেমন *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকে চতুর্থ অঙ্কেও দুর্বাসার শাপটি নেপথ্য থেকে শ্রুত হয়, তেমনই এখানেও তার প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় শিষ্য বলে–

যেন মমোপদেশস্ত্বযা লঙ্ঘিতস্তেন ন তে দিব্যং স্থানং ভবিষ্যতীত্যুপাধ্যাযস্য শাপঃ। মহেন্দ্রেণ পুনঃ প্রেক্ষণাবসানে লজ্জাবনতমুখী ভণিতা যস্মিন্বদ্ধভাবাসি তস্য মে রণসহাযস্য রাজর্ষেঃ প্রিযমত্র করণীযম্। সা ত্বং যথাকামং পুরুরবসমুপতিষ্ঠস্ব যাবত্ স ত্বযি দৃষ্টসংতানো ভবেদেতি।[১৩০]

নটীর পূজা-র ক্ষেত্রেও যেমন রবীন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যনির্দেশকে মানতে আগ্রহী হননি, তদ্বৎ *শাপমোচন*-এও দেখা যাচ্ছে যে তিনি শাপবৃত্তান্তটিকে মঞ্চোপরি প্রদর্শিত করেছেন। তবে এই পরিবর্তনের জন্য যে ত্রোটকত্বের হ্রাস ঘটেছে এমনটি নয়; অভিশাপবৃত্তান্তটি কোন্ স্থানে প্রযুক্ত হয়েছে তা বিচার্য। *বিক্রমোর্বশী*-তে প্রথম এবং দ্বিতীয় অঙ্ক জুড়ে উর্বশী তার সখী চিত্রলেখা, সহজন্যা, রম্ভা, মেনকাদের সঙ্গে স্বর্গবাস করেছে এবং প্রথম থেকেই রাজা পুরুরবার প্রতি অনুরাগিনী। অন্যদিকে রাজাও উর্বশীর সঙ্গলাভে উন্মুখ। তাই অভিশাপটি এখানে কোনও বিরহের মুহূর্ত সৃষ্টি করেনি। বরং তাদের মিলনকে অনায়াসসাধ্য ক'রে তুলেছে। *শাপমোচন* তার সাপেক্ষে বিপরীত। সেখানে মধুশ্রীর সঙ্গে গন্ধর্ব সৌরসেনের রম্যক্রীড়ার কোনও উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেননি। অভিশাপহেতুটি কেবলমাত্র এক; তা হ'ল 'অনবধান'। প্রিয়ের বিরহে ললিতকলাভিনয়ে উর্বশী ভুল শব্দপ্রক্ষেপ করে এবং সৌরসেন প্রিয়াবিরহে বাদ্যযন্ত্রে তালরক্ষা করতে অসমর্থ হয়। তবে উর্বশী এবং মধুশ্রীর মধ্যে তুলনা করা হলে দেখা যায় উভয়েই দয়িতের সঙ্গে মিলনে উন্মুখ। মধুশ্রী কোনও অপরাধ না ক'রেও মর্ত্যে গমন করতে চায় শুধুমাত্র তার প্রণয়ী সৌরসেনের সঙ্গলাভের জন্যই। তাই দুটি ঘটনার মধ্যে বাহ্যগত অমিল থাকলেও চরিত্রের রূপরেখায় একই বর্ণ প্রতিবিম্বিত হয়।

আবার, *বিক্রমোর্বশী*-তে পুরুরবা এবং উর্বশীর দাম্পত্যজীবনের কোনও প্রত্যক্ষ বর্ণনা নেই। তৃতীয় অঙ্কে অভিশপ্ত হয়ে উর্বশী স্বর্গরাজ্যে অধিকার হারালে পুরুরবার সঙ্গেই দিনযাপন করবে বলে মনস্থির করে এবং

রাজাও যেন অযাচিতভাবে তাকে লাভ করে। চতুর্থ অঙ্কে উর্বশীর পুনরায় কুমারগণের দ্বারা শাপিত হলে পুরুরবার মণিস্পর্শে চেতনালাভ করে। পঞ্চম অঙ্কে দেখা যায় তাদের দীর্ঘদিনের সংসারযাত্রা অতিবাহিত হয়েছে এবং তাদের সন্তান আয়ু রাজ্যাভিষিক্ত হতে চলেছে। অথচ শর্ত ছিল যে পুরুরবা পুত্রদর্শনমাত্রেই উর্বশীকে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাই উর্বশী তার পুত্রকে চ্যবন ঋষির আশ্রমে লালিতপালিত করেছে। অন্যদিকে *শাপমোচন*-এ দেখা যায় মর্ত্যে অরুণেশ্বর এবং কমলিকার দাম্পত্য জীবন মোটেই সুখদ নয়; এমনকি পূর্বকথাবিস্মৃত কমলিকা অরুণেশ্বরকে ত্যাগ করে। পরে তার মোহরস অপসারিত হলে সে পরমের দিকেই এগিয়ে আসে ধীরপদে। অর্থাৎ মোহভঙ্গের বিষয়টি দু ক্ষেত্রেই বর্তমান। *বিক্রমোর্বশী*-র পঞ্চম অঙ্কে পুত্রসহ রাজ্য সঙ্গে উর্বশীর মিলন সম্পন্ন হলে অপ্সরাগণ বলে "দিষ্ট্যা পুত্রস্য যুবরাজশ্রিয়া ভর্তুরবিরহেণ বর্ধ্যসে"[১৩১]। অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে মিলনও যেমন তার চরিতার্থ হয়েছে, তেমনই তার পুত্রও যোগ্য উত্তরসূরি হয়েছে। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকেও দেখা যায় রাজা দুষ্যন্ত স্ত্রী এবং পুত্রের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলে তার রাজ্যশ্রী প্রশস্ত হয়। অর্থাৎ এখানেই কামকে জয় ক'রে সত্যরূপ প্রেমবরে ধন্য হওয়া। অনুরূপভাবে কমলিকাও শেষে বলেছে –

তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজে না বাঁশি,
এই আলো এই হাসি ডুবে আঁধারে॥[১৩২]

তাই নাট্যকথাবস্তুটিই বা তার আঙ্গিকটিই কেবলমাত্র বিচার্য নয়; একটি ত্রোটক-এর মূল বক্তব্য কী এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রভেদ কীরূপ; এই ধ্রুবত্বের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। স্বর্গ এখানে জৈবিক কামনার প্রতীক এবং মর্ত্য মানবতা, সদাচারের প্রতীক। সেই কামনার স্খলন ঘটে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে পতিত হওয়ার অভিশাপে। এই দ্বন্দ্বকে যদি কোনও নাট্যে ললিতোপচারসহযোগে অভিব্যঞ্জিত করা হয়, তবেই তা 'ত্রোটক'। তাই সেদিক থেকে কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই প্রবর।

❖ **চরিত্রচিত্রণ :**

প্রথমতঃ কালিদাসের *বিক্রমোর্বশী* ত্রোটকে স্বর্গের একাধিক চরিত্র উপস্থিত। উর্বশীব্যতীত অন্যান্য অপ্সরাগণ রম্ভা, মেনকা, চিত্রলেখা, সহজন্যা, দেবর্ষি নারদ, চিত্ররথ, ভরতশিষ্যদ্বয় ইত্যাদি। আবার মর্ত্যের চরিত্রদের মধ্যে পুরুরবা, বিদূষক, আয়ু, পুরুরবার প্রথমা স্ত্রী, তাপসী ইত্যাদি। অন্যদিকে *শাপমোচন*-এ স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, উর্বশী, সৌরসেন, মধুশ্রী ইত্যাদি চরিত্র থাকলেও মর্ত্যের চরিত্রের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। অরুণেশ্বর এবং কমলিকা ব্যতীত কমলিকার সখীগণ এবং অরুণেশ্বরের সখাগণ উপস্থিত। তন্মধ্যে অরুণেশ্বরের সখাগণের নাট্যক্রিয়ায় সবিশেষ ভূমিকা নেই। শুধুমাত্র এটুকুই জানা যায় যে তারা সকলেই রূপবান। কমলিকার পিতার চরিত্র চিত্রিত হয়নি; শুধুমাত্র গান্ধাররাজ অরুণেশ্বরকর্তৃক প্রেরিত পত্রের নিরীখে নিজ কন্যার সঙ্গে তার বিবাহে সম্মতি দান করে। তাই *বিক্রমোর্বশী*-তে যেমন স্বর্গ ও মর্ত্যের চরিত্রের সংখ্যাগত দিক থেকে একটি সমানুপাতিকতা বজায় থেকেছে, *শাপমোচন*-এ সেই ভারসাম্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ *বিক্রমোর্বশী*-র নায়ক চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবা যেভাবে নাট্যে চিত্রিত হয়েছে, সেখানে তার রাজোচিত গুণের কয়েকটি নমুনা রয়েছে। যেমন প্রথম অঙ্কে অসুরের থেকে উর্বশীকে নিবৃত্ত করা। নারীদের সম্ভ্রমরক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য বরাত চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। তবে দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক মাণবকের সঙ্গে কথোপকথনে জানা যায় সে বিবাহিত পুরুষ। পরস্ত্রী উর্বশীর প্রতি আকর্ষণে তার স্ত্রী মানিনী। আবার চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্কে তার প্রিয়তমা উর্বশীর প্রতি কামগন্ধচিত্তের বহুবিধ পরিচয় পাওয়া যায়। উর্বশীর সঙ্গে মিলনের অভিজ্ঞানস্বরূপ তার শিরোভূষণ মণিটি বিহগকর্তৃক হৃত হ'লে সেটি পুনরুদ্ধারের জন্য যাবতীয় শক্তির প্রয়োগ ঘটাতে সমর্থ। *বিক্রমোর্বশী*-র চতুর্থ অঙ্কে একটি প্রক্ষিপ্ত অংশ পরবর্তীতে সংযোজিত হয়েছে ব'লে বহু পণ্ডিতদের ধারণা। তাই সেই সংযোজিত অংশটি 'নাটক'রূপী *বিক্রমোর্বশী*-তে উপলব্ধ না হলেও 'ত্রোটক'রূপী *বিক্রমোর্বশী* -তে দৃশ্য। সেখানে উর্বশী কুমারবনে প্রবেশজন্য অভিশপ্ত হয়ে জড়ে পরিণত হ'লে পুরুরবা তার জন্য অধীর হয়ে পড়ে। ইতস্ততঃ ভ্রমণ ক'রেও তার থেকে প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় পুরুরবার যে খেদোক্তি, তা অতিরঞ্জন। যদিও প্রাচীনকালে সংস্কৃত নাট্যে রাজার কোনও নায়িকার প্রতি মোহান্ধতা জন্মালে এরূপ শ্লোকাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় তবুও এই *বিক্রমোর্বশী*-তে এই অংশে রাজার শ্লোকাবৃত্তি এবং নৃত্যটি *উন্মত্তরাঘব* প্রেক্ষণকজাতীয় নির্যাস বহন করে। এখানে একটি শ্লোক হ'ল –

> গন্ধোন্মাদিতমধুকরগীতৈর্বাদ্যমানৈঃ পরভৃততুর্যৈঃ।
> প্রসৃতপবনোদ্বেলিতপল্লবনিকরঃ সুললিতবিধিপ্রকারং নৃত্যতি কল্পতরু।।[১৩৩]

এখানে রয়েছে সেই কালিদাসোচিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যচিন্তা। এখানে বলা হয়েছে যে প্রবাহিত মলয় বাতাসে কম্পিত নবপত্রশোভিত হয়ে কল্পতরু বৃক্ষ নৃত্যোল্লাসে মত্ত। ভ্রমরেরা গুঞ্জন শুরু করেছে এবং পরভৃতদের তূর্য বাদ্যরূপে সঙ্গতবিধান করছে। আবার, দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষককে রাজা বলে –

> মম কুসুমিতাস্বপি সখে নোপবনলতাসু নম্রবিটপাসু ।
> চক্ষুর্বধ্নাতি ধৃতিং তদ্রুপালোকদুর্ললিতম্ ।।[১৩৪]

এর বাংলা ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায় যে বসন্তকালে উপবনের লতাগুচ্ছে পুষ্প বিকশিত হয়েছে, নব পল্লবদল নত হয়ে রয়েছে তথাপি সেই নিসর্গসুন্দর প্রকৃতির ওপর দৃষ্টি এবং রসগ্রহণে অনীহা দেখা দিয়েছে রাজার কারণ তার তৃষিত হৃদয় কেবলই অপরূপা উর্বশীর কটাক্ষকে কামনা করে। এই ধরণের শ্লোকাবৃত্তির রীতি বোধহয় উপরূপকের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যদিকে *শাপমোচন*-এ কমলিকার চিত্রদর্শনের পরে অরুণেশ্বরের পূর্বরাগদশায় উল্লিখিত গানটি হ'ল –

> ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
> ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায় পাতায় ডালে ডালে ।
> যে গান তোমার সুরের ধারায় বন্যা জাগায় তারায় তারায়
> মোর আঙিনায় বাজল সে সুর আমার প্রাণের তালে তালে ।[১৩৫]

এই গানটিও প্রকৃতি (বসন্ত) পর্যায়ের রবীন্দ্রনসংগীত। অথচ সে কামাঙ্গী নয়। এখানে প্রেমের সুর স্পন্দিত হয়েছে। এরপরে আরও দুটি গান রয়েছে। যথা "তুমি কি কেবলই ছবি" এবং "কখন দিলে পরায়ে"। তন্মধ্যে প্রথম গানটিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

নয়নসমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।[১৩৬]

এটি অরুণেশ্বরের কন্দর্পপীড়া নয়; এ তার যথার্থ দোসরের প্রতি আত্ম-অবগাহন। নয়নের সম্মুখে তার উপস্থিতি একটি দ্বৈতবাদের প্রতীক কিন্তু যখন "নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই" বলা হচ্ছে, তখনই যেন "অহং ব্রহ্মাস্মি" তত্ত্ব উঠে আসে। দুটি হৃদয় একই সরলরেখায় মিলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈত সত্তায় বিশ্বাস করেছেন। তাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকেই তিনি প্রেমের সজীব স্পর্শে মানবীয় করেছেন। এখানে পুরুরবা এবং অরুণেশ্বরের চরিত্রবিশ্লেষণ আকাঙ্ক্ষিত নয়; বরং একটি উপরূপকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাট্যের মেরুকরণ। ত্রোটক তথা একটি উপরূপকের যে চরিত্রচিত্রণ, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাট্যের বহিরঙ্গের কতখানি স্বাতন্ত্র্য, তা-ই দর্শিত।

আবার, উর্বশী এবং কমলিকার চরিত্রালেখ্যে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। উর্বশী যেমন সখীসহযোগে তার অনুরাগ ব্যক্ত করে এবং শৃঙ্গারী হাব, ভাবের আশ্রয় নেয়; তেমনই কমলিকা-ও সখীদের কাছে বলেছে "দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে,"।

বিক্রমোর্বশী-র দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায় যে প্রমোদবনে রাজা এবং বিদূষকের বাক্যালাপে উর্বশী এবং চিত্রলেখা আকাশমার্গে ভ্রমণ করতঃ সেই স্থানে অবতরণ করে এবং তিরস্করিণী বিদ্যার দ্বারা নিজেকে সংবৃত ক'রে রাখে। তাই ভূর্জপত্রে একটি পত্ররচনা করে যেখানে লিখিত ছিল –

স্বামিন্ সংভাবিতা যথাহং ত্বয়া'জ্ঞাতা ।
যথানুরক্তস্য যদি নাম তবোপরি ।।
ননু মম লুলিতপারিজাতশযনীয়ে ভবন্তি ।
নন্দনবনবাতা অপ্যত্যুউষ্ণকাঃ শরীরকে ।।[১৩৭]

উর্বশী বলতে চেয়েছে যে তার হৃদয়সংবাদ তখনও পর্যন্ত রাজার কাছে অজ্ঞাত ছিল কিন্তু রাজার উর্বশীর প্রতি যে গাঢ় অনুরাগ জন্মেছে, উর্বশীর দিক থেকেও তার বরাভয় রয়েছে। যদিও কমলিকার ক্ষেত্রে যা পূর্বরাগ, উর্বশীর ক্ষেত্রে তা অনুরাগ পর্যায়ের শৃঙ্গার যেহেতু প্রথম অঙ্কেই তাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে। তবে উর্বশীর সঙ্গে কমলিকার

যেদিকে পার্থক্য রয়েছে যায়, তা হ'ল উর্বশী মদনতাপিত হলেও তার সেই মোহমাদকতা থেকে বিরহানল দ্বারা চিত্তশুদ্ধীকরণের যাত্রাপথটি ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত নয়। এখান থেকেই বোদ্ধব্য যে *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* এবং *বিক্রমোর্বশী* দুটিই পঞ্চাঙ্ক নাটকের লক্ষণ অনুসরণ করলেও শকুন্তলা এবং দুষ্যন্তের যে বিরহরূপ শাপের কল্যাণেই তাদের আত্মশুদ্ধি ঘটেছে, *বিক্রমোর্বশী*-তে সেই শাপ-ই সম্ভোগের উদ্দীপক হয়েছে। কালিদাসের সাহিত্যে যে জীবনদর্শনের ভারবত্ব থাকে, তা *বিক্রমোর্বশী*-তে কিঞ্চিৎ লঘু। সেই লঘুত্বের কারণ-ই এটির উপরূপকতা। অন্যদিকে কমলিকার বিরহ কালিদাসের *মেঘদূত* বা *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-এর সঙ্গেই উপমিত। *মেঘদূত*-এর উত্তরমেঘ অংশে যক্ষবধূর নির্বাক চিত্রকল্পই তার বেদনার মূর্ততা। "বীণাধ্বনি যেন আজ আর বাইরে নেই; এসেছে তার অন্তরের তন্তুতে তন্তুতে"[১৩৮] - এই রবীন্দ্রনাট্যবাক্যটি প্রমাণ করে যে তার অন্তরাত্মার জাগরণ ঘটেছে। স্বর্গ থেকে প্রাপ্ত শাপ যখন মর্ত্যে স্খলিত হয়, তখন অন্তর ধৌত হয় পুণ্যতোয়া তটিনীর স্পর্শ। সেই স্পর্শ-ই সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গেই লালিতপালিত জীবনমুখী প্রেম। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের সপ্তম অঙ্কে মহর্ষি মারীচ শকুন্তলাকে আশ্বাস দেয় –

> শাপাদসি প্রতিহত স্মৃতিরোধরুক্ষে ।
> ভর্তর্য্যপেততমসি প্রভুতা তবৈব ।।
> ছায়া ন মূর্ত্তি মলোপহতপ্রসাদে ।
> শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলভাবকাশা ।।[১৩৯]

এখানেই দুর্বাসার শাপপ্রসঙ্গের প্রাসঙ্গিকতা। মলিন দর্পণ তথা মোহমুগ্ধ দশায় শুদ্ধ প্রেম প্রতিবিম্বিত হয়না; যখন সেই মনোমুকুরে মোহ দূরীভূত হয়, তখনই যেন বিশদ স্ফটিকখণ্ডে আলোক বিচ্ছুরণের ম'ত প্রথম বর্ণালি ভাষায় শোভিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই দর্শনকেই তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন *শাপমোচন* এবং তাঁর পরবর্তী নৃত্যনাট্যগুলিতে। *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্যে তিনি মদনের চরিত্রে গানে ব্যবহার করেছেন এমনই ভাবনা –

> মায়া ছেড়ে দিক পথ,
> প্রেমের আসুক জয়রথ,
> রূপের অতীত রূপ
> দেখে যেন প্রেমিকের চোখ –[১৪০]

তাই *বিক্রমোর্বশী* এবং *শাপমোচন*-এর তুলনায় চরিত্রচিত্রণে বা বলা ভালো চরিত্রের ব্যক্তিত্বে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের ভাবনাকে গ্রহণ করলেও তা অনেকখানিই *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটক বা রূপকের আদর্শে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে *বিক্রমোর্বশী* জাতীয় ত্রোটক বা উপরূপকের প্রভাব হ্রস্বতা পেয়েছে।

❖ **নৃত্যভাবনা :**

বিক্রমোর্বশী এমনই একটি নাট্যগ্রন্থ যেখানে নৃত্যের উল্লেখ রয়েছে। চতুর্থ অঙ্কটি প্রক্ষিপ্ত হলেও শঙ্কর.পি.পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত *বিক্রমোর্বশী*-র Critical Edition *মহাকবিকালিদাসবিরচিতম্ বিক্রমোর্বশীয়ম্-*

এর Appendix অংশে সেই পাঠটি মুদ্রিত হয়েছে[১৪১] এবং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রাথমিকভাবে সম্পাদিত *বিক্রমোর্বশী*-তে যখন এই অংশটি চতুর্থ অঙ্কেই প্রাপ্ত[১৪২], তখন এটিকে মূল গ্রন্থান্তর্ভুক্ত হিসেবে মেনে নিতে দ্বিরুক্তি নেই। সেখানেই চর্চরী এবং দ্বিপদিকা সনৃত্য গীতের একটি প্রাধান্য রয়েছে। খণ্ডক, খুরক, কুটলিকা, মল্লঘটী, খণ্ডিকা ইত্যাদি নৃত্যের উল্লেখ থাকলেও চর্চরী এবং দ্বিপদিকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অধিক।চর্চরী পাওয়া যায় **১২,১৪,১৯,২৬,২৮** সংখ্যক গানে এবং দ্বিপদিকা রয়েছে ৬,৭, ১৫, ৩৫ সংখ্যক গানে[১৪৩]। উল্লেখ্য বিষয় এই যে গানগুলির বেশিরভাগই প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত। এমনকি চর্চরী নৃত্যগুলি কীভাবে অভিনয়, তারও নির্দেশ এখানে প্রদত্ত। যেমন **১৬** সংখ্যক গানের নৃত্যযোজনার নির্দেশ 'উপবিশ্য' এবং সেই গানের প্রথম পদের পরেই চতুর্থ অঙ্কের **১৬**সংখ্যক শ্লোকটির বাচিক অভিনয়।[১৪৪] তারপর বাকি পদটির নৃত্যাভিনয় শেষে **১৭** সংখ্যক শ্লোকটির আবৃত্তির নির্দেশ।[১৪৫] এই জন্য সেই শ্লোকটি আবৃত্তি হওয়ার সময় অঞ্জলিবদ্ধ হস্তমুদ্রা প্রদর্শিতব্য –

হংস প্রযচ্ছ মে কান্তাং গতিরস্যাস্ত্বয়া হৃতা ।
বিভাবিতৈকদেশেন দেযং যদভিযুজ্যতে ।।[১৪৬]

কামার্ত রাজা হংসকে দেখে বলে ওঠে যে সেই হংসগতি তার প্রিয়তমার তুল্য। তাই যে হংস সেই সুন্দরীর গমনভঙ্গীকে অনুকরণ করতে পারে, সে নিশ্চয়ই তাকে প্রত্যক্ষ করেছে। এক্ষেত্রে অঞ্জলিমুদ্রার প্রয়োগের যৌক্তিকতা এখানেই যে এটি হংসের কাছে রাজার প্রার্থনা। তার প্রিয়া উর্বশীকে ফিরিয়ে দিতে বলা হয়েছে উক্ত শ্লোকে। এখানে প্রতিটি গানই রাজার কণ্ঠে ভাষিত। অর্থাৎ একজন চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতি তথা নায়ক চরিত্র হয়েও শ্লোকগুলি সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হলেও গানগুলির বেশিরভাগই সংস্কৃতেতর প্রাকৃত ভাষার আশ্রয়ে রূপপ্রাপ্তি ঘটেছে। **১৬** সংখ্যক গানটি হ'ল –

রে রে হংস কিং গোপ্যতে ।
গত্যনুসারেণ মযা লক্ষ্যতে ।।[১৪৭]

অর্থাৎ হংস যেন রাজার থেকে অলক্ষ্যে যেতে চাইছে। তাই রাজার মনে হয়েছে যে সে যেন কিছু গোপন করতে চাইছে। *বিক্রমোর্বশী*-র চতুর্থ অঙ্কটি এমনই একটি রচনা যেখানে প্রাক্-সাহিত্যদর্পণযুগের নাট্যরাসকের চিত্রকল্প নিহিত। সামগ্রিকভাবে এটি ত্রোটক উপরূপক হলেও এখানে এককভাবে অপরাপর 'পদার্থাভিনয়' বা 'স্বল্পমাত্ররঞ্জনক্ষম' রূপকেরও অস্তিত্ব রয়েছে। এখানে চর্চরীগানের একটি শ্লোক হ'ল উপরিউক্ত "গন্ধোন্মাদিত..." ইত্যাদি শ্লোকটি। ঠিক এর পরের শ্লোকের সঙ্গেই "নর্তিত্বা" পদোল্লেখে কথিত হয়েছে রাজার নৃত্যনির্দেশ – "অথ বা ন প্রত্যাদিশামি যদা প্রাবৃষেণ্যৈরেব লিঙ্গৈর্মম রাজোপচারঃ কিং প্রতি। কথমিব"[১৪৮]। এরপরের শ্লোকে সেখানে বর্ষাবর্ণনা দৃশ্য। রাজা ভাবতে থাকে তড়িৎলতা তার রাজচ্ছত্র, নিচুলতরু যেন চামরব্যজন করছে এবং মত্ত শিখীগণ যেন চারণবৃন্দ। এরই সঙ্গে পর্বতগাত্রে বহতা নদীধারা যেন তার কাছে সোপহার সুহৃদ বণিকবৃন্দ –

বিদ্যুল্লেখা কনকরুচিরশ্রী বিতানং মমাভ্রং
ব্যাধুযন্তে নিচুলতরুভির্মঞ্জরীচামরাণি ।
ঘর্মচ্ছেদাত্ পটুতরগিরো বন্দিনো নীলকণ্ঠা
ধারাসারোপনযনপরা নৈগমাশ্চাম্বুবাহাঃ ।।[১৪৯]

শ্লোকটি সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত এবং এখানে কালিদাসের প্রকৃতিভাবনা ধরা দিয়েছে। চেতন-অচেতনের যে রূপায়িত সম্বন্ধ কালিদাসের কাব্যরচনার বৈশিষ্ট্য, তা এখানে বিরাজমান। অথচ গানগুলিতে কালদাসীয় চিহ্নের প্রকাশ নেই। যেমন ১৭ সংখ্যক শ্লোকে কাব্যসুষমা বর্তমানে, অপরদিকে ১৮ সংখ্যক গান যেখানে কুটিলিকা নৃত্যগতি প্রযোজ্য, সেখানে বলা হয়েছে –

মর্মররণিতমনোহরে
কুসুমিততরুবরপল্লবে ।
দযিতাবিরহোন্মাদিতঃ
কাননে ভ্রমতি গজেন্দ্রঃ ।।[১৫০]

শ্লোকার্থ দাঁড়ায় প্রিয়তমার বিরহে শোকোন্মত্ত হয়ে গজরাজ মর্মরমণিমনোহর ও পুষ্পিততরুশোভিত কাননে ভ্রমণ করছে। মূল নাট্যস্রোতে এটি অপ্রাসঙ্গিক। শুধুমাত্র এটিই বলা যেতে পারে যে রাজাও যেরূপ বিরহী, তেমনই হস্তীরাজও বিরহদশার শিকার। দ্বিলয়ান্ত চর্চরীগানে (যা ১৯ সংখ্যক গান) দেখি রাজা চক্রবাকের উদ্দেশ্যে তার প্রিয়তমার সন্ধান করে[১৫১]। এই অনুক্রম ২২নং চর্চরী গীতিতেও লক্ষ্য করা যায় –

অহং ত্বাং পৃচ্ছামি আচক্ষ গজবর
ললিতপ্রহারেণ নাশিততরুবর।
দূরবিনির্জিতশশধরকান্তিঃ
দৃষ্টা প্রিযা ত্বযা সংমুখং যান্তী ।।[১৫২]

এখানে তরুণী এবং গজবরকে জিজ্ঞাসা করেছে চন্দ্রিকাকে পরাভূত করতে পারে যে নারী, সেই লাবণ্যময়ী উর্বশী তাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে কিনা। সুতরাং এই চতুর্থ অঙ্কের এই গানগুলির থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে নৃত্য প্রধানতঃ বিবৃতিমূলক ছিল সেকালে। এই গবেষণাসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়েই যেখানে 'পদার্থাভিনয়' এবং 'বাক্যার্থাভিনয়'-এর রূপভেদ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেখানেই এই বিষয়টি স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে যে নৃত্য যদি প্রতি পদের অনুকারক হয়, তবে এই চর্চরী গানে প্রযোজিত নৃত্যে সেই সুযোগ রয়েছে। 'শশধরকান্তি' বা শুভ্রতা, 'কুসুমিততরু' বা পুষ্পল বৃক্ষ, 'গত্যনুসার' বা হংসগতির অনুকরণ ইত্যাদি বিষয় হস্তাভিনয়, পদাভিনয়ের দ্বারা ব্যক্ত হতে পারে। অথচ শ্লোকাবৃত্তির ক্ষেত্রে নির্দেশিত যে তা অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে অভিনেয়। তাই আলোচ্য *বিক্রমোর্বশী* যদি একটি আদর্শ উপরূপক হয়ে থাকে, তবে বলাই যায় যে উপরূপকের নৃত্য ছিল পদার্থাভিনয়প্রধান।

অন্যদিকে *শাপমোচন* কথিকার নৃত্যভাবনা যদি গভীর বীক্ষণের সাহায্যে বিচার করা হয়, তবে তা বাক্যার্থাভিনয়প্রধান। এই অধ্যায়েরই *শাপমোচন*-এর মঞ্চায়নের প্রসঙ্গে কথিত হয়েছে যে সিংহলে অভিনয়ের সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের বাদ্যযন্ত্রবাদনের মাধ্যমে একটি সাংগীতিক অনুবন্ধ রচনা করা হয়েছিল। এমনকি স্বর্গরাজ্যে সুরসুন্দরী উর্বশীর নৃত্যও উপস্থাপিত হ'ত যা গানের ওপর আধারিত। বর্তমানে উর্বশীর শুধুই তালনর্তনপারদর্শিতা প্রদর্শিত হয় অর্থাৎ *শাপমোচন*-এর প্রথম দৃশ্যেই একটি পৌরাণিক পটভূমিকায় বিস্তারে যে পদার্থাভিনয়ী চারুনৃত্যের বিহ্বলতায় উপরূপকের পরিবেশ তৈরি হয়েই যায়, তা সন্দেহাতীত। এই প্রথম দৃশ্যে সুরকন্যাদের লালিত্যপ্রকাশ, সুরসভার প্রস্তুতি, অনন্তর তালনৃত্যের সঙ্গে আঙ্গিক এবং সাত্ত্বিক ভাবাশ্রয়ী নির্বাক অভিনয়-ই তো উপরূপকের প্রধান অলংকার। ইন্দ্র-ইন্দ্রাণীর পারস্পরিক সম্ভোগচিত্র, বৈভবের ভব্যতা এবং শিল্পের সমাহার যেভাবে সংগীতব্যতিরেকে ওই দৃশ্যটিকে মথিত করে, তা প্রতিটি প্রতি পদে অভিব্যঞ্জিত। এমনকি গন্ধর্ব সৌরসেনের উতলা হৃদয়ও তার মৃদঙ্গবাদনে অনুভাবিত। তাই *শাপমোচন*-এর এই যে প্রেক্ষাপটরচনা, তার সঙ্গে *বিক্রমোর্বশী*-র ছান্দসিক ভাবসাযুজ্য সহৃদয়ের চিত্তকে রঞ্জিত করে।

এছাড়াও *শাপমোচন*-এ যে নাট্যক্রিয়াগুলি (action) উল্লিখিত, তা কেবলই পাঠ্য। যখন মদ্ররাজকুলে কমলিকার পিতার কাছে তার কন্যার বিবাহপ্রস্তাব আসে, তখন সেই নাট্যঘটনাটি উহ্য রয়ে গেছে। আবার, কীভাবেই বা কমলিকার চিত্র গান্ধাররাজের কাছে এসে পৌঁছায়, তারও কোনও অনুমান করা যায়না। উর্বশীর নৃত্য, ইন্দ্রের শাপদান, মধুশ্রীর অনুনয়ের অংশটিই অভিনেয়। তাই যে ক'টি গান প্রকাশ এবং স্বগতোক্তির ন্যায় নাট্যে উল্লিখিত, সেই গানগুলি নৃত্যে প্রযোজিত হলে শুধুই চরিত্রের মনোলোকের ধারাপাতের শব্দস্পন্দন শ্রুত হয়। যেমন "মোর বীণা ওঠে" গানটির "মম অন্তর কম্পিত আজি নিখিলের হৃদয়স্পন্দে" গানে পদার্থাভিনয়ের অবকাশ নেই। এখানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগের প্রতিটি শব্দের ব্যাখ্যা এবং বহিঃপ্রকাশ কাম্য নয়। রবীন্দ্রনৃত্যে প্রয়োজন অন্তরের প্রকাশ। *রবীন্দ্রনাথের গান : অধরা মাধুরী-রূপের সন্ধানে* গ্রন্থে সুকুমার সেন বলেছেন –

কবিতা ও গানের আকার-প্রকারে পার্থক্য আছে। প্রথমটিকে ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়টিকে পাখির ওড়ার সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রথমটি সীমিত, দ্বিতীয়টি সীমাহীন।[১৫৩]

আবার, পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত *রবীন্দ্রায়ণ : দ্বিতীয় খণ্ড* -এ বিমলচন্দ্র সিংহ 'রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য' প্রবন্ধে বলেছেন –

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে এমন একটি রস আছে যা রবীন্দ্রসাহিত্যে দুর্লভ। এগুলির মধ্যে কবিতা আছে কিন্তু সেটি কাহিনীর অনুবর্তী, গান আছে কিন্তু কাহিনী ও নৃত্যকে ছেড়ে সে গান চলেনা, আবার নৃত্য আছে কিন্তু কাহিনী ও গানের সঙ্গে তার সংযোগ সম্পূর্ণ।[১৫৪]

উৎপল কুমার ব্যানার্জী *Tagore's mystique of Dance* গ্রন্থে 'Bhava Nritya – Mood dance' বিষয়ে একটি ধারণা দিয়েছেন –

Whenever he directed the Ashram girls in dance, he insisted upon the song's bhava to be felt in the dancer's kinaesthetic, so that she would pour her heart and soul into achieving the rhythmic mobility of the song she is depicting. Tagore's dance was, therefore, a mood dance par excellence.[১৫৫]

আবার অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় *রবীন্দ্রনৃত্য* গ্রন্থের প্রাককথন অংশে বলেছেন –

রবীন্দ্রসাহিত্যের নির্ভরতায় দেহের ভাষায় প্রকাশিত হলে যে নতুন মিশ্রশিল্পরূপ, তা-ই ক্রমশ শান্তিনিকেতনের নৃত্য, রবীন্দ্র-প্রবর্তিত নৃত্য থেকে হয়ে উঠল 'রবীন্দ্রনৃত্য'।[১৫৬]

এবং এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের কারণেই যখন জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির সদস্য শ্রীমতী শুভ্রা ঠাকুরের থেকে তাঁর শান্তিনিকেতনের রতনপল্লীর আবাসে ১১ই অগাস্ট, ২০১৯ তারিখে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা নয়, তিনি তাঁর একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধের উল্লেখ করেন যা বিশ্বভারতী-র মানবীবিদ্যা বিভাগের একটি আলোচনাসভায় তিনি পাঠ করেছিলেন। সেই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন –

আরেকটি অভিনব নৃত্যের সূচনা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে, সেটি হল রবীন্দ্রকবিতার সঙ্গে নৃত্য। কবিতার ভাবকে ও ছন্দকে অনুসরণ করে সমস্ত শরীর ও মুখের অভিব্যক্তি দিয়ে তা প্রকাশ করা।[১৫৭]

এমনকি তিনি স্মৃতিচারণা ক'রে *বাল্মীকি-প্রতিভা* গীতিনাট্যের উদাহরণ দিয়ে বিশ্বভারতী-র প্রাক্তন নৃত্যশিক্ষক হরিদাস নাইয়ারের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন 'ভাঁড়ামো' বিষয়টি রবীন্দ্রনৃত্যে তিনি আমল দিতেন না। এমনকি স্বয়ং শুভ্রা ঠাকুর মনে করেন যে রবীন্দ্রনৃত্যে প্রকাশভঙ্গি হওয়া উচিত মার্জিত এবং সংহত। নাট্যাভিনয়ে যে আবেগ সংযমের প্রয়োজন নেই, রবীন্দ্রনৃত্যে সেই আবেগকেই সীমান্তবর্তী করা অ-রাবীন্দ্রিক। যেমন উনি মনে করেন নৃত্যনাট্যে অশ্রুপাত সর্বদা পরিহার্য।

আবার, বিশ্বভারতী-র প্রাক্তন ছাত্র শুভদীপ সরকার যিনি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের বসন্তোৎসবে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি 'শতবর্ষে সংগীতভবন' অনুষ্ঠানে *শাপমোচন* কথিকায় অরুণেশ্বর চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তিনি ১৭ই জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে দূরাভাষে গৃহীত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে "মোর বীণা ওঠে" গানে 'বীণা' বাদ্যযন্ত্রের আঙ্গিক অনুকরণ করা হয়নি সেই প্রয়োজনায়। এমনকি "ও আমার চাঁদের আলো" গানেও 'চাঁদ' বিশেষ হলেও 'আলো'টিই গীতভাবের অন্তর্লোক। তাই সেই জ্যোৎস্নায় পরিব্যাপ্তির সূচক হতে হবে নৃত্যের মাধ্যমে মঞ্চপরিক্রমা।

অর্থাৎ এই আলোচনাগুলি *শাপমোচন* কথিকার নৃত্যভাবনার সঙ্গে পুরাকালের উপরূপকের নৃত্যভাবনার সঙ্গে যোগ বা বিয়োগের একটি গণনা করতে সমর্থ হয়। রবীন্দ্রসংগীত যেরকম বিমূর্ত, তেমনই রবীন্দ্রনৃত্যও যথানুকরণীয় প্রতিমা নয়। নিরাকারের মধ্যেও যে রূপলাবণ্যকে ধরা যায় এবং জটিল বা যৌগিক মনস্তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় দেহছন্দের মাধ্যমে, তারই প্রমাণ রবীন্দ্র-প্রবর্তিত-নৃত্য। বসন্তকালের বর্ণনা "আজি দখিনদুয়ার খোলা" গানেও রয়েছে কিন্তু সেখানে ঋতুরাজ বসন্তকে আহ্বান জানানো হয়েছে কিন্তু সেই বসন্তকে কোনও রূপে বেঁধে চরিত্রাকারে খাটো করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে –

এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু মেখে পিয়ালফুলের রেণু,
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো ।।[১৫৮]

বসন্তের আগমনের প্রকৃতিরঞ্জন হয়েছে কবির কথায় কিন্তু বসন্ত কীরূপে উপস্থিত হবে, তার কোনও লক্ষণ নেই। তাই এই গানে শব্দানুগত পদার্থাভিনয় অনুচিত হয়ে পড়ে স্বভাবতই। এছাড়াও যেখানে *বিক্রমোর্বশী* নাট্যে কেবল রাজার কামব্যাকুলতাতেই নৃত্যপ্রসঙ্গ রয়েছে, সেখানে *শাপমোচন*-এ পূর্বরাগ, বিবাহ, অঙ্গসজ্জা, বিরহ প্রতিক্ষণেই নৃত্যের আবশ্যকতা। তাই বিক্রমোর্বশী একটি নৃত্যনাট্য হয়ে উঠতে পারেনি। *শাপমোচন*-ও পারিভাষিক দৃষ্টিতে নৃত্যনাট্য না হলেও রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী পরিপূর্ণ নৃত্যনাট্যগুলির পূর্বপ্রজন্মরূপে নিঃসন্দেহে নিজ অকৃত্রিম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

অর্থাৎ বহিরঙ্গের দিক থেকে প্রাচীনকালের 'ত্রোটক' নাট্যধারার সঙ্গে কবিগুরুর *শাপমোচন* কথিকার তুলনামূলক আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়, সেগুলি হ'ল –

- ত্রোটক উপরূপক হলেও রূপকজাতীয় নাট্যধারার সঙ্গে এর গঠনগত বিরূপতা ছিলনা যা *শাপমোচন* কথিকায় দৃষ্ট হয়। *শাপমোচন*-এ বাচিক অভিনয়কারী এবং নৃত্যপরিবেশনকারী দুই ভিন্ন কুশীলবের প্রয়োজন যা ত্রোটক-এ পরিলক্ষিত হয়না।
- *শাপমোচন* কথিকায় প্রাচীন ভারতীয় নাট্যানুশাসনকে উপেক্ষা করতঃ অভিশাপপ্রদানের ম'ত দুর্ঘটনাকে স্থান দেওয়া হয়েছে যা প্রাচীন ভারতীয় ত্রোটক উপরূপক করেনি।
- *বিক্রমোর্বশী* একটি যথাযথ ত্রোটক হলে সেখানে দেখা যায় পাত্রপাত্রীর বহুত্ব কিন্তু *শাপমোচন* -এ প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের স্বল্পতায় নায়ক-নায়িকা ব্যতীত অন্যান্য চরিত্র অতিমাত্রায় উদ্ভাবিত হয়নি।
- *বিক্রমোর্বশী*-তে রাজার চরিত্রে গাম্ভীর্য *শাপমোচন*-এর সাপেক্ষে অনেকখানিই কম। তবে উভয় ক্ষেত্রেই তাদের বিরহদশায় নৃত্যোল্লেখ সমর্থিত।
- ত্রোটক তথা একটি উপরূপকের মানদণ্ড যদি নৃত্য হয়, তবে সেই প্রাচীন নৃত্যধারাগুলি ছিল পদার্থাভিনয়মূলক এবং বাচ্যার্থ সেখানে রমণীয়। জীবনবোধের রস সেখানে অনুপলব্ধ। রবীন্দ্রসংগীত যা দিয়ে *শাপমোচন* প্রলিপ্ত, সেখানে গানগুলির দার্শনিক ভাবসমৃদ্ধতার সঙ্গে রবীন্দ্রনৃত্য-ও বাক্যার্থদ্যোতক

এবং নান্দনিকতার দিক থেকে তুরীয়। এমনকি *বিক্রমোর্বশী*-তে নৃত্যের ভূমিকা অতি নগণ্য কিন্তু *শাপমোচন*-এ নৃত্য-ই প্রধানরূপে উপজীব্য।

গবেষণা-সন্দর্ভের এই অধ্যায়ের বিষয় ত্রোটক নামের উপরূপকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাট্যবিশেষের সম্পর্কবিধান। *শাপমোচন* -কে বিচার্যরূপে গ্রহণ ক'রে তার মধ্যে প্রাচীন ত্রোটক-এর গুণাবলি কতখানি রয়েছে এবং কতখানি নেই; তার জন্যই এই অধ্যায়ের অবতারণা। তাই অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ দু'দিক থেকেই খুঁটিনাটি বিষয় পরীক্ষার মাধ্যমে অবশেষে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়, তা হ'ল যে ত্রোটক-এর নাট্যতত্ত্বগত বিধিনিষেধের মধ্যে তার ব্যাকরণগত দিকগুলি রবীন্দ্ররচনায় পাওয়া গেলেও তার আঙ্গিক, কৌশল এবং প্রযুক্তিগত ভাবনায় বিস্তর পার্থক্য বর্তমান। তাই *মায়ার খেলা* বা *নটীর পূজা*-কে যথাক্রমে একটি 'নাটিকা' এবং 'প্রেঙ্খণ'রূপে প্রকাশ করা যতখানি অনায়াসে ঘটেছে, *শাপমোচন*-কে ত্রোটকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে ততখানিই প্রতিমুখতার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি *বিক্রমোর্বশী*-তে নাটিকা-র কিঞ্চিৎ ধর্মও বর্তমান। দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা পুরুরবার সঙ্গে তার প্রথমা পত্নীর সম্পর্কের অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করা যায় এবং সে কুপিতা নারী। তবে সাগরনন্দীর উল্লিখিত *মেনকানহুষ* বা সাহিত্যদর্পণোক্ত *স্তম্ভিতরম্ভ*-এও এরূপ দুই নারীর মধ্যে এক পুরুষের অবস্থানের কোনও পরিস্থিতি ছিল কিনা তা যেহেতু বলা যায়না, তাই এটিকে ত্রোটক-এর পালনীয় বিশিষ্টতা কিনা বলা যায়না। আবার দ্বিপদিকা, চর্চরীর ম'ত প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতিগুলি তদানীন্তন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল ব'লেই তা নাট্যে স্থান পেয়েছিল। যেহেতু সেই ধরণের নৃত্য বা তন্নাম্নী নৃত্য বর্তমানে প্রচলিত নেই এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে রবীন্দ্রনৃত্য অতিমাত্রায় চর্চিত, তাই যুগের পরিবর্তন বিষয়টিও লক্ষণীয়। একটি ত্রোটক-এর নৃত্য এবং সেই নৃত্যের জন্য ব্যবহৃত গানগুলির প্রতিলিপি বর্তমানে একাধিক শতাব্দীর ব্যবধানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই উপরূপকের নির্যাস পেতে হ'লে তাকে 'প্রাচীন'-এর বেড়ায় আবদ্ধ রাখলে চলবে না। আধুনিক সময়, সহৃদয়ের আর্থ-সামাজিক পরিবেশগত অবস্থান এবং ভারতীয় চারুকলার গতিপ্রকৃতি অনুসারেই তাকে নবরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই বিবেকীগণের কর্তব্য। তাই *শাপমোচন*-এ অভিশাপপ্রদানের মাধ্যমে স্বর্গীয় কোনও চরিত্র মর্ত্যলোকে এসে পৌঁছালে তাদের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটায় এবং পঞ্চাঙ্ক রীতি, পঞ্চসন্ধি ইত্যাদি যদি তার মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তাকে আধুনিক কালের উপরূপকরূপে গ্রহণ করতে শাস্ত্রলঙ্ঘনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়না। বর্তমানে যেমন বাংলা নাটকেও অঙ্কের পরিবর্তে দৃশ্য দেখা যায়, তেমনই কয়েকটি পরিবর্তনে একটি উপরূপকের সত্তা বিনষ্ট হয়না। তাই *শাপমোচন*-এ ত্রোটক ধর্মের অনুসন্ধানের পরে এটিকে এভাবেও ভাবা যেতে পারে যে একটি ত্রোটক-এর বিবর্তনের উদাহরণস্বরূপ *শাপমোচন* রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রসূত হয়েছে অচেতন মননেই।

উল্লেখপঞ্জি

১. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক - হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৪, পৃষ্ঠা - ২৮৮

২. দ্রষ্টব্য : দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৯৩-৯৪

৩.*রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন* – ভূমিকা, পৃষ্ঠা - ৫৪১

৪.*চিত্রা*, স্বর্গ হতে বিদায়, পৃষ্ঠা - ৯৯-১০৫

৫. *Ṛgveda-Saṃhitā : with the Commentary of Sāyaṇācārya : Vol IV Maṇḍalas IX-X*, সম্পাদক – S. . Sontakke ও C. . Kashikar, ১০/৯৫, পৃষ্ঠা - ৬৪০-৪৭

৬. *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য*, নবম অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১১২

৭. *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল*, সম্পাদক – অচিন্ত্য বিশ্বাস, ৮/১২, পৃষ্ঠা - ৩৮৩

৮. *Kalidasa's Meghadutam : with the commentary of Mallinath*, সম্পাদক – কুমুদরঞ্জন রায়, ১/১, পৃষ্ঠা - ১৪

৯. *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ : মহাকবি -শ্রীকালিদাসপ্রণীতম্*, সম্পাদক - হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৪/১, পৃষ্ঠা - ২৭৩

১০. *মানসী*, মেঘদূত, পৃষ্ঠা - ২১৯-২৫

১১. *প্রাচীন সাহিত্য*, মেঘদূত, পৃষ্ঠা - ১৪-১৭

১২. *তদেব*, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, পৃষ্ঠা - ১৮-৩২

১৩. *তদেব*, শকুন্তলা, পৃষ্ঠা - ৩৩-৫৪

১৪. *লিপিকা*, মেঘদূত, পৃষ্ঠা - ১৯-২২

১৫. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন*, প্রথম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৩

১৬. *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, সম্পাদক – রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কুশজাতক, পৃষ্ঠা - ১১০-১২

১৭. *রাতের তারা দিনের রবি*, সম্পাদক – উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, অমিয় প্রেমের মন্ত্রে বুদ্ধের শরণ লইলাম, পৃষ্ঠা - ৩০১

১৮. *রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধচর্চা*, রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি,পৃষ্ঠা - ১৬

১৯. *Mahāvastu Avadāna : Vol. 2*, সম্পাদক – রাধাগোবিন্দ বসাক, কুশজাতক, পৃষ্ঠা - ৫৬৬-৬৬৮

২০. *তদেব*, কুশজাতক, পৃষ্ঠা - ৬০২

২১. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন*, চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫১

২২. *Mahāvastu Avadāna : Vol. 2*, সম্পাদক – রাধাগোবিন্দ বসাক, কুশজাতক, পৃষ্ঠা - ৬০৬

২৩. *তদেব*, কুশজাতক, পৃষ্ঠা - ৬২১

২৪. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন*, দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৭

২৫. *তদেব, শাপমোচন*, চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫১

২৬. *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য*, নবম অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১১৮

২৭. *তদেব*, নবম অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১১৮-১৩৯

২৮. *তদেব*, নবম অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১২১

২৯. *তদেব*, নবম অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১২৭-২৯

৩০. *তদেব*, নবম অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১২৬

৩১. *তদেব*, নবম অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১৩৩-৩৪

৩২. *তদেব*, নবম অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১৩২

৩৩. *তদেব*, নবম অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১৩৫

৩৪. *তদেব*, নবম অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১৩৩

৩৫. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৭-১১, পৃষ্ঠা - ২৮৮-৮৯

৩৬. *তদেব*, ৬/২৭৩, পৃষ্ঠা - ৪১২

৩৭. *তদেব*, ৬/২৭৩, পৃষ্ঠা - ৪১২

৩৮. *সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোশ*, সম্পাদক – সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, একবিংশ অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ২৯১

৩৯. তত্রৈব

৪০. *তদেব,* একবিংশ অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ২৯২

৪১. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৭, পৃষ্ঠা - ২৮৮

৪২. *তদেব,* ৬/৭-১১ -এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ২৯০

৪৩. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২২৯

৪৪. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২২৯

৪৫. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২২৯

৪৬. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* প্রথম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৪

৪৭. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/৯, পৃষ্ঠা - ২৮৯

৪৮. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* প্রথম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৪

৪৯. *The Manusmṛti with the commentary Manvarthamuktāvalī of Kullūka,* সম্পাদক – নারায়ণ রাম আচার্য কাব্যতীর্থ, ৭/৪৭, পৃষ্ঠা - ২৫৫

৫০. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫৩

৫১. *তদেব, শাপমোচন,* চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫১

৫২. *তদেব, শাপমোচন,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫৩

৫৩. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/৩৮, পৃষ্ঠা - ৯১

৫৪. *রবীন্দ্র -নাট্য -সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৯

৫৫. *তদেব, শাপমোচন,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৭

৫৬. *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ : মহাকবি-শ্রীকালিদাসপ্রণীতম্,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫/১৬, পৃষ্ঠা - ৩৭২

৫৭. *রবীন্দ্র -নাট্য -সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫১

৫৮. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২১৪-২১৬

৫৯. *The Svapnavāsadatta of Bhāsa,* সম্পাদক – T Gaṇāpati Śāśtrī, বিষ্কম্ভক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্ক), পৃষ্ঠা - ৬৩

৬০. *তদেব,* ১/8, পৃষ্ঠা - ৩

৬১. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/১০, পৃষ্ঠা - ২৮৯

৬২. *তদেব,* ৬/২৭৩-এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৪১৩

৬৩. *সংগীত দামোদর,* সম্পাদক – মহুয়া মুখোপাধ্যায়, ৪/৪৩২, পৃষ্ঠা - ১৬৭

৬৪. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৭৩-এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৪১৩

৬৫. *তদেব,* ৩/১৯৭, পৃষ্ঠা - ১৯২

৬৬. *তদেব,* ৩/১৮৪, পৃষ্ঠা - ১৭৭

৬৭. *তদেব,* ৩/১৮৫, পৃষ্ঠা - ১৭৭

৬৮. *তদেব,* ১৯৩, পৃষ্ঠা - ১৮৭

৬৯. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* প্রথম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৪

৭০. *তদেব, শাপমোচন,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫২

৭১. তত্রৈব

৭২. *তদেব, শাপমোচন,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৪

৭৩. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/১৮৬, পৃষ্ঠা - ১৭৭

৭৪. *তদেব,* ৩/১৮৬, পৃষ্ঠা - ১৭৭

৭৫. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৫

৭৬. *তদেব, শাপমোচন,* দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৬

৭৭. তত্রৈব

৭৮. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/১০, পৃষ্ঠা - ২৮৯

৭৯. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২২৭

৮০. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫৩

৮১. *তদেব, শাপমোচন,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫৪

৮২. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২২৮-২২৯

৮৩. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৮

৮৪. *তদেব, শাপমোচন,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৯

৮৫. *তদেব, শাপমোচন,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫০

৮৬. *তদেব, শাপমোচন,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৯

৮৭. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২২৯-২৩১

৮৮. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫১

৮৯. *তদেব, শাপমোচন,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫২

৯০. তত্রৈব

৯১. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২৩০

৯২. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫২

৯৩. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২৩১-২৩২

৯৪. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫৩

৯৫. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২২৬

৯৬. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২২৬

৯৭. *সংগীত দামোদর,* সম্পাদক – মহুয়া মুখোপাধ্যায়, ৪/৪৩২, পৃষ্ঠা - ১৬৭

৯৮. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/১১, পৃষ্ঠা - ২৮৯

৯৯. *তদেব,* ৩/২০৯, পৃষ্ঠা ২০৬

১০০. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫৪

১০১. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৩/২০৯, পৃষ্ঠা - ২০৬

১০২. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫৪

১০৩. *তদেব, শাপমোচন,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫৩

১০৪. *তদেব, শাপমোচন,* পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫৪

১০৫. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/১০, পৃষ্ঠা - ২৮৯

১০৬. *সংগীত দামোদর,* সম্পাদক – মহুয়া মুখোপাধ্যায়, ৪/৪৩২, পৃষ্ঠা - ১৬৭

১০৭. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২৩৩

১০৮. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন,* তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৯

১০৯. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২৩৩

১১০. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২৩৩

১১১. দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২৩৩

১১২. দ্রষ্টব্য : প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৫৪

১১৩. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৭৩, পৃষ্ঠা - ৪১২

১১৪. *The Vikramōrvaśīyam, A Sanskrit play, by Kālidāsa*, সম্পাদক – শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত ও ভাস্কর রামচন্দ্র আত্রে, CRITICAL NOTICE (FIRST EDITION), পৃষ্ঠা - ২

১১৫. তত্রৈব

১১৬. *The Vikramōrvaśīyam of Kālidāsa*, সম্পাদক – M. . Kale, প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১

১১৭. *বিক্রমোর্বশী [ত্রোটকম্] : মহাকবি মহাকবি শ্রীকালিদাসবিরচিতা*, জীবনান্দ-বিদ্যাসাগর-ভট্টাচার্য্য, প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ২

১১৮. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/২৭৩-এর বৃত্তি, পৃষ্ঠা - ৪১৩

১১৯. *রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য*, তৃতীয় অধ্যায়, সেতুবন্ধ : নৃত্যনাট্যের আয়োজন পর্ব, পৃষ্ঠা - ১৩৩

১২০. *রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য : একটি নারীবাদী পাঠ*, শাপমোচন, পৃষ্ঠা - ৫৪-৫৯

১২১. *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য*, নবম অধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১৩২

১২২. *রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য : একটি নারীবাদী পাঠ*, শাপমোচন, পৃষ্ঠা - ৬১

১২৩. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন*, তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৯

১২৪. তত্রৈব

১২৫. তত্রৈব

১২৬. *তদেব, শাপমোচন*, তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৯-৫০

১২৭. *The Vikramōrvaśīyam, A Sanskrit play, by Kālidāsa*, সম্পাদক – শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত ও ভাস্কর রামচন্দ্র আত্রে, ১/৭, পৃষ্ঠা - ৯

১২৮. *তদেব*, ২/৫, পৃষ্ঠা - ৩৩

১২৯. *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬/১৬, পৃষ্ঠা - ২৯১

১৩০. *The Vikramōrvaśīyam, A Sanskrit play, by Kālidāsa*, সম্পাদক – শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত ও ভাস্কর রামচন্দ্র আত্রে, মিশ্রবিষ্কম্ভক (দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের মধ্যবর্তী), পৃষ্ঠা - ৭১-৭২

১৩১. *তদেব*, পঞ্চম অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১৭০

১৩২. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন*, পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫৪

১৩৩. *The Vikramōrvaśīyam, A Sanskrit play, by Kālidāsa*, সম্পাদক – শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত ও ভাস্কর রামচন্দ্র আত্রে, চতুর্থ অঙ্ক, গীতসংখ্যা ৯, পৃষ্ঠা - ১১৪A

১৩৪. *তদেব*, ২/৮, পৃষ্ঠা - ৩৬

১৩৫. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন*, দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৫

১৩৬. *তদেব, শাপমোচন*, দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৪৫-৪৬

১৩৭. *The Vikramōrvaśīyam, A Sanskrit play, by Kālidāsa*, সম্পাদক – শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত ও ভাস্কর রামচন্দ্র আত্রে, ২/১২-১৩, পৃষ্ঠা - ৪৯

১৩৮. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন*, পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা ৫৫২

১৩৯. *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ : মহাকবি -শ্রীকালিদাসপ্রণীতম্*, সম্পাদক – হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ, ৭/৩২, পৃষ্ঠা - ৬২০

১৪০. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, চিত্রাঙ্গদা*, পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৭৩০

১৪১. *The Vikramōrvaśīyam, A Sanskrit play, by Kālidāsa*, সম্পাদক – শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত ও ভাস্কর রামচন্দ্র আত্রে, Appendix I, চতুর্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা – ১০৮A-১৩৬A

১৪২. *বিক্রমোর্বশী [ত্রোটকম্] : মহাকবি মহাকবি শ্রীকালিদাসবিরচিতা*, জীবনান্দ-বিদ্যাসাগর-ভট্টাচার্য্য, চতুর্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা – ৩৬-১১৫

১৪৩. *The Vikramōrvaśīyam, A Sanskrit play, by Kālidāsa*, সম্পাদক – শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত ও ভাস্কর রামচন্দ্র আত্রে, Appendix I, চতুর্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১১৬A-১৩৬A

১৪৪. *তদেব*, চতুর্থ অঙ্ক, ৪/১৬ পৃষ্ঠা - ১২০A

১৪৫. *তদেব*, ৪/১৭, পৃষ্ঠা – ১২০A

১৪৬. তত্রৈব

১৪৭. *তদেব*, গীতসংখ্যা ১৬, পৃষ্ঠা – ১২০A

১৪৮. *তদেব*, Appendix I, চতুর্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা - ১১৪A

১৪৯. *তদেব*, ৪/৪, পৃষ্ঠা – ১১৪A

১৫০. *তদেব*, Appendix I, চতুর্থ অঙ্ক, গীতসংখ্যা ১৮, পৃষ্ঠা - ১২০A

১৫১. *তদেব*, গীতসংখ্যা ১৯, পৃষ্ঠা – ১২০A

১৫২. *তদেব*, Appendix I, চতুর্থ অঙ্ক, গীতসংখ্যা ২২, পৃষ্ঠা - ১২৩A

১৫৩. *রবীন্দ্রনাথের গান : অধরা মাধুরী-রূপের সন্ধানে*, পৃষ্ঠা - ১৮

১৫৪. *রবীন্দ্রায়ণ : দ্বিতীয় খণ্ড*, সম্পাদক – পুলিনবিহারী সেন, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য, পৃষ্ঠা - ২১৫

১৫৫. *Tagore's Mystique of Dance*, Bhava Nritya-Mood dance, পৃষ্ঠা - ১১৪

১৫৬. *রবীন্দ্রনৃত্য*, প্রাককথন, পৃষ্ঠা - ১

১৫৭. শ্রীমতী শুভ্রা ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত প্রবন্ধটি ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে

১৫৮. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, শাপমোচন*, চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা - ৫৫০

উপসংহার

উপসংহার

দীর্ঘ ছ'টি অধ্যায় জুড়ে প্রস্তাবিত অধ্যায়গুলির যথাবিধি গ্রন্থনার পরে নিয়মানুযায়ী উপসংহার পর্বে সমগ্র গবেষণার নির্যাস সারতঃ উপস্থাপন করাই গবেষকের দায়িত্ব। তাই "সংস্কৃত উপরূপক ও নির্বাচিত রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্য : নান্দনিক প্রসঙ্গ" এই বিষয়টি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তার একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করা যাক।

❖ গবেষণার নিষ্কর্ষ

প্রতিটি অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয়গুলির সারতত্ত্ব তুলে ধরা যাক।

- **প্রথম অধ্যায় :**

এই অধ্যায়রচনার মাধ্যমে যে তত্ত্বটি ধরা দিয়েছে, তা হ'ল 'উপরূপক' শব্দটির উৎস বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণ* বা অমৃতানন্দযোগীর *অলংকারসংগ্রহ*। তবে সংজ্ঞা নতুন হলেও সংজ্ঞী বহু প্রাচীন। ভরতোক্ত দশপ্রকার রূপকের সমান্তরালেই 'নাটিকা' নামক একটি বিশেষ নাট্যসংরূপ দিয়েই এই গোত্রের যাত্রার শুভ সূচনা ঘটেছিল। কালক্রমে নাটিকার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন করে প্রকরণিকা। অন্যদিকে স্বতন্ত্রভাবে বিরাজিত নৃত্য বা বলা ভালো নর্তনকলাগুলি যথা শ্রীগদিত, হল্লীশ, রাসক ইত্যাদিও একটি বিশিষ্ট ছত্রের আশ্রয়গ্রহণ করে। নাটিকার নেতৃত্বেই এই নৃত্যগুলিও কিঞ্চিৎ নাট্যিকরূপে ভারতীয় সৃজনশীল সংস্কৃতিতে অবতীর্ণ হয়। এভাবেই 'নৃত্য', 'পদার্থাভিনয়', 'স্বল্পমাত্ররঞ্জনক্ষম রূপক' ইত্যাদি অভিধাকে জয় ক'রে শেষ পর্যন্ত সারস্বত সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ক'রে হয়ে উঠেছে 'উপরূপক'। তাই এই চূড়ান্ত পরিণতির পরেও উপরূপকমালিকার মধ্যে যেটি প্রধানভাবে নেতৃত্ব দান করেছে, তা হ'ল নাটিকা। তাই ত্রোটক, সট্টক, নাট্যরাসক, গোষ্ঠী, প্রস্থান, হল্লীশ, ভাণিকার মধ্যেও রাসকের ম'ত প্রাচীন উপস্থাপনা উপরূপকের প্রধান বা প্রকৃতি হতে পারেনি। তাই উপরূপকের সংজ্ঞা প্রাপ্তিতে রাসক বা হল্লীশের একটি শাস্ত্রানুমোদিত উপাধি লাভ হওয়ায় সেই প্রযোজনাগুলির পদোন্নতি যেমন ঘটেছে, তেমনই নাটিকার প্রাধান্য খর্বিত হয়েছে ব'লেই মনে হয়। কারণ ভরতের সময় থেকে বিনোদনজগতে নাটিকার রচনা অব্যাহত ছিল। এমনকি এটির কোনও ইতিবৃত্তগত বা অঙ্কগত কোনও স্বরূপ পরিবর্তন-ও হয়নি *সাহিত্যদর্পণ*-এর সময় পর্যন্ত। অর্থাৎ নাটিকার রূপকত্বলাভের দাবী অসঙ্গত বা অন্যায্য হ'তনা। তাই বিশ্বনাথ কবিরাজ বা শুভঙ্কর এটিকে রূপকের ভূষণ না দেওয়ায় কিছু নৃত্যসঞ্জাত নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে একই সারিতে চিহ্নিত করায় নাটিকার রূপকসুলভ অহমিকা হ্রস্ব হয়েছে। শুধুমাত্র জৈন আলংকারিক বা মধ্যভারতের রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র, হেমচন্দ্রের ম'ত কিছু আলংকারিকগণের দৃষ্টিতে নাটিকা 'রূপক' আখ্যা লাভ করলেও সেই আসন চিরস্থায়ী হয়নি। তাই *দশরূপ, সাহিত্যদর্পণ*-এর ম'ত প্রকরণ গ্রন্থে নাট্যতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ের উদাহরণে *রত্নাবলী* তথা একটি নাটিকা পদে পদে উল্লিখিত হলেও সে একাদশতম রূপক হয়ে উঠতে পারেনি।

- **দ্বিতীয় অধ্যায় :**

এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বে উপরূপকের লক্ষ্য গ্রন্থ এবং উপরূপকের তত্ত্ববিষয়ক প্রাচীনতা এবং নবীনতার মধ্যে একটি সেতু নির্মাণের প্রয়াস করা হয়েছে। অষ্টাদশ উপরূপকের পৃথক পৃথক নামকরণ হয়েছিল তার আঙ্গিক এবং ভাববস্তুর আশ্রয়ে। তবে আধুনিক যুগের টীকাকারগণ বিশেষতঃ হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ এবং কৃষ্ণমোহন শাস্ত্রীর দুটি টীকা যথাক্রমে *কুসুমপ্রতিমা* এবং *লক্ষ্মী* টীকা কীভাবে নিরুক্তির দ্বারা উপরূপকের নামগুলিকে ব্যাখ্যা করেছেন, তা প্রথমেই দর্শিত হয়েছে। তবে এই টীকাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তির মাধ্যমে তার অর্থ উদ্ধার করেছে। তার ফলে রাসক এবং নাট্যরাসকের মৌলিক পার্থক্য উঠে আসেনি। এমনকি শিল্পক উপরূপকের প্রসঙ্গে ললিতকলার প্রাধান্যকেই স্বীকার করা হলেও কোনও নাট্যগ্রন্থ না থাকার ফলে তার যাথার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন চিহ্ন রয়েই যায়। সম্মিলিতভাবে রূপক এবং উপরূপকের শ্রেণিবিন্যাসে রূপক, রূপিকা এবং উপরূপক নামক তিনটি বিভাগকে নির্দেশ করা হয়েছে যা পূর্বকালে অপ্রস্তুত ছিল। এমনকি নাট্যপ্রভাবিত এবং নৃত্যপ্রভাবিতরূপেও উপরূপকের দুটি বিভাগ প্রস্তুত করা হয়েছে। রূপক এবং উপরূপকের পারস্পরিক সম্বন্ধে দেখানো হয়েছে নাটক-নাটিকা, ব্যায়োগ-সমবকার-প্রেঙ্খণ এবং ডিম-সংলাপকের সাযুজ্য। এই তিনটি ক্ষেত্রেই আভ্যন্তরীণ পরিকাঠামোগত সাদৃশ্য একটি প্রশ্নের জন্ম দেয় যে নাটক, ব্যায়োগ, সমবকারের ম'ত রূপক থাকা সত্ত্বেও কেন নাটিকা, প্রেঙ্খণ এবং সংলাপক উপরূপকের জন্ম হয়েছিল। অর্থাৎ উক্ত উপরূপকগুলি কি রূপক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল অথবা ভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যেমন 'প্রেঙ্খণ' নামটি গতি অর্থে জ্ঞাপিত এবং 'সংলাপক' শব্দটি বিশেষভাবে কিছু বচনের সমার্থক। তাই নাট্যবস্তুবাচক নামকরণ না হওয়ায় এবং নির্দিষ্ট কিছু রূপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় দূরদৃষ্টিক্রমে বলা যায় যে 'ব্যায়োগ' রূপকের আঙ্গিক অভিনয়রীতির পার্থক্যেই নতুন উপরূপক 'প্রেঙ্খণ'-এর জন্ম হয়েছিল এবং অন্যদিকে বাকচাতুর্য বা বাচিক অভিনয়ের তারতম্যের জন্যই 'ডিম' রূপক অপেক্ষা ভিন্ন উপরূপক 'সংলাপক'-এর জন্ম হয়েছিল।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে কয়েকটি উপরূপক যথা নাটিকা, প্রেঙ্খণ, উল্লাপ্য, শ্রীগদিত, ভাণিকার এমন কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে যা *সাহিত্যদর্পণ*-এর পরবর্তী যুগের। ফলতঃ বেশ কিছু লাক্ষণিক বৈভিন্ন্য পরিলক্ষিত হয়েছে উক্ত উপরূপকগুলির মধ্যে। অর্থাৎ সংস্কৃতির পরিবর্তন যে *সাহিত্যদর্পণ*-এর উত্তরকালেও ঘটেছে বা সাম্প্রতিককালেও ঘটে চলেছে, তার জন্যই এই পর্বের অবতারণা। অর্থাৎ এই পর্বের মাধ্যমে এটিরও সম্ভাবনা থেকে যায় যে পরবর্তীতে যদি উপরূপক সম্পর্কিত সংস্কৃত বা ভারতের যে কোনও প্রাদেশিক ভাষায় শাস্ত্ররচনা হয়, তবে সাহিত্যদর্পণোক্ত মতামতের কিঞ্চিৎ পরিমার্জন ঘটতে বাধ্য।

তৃতীয় পর্বে উপস্থাপিত হয়েছে আধুনিক কালের বিভিন্ন মনীষী এবং গবেষকদের উপরূপক-বিষয়ক মতাবলি। এর মধ্যে বিনয়চন্দ্র মজুমদারের মতটি অনেকখানিই বাস্তবতা পূর্ণ ব'লেই মনে করা হয়েছে। তিনি রূপক এবং উপরূপকের বিভেদের মধ্যে দেখিয়েছেন উভয়ের আবেদনগত পার্থক্য। রূপক এবং উপরূপকের ইতিবৃত্ত যাই হোক না কেন; রূপক বিনয়ী এবং সংযতভাবে তাকে পরিবেশন করলেও উপরূপক বাচার্থ্যপ্রভাবিত হয়ে জাগতিক

বা নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রকৃতিকে তদ্বৎ পরিবেশন করে। তাই রূপকের মধ্যে যে modesty থাকে, উপরূপকে তা অনেকাংশেই কম। উপরূপকে আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য অভিনয় এবং সংগীতের skill enhancement ঘটেছে। বিষয়বস্তু বা মূল নাট্যবার্তা অপেক্ষা তার আবেদনকৌশল একপ্রকার সহৃদয়কে সমাকৃষ্ট করেছিল।

চতুর্থ বা শেষ পর্বটি চমকপ্রদ। এই অংশে উনবিংশ শতকের কলিকাতায় নাট্যরাসক নামাঙ্কিত এক প্রকার নাট্যচর্চার তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তৎসহ রাজকৃষ্ণ রায়ের একটি মৌলিক বাংলা উপরূপক *নাট্যসম্ভব*-এর যাবতীয় তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতের কলিকাতা বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মধ্যে বাঙালিদের মধ্যেও উপরূপকচর্যার একটি কালিক জোয়ার এসেছিল, তার প্রমাণ এই অংশের আলোচনা।

- **তৃতীয় অধ্যায় :**

এই অধ্যায়টির বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাট্যকর্মের মধ্যে উপরূপকের একটি বিশেষ দিক যথা কাব্যধর্মিতার অবস্থান। সংস্কৃত উপরূপকগুলির মধ্যে শ্লোকসংখ্যার বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন *রত্নাবলী, কর্ণসুন্দরী, উন্মত্তরাঘব, দ্রৌপদীস্বয়ংবর* ইত্যাদি। গদ্যাংশ অপেক্ষা পদ্যাংশ পরিমাণ এই উপরূপকগুলিতে বেশি। তাই রবীন্দ্রনাথের একাধিক কাব্যনাট্য যেমন *বিসর্জন, রাজা ও রাণী, চিত্রাঙ্গদা* এবং নাট্যকাব্য *কর্ণকুন্তীসংবাদ, বিদায়-অভিশাপ,* তত্ত্বপ্রধান নাটক *বিসর্জন* ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য ক'তখানি উপরূপকের আঙ্গিকে ধরা দিয়েছে, তা উদাহরণসহযোগে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এখান থেকে যেমন প্রমাণিত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাট্য আপাতঃদৃষ্টিতে ব্যঞ্জনাধর্মী বা ধ্বনিপ্রধান সাহিত্য হলেও তার প্রকাশভঙ্গিতে বিশেষ ক'রে *চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ* কাব্যনাট্যে উপরূপকের নিজস্ব ধর্ম অনেকাংশেই বর্তমান।

আবার যেহেতু উপরূপকের মাতৃকা পদার্থাভিনয়প্রধান নৃত্য; তাই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাটগুলির মধ্যে পদার্থাভিনয় নাকি বাক্যার্থাভিনয় অধিক প্রভাবশালী; তাও উদাহরণসহযোগে বিশ্লেষিত হয়েছে। এই আলোচনার ফল হয় পৃথক। রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যগুলিতে প্রযুক্ত রবীন্দ্রনৃত্য (শান্তিনিকেতনী ঘরাণা) ক্রিয়াপ্রধান নয়; বরং তা ভাবসৌন্দর্যপ্রধান। সেখানে গানের বাণীর হুবহু অনুকরণ করা হয়না। তবে নৃত্যপ্রভাবিত উপরূপকগুলির নৃত্য কীরূপ ছিল; তার Raw Documentation না থাকায় এই আলোচনা হয়েছে উপরূপকের তত্ত্ব (theory) অনুযায়ী। তাই এই আলোচনা গবেষণার নিরীখে প্রয়োজনীয় হলেও তা চূড়ান্ত বা সর্বাংশেই সত্য এমন স্বীকারোক্তি অনুচিত।

- **চতুর্থ অধ্যায় :**

এই অধ্যায় নাটিকা উপরূপকের সঙ্গে *মায়ার খেলা*-র আত্মীকরণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিবাহ-আইনকে মাথায় রেখেই নিরপেক্ষভাবে এর বিচার, করা হয়েছে। তাই নাটিকায় পুরুষের দ্বিবিবাহ এখানে কাঙ্ক্ষিত নয়। বরং দুই নারীকে কেন্দ্র করে এক পুরুষের সম্পর্কের ঘূর্ণায়মান আবর্তের জটিল মনস্তত্ত্বের সুচারু উপস্থাপনা-ই এর লক্ষ্য। বহিরঙ্গ বা নাট্যতত্ত্বের (নায়ক-নায়িকা, রস, সন্ধি, বৃত্তি) দিকগুলির সঙ্গে যেমন নাটিকা

এবং *মায়ার খেলা*-র দূরত্ব ক্ষীণ হয়েছে, তেমনই অন্তরঙ্গতার (নাট্যচরিত্রচিত্রণ, চরিত্রের নামকরণ, ঋতুর বৈচিত্র্য) দিক থেকেও *মায়ার খেলা* প্রাচীন নাটিকা পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছে। উপরূপকের লক্ষণসঙ্গতি বা বহিরঙ্গ অপেক্ষা এই দিকটিই প্রধান; কারণ রূপক এবং উপরূপকের মধ্যে যে সীমারেখা নির্ধারিত ছিল, সেই পার্থক্যের বিষয়গুলি যদি *মায়ার খেলা*-য় দৃষ্ট হয়; তবে তা উপরূপক হয়ে উঠতে পারে। এমনকি এই অধ্যায়ের আলোচনার দ্বারাই বার্ণিক রায়ের উক্তিকে খণ্ডন করা হয়েছে ব'লেই মনে হয়। গবেষণার ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে বার্ণিক রায়ের মতে উপরূপকের ম'তত নিম্নশ্রেণীর নাট্যকলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের তুলনা অযৌক্তিক। অথচ *মায়ার খেলা*-র আভ্যন্তরীণ রচনা প্রমাণ করেছে এই রবীন্দ্রনাট্যে সংযমের অভাব রয়েছে যা নাটিকায় একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করত।

- **পঞ্চম অধ্যায় :**

এই অধ্যায়ের বিষয় প্রেঙ্খণ উপরূপকের সঙ্গে *নটীর পূজা*-র তুলনামূলক আলোচনা। এক্ষেত্রেও প্রেঙ্খণের প্রকৃতিগত ভাবনাকেই উপজীব্য ক'রে তোলা হয়েছে। দ্বন্দ্ব, সংঘাত, ভেদ, মতানৈক্য, হিংসাত্মক কর্মের নিদর্শন *নটীর পূজা* । তবে ভি রাঘবন-এর নাট্যরচনাতেই প্রেঙ্খণের পরিবর্তন এসেছিল। পুরুষদের পরিবর্তে নারীচরিত্রকে protagonist রূপে ব্যবহার করার সাহস তিনিই দেখিয়েছিলেন। তাই এই রবীন্দ্রনাট্যটি প্রেঙ্খণের লক্ষণের সঙ্গে সর্বাংশে যে সাযুজ্য বহন করতে পেরেছে, তা নয়; তবে নাট্যবার্তা এবং পরিবেশগত দিক থেকে এটি প্রেঙ্খণ না হলেও তার মিত্রসুলভ হতে পেরেছে।

- **ষষ্ঠ অধ্যায় :**

এটিই অন্তিম অধ্যায়। এই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় হ'ল ত্রোটক নামক নাট্যপ্রধান উপরূপকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-কৃত *শাপমোচন* কথিকার তুলনামূলক আলোচনা। ত্রোটক-কে *নাটকলক্ষণরত্নকোশ* নাটকেরই প্রকারভেদ রূপে মানলেও যেহেতু এই অধ্যায়ে মহাকবি কালিদাসের *বিক্রমোর্বশী* ত্রোটকের কথাও ব্যক্ত হয়েছে, তাই পরিশেষে বলা যায় যে *বিক্রমোর্বশী* উপরূপক-ই। কালিদাসের *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকে যে অভিশাপের দার্শনিক মাহাত্ম্য রয়েছে, তা *বিক্রমোর্বশী*-তে অনুপস্থিত। বরং এই অভিশাপ নায়ক-নায়িকার নর্মক্রীড়ার সহায়ক হয়ে উঠেছে। এমনকি উভয়ের ভোগলিপ্সার অতিরিক্ত কোনও গভীর মনস্তত্ত্ব এখানে নেই বললেই চলে। অন্যদিকে *শাপমোচন* ত্রোটকের ম'ত অভিশাপবৃত্তান্তের দ্বারা স্বর্গ এবং মর্ত্যের মেলবন্ধন ঘটালেও তা বিক্রমোর্বশী ত্রোটক অপেক্ষা উন্নত।

❖ **উপরূপক-এর সম্ভাব্য সংজ্ঞা :**

এই গবেষণার শেষে পাঠকের মনে একটি প্রশ্ন উদিত হতেই পারে যে তাহলে 'উপরূপক'-এর সংজ্ঞা কী? কারণ উপরূপকের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা এবং ফল দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বিবিধ বর্ষীয়ান পণ্ডিতদের উদ্ধৃতির ব্যাখ্যার মাধ্যমে। অথচ "উপরূপক কাকে বলে?" এই উত্তর দেওয়া হয়নি। তাই সংস্কৃত কারিকার বদলে যদি বাংলায় এই উপরূপকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তবে বলতে হয় যে আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য-সাত্ত্বিক এই চতুর্বিধ

অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত যে নাট্যধারা মূলতঃ সমাজজীবনের বিবিধ ঘটনার মধ্যে যুবক-যুবতীর কামলোলুপতা বা ভোগপ্রাচুর্য, নাগরিক জীবনের প্রান্তিক স্তরের মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের চাওয়া-পাওয়া, সমাজসমস্যার সমাধানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, রাত্রির অন্ধকারে নিষিদ্ধ বা দুর্গম বা জনহীন স্থানে ঘটে যাওয়া রোমাঞ্চকর বা উত্তেজনামূলক কাহিনি বা বুদ্ধিদীপ্ততাশূন্য হাস্যাস্পদ ও অতিমাত্রায় রোচক কোনও বিষয়ের ম'ত প্রভৃতি ঘটনাকে সমাজের কেবলমাত্র বিনোদনাকাঙ্ক্ষী শ্রেণির সহৃদয়ের সম্মুখে গান, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি মনোরঞ্জনকারী উপাদানের সাহায্যে অভিনীত হয়, যে নাট্যধারায় বক্তব্য অপেক্ষা তার অভিনয়রীতির চাতুরীকেই প্রধান ক'রে তোলা হয় এবং যে নাট্যধারায় অদ্ভুত রসের অভিব্যঞ্জনা ক্ষীণ ও শৃঙ্গার-হাস্য-রৌদ্র-ভয়ানক রসের আতিশয্য চরমভাবে উপভোগ্য, তা-ই 'উপরূপক'।

❖ **রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে উপরূপক :**

উক্ত তিনটি রবীন্দ্রনাট্যের বিশ্লেষণে যেটি অনুধাবন করা যায়, সে সম্পর্কে বলতে হয় যে এই তিনটি নাট্যের মধ্যে *মায়ার খেলা* গীতিনাট্যে উপরূপকের আঙ্গিক সর্বাধিক লক্ষণীয়। নাটিকা নামক বিশেষ উপরূপকরূপেও যেমন তার ইতিবাচকতা রয়েছে, তেমনই রাজকৃষ্ণ রায়ের রচনার ম'তই কোনও বিশেষ প্রকার উপরূপকব্যতীত সাধারণ উপরূপক হিসেবেও তাকে গণ্য করা যায় মূলতঃ অন্তরঙ্গ সাযুজ্যগুলির জন্যই। আবার কথিকারূপী *শাপমোচন* নাট্যটি ত্রোটক নামক উপরূপকের বিষয়বস্তু এবং নৃত্যের অবিচলতাকে বরণ করলেও নাট্যস্থ পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সম্পূর্ণ তাদাত্ম্য সম্বন্ধ তৈরি হয়নি বাচিক অভিনয়ের শূন্যতার জন্যই। *নটীর পূজা* এই দুটির মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে। সেখানে মানবতাবাদী দার্শনিক তত্ত্ব এতই প্রদীপ্ত যে প্রেক্ষণ উপরূপকের ভাবকল্প মিলে গেলেও মৌলতার দিক থেকে তা উপরূপক নয়।

তবে এই তিনটি নাট্যের অতিরিক্ত যে চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যের আলোচনা তৃতীয় অধ্যায় জুড়ে হয়েছে, সেখান থেকে বলা যায় যে *চিত্রাঙ্গদা*-ও প্রকার বিশেষ উপরূপক না হয়েও উপরূপকের তত্ত্ব-কে অনেকখানিই বহন করেছে। এমনকি *বসন্ত, শেষ বর্ষণ* এই ধরণের নাট্যগুলিও 'গোষ্ঠী' উপরূপকের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। সেখানে বিশেষ কোনও প্রধান নাট্যচরিত্র নেই এবং নৃত্যগীতের যথেচ্ছ উপক্রম লক্ষণীয়। আবার যদি নৃত্যনাট্যগুলির কথা বলা হয়, তবে সেক্ষেত্রে উপরূপকের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য থাকলেও প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাপেক্ষে বলতে হয় যে সেগুলিও যথার্থ উপরূপক নয়; কারণ উপরূপক নৃত্যনাট্য নয়। তুলনায় *বাল্মীকি-প্রতিভা* এবং *কালমৃগয়া* এই দুটি গীতিনাট্যকে উপরূপকের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। *বাল্মীকি-প্রতিভা* নাট্যে দস্যুদের সংলাপগুলি সুরসহযোগে উক্ত হয়। সেগুলি গদ্য থেকে গীতের প্রতি যাত্রার একটি পরিবৃত্তি বা স্থানান্তরণের চেষ্টা। এমনকি সেগুলি মঞ্চে কুশীলবদের গাওয়া উচিত; নেপথ্য থেকে নয়। আঙ্গিক অভিনয়-ও কিছুক্ষেত্রে অতিনাটকীয় হয়ে পড়ে। তাই উপরূপকের ছন্দ (pattern) সেখানে অধিকতর প্রকাশিত (exposed)। *শারদোৎসব, ডাকঘর, রক্তকরবী* এই ধরণের রূপক-সাংকেতিক নাট্যগুলির মধ্যে রূপক এবং উপরূপকের কোনও প্রকার বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান-ই কাম্য নয়। এগুলিকে রবীন্দ্রনাট্যের পাশাপাশি 'রবীন্দ্রাভিনেয় সাহিত্য' বললেও ভুল হবেনা। জীবনদর্শন এবং আধ্যাত্মিক স্তরের এমনই উচ্চ স্তরে এগুলির অবস্থান যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিনয়চন্দ্র

মজুমদারের উপরূপকসম্পর্কিত আলোচনার পরে পুনরায় এগুলির মধ্যে উপরূপকত্ব নির্ণয় করার প্রচেষ্টা-ই মূর্খতার পরিচয় হবে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাট্যের মধ্যে 'গীতনাট্য', 'ঋতুনাট্য' এবং 'কাব্যনাট্য' এই তিন ধারার নাট্যের মধ্যেই উপরূপকের নির্যাস সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দশরূপকের বিধিবিধান অনুসারে নাট্যরচনা করা উচিত এই মতকে অস্বীকার করলেও দেখা যাচ্ছে তাঁর তিনটি ধারার নাট্যের মধ্যে উপরূপকের আঙ্গিক গোপনে অধিকৃত হয়েছে। তাই উপরূপক না হলেও উপরূপকের ছায়া রয়েই গেছে এই ধরণের গ্রন্থনায়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাট্য যেমন রবীন্দ্রদর্শনের অভিজাত সম্পদ, তেমনই এগুলি উপরূপকের আঙ্গিকের নবপ্রজন্মস্বরূপ।

❖ **প্রারম্ভিক পর্বে উত্থাপিত প্রশ্নের সমাধান**

সুতরাং সমাপ্তি পর্বে এসে প্রতিজ্ঞাবাক্যগুলির পরখ ক'রে নেওয়া আবশ্যক ব'লেই বলতে হয় যে

- রবীন্দ্রনাট্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সুষম নৃত্যকলা রবীন্দ্রসাহিত্য অপেক্ষা রবীন্দ্রদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। সেখানে নৃত্য কথাকলি, মণিপুরী বা অন্য কোনও আঙ্গিকে অভিনীত হলেও একাধারে চারুত্ব এবং গুরুত্বকে বহন করবে।

- রবীন্দ্রনৃত্যে বাক্যার্থাভিনয়-ই মান্যতা পেয়েছে। তার উদাহরণ তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত *চিত্রাঙ্গদা, শাপমোচন*-এর নৃত্যাভিনয় সম্পর্কিত সাক্ষাৎকারগুলি।

- প্রাচীন উপরূপকগুলির মধ্যে প্রাপ্ত অভিনয়নির্দেশ বিষয়ক যে প্রশ্নটির কথা বলা হয়েছিল, তার উত্তরে বলতে হয় চতুর্থ অধ্যায়ের কথা। নাটিকার মধ্যে দেহজ কামশৃঙ্গারের একাধিক বর্ণনা থাকত, তার প্রমাণ *রত্নাবলী, কর্ণসুন্দরী*-র ম'ত নাটিকার প্রথম অঙ্ক। সেখানে প্রসঙ্গটি কামজ বিলাসের কিন্তু মঞ্চোপরি প্রত্যক্ষভাবে সেই সম্ভোগ শৃঙ্গারদৃশ্য দর্শিত হয়নি। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাট্যের মধ্যে *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যের অর্জুনের মধ্যেও রতিসঞ্চারমূলক একাধিক কবিতার উদাহরণে বোঝা যায় চিত্রাঙ্গদার অনুপস্থিতি কালের দৃশ্যতেই অর্জুনের সংলাপগুলি অধিকমাত্রায় কাব্যধর্মী। তাই নায়িকা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে সাক্ষাতে কোনও সম্ভোগ দৃশ্যের অতিনাটকীয়তা সেখানে না থাকায় উপরূপকের আঙ্গিককে বহন করেছে। *উন্মত্তরাঘব*-এও সীতাবিরহেই রামের শ্লোকাবৃত্তি। *মায়ার খেলা*-কে নাটিকারূপে কল্পনা করা হলেও সেখানে একই চরিত্রের ক্রমাগত গান ব্যবহৃত হয়নি। তাই একটি নাট্যরচনাকালেই নাট্যকারের দ্বারাই যে কিছু অনুক্ত নাট্যনির্দেশনা থেকেই যায়; তাই রবীন্দ্রনাট্যে এরকম কিছু অনুক্ত নির্দেশের কথা ভাবা যেতে পারে যে তাঁর কাব্যনাট্য অভিনীত হলে বাগভিনয়ে যত্নশীল হতে হবে অভিনেতাকে যাতে ক্রমাতগ কবিতাবৃত্তি শ্রবণে যেন মানসিক খেদ উৎপন্ন না হয়। তাই গীতিনাট্যের ক্ষেত্রেও গানের তাল পরিবর্তন করা হয়েছে।

- রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য ছাড়াও *বাল্মীকি-প্রতিভা*-র "কালী কালী বলো রে আজ", *অচলায়তন* নাটকের "আমরা চাষ করি আনন্দে" বা *মুক্তধারা*-র "নমো যন্ত্র" গানগুলির নৃত্যে পদার্থাভিনয় থাকলে তা দৃষ্টিকটু হয়না।

সেখানে সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা ছান্দস দোলন-ই কাম্য। এমনকি চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে আনন্দ চরিত্রের নৃত্য নেই। গানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে "জল দাও" , "কল্যাণ হোক" আঙ্গিক অভিনয়ের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। তবে সেই আঙ্গিকে লালিত্য থাকে তা বলাই বাহুল্য। তাই বলা যেতে পারে যে কোনও কোনও রবীন্দ্রনাট্যে পদার্থাভিনয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

- রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য উপরূপকের নামান্তর নয়। কারণ উপরূপক মাত্রেই নৃত্য নয়; নাটিকা, ত্রোটক, সংলাপক, প্রেঙ্খণ জাতীয় উপরূপক আদ্যন্ত সাংগীতিক নয়। অর্থাৎ সংগীত উপরূপকের অপরিহার্য অঙ্গ নয়।

- রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য বা রবীন্দ্রকাব্যনাট্যকে 'রবীন্দ্রোপরূপক' বলা নিতান্তই অর্বাচীনতার পরিচায়ক। তার কারণ *ফাল্গুনী* নাট্যকাব্যে তিনি বলেছেন যে তাঁর নাট্য প্রত্যক্ষভাবে রূপক-এর conventional form-এ গঠিত হবেনা।

- রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয়কৌশল বিষয়ে দৃঢ় মতামত পরিবেশন করা এই গবেষণার দ্বারা নির্ণীত হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু এই গ্রন্থনা কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রীর নিজস্ব অভিজ্ঞতাস্বরূপ একটি নিবন্ধ নয়, তাই সাধ্যের অতীত বিষয়কে কল্পনার দ্বারা ব্যক্ত না করাই বিধেয়।

- রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যে পুরুষ বা নারীর নৃত্যভূমিকার সঙ্গে উপরূপকের যোগসূত্র বিধান করার জন্য উপযুক্ত দুটি উপরূপকের কথা বলা যায়। যথা *বিক্রমোর্বশী* এবং *উন্মত্তরাঘব* । সেখানে পুরুষের নৃত্য বা ছান্দসিক শরীরী প্রকাশের নির্দেশ রয়েছে। আবার *অভিনবভারতী*-তে উল্লিখিত হল্লীসক নৃত্তপ্রবন্ধে দেখা যায় কৃষ্ণের নর্তন। তাই রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যে পুরুষ চরিত্র প্রযুক্ত হওয়ায় অন্ততঃ এটি বলা যেতে পারে যে নৃত্যের ভূমিকায় লিঙ্গবিধির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পার্থপাথেয় উল্লাপ্যে নারীচরিত্রের গান থাকলেও তা নৃত্যসহ অভিনীত হওয়ার নির্দেশ নেই। অথভ সমস্ত রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যেই নায়িকাত নৃত্যভূমিকা অপরিসীম।

- রবীন্দ্রনৃত্য কোনও বিশেষ শৈলীর আধানে দৃশ্যায়িত হয়না। এই বিষয়ে ভূমিকা-র গ্রন্থসমীক্ষা পর্বে রবীন্দ্রনৃত্য-বিষয়ক যে গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিতে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত রয়েছে। এমনকি এই গবেষণাতেও উপরূপকের জন্য নির্দিষ্ট নৃত্যশৈলী সম্পর্কে কোনও তথ্য বা তত্ত্ব পরিবেশিত হওয়ার অবকাশ ঘটেনি। তাই এই প্রশ্নটির উত্তর-ও অমীমাংসিত রয়ে যায়।

- রবীন্দ্রনৃত্যব্যতীত ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক লোকনৃত্য বা শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে উপরূপকের নির্যাস রয়েছে তা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তবে এগুলি যেমন scripted নয়; তেমনই *সাহিত্যদর্পণ*-এ উল্লিখিত বেশিরভাগ উপরূপক-ই বর্তমানে অনুপলব্ধ হওয়ায় এমন সম্ভাবনাও রয়ে যায় যে *কেলি-রৈবতক, বালিবধ, দেবী-মহাদেব* এগুলি কোনও একক নাট্যকারের রচনা ছিল নাকি কোনও প্রচলিত লোকসংস্কৃতিগত নাট্যধারা। তার কারণ রাসলীলা, মদনদহন, নৃসিংহবিজয়, রামলীলা এগুলি

লোকপ্রচলিত নাট্যধারা। তাই *ভাবপ্রকাশন*-এর উদাহরণগুলি সম্ভবতঃ কোনও একক কবির নির্দিষ্ট রচনা নয় বলেই প্রতীতি জন্মায়।

❖ **সিদ্ধান্ত :**

এই দীর্ঘ গবেষণার অন্তিম লগ্নে উপস্থিত হয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, তাকে দুভাবে ভাগ করা যেতে পারে। যথা মীমাংসিত এবং অমীমাংসিত। যে বিয়গুলি প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলি হ'ল –

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনার পূর্বেই কলিকাতা অঞ্চলে বাঙালিদের দ্বারা উপরূপকের রচনা সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে রাজকৃষ্ণ রায় চিরস্মরণীয়।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর *রত্নাবলী* এবং *বিক্রমোর্বশী*-র বাংলা অনুবাদমূলক নাট্যরচনা করেছেন। সুতরাং জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে নাটিকা এবং ত্রোটকের নবরূপায়ণ ঘটেছে।
- উপরূপক এবং নির্বাচিত তিনটি রবীন্দ্রনাট্যের মধ্যে *মায়ার খেলা*-র সঙ্গে নাটিকা শ্রেণীর উপরূপকের যে নিবিড় আত্মীয়তা রয়েছে, তা অন্য দুটি নাট্য যথা *নটীর পূজা* এবং *শাপমোচন*-এর সঙ্গে যথাক্রমে প্রেঙ্খণ এবং ত্রোটকের সম্পর্ক ততখানি ঘনিষ্ঠ নয়।
- খ্রিস্টিয় বিংশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত রবীন্দ্রনাট্যের মধ্যে উপরূপকের সুরভি যতখানি আঘ্রাত হয়, শান্তিনিকেতন পর্বে রচিত রবীন্দ্রনাট্যের মধ্যে ততখানি অনুভূত হয়না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে মায়ার খেলা জোড়াসাঁকো-পর্বের রচনা এবং *নটীর পূজা* এবং *শাপমোচন* শান্তিনিকেতন-পর্বের রচনা।
- ভরতোক্ত *নাট্যশাস্ত্র* এবং *সাহিত্যদর্পণ* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধীত ছিল। তথাপি তিনি তাঁর নাট্যরচনায় রূপক বা উপরূপকের প্রতিলিপি নির্মাণ করেননি।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধিক ক্ষেত্রে 'নাটিকা' শব্দের ব্যবহার করলেও তার অর্থ উপরূপকরূপী নাটিকা নয়। পঞ্চাঙ্করীতি বিবর্জিত, সাংগীতিক কাঠামোয় সুসজ্জিত এবং তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত নাট্যরচনা-ই তাঁর দৃষ্টিতে 'নাটিকা'।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবশিষ্য তথা রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য-যুগের অন্যতম অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব শান্তিদেব ঘোষ উপরূপকের মূল ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তথাপি তিনি রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যকে 'উপরূপক' রূপে স্বীকৃতি না দিয়ে ভারতের আঞ্চলিক নৃত্যাত্মক নাট্যগুলির মধ্যে উপরূপকের অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন।

এছাড়া এই গবেষণার পরেও যে বিষয়গুলি অমীমাংসিত থেকে গেছে, তা হ'ল –

- উপরূপকের আদি নৃত্যশৈলীর স্বরূপ।
- উপরূপকের উদাহরণগুলি কোনও একক নাট্যকারের নির্দিষ্ট রচনা।

- অনাদিমিশ্রের *রাসসংগোষ্ঠী* নামক গোষ্ঠী উপরূপকের বিচার।
- শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বা কীভাবে উপরূপকের তত্ত্ব সম্পর্কে নিষ্ণাত হয়েছিলেন।

❖ গবেষণার উপযোগিতা

যেহেতু এই গবেষণাকার্যটি Indian Performing Arts বিষয়ক। তাই সংস্কৃত বিভাগ ব্যতীত এর ব্যাপ্তি আরও কয়েকটি বিষয় পর্যন্ত হতে পারে। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, সংগীতবিদ্যা (Musicology) এবং নাট্যবিদ্যা (Theatre Studies)-র ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানান্বেষণে সহায়ক হতে পারে। এমনকি উপরূপকের তত্ত্ব সম্পর্কে অভিহিত হয়ে কোনও নাট্যকার যে কোনও ভাষায় নতুন কোনও উপরূপক রচনা করতে পারেন। যেমন ত্রোটক-কে বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুসারে স্বর্গ এবং মর্ত্যের পৌরাণিক পটভূমিকার বদলে আয়াস (মর্ত্য) এবং অনায়াসের (স্বর্গ) ধারণায় নবরূপে ত্রোটক রচনা হতে পারে। আবার নাগরিক জীবনের কোনও যুবকের সঙ্গে একাধিক নারীর সাহচর্যে নির্মিত হতে পারে কোনও উল্লাপ্য। প্রান্তিক স্তরের মানুষজনের প্রেমাখ্যান নিয়ে হতে পারে কোনও প্রস্থান উপরূপক।

❖ সম্ভাব্য আগামী গবেষণা

এখানে যে বিষয়গুলি অমীমাংসিত রয়েছে, সেগুলিকে কেন্দ্র ক'রে যেমন কোনও শোধকার্যের সম্ভাবনা রয়েছে; তেমনই আরও কয়েকটি বিষয়ে গবেষণার সুযোগ উজ্জ্বল হতে পারে। যথা –

- অপরাপর রবীন্দ্রনাট্যে উপরূপকের অনুসন্ধান।
- ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় রচিত আধুনিক কালের নাট্যের মধ্যে উপরূপকের অনুসন্ধান।
- প্রাচীন ভারতের লোকসংস্কৃতিতে উপরূপকের অবদান।

অর্থাৎ উপরূপক প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিরই একটি অঙ্গ। তাই একাধারে এটি প্রাচীন, প্রথাসিদ্ধ, ঐতিহ্যবাহী এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই নাট্যধারা সুপ্তভাবে অনুসৃত হয়ে চলেছে ভারতের বর্তমান নাট্যশৈলীতেও। আশা করা যায় ভবিষ্যতেও এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব থাকবে অব্যাহত।

গ্রন্থপঞ্জি

❖ **সংস্কৃত ও পালি আকর গ্রন্থ**

▪ **বিভাগ-ক**

অগ্নিপুরাণ. পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা). *অগ্নিপুরাণম্.* কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ.

অমরসিংহ. *অমরকোশ.* ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস শ্রেষ্ঠী (সম্পা). *অমরকোশঃ : শ্রীমদমরসিংহবিরচিতঃ.* মুম্বই : স্বকীয় "শ্রীবেঙ্কটেশ্বর" স্টীম যন্ত্রালয় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৩৫ শকাব্দ.

আনন্দবর্ধন. *ধ্বন্যালোক.* সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য্য (সম্পা). *আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য-প্রণীত ধ্বন্যালোক ও আচার্য্য অভিনবগুপ্ত-বিরচিত লোচন.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ.

কালিদাস. *অভিজ্ঞানশকুন্তল.* হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ (সম্পা). *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ : মহাকবি-শ্রীকালিদাসপ্রণীতম্.* হেমচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৬০ শকাব্দ (২য় সং).

কালিদাস. *বিক্রমোর্বশী.* জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্তৃক ব্যাখ্যায়িত এবং আশুবোধ-বিদ্যাভূষণ ও নিত্যবোধ-বিদ্যারত্ন কর্তৃক পরিবর্ধিত. *বিক্রমোর্বশী [ত্রোটকম্].* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : বাচস্পত্য যন্ত্র কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৫.

কালিদাস. *বিক্রমোর্বশী.* সুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী. *মহাকবি-শ্রীকালিদাসবিরচিতম্ বিক্রমোর্বশীযম্.* মুম্বই : নির্ণয় সাগর মুদ্রণালয় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৯৪২.

জগন্নাথ. *রসগঙ্গাধর.* দেবর্ষিভট্ট মথুরানাথ শাস্ত্রী (সম্পা). *মহাকবিশ্রীজগন্নাথপণ্ডিতরাজবিরচিতো নাগেশভট্টকৃতটীকযা চ সহিতো রসগঙ্গাধরঃ.* মুম্বই : সত্যভামাবাঈ পাণ্ডুরঙ্গ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৯৪৭.

দণ্ডী. *কাব্যাদর্শ.* চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় (সম্পা). *শ্রীদণ্ড্যাচার্য্যবিরচিতঃ কাব্যাদর্শঃ,* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৫.

দামোদর. *কুট্টনীমত.* ত্রিদিবনাথ রায় (অনু). *কুট্টনীমতম্ : দামোদর গুপ্ত কবি বিরচিতং.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ.

দীপবংশ. স্বামী দ্বারিকাপ্রসাদ (অনু) ও পরমানন্দ সিংহ (সম্পা). *বৌদ্ধ ধর্ম কে ইতিহাস কা প্রামাণিক গ্রন্থ দীপবংস.* বারাণসী : বৌদ্ধ আকর গ্রন্থমালা; মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠ, ১৯৯৬.

নন্দিকেশ্বর. *অভিনয়দর্পণ.* হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (সম্পা). *শ্রীনন্দিকেশ্বরবিরচিত অভিনয়দর্পণ.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ.

নাগেশভট্ট. *পরমলঘুমঞ্জুষা.* বিজয়া গোস্বামী (সম্পা). *পরমলঘুমঞ্জুষা.* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৬.

পাণিনি. *অষ্টাধ্যায়ী.* তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য (সম্পা). *পাণিনিপ্রণীত অষ্টাধ্যায়ী.* কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৪.

পাণিনি. *ধাতুপাঠ.* কনকলাল শর্মা (টিপ্পণী). *শ্রীমৎপাণিনিমুনিপ্রণীতঃ ধাতুপাঠঃ : ধাত্বর্থপ্রকাশিকয়া টিপ্পণ্যা সমলঙ্কৃতম্.* বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, ১৯৬৯

বাগ্ভট. *কাব্যানুশাসন.* শিবদত্ত শর্মা ও বাসুদেব শর্মা কর্তৃক সংশোধিত. *শ্রীমদ্বাগভটবিরচিতং কাব্যানুশাসনম্ : তেনৈব কবিনা বিনির্মিতয়া ব্যাখ্যয়া সমলংকৃতম্.* মুম্বই : নির্ণয়সাগর যন্ত্রালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯১৫.

বামন. *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি.* শ্রীকৃষ্ণ মূরী (সম্পা). *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ : বামনবিরচিতা.* শ্রীরঙ্গনগর : শ্রীবাণীবিলাস মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৯০৯.

বাল্মীকি. *রামায়ণ.* দ্বারকাপ্রসাদ শর্মা (সম্পা). *সচিত্র শ্রীমদ্বাল্মীকি-রামাযণ [হিন্দীভাষানুবাদ সহিত] : কিষ্কিন্ধাকাণ্ড - ৫.* এলাহাবাদ : রামনারায়ণ লাল পব্লিশর ঔর বুকসেলর, ১৯২৭.

বাৎসায়ন. *কামসূত্র.* মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা). *মহর্ষিবাৎসায়নপ্রণীতং কামসূত্রম্.* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৩ (২য় সং).

বিজয়পাল. *দ্রৌপদীস্বয়ংবর.* শান্তিপ্রসাদ পণ্ড্যা. *মহাকবিবিজযপাল-বিরচিতম্ দ্রৌপদীস্বযংবরম্.* আমদাবাদ (আহমদাবাদ) : ইতিহাসসর্বজ্ঞ শ্রী হেমচন্দ্রাচার্য নবম জন্মশতাব্দী স্মৃতি সংস্কার শিক্ষপ্রণিধি, ১৯৯৩

বিশ্বনাথ-কবিরাজ. *চন্দ্রকলা.* প্রভাতশাস্ত্রী সাহিত্যাচার্য্য (সম্পা). *সাহিত্যদর্পণকার আচার্যবিশ্বনাথপ্রণীতা চন্দ্রকলানাটিকা.* এলাহাবাদ : দেবভাষা প্রকাশন, ১৯৮৪ (৫ম সং).

বিশ্বনাথ-কবিরাজ. *সাহিত্যদর্পণ.* যোগেশ্বরদত্ত শর্মা পারাশর (সম্পা). *সাহিত্যদর্পণম্ : দ্বিতীয় খণ্ড.* দিল্লী : নাগ পাবলিশার্স, ২০০০.

বিশ্বনাথ-কবিরাজ. *সাহিত্যদর্পণ.* হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ (সম্পা). *সাহিত্যদর্পণঃ : শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজ-প্রণীতঃ.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৮১ (৫ম সং-এর পুনর্মুদ্রণ).

বিশ্বনাথদেব. *মৃগাঙ্কলেখা.* রামপ্রতাপ (সম্পা). *আচার্য তথা নাটিকাকার বিশ্বনাথদেববিরচিত সাহিত্যসুধা এবং মৃগাঙ্কলেখা (ভাগ-২).* দিল্লী : ঈস্টর্ন বুক লিংকর্স, ২০১৮.

বিহ্লণ. *কর্ণসুন্দরী.* অবিনাশ চন্দ্র (সম্পা). *মহাকবিশ্রীবিহ্লণবিরচিতা কর্ণসুন্দরীনাটিকা.* প্রয়াস (এলাহাবাদ) : গঙ্গানাথ ঝা কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, ২০০৩.

ভট্টোজিদীক্ষিত. *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী.* গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা (সম্পা). *শ্রীমদ্ভট্টোজিদীক্ষিতবিরচিতা বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী বালমনোরমা-তত্ত্ববোধিনীসহিতা (কারকপ্রকরণান্তা) : প্রথমো ভাগঃ.* দিল্লী : মোতীলাল বারাণসীদাস, ২০১০ (১১শ মুদ্রণ), (১ম সং-১৯৬১).

ভাগবতপুরাণ. বিজনবিহারী গোস্বামী (অনু) ও ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ মহারাজ (সম্পা). *শ্রীমদ্ভাগবতম্ : দশমস্কন্ধমাত্রম্ (পূর্ব্বার্দ্ধ) শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্.* শ্রীধাম মায়াপুর : ঈশানোদ্যানস্থিত “শ্রীচৈতন্যবাণী” যন্ত্রে শ্রীমদ্ভক্তিবারিধিস্বামী পরিব্রাজক মহারাজ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ৫১৪ গৌরাব্দ.

ভাগবতপুরাণ. রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (অনু). *শ্রীমদ্ভাগবতম্ মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীতম্ : সপ্তমস্কন্ধঃ.* বহম্পুর (বহরমপুর) : রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৯২ বঙ্গাব্দ.

ভামহ. *কাব্যালংকার.* রামানন্দ শর্মা (সম্পা). *আদ্যাচার্য ভামহবিরচিত কাব্যালঙ্কার.* বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, ২০০২.

ভোজদেব. *শৃঙ্গারপ্রকাশ.* রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী ও সদাশিবকুমার দ্বিবেদী (সম্পা). *শৃঙ্গারপ্রকাশঃ [সাহিত্যপ্রকাশঃ] : প্রথমো ভাগঃ [১ -১৪ প্রকাশাঃ]ও দ্বিতীয়ো ভাগঃ [১৫ -২৫, ২৭ -৩৬ প্রকাশাঃ]* নঈ দিল্লী : ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় কলাকেন্দ্রম, বারাণসী : কালিদাসসংস্থানম, ২০০৭

মথুরাদাস. *বৃষভানুজা.* পাণ্ডুরঙ্গ জাবজী (সম্পা). *শ্রীমথুরাদাসবিরচিতা বৃষভানুজা.* মুম্বই : স্বীয় নির্ণয় সাগর মুদ্রণযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৯২৭ (২য় সং).

মম্মট. *কাব্যপ্রকাশ.* ঝলকীকর (সম্পা). *কাব্যপ্রকাশঃ : অলংকারসন্দর্ভঃ মম্মটভট্টবিরচিতঃ.* দিল্লী : পরিণত পাবলিকেশন্স, ২০০৮ (পুনর্মুদ্রিত), (১ম সং – ১৯১৭) .

মিশ্র, প্রভুনারায়ণ. *পার্থপাথেয়. পার্থপাথেযং নাম উল্লাপ্যম্.* বেনারস (বারাণসী) : শ্রী লক্ষ্মণ ঝা দানাধ্যক্ষ দ্বারা প্রকাশিত, ১৯৮৪.

রাঘবন, ভি. *প্রেক্ষণকত্রয়ী.* মাদ্রাজ (বর্তমানে চেন্নাই) : শ্রীরামচন্দ্র প্রিন্টিং ওয়ার্কস মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৯৫৬.

রাজশেখর. *বিদ্ধশালভঞ্জিকা.* রমাকান্ত ত্রিপাঠী (সম্পা). *মহাকবিশ্রীরাজশেখরবিরচিতা বিদ্ধশালভঞ্জিকা : ‘প্রকাশ’ হিন্দী ব্যাখ্যোপেতা.* বারাণসী : চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬৫

রূপগোস্বামী. *দানকেলিকৌমুদী.* রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (অনু). *দানকেলিকৌমুদী নাটিকা.* বহরমপুর : রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ.

ললিতাসহস্রনামস্তোত্র. বটুকনাথ শাস্ত্রী ও শীতলাপ্রসাদ উপাধ্যায় (সম্পা). *ভাস্কররায়-গ্রন্থাবলী [প্রথমো ভাগঃ] : ললিতাসহস্রনামস্তোত্রম্ (ব্যাখ্যাদ্বয়োপেতম্).* বারাণসী : সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩.

শুভঙ্কর. *সংগীতদামোদর.* মহুয়া মুখোপাধ্যায় (অনু). *সংগীত দামোদর.* কলকাতা : (দ্য) এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৯.

শূদ্রক. *মৃচ্ছকটিক.* হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ (সম্পা). *মৃচ্ছকটিকম্ : কবিপ্রবর-শ্রীশূদ্রকরাজেন বিরচিতম্.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৫৬ শকাব্দ.

সাগরনন্দী. *নাটকলক্ষণরত্নকোশ.* সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (সম্পা). *সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোশ.* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৭.

স্কন্দপুরাণ. পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা). *স্কন্দপুরাণম্ : সপ্তখণ্ডাত্মকম্ শ্রীমন্মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : 'বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন' প্রেসে নটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ.

হেমচন্দ্র. *অভিধানচিন্তামণি.* হরগোবিন্দ শাস্ত্রী (সম্পা). *কলিকালসর্বজ্ঞ-শ্রীহেমচন্দ্রাচার্যবিরচিতঃ অভিধানচিন্তামণিঃ : সটিপ্পণ 'মণিপ্রভা' হিন্দীব্যাখ্যাবিমর্শোপেতঃ.* বারাণসী : চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬৪.

- **বিভাগ-খ**

Avadāna-Śataka. P. L. Vaidya (Ed). *Avadāna-Śataka.* Darbhanga : The Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 1958.

Bharata. *Nāṭyaśāstra.* M. Ramkrishna Kavi (Ed). *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Chapter 1-7 Illustrated Vol I.* Baroda (now Vadodara) : Oriental Institute, 1956.

Bharata.*Nāṭyaśāstra.* Ramkrishna Kavi (Ed), V. M. Kulkarni & Tapasvi Nandi (Rsvd Ed), R.I. Nanavati (Gen Ed). *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni : with the commentary Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya : Vol II.* Vadodara, Oriental Institute, 2001.

Bhāsa. *Svanpavāsavadatta.* T. Gaṇapati Śāśtrī (Ed). *The Svanpavāsavadatta of Bhāsa : Edited with notes.* Trivandum (now Thiruvananthapuram): Published under the authority of the Govt of his highness The Maharaja of Travancore, 1912.

Bhojadeva. *Sarasvatī-Kaṇṭhābharaṇa.* Paṇḍit Kedārnāth Śarma & Wāsudev Laxmaṇ Śāśtrī Paṇśīkar (Ed). *The Sarasvatī-Kaṇṭhābharaṇa of Dhāreshvara Bhojadeva : with Commentaries of Rāmsinha (I-III) and Jagaddhara (IV).* Bombay (now Mumbai) : "Nirnaya-Sagara" Press, 1934.

Dhanañjaya. *Daśarūpa.* F E Hall (Ed). *Daśarūpam with Dhanika's Commentary.* Calcutta (now Kolkata) : The Asiatic Society, 1989.

Hemacandra. *Kāvyānuśāsana.* Ramananda Sharma. *Kāvyānuśāsanam of Acharya Hemacandra.* Varanasi : Krishnadas Academy, 2000.

Kālidāsa. *Kumārasamvaba.* M. R. Kale (Ed). *Kumārasamvaba of Kālidāsa.* Delhi : Motilal Baranasidass, 1981 (7th Ed).

Kālidāsa. *Mālavikagnimtra.* Kāśīnāth Pāṇḍuraṅg Parab (Ed). Wāsudev Laxmaṇ Śāśtrī Paṇśīkar (Rvsd). *The Mālavikagnimtra of Kālidāsa : with the Commentary of Kātyavema.* Bombay (now Mumbai) : "Nirnaya-Sagara" Press, 1924.

Kālidāsa. *Meghadūta.* Kumudranjan Ray (Ed). *Kalidasa's Meghadūtam : with the commentary of Mallinath : Cantos I-X.* Calcutta (now Kolkata) : Printed by Lakshmi Janardan Press, 1959.

Kālidāsa. *Raghuvamśa.* Moreshwar Ramchandra Kale (Ed). The Raghuvamśa of Kālidāsa : with The Commentary (the Sanjīvanī) of Mallinātha. Bombay (now Mumbai) : Gopal Narayen & Co, 1922 (3rd Ed).

Kālidāsa. *Vikramōrvaśī.* Shankar Pandurang Pandit & Bhāskar Rānchandra Atre (Ed). *Vikramōrvaśīyam : a Sanskrit play by Kālidāsa.* Bombay (now Mumbai) : Government Central Book Depot, 1901 (3rd Ed).

Kautīlya. *Arthaśāstra.* T. Gaṇapati Śāśtrī (Ed). *Arthaśāstra of of Kauṭalya : Edited with the commentary 'Srīmūlā' of Mahāmahopādhyāya T. Gaṇapati Śāśtrī* . Delhi : Bharatiya Vidya Prakashan, 1990 (2nd Ed).

Madana. *Pārijtānañjarī.* E. Hultzsch (Ed). *Pārijātamañjarī or Vijayaśrī : a Nāṭikā composes about A.D. 1213.* Bombay (now Mumbai) : "Nirnaya-Sagara" Press, 1906.

Mādhavabhaṭṭa. *Subhadrāharaṇa.* Pandit Durgaprasad & & Kāśīnāth Pāṇḍuraṅg Parab (Ed). *The Subhadrāharaṇa of Mādhavabhaṭṭa.* Bombay (now Mumbai) : Nirṇaya Sāgara Press, 1888.

Mahāvastu Avadāna. Radhagovinda Basak (Ed). *Mahāvastu Avadāna : Vol. 2.* Calcutta (now Kolkata) : Sanskrit College, 1965.

Manu. *Manusmṛti.* Nārāyaṇ Rām Āchaya Kāvyatīrtha (Ed). *The Manusmṛti with the commentary Manvarthamuktāvalī of Kullūka.* Bombay (now Mumbai) : Satyabhāmābāi Pāṇḍuraṅg, for the Nirṇaya Sāgara Press, (publishing year is not mentioned).

Nāgārjuna.*Mahāprajñāpāramitāśāstra.* Gelongma Karma Migme Chodron (Trans). *The Treatise on the Great Virtue of Wisdom of Nāgārjuna. (Mahāprajñāpāramitāśāstra) : Vol II – Chapter XVI-XXX.* (Year, Place and Publishing House are not mentioned).

Rājaśekhara. *Kāvyamīmāmsa.* Madhusudana Miśra. *The Kāvyamīmāmsa of Rājaśekhara : Edited with the Madhusūdani Commentary.* Benares (Varanasi) : The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1934.

Rāmacandra-Guṇacandra. *Nāṭyadarpaṇā.* K. H. Trivedi (Ed). *The Nāṭyadarpaṇā of Rāmacandra and Guṇacandra : A Critical Study.* Ahmedabad : L. D. Institute of Indology, 1966.

Ṛgveda-Saṃhitā. N. S. Sontakke & C. G. Kashikar (Ed). Ṛgveda-Saṃhitā with the commentary of Sāyaṇācārya : Vol IV - Maṇḍalas IX-X. Poona (now Pune) : Vaidika Saṃśodhana Maṇḍala, 1946.

Samrajya Lakshmi Pithika. K. Vāsudeva Śāśtrī K. S. Subrahmanya Śāśtrī (Ed). *Samrajya Lakshmi Pithika (The Emperor's Manual)*. Tanjore : Published by S. Gopalan, 1952.

Śāradātanaya. *Bhāvaprakāśana*. Yaduraja Yatigiri Swami & K S Ramaswami Sastri (Ed). *Bhāvaprakāśana of Śāradātanaya*. Baroda (now Vadodara) : Oriental Institute, 1968 (2nd Ed), (1st Ed – 1930) .

Śārṅgadeva. *Saṅgītaratnākara*. S Subrahamanya Sastri (Ed). *Saṅgītaratnākara of Śārṅgadeva : with Kalānidhi of Kallinatha and Sudhākara of Siṃhabhūpala : Vol. IV – Adhyāya 7*. (Place not mentioned) : The Adyar Library, 1953.

Śrīharṣa. *Priyadarśikā*. Vishṇu Dāji Gadre (Ed). *The Priyadarśikā of Śrī Harshadeva*. Bombay (now Mumbai) : Nirṇaya Sāgara Press, 1884.

Śrīharṣa. *Ratnāvalī*. M. R. Kale (Ed). *The Ratnāvalī of Śrī Haraha-deva*. Bombay (now Mumbai) : Gopal Narayan & Co., 1925.

Śukranītisāra. Gustav Oppert. (Ed). *Śukranītisāra : Vol 1*. Madras (now Chennai) : Printed by E. Keys, at the Government Press, 1882.

The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal. Rājendralāl Mitra (Ed). Calcutta (now Kolkata) : The Asiatic Society of Bengal, 1882.

Vāmana. *Kāvyālaṃkārasūtravṛtti*. Srikrishnamuri (Ed). *Kavyalankarasurtra Vritti : with the commentary Kamadhenu*. Srirangam : Sri Vani Vilas Press, 1909.

Vidyānātha. Pratāparudrayaśobhuṣaṇa. Kamalāśankara Prānaśankara Trivedī (Ed). Pratāparudrayaśobhuṣaṇa of Vidyānātha : with the Commentary, Ratnāpana, of Kumārasvāmin, son of Mallinātha. Mumbai : Government Central Press, 1909.

Virūpakṣadeva. *Unmattarāghava*. V. Krishnamacharya (Ed). *Unmattarāghava of Virūpakṣadeva*. The Adyar Library, 1946.

Viśvanātha. *Saugandhikāharaṇa.* Mahāmahopādhyāya Pāṇḍit Śivadatta & Kāśīnāth Pāṇḍuraṅg Parab (Ed). *The Saugandhikāharaṇa of Viśvanāthakavi.* Bombay (now Mumbai) : Nirṇaya Sāgara Press, 1902.

Williams, Monier. *A Sanskrit-English Dictionary.* Oxford : Clarendon Press, 1960 (rpt), (1st Ed – 1899).

❖ **বাংলা আকর গ্রন্থ**

কাশীরামদাস. *মহাভারত.* সুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও পরিশোধিত. *কাশীদাসী অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত [মহামুনি বেদব্যাস প্রণীত মূল সংস্কৃত হইতে].* পূর্ণচন্দ্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ.

চক্রবর্ত্তী, বিহারীলাল. *সারদামঙ্গল.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ.

চৌধুরী, অহীন্দ্র. *নিজেরে হারায়ে খুঁজি : প্রথম পর্ব.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ.

ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ. *জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী (চতুর্থ ভাগ).* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : বসুমতী সাহিত্য মন্দির.

ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ. *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি.* বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পা). কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *কড়ি ও কোমল.* আশুতোষ চৌধুরী (সম্পা). কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা): আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড সংস্করণ).* শোভন সোম (সম্পা). কলকাতা : রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়, ২০১০, (১১শ মুদ্রণ), (১ম প্রকাশ - ২০০৩).

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *চিঠিপত্র : চতুর্দশ খণ্ড.* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *চিত্রা.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩০২ বঙ্গাব্দ.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *জীবনস্মৃতি.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ (১ম সং-এর ৪র্থ মুদ্রণ)

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *নৈবেদ্য.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ (বিশ্বভারতী-র ৮ম পুনর্মুদ্রণ), (১ম প্রকাশ – ১৩০৮ বঙ্গাব্দ).

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *প্রাচীন সাহিত্য.* কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ (২৫তম মুদ্রণ), (১ম প্রকাশ – ১৩১৪ বঙ্গাব্দ).

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *মানসী.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ (১৩৫০ বঙ্গাব্দের নূতন সংস্করণের ১৬শ পুনর্মুদ্রণ), (১ম প্রকাশ – ১২৯৭ বঙ্গাব্দ).

ঠাকুর, *রবীন্দ্রনাথ. রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড.* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড.* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *রবীন্দ্র-রচনাবলী : একবিংশ খণ্ড.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : বিশ্বভারতী, ১৯৭১ (২য় সং), (১ম সং – ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ).

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *রবীন্দ্র-রচনাবলী : পঞ্চবিংশ খণ্ড.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : বিশ্বভারতী, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রিত), (১ম সং – ১৩৫৫বঙ্গাব্দ).

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *রবীন্দ্র-রচনাবলী : সপ্তদশ খণ্ড.* কলকাতা : বিশ্বসভায়, ১৪১০ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রিত) (১ম সং – ১৪০৭ বঙ্গাব্দ).

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *লিপিকা.* কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ (১৮শ পুনর্মুদ্রণ), (১ম প্রকাশ – ১৩২৯ বঙ্গাব্দ).

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *সঞ্চয়িতা.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ (৮ম সং).

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *সংগীতচিন্তা.* কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ (২য় সংস্করণের ৪র্থ পুনর্মুদ্রণ), (১ম প্রকাশ – ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ).

বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ. *সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্কভঞ্জন* . কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত এবং শ্রীরাম নৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত, ১২৮১ বঙ্গাব্দ.

রায়, রাজকৃষ্ণ. *নাট্যসম্ভব.* কলিকাতা : আলবার্ট প্রেস থেকে প্রকাশিত, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ.

রায়, রাজকৃষ্ণ. *পতিব্রতা নাট্যগীতি* . কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : শ্রী বিশ্বম্ভর চন্দ্র দ্বারা প্রকাশিত ও জহরিলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত, ১২৮২ বঙ্গাব্দ.

সরলা দেবী. *জীবনের ঝরাপাতা.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : সাহিত্য সংসদ, ১৮৭৯ শকাব্দ.

❖ **বাংলা সহায়ক গ্রন্থ**

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর. *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব.* ক্যালকাটা (বর্তমানে কলকাতা) : সংস্কৃত প্রেস ডিসপোসিটরি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৭৯ (৪র্থ সং).

কুণ্ডু, প্রণয়কুমার. *রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য.* কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ৩য় সং), (১ম প্রকাশ – ১৯৬৫).

ঘোষ, শঙ্খ. *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক.* কলকাতা : রত্নাবলী, ১৯৯৫.

ঘোষ,শান্তিদেব. *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য.* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ (চতুর্থ মুদ্রণ) (প্রথম সং—১৩৯০ বঙ্গাব্দ).

ঘোষ, শান্তিদেব, *রবীন্দ্রসঙ্গীত.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা): বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ (৬ষ্ঠ সং), (১ম সং- ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ).

চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ. *রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া.* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫.

চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী. *ভারতের নৃত্যকলা.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৫ (৩য় সং).

চৌধুরী, দর্শন. *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস.* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫.

দাশ, ভবেশ. *কলকাতা বেতার : ২.* কলকাতা : গাঙচিল, ২০১৪.

দাশগুপ্ত, মানস. *তাল- অভিধান.* কলকাতা : অ্যালফা ইনফোটেক কর্তৃক মুদ্রিত, ১৪০২.

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন. *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ.

দে সরকার, পুলকেশ. *রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র.* কলকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : আলোকচক্র : ১৯৫৯.

দেব, চিত্রা. *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল.* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড.

নাথ, দেবতোষ. *রবীন্দ্র নৃত্যতত্ত্ব.* শিলচর : নতুন দিগন্ত প্রকাশনী, ২০১৯.

প্রতিমা দেবী, *নৃত্য.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ (৩য় মুদ্রণ), (১ম সং-১৩৫৬).

বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী. *বাংলার লোকনাট্য যাত্রা ও সাতটি রবীন্দ্র-নাটক.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ.

বন্দ্যোপাধ্যায়, কনক. *রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯৫০.

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত. *নটীর পূজা : রবি পরিক্রমা.* কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৯.

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ. *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস.* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১০ (২য় সং-এর ৪র্থ মুদ্রণ), (১ম সং – ১৯৮৮).

বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র/বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা. *রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিক.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : মিত্রালয়, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ.

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ/বাগল, যোগেশচন্দ্র. *সাহিত্যসাধকচরিতমালা : চতুর্থ খণ্ড.* কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১৭.

বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহাশিস. *রবীন্দ্র নৃত্য বিরচনা.* কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ২০১০.

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. *বঙ্গীয় শব্দকোষ : প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড,* নিউ দিল্লী : সাহিত্য অকাদেমি, (সাল অনুল্লিখিত) (১ম প্রকাশ – ১৩৪০-৫৩ বঙ্গাব্দ).

বসু, সৌমিত্র. *রবীন্দ্রনাটকের নির্মাণশৈলী : উনিশ শতক.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : সেরা প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩.

বিশী, প্রমথনাথ. *রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ.* কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ২০১৭ (৭ম সং) (১ম সং - ১৯৭৩).

বিশী, প্রমথনাথ. *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ (২য় সং-এর পুনর্মুদ্রণ), (১ম প্রকাশ – ১৩৫১ বঙ্গাব্দ).

বিশ্বাস শৈলেন্দ্র/সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র. *Samsad Bengali-English Dictionary.* ক্যালকাটা (বর্তমানে কলকাতা) : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬ (৩য় মুদ্রণ), (১ম সং – ১৯৬৮) .

বিশ্বাস, সুখেন. *নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য.* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১০.

ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ. *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা.* ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ (৭ম পরিমার্জিত সংস্করণ), (প্রথম সং-১৩৬১ বঙ্গাব্দ).

ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ. *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ : তৃতীয় খণ্ড* . কলকাতা : নাথ ব্রাদার্স, ১৯৮২

ভট্টাচার্য, সাধনকুমার. *এরিস্টটলের পোয়েটিক্স্ ও সাহিত্যতত্ত্ব.* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫ (১০ম সং) (১ম সং – ১৯৭৮) .

মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার. *রাতের তারা দিনের রবি.* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

মিশ্র, অশোককুমার. *রবীন্দ্রনাট্যে রূপ : অরূপ.* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১১

মুখোপাধ্যায়, অমর্ত্য, *রবীন্দ্রনৃত্য.* কলকাতা : স্পার্ক বুক কোম্পানি, ২০১৯.

মুখোপাধ্যায়, কল্পিকা. *প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যে সঙ্গীত.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : সুবর্ণরেখা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ.

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার. *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক : প্রথম খণ্ড.* কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ (৬ষ্ঠ সং – এর মুদ্রণ), (১ম সং – ১৩৪০ বঙ্গাব্দ).

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার. *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক : দ্বিতীয় খণ্ড.* নরেশ গুহ ও শিবানী রায় (সম্পা). কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ (৫ম সং – এর ৫ম মুদ্রণ), (১ম সং – ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ).

মৈত্র, শেফালী. *রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য : একটি নারীবাদী পাঠ.* কলকাতা : এবং মুশায়েরা, ২০১৯.

রায়, বার্ণিক. *হ্বাগনের ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য.* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯ (২য় সং) (১ম সং – ১৯৬৩).

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ. দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (সম্পা). *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ : তৃতীয় খণ্ড.* নাথ ব্রাদার্স, ১৯৮২.

শিকদার, অশ্রুকুমার. *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য.* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০১৪.

সরকার, পবিত্র. *নাটমঞ্চ নাট্যরূপ.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : প্রমা প্রকাশনী, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ.

সেন, অমিয়কুমার/সেন, নীলিমা. *সুরের গুরু.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : অনন্য প্রকাশন, ১৯৬৫.

সেন, ইন্দ্রাণী. *রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য : সেকাল থেকে একাল.* কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০২২.

সেন, পুলিনবিহারী. *রবীন্দ্রায়ণ (দ্বিতীয় খণ্ড).* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : বাক্ - সাহিত্য, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ.

❖ **বাংলা পত্রিকা**

মজুমদার, বিনয়চন্দ্র. *নাট্যরুচি. প্রবাসী : প্রথম ভাগ – ফাল্গুন -চৈত্র : একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা.* রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.). কলিকাতা (কলকাতা), ১৩০৮ বঙ্গাব্দ.

সরকার, অশোক কুমার. *শারদীয়া দেশ পত্রিকা.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ.

❖ হিন্দি সহায়ক গ্রন্থ

गुन्देचा, सङ्गीता. *भास का रङ्गमञ्च*. दिल्ली : न्यू भारत बुक कॉरपोरेशन, २०१८ (२य सं).

चक्रवाल, इन्द्रा. *उपरूपकों का उद्भव और विकास*. वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन, १९८६.

सिन्हा, जयश्री. *संस्कृत नाटिका विमर्श*. दिल्ली : कैपिटल पब्लिशिंग हाउस, १९८५.

❖ ইংরেজি আলোচনামূলক গ্রন্থ

Banerjee, Utpal K. *Tagore's Mystique of Dance.* New Delhi : Niyogi Books, 2011.

Banerjee, Sruti. *Rabindranritya : the idiom created by Tagore.* New Delhi, Subhi Publishers, 2019

Dey, Sushil kumar. *History of Sanskrit PoeticsPoetics : in two volumes.* Calcutta (now Kolkata) : Firma K L Mukhopadhyay, 1960 (2^{nd} Ed).

Sur, H. C. *Comprehensive English-Bengali Dictionary.* Calcutta (now Kolkata) : S. K. Lahiri & Co., 1901.

Thapar, Romila. *A History of India : Vol 1.* England : Penguin Books, 1985 (13^{th} rpt), (1^{st} Ed – 1966) .

Uparūpaka-s in Indian Performing Arts. (Ed.) Deepti Omchery Bhalla. Mumbai : Bharatiya Vidya Bhavan, 2023.

পরিশিষ্ট

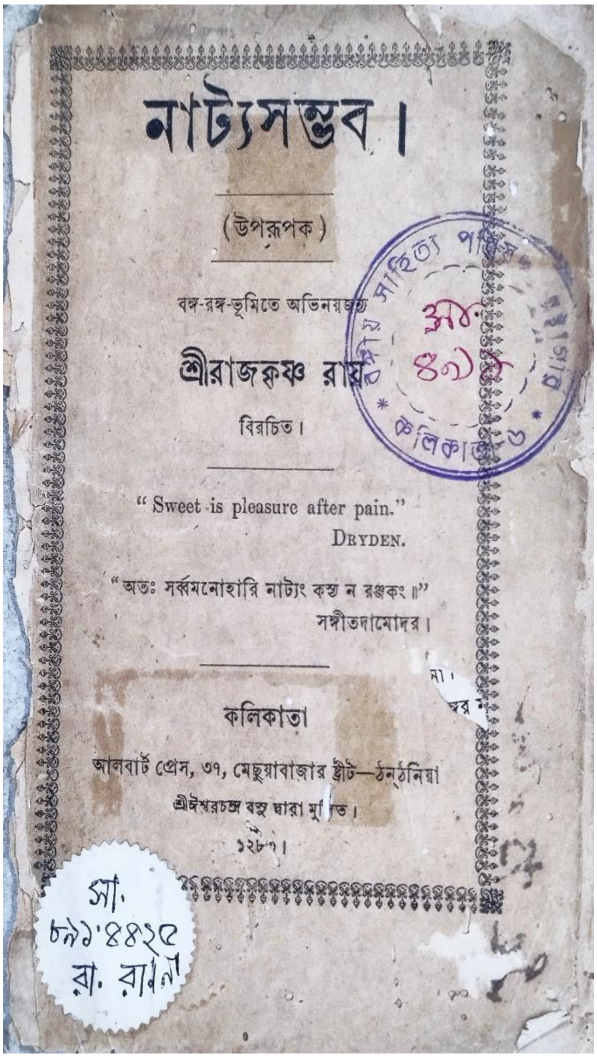
নাট্যসম্ভব।

(উপরূপক)

বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে অভিনয়জন্য

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়

বিরচিত।

"Sweet is pleasure after pain."
DRYDEN.

"অতঃ সর্ব্বমনোহারি নাট্যং কস্য ন রঞ্জকং॥"
সঙ্গীতদামোদর।

কলিকাতা

আলবার্ট প্রেস, ৩৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—ঠনঠনিয়া
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।
১২৮৭।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ সংরক্ষিত *নাট্যসম্ভব* উপরূপক গ্রন্থ

'চিদাকাশ কলালয়' কর্তৃক আয়োজিত 'ভাণোৎসব' নাট্যপ্রযোজনা-র প্রচারপুস্তিকা (ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

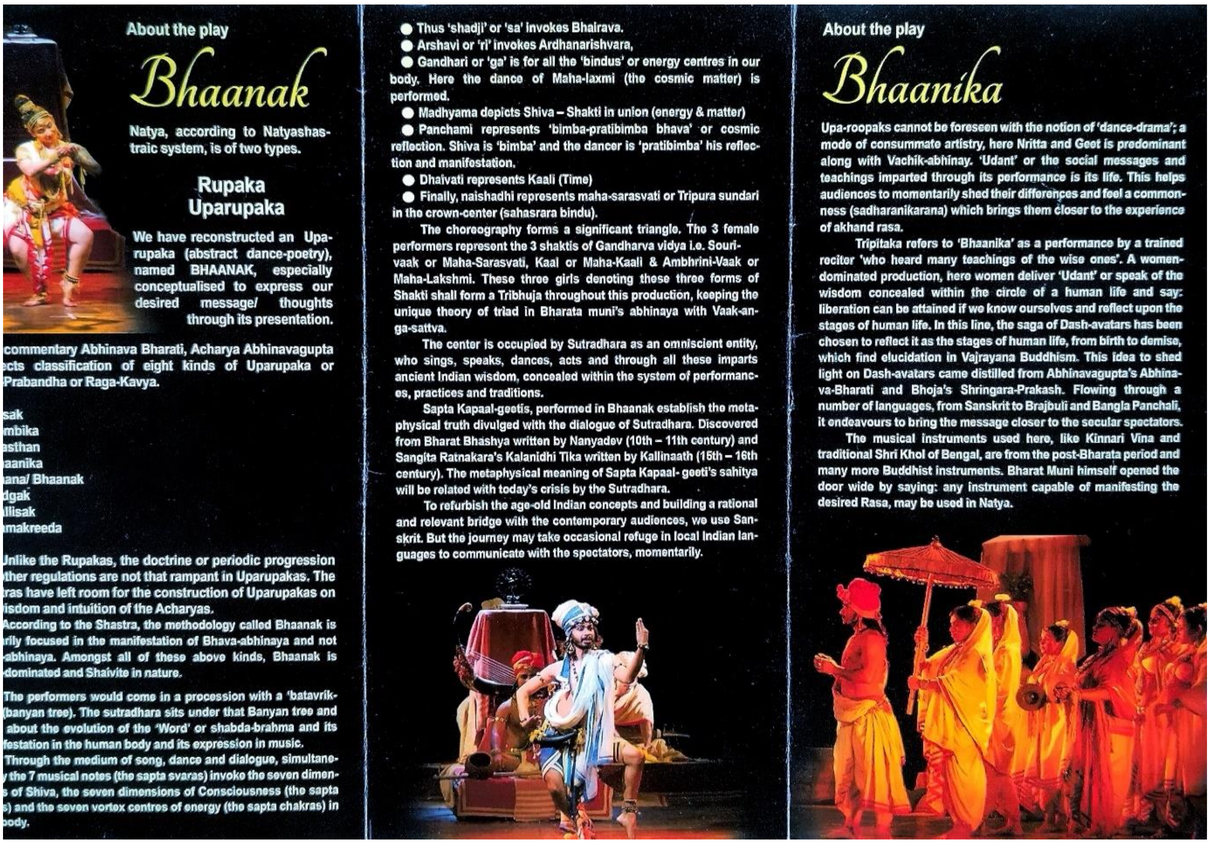

About the play

Bhaanak

Natya, according to Natyashastraic system, is of two types.

Rupaka
Uparupaka

We have reconstructed an Uparupaka (abstract dance-poetry), named BHAANAK, especially conceptualised to express our desired message/ thoughts through its presentation.

commentary Abhinava Bharati, Acharya Abhinavagupta ects classification of eight kinds of Uparupaka or Prabandha or Raga-Kavya.

sak
mbika
asthan
aanika
ana/ Bhaanak
dgak
llisak
makreeda

Jnlike the Rupakas, the doctrine or periodic progression ther regulations are not that rampant in Uparupakas. The ras have left room for the construction of Uparupakas on isdom and intuition of the Acharyas.

According to the Shastra, the methodology called Bhaanak is rily focused in the manifestation of Bhava-abhinaya and not abhinaya. Amongst all of these above kinds, Bhaanak is dominated and Shaivite in nature.

The performers would come in a procession with a 'batavrik- (banyan tree). The sutradhara sits under that Banyan tree and about the evolution of the 'Word' or shabda-brahma and its festation in the human body and its expression in music.

Through the medium of song, dance and dialogue, simultane- y the 7 musical notes (the sapta svaras) invoke the seven dimen- s of Shiva, the seven dimensions of Consciousness (the sapta s) and the seven vortex centres of energy (the sapta chakras) in body.

- Thus 'shadji' or 'sa' invokes Bhairava.
- Arshavi or 'ri' invokes Ardhanarishvara,
- Gandhari or 'ga' is for all the 'bindus' or energy centres in our body. Here the dance of Maha-laxmi (the cosmic matter) is performed.
- Madhyama depicts Shiva – Shakti in union (energy & matter)
- Panchami represents 'bimba-pratibimba bhava' or cosmic reflection. Shiva is 'bimba' and the dancer is 'pratibimba' his reflection and manifestation.
- Dhaivati represents Kaali (Time)
- Finally, naishadhi represents maha-sarasvati or Tripura sundari in the crown-center (sahasrara bindu).

The choreography forms a significant triangle. The 3 female performers represent the 3 shaktis of Gandharva vidya i.e. Sourivaak or Maha-Sarasvati, Kaal or Maha-Kaali & Ambhrini-Vaak or Maha-Lakshmi. These three girls denoting these three forms of Shakti shall form a Tribhuja throughout this production, keeping the unique theory of triad in Bharata muni's abhinaya with Vaak-anga-sattva.

The center is occupied by Sutradhara as an omniscient entity, who sings, speaks, dances, acts and through all these imparts ancient Indian wisdom, concealed within the system of performances, practices and traditions.

Sapta Kapaal-geetis, performed in Bhaanak establish the metaphysical truth divulged with the dialogue of Sutradhara. Discovered from Bharat Bhashya written by Nanyadev (10th – 11th century) and Sangita Ratnakara's Kalanidhi Tika written by Kallinaath (15th – 16th century). The metaphysical meaning of Sapta Kapaal- geeti's sahitya will be related with today's crisis by the Sutradhara.

To refurbish the age-old Indian concepts and building a rational and relevant bridge with the contemporary audiences, we use Sanskrit. But the journey may take occasional refuge in local Indian languages to communicate with the spectators, momentarily.

About the play

Bhaanika

Upa-roopaks cannot be foreseen with the notion of 'dance-drama'; a mode of consummate artistry, here Nritta and Geet is predominant along with Vachik-abhinay. 'Udant' or the social messages and teachings imparted through its performance is its life. This helps audiences to momentarily shed their differences and feel a commonness (sadharanikarana) which brings them closer to the experience of akhand rasa.

Tripitaka refers to 'Bhaanika' as a performance by a trained reciter 'who heard many teachings of the wise ones'. A women-dominated production, here women deliver 'Udant' or speak of the wisdom concealed within the circle of a human life and say: liberation can be attained if we know ourselves and reflect upon the stages of human life. In this line, the saga of Dash-avatars has been chosen to reflect it as the stages of human life, from birth to demise, which find elucidation in Vajrayana Buddhism. This idea to shed light on Dash-avatars came distilled from Abhinavagupta's Abhinava-Bharati and Bhoja's Shringara-Prakash. Flowing through a number of languages, from Sanskrit to Brajbuli and Bangla Panchali, it endeavours to bring the message closer to the secular spectators.

The musical instruments used here, like Kinnari Vina and traditional Shri Khol of Bengal, are from the post-Bharata period and many more Buddhist instruments. Bharat Muni himself opened the door wide by saying: any instrument capable of manifesting the desired Rasa, may be used in Natya.

'ভাণোৎসব'-এর প্রচারপুস্তিকায় ভাণক ও ভাণিকা-র বিবরণ

২০১২ সালে বিশ্বভারতী-তে অনুষ্ঠিত *মায়ার খেলা*-য় মায়াকুমারীগণ

(ড. তমালিকা দে-র সৌজন্যে প্রাপ্ত)

২০১৩ সালে বিশ্বভারতী-তে অনুষ্ঠিত *নটীর পূজা*-য় শ্রীমতী ও উপালি

(অধ্যাপক তথা চিত্রশিল্পী সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

২০০৭ সালে বিশ্বভারতী-তে অনুষ্ঠিত *শাপমোচন*-এ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী

(ড. তমালিকা দে-র সৌজন্যে প্রাপ্ত)

২০০৭ সালে বিশ্বভারতী-তে অনুষ্ঠিত *শাপমোচন*-এ অরুণেশ্বর ও কমলিকা

(ড. তমালিকা দে-র সৌজন্যে প্রাপ্ত)

২০১৮ সালে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ অনুষ্ঠিত *শাপমোচন*-এ কমলিকা ও অরুণেশ্বর

(টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর প্রাক্তন ছাত্রী স্বাতী ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত)